ডলার করিয়া। তা' ছাড়া, ঐ ফাউণ্ডেসন হইতে ছাত্রগণের অপরাপর ব্যয় প্রদান করা হইবে। যে সকল ছাত্র আমেরিকায় শিক্ষালাভার্থ বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের নির্ব্বাচন করিবেন ভারতের সায়েণ্টিফিক বোর্ড অব ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড (Scientific Board of Indian Research Fund)। যে সকল মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট বেতন লইয়া ভারতে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ঘটিত কার্য্যে কোন সাধারণ সভা-সমিতির (জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটীর) অধীনতায় নিযুক্ত আছেন, কিম্বা কোন চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেই ছাত্রগণ বৃত্তি লাভের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। ভারত-বাসীরা এই বৃত্তিলাভের অধিকারী হইবেন কি না,—পাইয়োনীয়ার তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নাই। সে যাহা হউক, আমরা রকফেলার ফাউণ্ডেসনের এই উদারতার প্রশংসা করিতেছি। ভারতে সাধারণ স্বাস্থ্যের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতে, ভারত হইতে ছাত্রগণকে আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিতে যাইবার সুযোগ দিয়া রকফেলার ফাউণ্ডেসন ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। বিদেশী ছাত্রগণের সুবিধার জন্য এই বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করায় রকফেলার মহোদয়ের কেবল যে অর্থোপার্জ্জন সার্থক হইয়াছে তাহা নহে; ইহাতে তাঁহার যে অকৃত্রিম মহানুভবতা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু ভারতের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিলে, মনে হয়, আরও কতিপয় ছাত্রের প্রতি বৎসর আমেরিকায় কিম্বা ইয়োরোপে গিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভারতবাসীরা কি এরূপ কয়েকটি বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না? ব্যক্তি বিশেষের তহবিল হইতে না হউক, সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এইরূপে একটী তহবিল স্থাপন পূর্ব্বক স্থায়ীভাবে ও নিয়মিতভাবে ছাত্রগণকে বিদেশ স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার্থ প্রেরণ করা অতীব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। রকফেলার ফাউণ্ডেসন যে মহৎ দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ধারণ করিলেন, তাহা অনুসৃত হইতে দেখিলে সকলেই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

শঙ্খধ্বনির রোগ-বীজাণু নাশের শক্তি।—

ভারতীয় হিন্দু পুরমহিলাগণ, অন্ততঃ বাঙ্গালী হিন্দু অন্তঃপুরিকাগণ, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নিত্য এইরূপ শঙ্খধ্বনি কেন করা হয়, এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেকেরই মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। এবং উহা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বিবেচনা করিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হন। আবার কেহ কেহ বিবেচনা করেন, সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি করার অর্থ রোগবীজাণু নাশ। কারণ, এমন অনেক রোগবীজাণু আছে, যাহারা প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলীলা সংবরণ করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ধারণা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নহে। কারণ, শঙ্খ-ধ্বনির ফলে বায়ুরাশিতে যে প্রবল তরঙ্গ উঠে হয়, তাহা বায়ু মণ্ডলে নিয়ত ভাসমান বহু বীজাণুর পক্ষে অসহ্য হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাহার ফলে তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্তিও খুব সম্ভব। শুনিতেছি, আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শঙ্খধ্বনির এই গুণটি demonstration করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরীতে ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একটি কাচ-পাত্রের ভিতর,—সতত বায়ুমণ্ডলে ভাসমান এমন কয়েক শ্রেণীর জীবাণু স্থাপন করিয়া, আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র তন্মধ্যে শঙ্খধ্বনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরে সেই আধারস্থিত জীবাণুপূর্ণ বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, তন্মধ্যস্থ অধিকাংশ জীবাণুই ধ্বংস সংবরণ করিয়াছে। বিদেশীয়েরা এবং এদেশীয় পাশ্চাত্য প্রণালী মতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা হিন্দুর আচার ব্যবহার মাত্রকেই কুসংস্কার বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে আমরা তাঁহাদের কিছু দোষ দেখি না। কারণ, হিন্দুর আচার ব্যবহার সামাজিক ও গার্হস্থ্য সংস্কারের যাঁহারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা জনসাধারণকে কেবলমাত্র কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল উপদেশ পালন করিতে হইবে, সেই সকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা সকলের আয়ত্তাধীন হওয়ায়, কারণ না জানিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোনরূপ অনুষ্ঠান মানিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা তাঁহাদের এই অবিশ্বাস একটুও অস্বাভাবিক মনে করি না। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য—হিন্দুর প্রাচীন প্রথা, সংস্কার, আচার, ব্যবহার অনুষ্ঠানের বিজ্ঞান-সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করা। প্রকাশ্য পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা। তাহা হইলে সেই সকল বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু না জানিয়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্ধ ভাবে প্রাচীন প্রথার উপকারিতা বিশ্বাস করা কঠিন।

১ম হইতে ১২শ সংখ্যা।

বঙ্গভাষায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় সচিত্র মাসিকপত্র

স্বাস্থ্য-সমাচার

[ব্যাধি, দারিদ্র্য ও শিক্ষা-সমস্যা-সমাধানমূলক]

১১শ বর্ষ ১৩২৯
বৈশাখ—চৈত্র

সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু
৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

হ্যাণ্ডার্ড প্রাগ প্রেসে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়-সূচী।

(সন ১৩২৯ সাল)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অজীর্ণতা	ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	[illegible]
আমেরিকায় মদ্য বর্জ্জনের সুফল ...		[illegible]
আলোচনা		২৬, ৫৪, ৮২, ১১০, ১৬৮, [illegible]
উভয় সঙ্কট	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	[illegible]
কোন্‌টা আগে ?	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	[illegible]
ক্রিমি-চিকিৎসা	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	[illegible]
ক্রোধ		[illegible]
গর্ভিণী-আক্ষেপ	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	২৩৪, [illegible]
"গুপ্ত—প্রকাশ" বা চরিত্র গঠনের পন্থা	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	[illegible]
গোবর গুহ		[illegible]
জীবাণু-রহস্য	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	৪, [illegible]
তাম্রকূট দর্শন ...		[illegible]
দাঁতের কথা	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	[illegible]
ধূমপান—(তামাক)	শ্রীচক্রধর সাহা	[illegible]
নব বর্ষের বার্ত্তা		[illegible]
পড়ান না পীড়ন করা ? ...	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	[illegible]
পরলোক গত ভীম ভবানী ...		[illegible]
পল্লী-উন্নতি	রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র	[illegible]
পল্লী-উন্নতি	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এ	[illegible]
পল্লী-সংস্কার	শ্রীচক্রধর সাহা	[illegible]
পল্লী-স্বাস্থ্য ...		২৫, ৫১, [illegible]
প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা		৪৯, ১০৭, ১৮৮, [illegible]
প্রসব-বৈচিত্র্য	ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য বিশারদ	[illegible]
মাছির কথা	শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু	[illegible]
ম্যালেরিয়ার কথা	শ্রীহরিমোহন চৌধুরী	২৭২, [illegible]
রোগ সংক্রামণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে দু'এক কথা	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	[illegible]
রোগ হয় কেন ?	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস্	[illegible]
বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী ...	ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য রত্ন	[illegible]
বাঙ্গালা কি প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর ? ...	শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন বি-এল্	১৬৩, ১৯৭, [illegible]
বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	[illegible]
বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া		[illegible]
বিবিধ প্রসঙ্গ	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু	[illegible]
শারীর সৌন্দর্য্য		[illegible]
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গে ...		২২১, ২৫০, [illegible]

বিষয়		পৃষ্ঠা
শিশু পালন		৩০৫
সংক্রামক রোগ ও তাহা নিবারণের ব্যবস্থা	জনৈক দীন সেবক	৮৫, ১৮২,২০৬
সর্ষপ তৈল	ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী	২২
সাত ঘাটের জল	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	২১১, ২৪৬
সুসন্তান লাভের উপায় ...	ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-রত্ন	৮
স্বাস্থ্য ও আনন্দ		৪১
স্বাস্থ্যধর্ম্ম		৩০৯
স্বাস্থ্য-বিধান	শ্রীবিভূতিভূষণ জানা	১০২
স্বাস্থ্য সন্দেশ রকমারি ...	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	৩০৩
স্বাস্থ্য-সমাচারের আত্ম-নিবেদন ...		১১২
হাঁপানি (Asthma) ...	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্	১৬৯
হাসির টুক্‌রা		১২০
হিন্দু ডুবিল	ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-রত্ন	৯৪, ১৪৬, ২২৫, ২৮৬

চিত্র-সূচী

১। মৃত অস্থির উপর জীবাণুর ক্রিয়া ৪
২। লেগুমিনাস প্ল্যান্টের শিকড়ে টিউবারকল্ রাশি ৫
৩। লেগুমিনাস প্ল্যান্টের শিকড়ে চারটি টিউবারকল্ ৫
৪। মাটীর মধ্যের নাইট্রোজেন-ধারক জীবাণু ৬
৫। গাজর ৬
৬। দেহের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করায় রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি তাহাদের আক্রমণ করিতেছে ৭
৭। প্রদাহ (inflammation) হইলে কি হয় তাহাই দেখান হইতেছে ৭
৮। গৃহ-মক্ষিকা, তাহার ডিম ও মককীটাবস্থা ৩৪
৯। আস্তাবলের মাছি ৩৪
১০। গোবরের মাছি ৩৫
১১। ফলের মাছি ৩৫
১২। মাছির গুটি অবস্থা ৩৭
১৩। মাছির পায়ের একটা সামান্য অংশ খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে ৩৭
১৪। পড়ান না পীড়ন করা ? ৪৫
১৫। মাড়ির মধ্যে দাঁত ৫৮
১৬। যুবকের মুখের ভিতরের দাঁতগুলি ৬০
১৭। কচিছেলের চোয়ালের মধ্যে লুক্কাইত দাঁত ৬০
১৮। উপরের ও নীচের পাটির চোয়ালের মধ্যে বত্রিশটি দাঁতের বত্রিশটি ঘর ৬৮
১৯। আধুনিক পল্লীচিত্র ১৫৪
২০। অজ্ঞানতা কূপের উপর স্তোকবাক্যরূপ তক্তায় হাতুড়ে কবিরাজ দাঁড়াইয়া আছেন ১৫৫

২১। বিদেশী বেশধারী ডাক্তার মহাশয় দেশের সমস্ত অর্থই বিদেশী বঁধুর মুখ বিবরে পুরিতেছেন
২২। দেশীধাত্রী একহাতে শিশুর গলা টিপিতেছেন এবং অপর হাতে যমদূতকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন
২৩। হিন্দু-ঘরের যমকূপ-রূপ আঁতুড় ঘর
২৪। বাঙ্গালার বীর প্রসবিনী
২৫। গরীব নাচার বাবা !
২৬। শমন-রাজের রপ্তানী সেরেস্তা
২৭। ব্যারামগ্রস্ত ফুস ফুস ও শ্বাসযন্ত্র
২৮। একটী শ্বাসনলীর ক্ষুদ্রতম অংশে সংলগ্ন তিনটি কোষগুচ্ছ
২৯। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী
৩০। বামপাশে থামের মত ঐটি মেরুদণ্ড
৩১। মুখ ও শ্বাস পথ
৩২। শ্বাস নলীর আকৃতি
৩৩। হৃৎপিণ্ড (বামদিক)
৩৪। হৃৎপিণ্ড (বামদিক)
৩৫। হৃৎপিণ্ড (দক্ষিণদিক)
৩৬। মস্তিষ্ক
৩৭। প্রতিফলিত ক্রিয়ার ছবি
৩৮। সমস্ত দেহের নাড়ীর (nerves) বিস্তৃতি
৩৯। মস্তিষ্কের কোথায় দেহের কোন্ অংশের কায হয়
৪০। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ছবি
৪১। প্রতিফলিত ক্রিয়ার (reflex act) ছবি
৪২। ভীম ভবানী পাঁচমণ ওজনের প্রকাণ্ড বাবু-বেল ভাঁজিতেছেন
৪৩। সার্কাসে খেলা দেখাইতে নামিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভীম ভবানী
৪৪। ভবানীর আধুনিকতম প্রতিকৃতি
৪৫। ভবানীর বুকে মুর্শিদাবাদ-নবাবের বিরাটকায় বুনো হাতী
৪৬। বাঙ্গালার জগজ্জয়ী মল্লবীর (শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ ওরফে গোবর গুহ) [মুখপাত]
৪৭। উভয় সঙ্কট
৪৮। পরলোকগত ভীম ভবানী [মুখপাত]
৪৯। সন্তরণ প্রতিযোগীতা [মুখপাত]
৫০। সাইকেলে বারাণসী [মুখপাত]
৫১। গোলোকগত মতিলাল ঘোষ [মুখপাত]

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৯ সাল { ১ম সংখ্যা

নববর্ষের বার্ত্তা।

পুরাতন বর্ষ গেল, নূতন আসিল। ১৩২৮ সালকে বিদায় দিয়া ১৩২৯ সাল দেখা দিল। প্রতি বৎসরই নববর্ষারম্ভে মানুষ কত নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া নূতন করিয়া জীবন যাত্রার কল্পনা করে। আমরা উৎসব করিয়া পুরাতন বর্ষকে বিদায় দিই, উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বৎসরকে আবাহন করি। এই ভাবে আমাদের জাতীয় জীবন এত দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পুরাতনের বিদায় ক্ষণে, নূতনের শুভাগমনে, আজ আমাদের মনে ক্রমাগতই এই প্রশ্নটি উঠিতেছে—আমরা ঠিক পথে চলিতেছি কি ?

মানব সুখান্বেষী। সভ্য মানব কেবল সুখাভিলাষী নয়;—সুখের সঙ্গে সে আরও কিছু চায়—বিলাস, আরাম। মানব জাতিকে সর্ব্ব প্রকারে সুখী, বিলাসী করিয়া তোলা সভ্যতার চরম লক্ষ্য। এই সুখ-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের সর্ব্বপ্রধান উপায় অর্থ। সুতরাং বিলাস ও সুখাকাঙ্ক্ষী সভ্য মানব সর্ব্বাগ্রে অর্থ সঞ্চয়ের কামনা করে। এই অর্থ-সংগ্রহের কামনা মানুষের মনকে এতটাই অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, সে আর ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারে না; ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে না; সঙ্গতি ও অসঙ্গতির ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর নাই। এইরূপ অবস্থায় মানুষ কেবলই অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে; এবং সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সুখের উপাদান, বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাহার পরিণাম কি, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছে না। সুখভোগের লোভে মানুষ যে পথে চলিতেছে, তাহাতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে দুঃখকেই যে বরণ করিয়া লইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না। তাই এই নববর্ষারম্ভে আমরা ভাবিতেছি,—আমরা সভ্যতার অনুসরণ করিয়া যে পথে চলিতেছি, তাহা কি ঠিক পথ ?

প্রকৃতির সহিত সভ্যতার চির বিরোধ। যাহা প্রকৃতির অনুমোদিত নয়, যাহা স্বাভাবিক নয়, যাহা কৃত্রিম,—তাহারই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতার উপাসনা করিতে গিয়া, কাজেই আমাদিগকে প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ করিতে হইতেছে—প্রকৃতির নিয়মের ব্যাভিচার করিতে হইতেছে। মানব-শিশু নীরোগ, সুস্থ, সবল দেহে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু তাহাকে লালন পালন করিবার সময় তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, অভিভাবক, হিতৈষী ব্যক্তিরা প্রকৃতির নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলেন না,—সর্ব্বপ্রকারে কৃত্রিমতাকে আশ্রয় করেন।

নবজাত শিশুর সর্ব্বপ্রধান খাদ্য—মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ। শিশুকে সেই স্বাভাবিক খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া, 'ফুড' নামধেয় কৃত্রিম খাদ্য দিয়া লালন পালন করা হয়; কারণ, ইহাই সভ্যতা। ক্ষুদ্র শিশুর অঙ্গে এত বস্ত্র ভার চাপানো হয় যে, তাহার গাত্রে একটু হাওয়া লাগিতে পারে না, একটুখানি সূর্য্যালোক তাহার কোমল অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, শিশুকে অনাবৃত গাত্রে রাখা অসভ্যতা। অথচ, আলো এবং বায়ুতেই জীব-রাজ্যের প্রধান জীবনী-শক্তি নিহিত। ফলে হইতেছে কি?—দলে দলে লক্ষ লক্ষ শিশু অকালে শিশু-লীলা সংবরণ করিতেছে। এই যে সভ্যতানুমোদিত সন্তান-পালন প্রথা,—ইহা কি ঠিক পথ?

মানবেতর প্রাণী সকল, এবং অসভ্য, বর্ব্বর, আদিম মানব অনাবৃত গাত্রে মুক্ত প্রান্তরে বৃক্ষ-শাখায় অথবা পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করে। আর সভ্যতাভিমানী মানব সভ্যতার গৌরবে স্ফীত হইয়া অভ্রভেদী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। সভ্য মানবের বাসগৃহে বিলাসিতার সকল উপকরণ স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। থাকে না কেবল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান আলো ও হাওয়া। এই আলো-হাওয়া বর্জ্জিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সৌন্দর্য্যে, সুষমায়, শিল্প-চাতুর্য্যে, ভাস্কর্য্যে অতুলনীয় হইতে পারে; কিন্তু তাহা স্বাস্থ্য-সম্পদে একান্ত দীন-হীন। বহু-কক্ষ-শোভিত, শিল্প-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত, ভাস্কর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন, ধনৈশ্বর্য্য-গর্ব্বের পরিচায়ক, গগনচুম্বী প্রকাণ্ড অট্টালিকা সভ্যতার অপরিহার্য্য হইলেও কিন্তু অস্বাস্থ্যের খনি। এইরূপ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিয়া ভোগ-বিলাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সভ্য মানুষ মাত্রেরই জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। এই সাধ মিটাইবার জন্য মানুষ করিতেছে না এমন কাজ নাই। অথচ তাহার এই প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সে লাভ করিতেছে কি? শুধু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা, আর ভগ্ন স্বাস্থ্য। তাই আমি সভ্য মানবকে জিজ্ঞাসা করিতে সাধ যাইতেছে—তোমরা—সভ্যতার মোহ-মুগ্ধ-মানব—যে পথে চলিতেছ তাহাই কি ঠিক পথ?

বাঙ্গালী আমরা—শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের জীবন যাত্রার প্রণালী কিরূপ ছিল? আমাদের পরিধেয় ছিল একখানি ধুতি—মোটা ধুতি, ওসার খাটো, হাঁটুর নীচে নামিত না;—গ্রীষ্মকালে একখানি উত্তরীয়, আর শীতকালে একখানি মোটা চাদর। আর এক জোড়া চটি জুতা। আমাদের মহিলাদের পরিধেয় একখানি মাত্র দেশী মোটা শাড়ী। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সাজ-সজ্জার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সৌখিন মিহী ধুতি সাড়ীর উপর কোট, ওয়েষ্ট-কোট, প্যাণ্ট, প্যাণ্টালুন, কলার, নেকটাই, মোজা, ষ্টকিন, বুট, সু,—(মেয়েদের) জ্যাকেট, সায়া, সেমিজ, ব্লাউজ—কত কি। এই সকল না হইলে আমাদের সভ্যতা বজায় থাকে না। এই সাজ পোষাকের আড়ম্বরে যে ব্যয়-বাহুল্য তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও,—এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এত বস্ত্র-বাহুল্য, অস্বস্তিকর ত বটেই—অস্বাস্থ্যকরও বটে।

তার পর খাদ্যের কথা। ক্ষেতের ধান চাউল উৎপন্ন মোটা চাউলের ভাত, তরিতরকারি, ঘরে গৃহপালিত সুপুষ্ট সুস্থদেহ গাভীর টাট্‌কা দুগ্ধ ও সুগন্ধি সুস্বাদু সুমিষ্ট গব্যঘৃত, বাগানের টাট্‌কা

মূলা ফল-মূল, এবং পুকুরের টাট্‌কা মাছ। তৎপরিবর্ত্তে এখন আমরা কি খাই? পল্লীবাস ছাড়িয়া শহরে বাস করিতে আরম্ভ করা অবধি, অযত্নে অবহেলায় আমাদের স্বচ্ছন্দজাত টাট্‌কা খাদ্য আর সুলভ নহে। এখন সহরের ভেজাল খাদ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে কেমন করিয়া?

আমাদের বাস-গৃহের গঠন প্রণালীরও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের সেই মাটীর দেওয়ালের উপর খড়ের চালের কুটীর আর আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না। বায়ু, রৌদ্র, আলো আমাদের বাসগৃহে পূর্ব্বে যেমন সুলভ ছিল,—আমাদের এখনকার সহরের ঘনসন্নিবিষ্ট, জনবহুল, রৌদ্র, আলো, বায়ু-বিহীন, অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে কোটা বাড়ীগুলি তেমনই অস্বাস্থ্যকর।

অন্ন, বস্ত্র, গৃহ—মানবজীবনের এই তিনটি সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তুতে আমরা দীনাতিদীন, হীনাতিহীন। আমাদের জীবনীশক্তি কাজেই অতি ক্ষীণ। দেহ রোগপ্রবণ। আমাদের আয়ুষ্কাল এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হ্রস্ব। অকাল মৃত্যু এখন আমাদের নিত্য সহচর। এরূপ অবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথের পরিবর্ত্তন আবশ্যক নহে কি?

সভ্যতার এই পরিণাম—এই জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা—ইহা কেবল আমরা নহি,—অধুনা পৃথিবীর সকল দেশের সকল বিবেচক লোকই বুঝিতেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহার প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথাসম্ভব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া সরলভাবে জীবন যাপন করিবার আবশ্যকতা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা তাঁহারা আজকাল স্বীকার করিতেছেন। জগৎ জুড়িয়া আজ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

নূতন বৎসরে আমরা আশার বাণী শুনিতে পাইতেছি—আমাদিগকে বাঁচিতেই হইবে। এই বিংশ শতাব্দীর দ্বাবিংশ বৎসরে পৃথিবীর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ জগৎবাসীকে আশার বাণী শুনাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া আমাদের সেই প্রাচীন কালের সরল জীবনযাত্রার প্রণালীর পুনঃ প্রবর্ত্তনের পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতেছেন। বাঙ্গালী, এস, আজ নূতন বৎসরের প্রারম্ভে, এস, আমরা তাঁহাদের আদেশ পালন করি—সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জিত হইয়া সরল জীবন যাপন করি।

এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে? সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। সকল প্রকার কৃত্রিমতা কপটতা পরিহার করিতে হইবে। দরিদ্র আমরা—বিলাসিতা আমাদের সাজে না। প্রকৃতির প্রিয় সন্তান আমরা—কৃত্রিমতা আমাদের চক্ষুশূল হউক।

এস, পাঠক পাঠিকা, আমরা সকলে মিলিয়া—

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই!

আমরা—

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ-পাশে
যারা চলে যায়, কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে!

এখন এস,—

ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা' যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে,
ঐ আছে রসাতল, ভাই।

এস, নূতন বৎসরের প্রথমে আমরা সকলে মিলিয়া সমস্বরে প্রার্থনা করি,—

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব।

সে জীবন তব ছিল তপোবনে,
সে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব !
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ,
দাও সে মন্ত্র তব !

এস বঙ্গবাসী, আমরা সঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাঙ্গলা মায়ের স্বাস্থ্য-দৈন্য ঘুচাইয়া বাঙ্গলা দেশকে আবার আগেকার সেই সুখ-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধিতে [illegible] করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি। এস, ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য পারিবারিক, গ্রাম্য ও নাগরিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করা হউক! তোমরা—স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, নব-বর্ষের এই আহ্বানে কর্ণপাত করিবে কি?

জীবাণু-রহস্য। (৩)

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল-এম্-এস্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিত্র-জীবাণু।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা জীবাণু জীবনের যেটুকু পরিচয় লইলাম, তাহাতে দেখিতেছি, জীবাণুরা সকল রকম রোগেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। জীবাণুকে কেবলই রোগের উৎপাদক কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে আমাদের চারিদিকে লক্ষ্য করিলে জীবাণুগণের এমন অনেক কার্য্যের পরিচয় পাইব যদ্দ্বারা মানব-সমাজের পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। চিকিৎসক, দন্ত-চিকিৎসক, পশু-চিকিৎসক, অস্ত্র-চিকিৎসক, স্বাস্থ্য-নীতিজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়র, কৃষিবিদ, এবং নব্য শিল্প-জগতের অধিকাংশ কর্ম্মীকে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে, তাঁহাদের নিত্য কর্ম্মে অল্পাধিক পরিমাণে জীবাণুগণের কার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রথমে জগতের খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া দেখুন। এই পৃথিবীতে জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদ—সকলেরই খাদ্য আবশ্যক। উদ্ভিদেরা মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারজান, বায়ু হইতে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প, এবং ভূমি ও বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে। প্রাণীরা উদ্ভিদ ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করে। জীবদ্দশায় প্রাণীরা জল এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পরিত্যাগ করে এবং এই দুইটী পরিত্যক্ত পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। যখন প্রাণীগণের মৃত্যু হয়, তখন জীবাণুরা

[illegible] "[illegible]" করিতেছে।

প্রাণীদের মৃতদেহস্থিত মাংস বা মাংসপেশীর পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তাহাকে নাইট্রোজেনে পরিণত করে। এই নাইট্রোজেনের কিয়দংশ ভূমির সহিত, এবং অবশিষ্টাংশ বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশিয়া যায়। মৃত প্রাণীগণের মাংস হইতে আবার জল ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জীবাণুগণেরই কৃপায় মৃত প্রাণীদেহ হইতে মৃত্তিকা ও বায়ুর মধ্যস্থতায় উদ্ভিদ তাহার খাদ্য প্রাপ্ত হয়। জীবাণুগণ না থাকিলে, একদিকে প্রাণীরা যেমন দুইদিনে উদ্ভিদ-জগৎকে খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিত; পক্ষান্তরে তাহারা উদ্ভিজ্জগণের খাদ্য যে জল, কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি (জীবিত অবস্থায়ই হউক, অথবা মৃত অবস্থায়ই হউক) তাহাদের মাংসের মধ্যে এমন আটকাইয়া রাখিত যে, খাদ্যাভাবে উদ্ভিজ্জ জগতের অস্তিত্ব লোপে বিলম্ব ঘটিত না। এবং উদ্ভিদগণের অস্তিত্ব লোপ ঘটিলে প্রাণীরাই বা অতঃপর কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত?

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। বীজ হইতে যে অঙ্কুর বাহির হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলে (কিন্তু সর্ব্বত্র নহে) জীবাণুগণের কার্য্য। কারণ, বীজের অভ্যন্তরে শিশু-বৃক্ষের যে খাদ্য থাকে, তাহা অতি কঠিন। শিশু বৃক্ষাঙ্কুর তাহা কোন মতে নরম করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। জীবাণুরাই সেই কঠিন খাদ্যকে কোমল করিয়া দেয়। সেই কোমল খাদ্য খাইয়া বৃক্ষের অঙ্কুর জীবিত থাকে ও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়। আবার জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিতে হইলে জমিতে সার প্রয়োগ করিতে হয়। এই সারে উদ্ভিদের খাদ্য থাকে। জীবাণুরাই এই সার প্রস্তুত করিয়া দেয়। কারণ, প্রাণীদেহ-পরিত্যক্ত টাটকা পদার্থ (মলমূত্র) সকল সারের হিসাবে অকর্ম্মণ্য জিনিস। জীবাণুরা তাহাদের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিলে, তবে তাহারা সাররূপে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়।

আরও একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। যে জাতীয় উদ্ভিদ হইতে মটর ও ডাল প্রস্তুত হয়, সেগুলির নাম "লেগুমিনাস প্ল্যাণ্টস" অর্থাৎ শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ। মাংস-ভোজীদিগের পক্ষে মাংস যেরূপ, উদ্ভিজ্জভোজীদের পক্ষে ডাল ও মটর প্রভৃতি সেই কার্য্য করিয়া থাকে। মাংস এবং ডাল মটর প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থ থাকে বলিয়াই উহারা জীবজগতের পক্ষে মূল্যবান খাদ্য। লেগুমিনাস প্ল্যাণ্ট বা সীম, মটর, ডাল প্রভৃতি উৎপাদনকারী শস্য বহু পরিমাণে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া রাখে। এই কারণে ইহারা মূল্যবান খাদ্য। কিন্তু ইহারা প্রত্যক্ষ ভাবে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিতে পারে না। জীবাণুগণ এই জাতীয় উদ্ভিদের দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবের মত (টিউবারকল্) পদার্থের সৃষ্টি

লেগুমিনাস্ প্লাণ্টের শিকড়ে টিউবারকল্ রাশি।

লেগুমিনাস্ প্লাণ্টের শিকড়ের চারটি টিউবারকল্‌কে খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে—জীবাণুগুলি [illegible] লক্ষ্য কর।

করে। সেই আবের মধ্য দিয়া ঐ জীবাণুগণের সাহায্যেই উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন আহরণ

মাটির মধ্যে নাইট্রোজেন-ধারক জীবাণুকে প্রবেশ করান হইয়াছে—তাহার ফলে কত নাইট্রোজেন (বুদবুদাকার) সংগৃহীত হইয়াছে।

করিতে পারে, এবং তাহারই ফলে মটর ও ডাল প্রভৃতি নাইট্রোজেনে পূর্ণ হয়। টিউবারকল্ সৃষ্টিকারী জীবাণুগণের সাহায্য না পাইলে উদ্ভিদেরা তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারিত না। আমরা জানি, নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থগুলি (nitrates) জমির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। জমিতে নাইট্রেটসের অভাব হইলে, সে জমিতে যে কোন শস্যের বীজই বপন করা হউক না কেন, তাহা অঙ্কুরিত হইবে না; কিম্বা অঙ্কুরিত হইলেও, পুষ্টিলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। জীবাণুরা এখানেও আমাদের পরম উপকারী বন্ধুর কাজ করে,—তাহারাই জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সঞ্চয়ে সাহায্য করে। ভূমি স্বতঃই বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উর্ব্বরতা লাভ করিতে পারে না। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া তাহাকে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তি কেবল মাত্র জীবাণুগণেরই আছে। অতএব, কৃষিকার্য্য, এবং পরোক্ষভাবে মনুষ্যের খাদ্য উৎপাদন জীবাণুদের অনুকম্পাতেই সম্ভবপর হইয়াছে।

গাজর—একটি সাধারণ চাষের ফল—অপরটি (বামদিকে) নাইট্রোজেনভুক্ত জমীতে চাষের ফল (কত বড়, তুলনা করুন)।

আরও একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। আজকাল আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে কয়লা একটা অপরিহার্য্য উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লা সহস্র প্রকার উপায়ে আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সহায়তা করে। এই কয়লার কিরূপে সৃষ্টি হয়? সম্পূর্ণরূপে না হউক, আংশিক ভাবেও, ইহা জীবাণুরই কাজ। সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, আমাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য, আমাদের জীবন ধারণের জন্য আমরা জীবাণুগণের নিকটে শত সহস্র প্রকারে ঋণী।

কেবল অন্নই বা বলি কেন,—আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও আমরা জীবাণুগণের নিকটে অল্প ঋণী নই। পাট, শন, নারিকেল প্রভৃতি জাতীয় গাছ যাহা হইতে আমরা পরিধেয় বস্ত্র ও গাত্রাবরণ প্রস্তুত করি,—এই অংশুগুলিকে জীবাণুগণের সাহায্যে বৃক্ষ হইতে এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই সকল অংশু সচরাচর এক প্রকার দৃঢ় আঠার মত পদার্থ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। জীবাণুগণের সাহায্য না পাইলে এই পদার্থটিকে কোন প্রকারেই কোমল করিতে পারা যাইত না। বাণিজ্য জগতে কিম্বা বৈজ্ঞানিক জগতে, অথবা শিল্প জগতে এ যাবৎ এমন কোন উপায় বাহির হয় নাই, যদ্দ্বারা ঐ আঠাবৎ পদার্থটিকে অংশু হইতে বিদূরিত করিয়া অংশুগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। জীবাণুরা না থাকিলে, এ ক্ষেত্রে আমাদের দশা কি ঘটিত, বলুন দেখি?

জীবাণু জগতের কাছে আমরা যে কত প্রকারে ঋণী, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এখন যে সকল বড় বড় কল-কারখানা ও অন্যান্য কারবার পৃথিবীর ধনবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিতেছে, মানব সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে,—ঐ সকলের জন্যও আমরা অনেকটা পরিমাণে জীবাণু-জগতের কাছে ঋণী। নীল রং উৎপাদন, স্পঞ্জকে কার্য্যকরী করা, চামড়ার পাইট, মদ্য ও ভিনিগার প্রস্তুত, মাখন, পনীর, দধি, সাইট্রিক এসিড, পাউরুটী প্রস্তুত—তামাকের পাতাকে ব্যবহারোপযোগী করা, অহিফেনকে ব্যবহারোপযোগী করা, কৌটার মধ্যে ফল বা মাংস সংরক্ষণ,—এসকল শিল্প-বাণিজ্যের কোনটাই, জীবাণু না থাকিলে সম্ভবপর হইত না; এই সকল ব্যাপারের মূলেই জীবাণুগণের মঙ্গলময় ক্রিয়ার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। বস্তুতঃ, আমাদের এই হিতকারী বন্ধু-জীবাণুরা না থাকিলে পৃথিবী আজ জীবগণের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত। কারণ, তাহা হইলে পর্ব্বত প্রমাণ মৃত জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের দেহে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইত,—মানুষের দাঁড়াইবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত থাকিত না।

এ হেন জীবাণুগণের সঙ্গে তুলনা করিবার উপযোগী একটী মাত্র পদার্থ এই পৃথিবীতে আছে—তাহা পরমাণু। উভয়েই অমিত শক্তির আধার। উভয়েই নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহাদের সকল গুণের সম্যক প্রকার বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আসুন, আমরা সসম্ভ্রমে সর্ব্বশক্তিময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করি!!!

[এই বক্তৃতা কলিকাতাস্থ যাদুঘরে (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে), টাউন হলে (শিশু ও মাতৃমঙ্গল প্রদর্শনীর উদ্ঘাটনোপলক্ষে) এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ইংরাজী ভাষায় দেওয়া বক্তৃতার সারমর্ম্ম।]

পুনশ্চ—অসাবধানতা বশতঃ দুইখানি চিত্র যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। সে দুইখানি নিম্নে দিলাম :—

দেহের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করার জন্য রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে

প্রদাহ (inflammation) হইলে কি হয় তাহাই দেখান হইতেছে—রক্তবাহী শিরাগুলি কত ফুলিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকেই কত শ্বেত কণিকা রহিয়াছে।

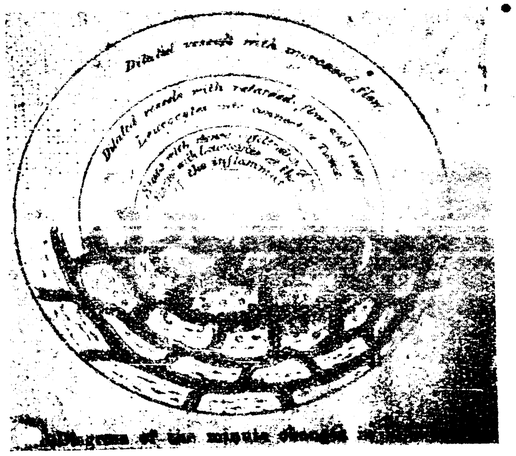

সুসন্তান লাভের উপায়।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮) মাতৃজং চাস্য হৃদয়ং মাতৃহৃদয়াভিসম্বন্ধ রস-বাহিনীভিঃ সম্পদ্যতে———।" (চরকসংহিতা)

অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় মাতা হইতে উৎপন্ন হয়; সেই হেতু মাতার হৃদয়ের সহিত গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় সম্যক্‌রূপে সম্বন্ধ থাকে। এইরূপে রসবাহিনী ধমনী দ্বারা মাতার ও গর্ভস্থ সন্তানের যোগ থাকে। অর্থাৎ মাতার রক্ত সন্তানের মধ্যে ধমনী (কর্ড্) দ্বারা প্রবাহিত হয়। এ জন্যই ভিষক্‌গণ গর্ভাবস্থায় প্রতিকূল আহার ও আচরণাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, উহাতে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"গর্ভস্থ সন্তান ও মাতার মধ্যে একমাত্র শোণিত সঞ্চালন দ্বারাই সম্পর্ক রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত ভ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার ভাবী জীবনের আচার, ব্যবহার ও চরিত্র সংগঠিত করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, গর্ভাবস্থায় জননীর সচ্চিন্তা ও সৎ-কার্য্যানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী সর্ব্বপ্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য—আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কারণ, ঐ সময় তিনি যে যে দ্রব্য আহার করিবেন, তাহা তাঁহার নিজ শরীরের ন্যায় সন্তানের শরীরেও শোণিতে পরিণত হইবে; এবং ঐ শোণিতেই সন্তানের ভাবী জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে। (1)

"খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ রক্তে পরিণত হইয়া মানব-দেহের পুষ্টিসাধন করে; এই সারভাগ রক্তে পরিণত হওয়ার সময়ে মানুষের দৈনিক চিন্তা ও কার্য্যকলাপ ইত্যাদি ঐ সারভাগের উপরে ক্রিয়া করে অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি ঐ সারভাগে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই প্রকৃতি ক্রমে রক্তকে অনুপ্রাণিত করে। এইরূপে স্নায়ুমণ্ডল, তৎপরে চরিত্র আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মানুষের চরিত্র ভাল কি মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, একটিমাত্র শোণিতকণাতেও মানবের চরিত্র ও ভাব পরিব্যক্ত থাকে।" (2)

"এইরূপে বিমর্ষ ও ক্রোধান্বিতা জননীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ঐ সমস্ত ভাব সঞ্চারিত হয়; এবং গর্ভস্থ সন্তান উক্ত শোণিতের প্রভাবে সংবর্দ্ধিত হওয়ায়

(1) There being no nervous connection between the fœtus and mother, it is through the blood of the mother only that the body of the child is nourished, its character influenced, and its habits of life formed."

"This being so, the first great requisite in the mother, during this gestative period of influence—next to right habits of thought and action—is correct diet. Her food, during the period, makes not only her own blood, but also the blood of the child, and this blood, vitalized by her nerves, system, imparts its vitality to the nervous and muscular system of the child, and in this way is the character of the new life influenced." (See Trans. Edinburgh Obstet. Soc. Vol. XXI, 1896, P. 189)

(2) A man or woman's daily thoughts and actions affect and impress the sections of the nutritive system, and through this the blood; and in this way, through its reaction on the nervous system, the character of the man increases for better or worse, as may be. It might with truth be said, that a drop of blood represents in its elements the character of the individual who manufactured it." (See Ditto, P. 189.)

লোকে যে সমস্ত বৃত্তির অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করে না, তৎসমস্ত বৃত্তি সহ শিশু জন্মগ্রহণ করে। (3) এজন্য গর্ভাবস্থায় মাতার নিরামিষ শাক-সব্জী আহার করা অতিশয় প্রশস্ত। (4)

"—মদ্যনিত্যা পিপাসালু-মনবস্থিতচিত্তং বা
গোধামাংসপ্রিয়া শর্করিলমশ্মরিণং—।"

(চরক সংহিতা)

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে রমণী সর্ব্বদা মদ্যপান করে, গোধামাংস ও বরাহমাংস ভক্ষণ করে, মৎস্য ও মাংস-প্রিয় হয়, এবং যে গর্ভবতী রমণী সর্ব্বদা মধুর, অম্ল, লবণরস, ঝাল, তিক্তরস, কষায়রস দ্রব্য ভোজন করে, তাহার সন্তান বিকৃত ও নানা রোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন :—

"শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত অত্যাবশ্যক। মাতা চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসল্লা, চর্ব্বি, চা, কাফি, নানারূপ মাদক দ্রব্যাদি আহার করিলে, তাহার পবিত্র, সুন্দর প্রিয়দর্শন সন্তান উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মাতার মাংসাদি আহার করা সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থায়ই মঙ্গল-জনক নহে।" (5)

সূতিকান্তু খলু বুভুক্ষিতাং—।" (চরক-সংহিতা)।

"তস্যাস্তু খলু যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে—।" (ঐ)

এই সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সন্তান উৎ-পাদনের সময়, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময় মাতা আহার বিহার, পান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। এই সময় মাতা সর্ব্বপ্রকার মানসিক উদ্বেগ, ক্রোধ, শোক, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিবেন। মাতা সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে ও সুস্থ শরীরে অবস্থান করিতে যত্ন করিবেন। এ বিষয়ে ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"সন্তানকে প্রকৃত প্রতিভাশালী করিতে হইলে, সন্তান উৎপাদনের ও স্তন্যদানের সময়েও মাতার বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক।"

"সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব অতীব গুরুতর। একাল পর্য্যন্ত মাতার সংযমে থাকা একান্ত আবশ্যক।" (6)

"মাতা প্রত্যহ যে সকল দ্রব্য আহার করেন, তাহাই স্তন্যরূপে পরিণত হইয়া সন্তানকে পরিপুষ্ট করিয়া

(3) The mother of a gloomy, morose, sullen or fretful disposition impresses these qualities on every globule of blood that comes through her system, and, as a necessity, on the rapidly growing tissues of the child, which after its birth will have embodied in its organization all these undesirable qualities." (See Ditto, p. 190.)

(4) "Undeniably, the best food for mothers, during this period of pregnancy, is fruit and vegetables, in as nearly their natural condition as possible. When apples, grapes, peaches, plums, &c., are eaten, the skins of such fruits should invariably be eaten along with the substance. One great trouble with pregnant women is costiveness, and this can in a great measure be avoided by the adoption of this rule." (See Ditto.)

(5) "Pure blood being a requirement in the right growth of the child, it is almost unnecessary to say that a clean, sweet, lovable baby cannot be grown by a mother who uses fat, meats, pork, spices, grease, tea, coffee, beer, whisky, wine, &c.; and even lean, fresh or healthy beef or mutton, the least hurtful of flesh diets, are not fit to make babies of the right stamp." (See Ditto, p. 190)

(6) Genius, to be successfully transmitted to the child, must be conceived in the period of preparation, exercised in the period of gestation, and the exercise continued during the whole period of nursing." (See Ditto, p. 266)

"The nine or twelve months of nursing will be the mother's last chance to directly perfect and establish the character of the child, and in no wise should it be slighted." (See Ditto, p. 269.)

সুসন্তান লাভের উপায়।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৮) মাতৃজং চাস্য হৃদয়ং মাতৃহৃদয়াভিসম্বদ্ধং রস-বাহিনীভিঃ সম্পদ্যতে ——।" (চরকসংহিতা)

অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় মাতা হইতে উৎপন্ন হয়; সেই হেতু মাতার হৃদয়ের সহিত গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় সম্যক্‌রূপে সম্বদ্ধ থাকে। এইরূপে রসবাহিনী ধমনী দ্বারা মাতার ও গর্ভস্থ সন্তানের যোগ থাকে। অর্থাৎ মাতার রক্ত সন্তানের মধ্যে ধমনী (নাড়ী) দ্বারা প্রবাহিত হয়। এ জন্যই ভিষক্‌গণ গর্ভাবস্থায় প্রতিকূল আহার ও আচরণাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, উহাতে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"গর্ভস্থ সন্তান ও মাতার মধ্যে একমাত্র শোণিত সঞ্চালন দ্বারাই সম্পর্ক রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত ভ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার ভাবী জীবনের আচার, ব্যবহার ও চরিত্র সংগঠিত করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, গর্ভাবস্থায় জননীর সচ্চিন্তা ও সৎ-কার্য্যানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী সর্ব্বপ্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য—আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কারণ, ঐ সময় তিনি যে যে দ্রব্য আহার করিবেন, তাহা তাঁহার নিজ শরীরের ন্যায় সন্তানের শরীরেও শোণিতে পরিণত হইবে; এবং ঐ শোণিতেই সন্তানের ভাবী জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে। (1)

"আহার্য্যের সারভাগ রক্তে পরিণত হইয়া মানব-দেহের পুষ্টিসাধন করে; এই সারভাগ রক্তে পরিণত হওয়ার সময়ে মানুষের দৈনিক চিন্তা ও কার্য্যকলাপাদি ঐ সারভাগের উপরে ক্রিয়া করে অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি ঐ সারভাগে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং ঐ প্রকৃতি ক্রমে রক্তকে অনুপ্রাণিত করে। এইরূপে স্নায়ুমণ্ডল, তৎপরে চরিত্র আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মানুষের চরিত্র ভাল কি মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, একটিমাত্র শোণিতকণাতেও মানবের চরিত্র ও ভাব পরিস্ফুট থাকে।" (2)

"এইরূপে বিষাদ ও কোপাম্বিতা জননীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ঐ সমস্ত ভাব সঞ্চারিত হয়; এবং গর্ভস্থ সন্তান উক্ত শোণিতের প্রভাবে সংক্রামিত হওয়ায়

(1) There being no nervous connection between the fœtus and mother, it is through the blood of the mother only that the body of the child is nourished, its character influenced, and its habits of life formed."

"This being so, the first great requisite in the mother, during this gestative period of influence—next to right habits of thought and action—is correct diet. Her food, during the period, makes not only her own blood, but also the blood of the child, and this blood, vitalized by her nervous system, imparts its vitality to the nervous and muscular system of the child, and in this way is the character of the new life influenced." (See Trans. Edinburgh Obstet. Soc. Vol. XXI, 1896, P. 18[illegible])

(2) A man or woman's daily thoughts and actions affect and impress the sections of the nutritive system, and through this the blood; and in this way, through its reaction on the nervous system, the character of the man increases for better or worse, as may be. It might with truth be said, that a drop of blood represents in its elements the character of the individual who manufactured it." (See Ditto, P. 18[illegible])

লোকে যে সমস্ত বৃত্তির অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করে না, তৎসমস্ত বৃত্তি সহ শিশু জন্মগ্রহণ করে। (3) এজন্য গর্ভাবস্থায় মাতার নিরামিষ শাক-সব্জী আহার করা অতিশয় প্রশস্ত। (4)

"—মদ্যনিত্যা পিপাসালু-মনবস্থিতচিত্তং বা
গোধামাংসপ্রিয়া শর্করিলমশ্মরিণং—।"

(চরক সংহিতা)

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে রমণী সর্ব্বদা মদ্যপান করে, গোধামাংস ও বরাহমাংস ভক্ষণ করে, মৎস্য ও মাংস-প্রিয় হয়, এবং যে গর্ভবতী রমণী সর্ব্বদা মধুর, অম্ল, লবণরস, ঝাল, তিক্তরস, কষায়রস দ্রব্য ভোজন করে, তাহার সন্তান বিকৃত ও নানা রোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন :—

"শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত অত্যাবশ্যক। মাতা চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসল্লা, চর্ব্বি, চা, কাফি, নানারূপ মাদক দ্রব্যাদি আহার করিলে, তাহার পবিত্র, সুন্দর প্রিয়দর্শন সন্তান উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মাতার মাংসাদি আহার করা সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থায়ই মঙ্গল-জনক নহে।" (5)

সূতিকাস্ত খলু বুভুক্ষিতাং—।" (চরক-সংহিতা)।

"তস্যাস্ত খলু যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে—।" (ঐ)

এই সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সন্তান উৎ-পাদনের সময়, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময় মাতা আহার বিহার, পান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। এই সময় মাতা সর্ব্বপ্রকার মানসিক উদ্বেগ, ক্রোধ, শোক, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিবেন। মাতা সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে ও সুস্থ শরীরে অবস্থান করিতে যত্ন করিবেন। এ বিষয়ে ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"সন্তানকে প্রকৃত প্রতিভাশালী করিতে হইলে, সন্তান উৎপাদনের ও স্তন্যদানের সময়েও মাতার বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক।"

"সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব অতীব গুরুতর। একাল পর্য্যন্ত মাতার সংযমে থাকা একান্ত আবশ্যক।" (6)

"মাতা প্রত্যহ যে সকল দ্রব্য আহার করেন, তাহাই স্তন্যরূপে পরিণত হইয়া সন্তানকে পরিপুষ্ট করিয়া

(3) The mother of a gloomy, morose, sullen or fretful disposition impresses these qualities on every globule of blood that comes through her system, and, as a necessity, on the rapidly growing tissues of the child, which after its birth will have embodied in its organization all these undesirable qualities." (See Ditto, p. 190.)

(4) "Undeniably, the best food for mothers, during this period of pregnancy, is fruit and vegetables, in as nearly their natural condition as possible. When apples, grapes, peaches, plums, &c., are eaten, the skins of such fruits should invariably be eaten along with the substance. One great trouble with pregnant women is costiveness, and this can in a great measure be avoided by the adoption of this rule." (See Ditto.)

(5) "Pure blood being a requirement in the right growth of the child, it is almost unnecessary to say that a clean, sweet, lovable baby cannot be grown by a mother who uses fat, meats, pork, spices, grease, tea, coffee, beer, whisky, wine, &c.; and even lean, fresh or healthy beef or mutton, the least hurtful of flesh diets, are not fit to make babies of the right stamp." (See Ditto, p. 190)

(6) Genius, to be successfully transmitted to the child, must be conceived in the period of preparation, exercised in the period of gestation, and the exercise continued during the whole period of nursing." (See Ditto, p. 266)

"The nine or twelve months of nursing will be the mother's last chance to directly perfect and establish the character of the child, and in no wise should it be slighted," (See Ditto, p. 269,)

থাকে। মাতৃরক্ত যখন দুগ্ধে পরিণত হয়, তখন মাতার মানসিক সর্ব্ববিধ অবস্থা সম্যকরূপে ঐ দুগ্ধে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং সন্তান ঐ মাতৃদুগ্ধ পান করিলে তাহার মধ্যেও মাতার ঐ সমস্ত মানসিক ও শারীরিক অবস্থাগুলি সঞ্চারিত হয়। অতএব মাতার দায়িত্ব যে কতদূর গুরুতর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

"একটি রমণী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর সহিত ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া কলহ করিয়াছিলেন; এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সন্তানকে স্তন্যদান করেন। ইহার অল্প পরেই সন্তানের শরীরে আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" (7)

এ সম্বন্ধে চরক-সংহিতায় ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন :—

"সত্ত্ববৈশেষ্যকরাণি পুনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাতাপিতৃসত্ত্বান্যন্তর্ব্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চাভীক্ষ্ণং স্বোচিতঞ্চ কর্ম্মসত্ত্ববিশেষোভ্যাসশ্চেতি।"

অর্থাৎ শুক্র-শোণিত-সংযোগকালে (সহবাসের সময়ে) পিতামাতার মনে যেরূপ ভাব থাকে, সেই সমুদায় আর আখ্যায়িকা, পুরাণ ও বেদাদি বিষয়ে যে সেই সমুদায় ভাব ও জন্মান্তরের পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত কর্ম্ম সমস্তই সন্তান প্রাপ্ত হই৷ থাকে।

"গর্ভোপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে।"

অর্থাৎ গর্ভের প্রথমোৎপত্তি-সময়ে (সহবাসের সময়ে) স্ত্রী মনে মনে যে জন্তু চিন্তা করিবে, গর্ভস্থ সন্তান তাহার আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ সহবাসের সময় পিতামাতার মনের ভাব যেরূপ থাকিবে, সন্তানের মনের ভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন :—

"পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তারং দর্শয়েদতঃ॥"

সুশ্রুত-সংহিতা।

অর্থাৎ ঋতুস্নানের পর নারী যাহাকে প্রথম দর্শন করে, তাহার সন্তান সেই পুরুষের সদৃশ হইবে। অতএব পতির মুখই প্রথমে অবলোকন করা উচিত।

অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতায় মহামতি বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন :—

"গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে।"

অর্থাৎ বীজ গ্রহণের সময় স্ত্রীর মন যে জন্তুতে গমন করিবে, সন্তান সেই জন্তুর সদৃশ হইবে। চক্রপাণি বলেন, যে জন্তুর ধ্যান করিবে, সন্তান সেইরূপ হইবে।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং—।"

'অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী (চতুর্থ দিবসে) ঋতুস্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভর্ত্তাকে কিংবা পুত্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করিবে। কারণ, ঋতুস্নানের পর যেরূপ পুরুষ দর্শন করে সেইরূপ সন্তান জন্মে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টার মহোদয় লিখিয়াছেন

"মাতার মনে বিশেষ কোন ধারণা হইলে, সন্তান তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (8)

---

(7) "That the food the mother daily uses goes to furnish the food of the infant, and that, in being converted into milk in the mammary glands, is influenced not only by the quality and quantity of the food eaten, but also by the mental state of the mother during and immediately preceding its secretion, and that this influence is carried in the milk directly to the child's organism, and affects in a smaller or greater measure the child's mental and physical character." (See Ditto, P. 267.)

(8) So in a smaller or greater measure, the mother's every day state of mind and body is carried to and impressed on the mind and body of her infant."

A mother, after a violent altercation with a neighbour, immediately after gave suck to her infant. The child had not been at the breast a moment when it went into violent convulsions, and for a time it had every appearance of dying." (See Ditto, P. 268.)

"কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষের প্রতি সুদৃঢ় ধারণা জন্মিলে যদি কোন ইন্দ্রিয়-সংস্রব নাও থাকে, তথাপি ঐ ধারণা-বশতঃ তাহার সন্তান ঐ পরপুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইবে। (9)

সুবিখ্যাত ডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় তাঁহার ধাত্রী-বিদ্যা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "মাতার সর্ব্বপ্রকার মানসিক অবস্থা বা ধারণা সন্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (10)

আধুনিক বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও ঐ সকল তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হলব্রোক মহোদয় বলিয়াছেন—

"মাতার হৃদয়ে যে কোন সুদৃঢ় ধারণা বা বিকৃতি জন্মে সন্তান তাহা প্রাপ্ত হইবে। (11)

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার রডক্ মহোদয় লিখিয়াছেন—

"ভয় ত্রাস ভিন্ন যে কোন ধারণা স্ত্রীলোকের মনে বদ্ধমূল হইবে, তাহাই সন্তান প্রাপ্ত হইবে। (12)

বিখ্যাতনামা ডাক্তার ড্যানক্যান মহোদয় এ সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন :—

"ভ্রূণের পরিবর্দ্ধনের সহিত মাতার মানসিক ধারণার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় মাতার মনে বাহ্য বস্তু দ্বারা যে ধারণা জন্মে, গর্ভস্থ ভ্রূণও তদ্দ্বারা সেইরূপ আকৃতি বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।" (13)

সুবিখ্যাত ডাক্তার স্মিথ বলিয়াছেন—"একটী ভাব-প্রবণা আইরিস রমণী গর্ভাবস্থায় একদিন একটি রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে একটী হাতের অঙ্গুলিহীন ভিক্ষুক হাত তুলিয়া উক্ত রমণীর নিকট ভিক্ষা

---

(9) "Wherein a strong and persistent impression upon the mind of a mother has appeared to produce a corresponding effect upon the development of the fœtus in utero". (See Dr. Carpenter's Physiology. Page 943).

That a strong mental impression made upon the female by a particular male will give the offspring a resemblance to him even though she has had no sexual intercourse with him." (See Ditto p 990 ; and see also Harvey. Loc Cit.).

(10) *Maternal impressions.*

"Fordyce Barker has written an interesting paper on it, in which he collects a number of curious and apparently authentic cases He cites Rokitansky, Carpenter, Geoffry, St. Hilaire, Allen, Thomson, and other eminent anatomists and physiologists as believing in the possibility of maternal impressions being conveyed to the fœtus. He contends that the causes should be habitual, acting on the fœtus through the blood as early in pregnancy."

The Influence of Maternal Inpressions on the Fœtus. See Dr. Playfair, Midwifery, Vol. 1, P. 301.)

(11) Dr. Halbrooke says .—"With regard to the belief that sudden frights or painful or startling impressions of any kind upon the mother produce corresponding results upon the unborn child."

(12) We might quote numerous instances, some from our own experience, in which most unquestionably congenital deformity could be accounted for only by impressions received by the mother during pregnancy. Any strong, striking impressions, not necessarily the result of fright or terror, may affect the child." See Lady's Manual by Dr. E. H. Ruddock M. D., Page 122.

(13) "Vivid mental impressions have a direct effect on the development of the fœtus. Many cases are on record in which infants were born with marks or deformities corresponding in character with object which had been seen and had made a strong impression, on the maternal mind at some period of gestation." (See Diseases of Infants and Children, by J.C. Duncan M.D., p. 130)

চাহিয়াছিল।" এই ঘটনার পরে যথা সময়ে উক্ত রমণীর এক কন্যা সন্তান জন্মে। তখন দেখা গেল যে, ঐ নবজাত কন্যাটার হাতের অঙ্গুলী নাই।" (14)

চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এবং পুরাণ ও সংহিতায় ও ডাক্তারি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "শিশু বালক ও যুবকগণ যে সকল উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি ও অঙ্গবিকৃতি অথবা মানসিক কোন বিকৃতি বা দৌর্ব্বল্য দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা তাহারা পিতা মাতা (বিশেষতঃ মাতা) হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জরায়ুজীবনেই পিতা মাতা হইতে পীড়ার বীজ শিশুর দেহাভ্যন্তরে অঙ্কুরিত হয়। পরে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার দেহায়তন যত বৃদ্ধি হয়, ততই ঐ বীজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং হঠাৎ বাহ্যজগতের কোন কারণ বশতঃ ঐ পীড়া বা বিকৃতি স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।" ফলতঃ শিশু পিতা মাতা হইতে যে কেবল তাঁহাদের অবয়ব ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়, এমন নহে; পিতা মাতার স্বভাব, চরিত্র, স্বাস্থ্য ও সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বা বিকৃতি ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (15)

গর্ভিণীর নিয়ম।

গর্ভিণীর যে যে নিয়ম পালন করা একান্ত ক... এবং যে যে কারণে গর্ভস্থ সন্তানের নানা পীড়া, ... বিকৃতি এবং অকাল-মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহা ম... আত্রেয় লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা "চরক সংহিতা" হইতে মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম, যথা :—

"গর্ভোপঘাতকরাস্থিমে ভাবা ভবন্তি—।"

গর্ভিণী উঁচু হইয়া বসিবে না। অসমান স্থা... কঠিন আসনে কখনও উপবেশন করিবেন না... কখনও মলমূত্রের বেগ ধারণ অথবা তীক্ষ্ণ ঔষধ বা ... ব্যবহার করিবে না। নিতান্ত অল্পাহার, অতিভোজন, যানারোহণ, শরীর সঞ্চালন, অপ্রিয় শব্দ শ্রবণ, অ... ও ভীষণ দৃশ্য দর্শন, শারীরিক ও মানসিক পরি... কোন ভারী দ্রব্য উত্তোলন, দূরে গমন ও রা... জাগরণ করিবে না। এই সমস্ত কার্য্য করিলে গর্ভ... হইতে পারে।" (16)

গর্ভবতী রমণী যানারোহণ, রাত্রিজাগরণ নৃত্য-... জনাকীর্ণ স্থানে গমন, গুরুতর আহার, অল্পাহার ...ভোজন, মাদকদ্রব্য সেবন সর্ব্বদাই পরিত্যাগ ...বে। (17)

সুশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে :—

"গর্ভিণী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে হৃষ্টচিত্তা, শুচি, ...তা, শুক্লবস্ত্র পরিহিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইবে। ...ন, বিকৃত, বা অঙ্গহীন ব্যক্তিকে দর্শন বা স্পর্শ ...বে না। দুর্গন্ধময় পদার্থ ব্যবহার করিবে না; ... যে সকল পদার্থ দর্শনে মনে ভয় বা ঘৃণা জন্মে, ... কোন পদার্থ কখনও দর্শন করিবে না। চিত্তের ...জনক কোনরূপ আলাপ হইতে সতত বিরত ...বে এবং কদাচ দূষিত অন্ন ভোজন করিবে না। ...রে ভ্রমণ, দূরদেশে গমন, শূন্য গৃহে বাস, অথবা ...নে গমন গর্ভিণীর পক্ষে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। ক্রোধ ...য়ের কারণ সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবে। ভারবহন ... উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন প্রভৃতি যাহাতে গর্ভনাশ ...তে পারে, এমন কার্য্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গর্ভাবস্থায় ... তৈলাদি মর্দ্দন অথবা অপরিমিত শারীরিক ...শ্রম করিবে না। কোমল অথচ সুখকর শয্যা ... আসনে শয়ন ও উপবেশন করিবে; অর্থাৎ শয্যা ... আসন যেন অতিশয় উচ্চ বা কোন প্রকারে কষ্টজনক ... হয়। মধুর প্রিয় দ্রব্য, তরল দ্রব্য, অগ্নিকর ও

স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিবে। সাধারণতঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত নিয়ম পালন করিবে।"

গর্ভবতী রমণীর আহার-বিহার প্রভৃতির দোষে সন্তানের যে যে অঙ্গ বিকৃত ও উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা মহর্ষি আত্রে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

"গর্ভিণী হস্ত পদ এবং অন্যান্য অঙ্গ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলে উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে।"

"যে গর্ভিণী সর্ব্বদা বাক্যের দ্বারা, শরীর সঞ্চালন দ্বারা ঝগড়া করে, সেই স্ত্রীর অপস্মার (হিষ্টিরিয়া) রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে।"

"যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা পুরুষ-সংসর্গ করে, তাহার সন্তান কাণা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ অথবা স্ত্রৈণ (স্ত্রীর অত্যন্ত বশীভূত) হইবে।"

"গর্ভিণী সর্ব্বদা শোক-পরায়ণা হইলে, তাহার সন্তান ভীত, ক্ষীণ বা অল্পায়ু হইবে।"

"যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা পরদ্রব্যের অভিলাষ করে, সেই স্ত্রীর পরের পীড়াদায়ক, অত্যন্ত ঈর্ষাবান্ অথবা স্ত্রৈণ সন্তান হয়।"

"গর্ভিণী চৌর্য্যশীলা হইলে তাহার সন্তান অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদা কলহ ও মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকে।"

"গর্ভিণী ক্রোধশীলা হইয়া যে সন্তান প্রসব করে, সেই সন্তান সর্ব্বদা ক্রোধশীল ও কপটাচার হয়।"

"যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা নিদ্রা-পরতন্ত্রা হয়, সেই স্ত্রী মূর্খ তন্দ্রালু সন্তান প্রসব করে।"

"যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা মদ্যপান করে, সেই স্ত্রী অস্থিরচিত্ত সন্তান প্রসব করে।"

"সর্ব্বদা মাংসপ্রিয়া গর্ভিণী যে সন্তান প্রসব করে, সেই সন্তান ধীরে ধীরে চক্ষুর নিমেষ ফেলে ও তাহার চক্ষুর পীড়া হয়।"

"গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রী সর্ব্বদা মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রী বোবা এবং স্থূল সন্তান প্রসব করে।"

---

(14) Dr. Smith says—An Irish woman * * was passing alone a street in the first month of her gestation when she was accosted by a begger who raised his hand destitute of thumb and finger and in God's name asked for alms. * * A female infant was born, but lacking the finger and thumb of one hand." (See Ditto.)

(15) "Observations and daily experience prove the fact, that any serious mental disturbance to which the mother may be exposed during the pregnant state, will tell upon the future constitutional vigour and mental health of her offspring. But where there is habitual indulgence in a life of excitement, or some cause of a depressing character constantly operating upon the system of the mother, the constitution of the child, both mental and physical, will almost invariably suffer. The predisposition which some children manifest to convulsions and head affections, during infancy and childhood, very frequently has its origin in the foregoing causes; and such cases are co... nually coming under the eye of the medical man." See Hints to Mothers, by Dr. Thomas B... M. D., P. 41.

(16) Abortion—miscarriage—causes :—"O... reaching, as in hanging a picture; falls ... blows; taking a false step in going up or do... stairs lifting heavy weights; long walks, ho... back exercise, or riding in carriages over rou... roads, climbing steep or difficult steps, danc... late hours, tight garments, indigestible fo... purgatives: violent mental emotions, as in ... anger, grief, fright &c."

(See Lady's Manual, by Dr. Ruddock, M. P. P. 172.)

"I may again remark that every kind of ag... ting exercise, such as riding in a carriage ... rapidity on uneven roads, violent mental emotio... will sometimes be followed by an immediate ef... upon the system; and convulsions, haemorrh... or a miscarriage may ensue."

(See Hints to Mothers, by Dr. Bull, M. D., P. ...

(17) "Crowded assemblies, however, of all kinds, public spectacles, and large parties—in short, everything calculated to rouse strong feelings, to depress the mind, or excite the passions—ought to be sedulously avoided. From a neglect of this precaution, miscarriage is a very frequent occurrence among young married women of the present day. The visiting, the large dinner parties, immoderate dancing, late hours, and the like, so common in modern society, and often pursued night after night, by exciting and exhausting the system, produce this accident as the inevitable result."

(See Hints to Mothers, by Dr. Bull M. D. P. 30)

"গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রী সর্ব্বদা অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রী নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও চক্ষুরোগগ্রস্ত সন্তান প্রসব করে।

"গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা লবণ রস ভক্ষণ করিলে, তাহার সন্তানের অল্প বয়সেই চর্ম্মের লোলতা, কেশের পক্কতা, অথবা টাকপড়া রোগ হইয়া থাকে।" (18)

"গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রী সর্ব্বাদা ঝাল দ্রব্য ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রীর অতি দুর্ব্বল অল্প শুক্র বা অনপত্য (যাহার সন্তানোৎপাদন-শক্তি নাই) ও বিবিধ চর্ম্মরোগগ্রস্ত সন্তান জন্মে।" (19)

"গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রী সর্ব্বদা তিক্তরস ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রীর দুর্ব্বল যক্ষ্মারোগগ্রস্ত সন্তান হয়।"

"যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা কষায়রস ভক্ষণ করে, তাহার সন্তান নানাবিধ রোগগ্রস্ত হয়।"

"অতএব যে স্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট সন্তানের ইচ্ছা করিবেন, তিনি গর্ভসঞ্চারের প্রথমদিন হইতেই উপরি উক্ত নানাবিধ নিয়মের অধীন হইয়া চলিবেন এবং পবিত্র ও শান্ত মনে থাকিবেন।"

সুশ্রুত সংহিতায় লিখিত আছে :—"গর্ভসঞ্চারের দিন হইতে মাতা এই সকল নিয়ম ... করিবেন। (20)

গর্ভিণী কখনও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিবেন না ... গর্ভিণীর পরিচ্ছদ সুন্দর ও স্বাভাবিক হওয়া উচি... অর্থাৎ পরিচ্ছদের জন্য যেন তাহার কোন কষ্ট না ... উত্তেজক কোন পদার্থ আহার করিবে না। ... জাগরণ ও মলমূত্রের বেগ ধারণ করিবে না। গর্ভি... রমণী সর্ব্বদা ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।"

এ সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা ডাক্তার ট্যানার ... তাঁহার "বাল-চিকিৎসা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"গর্ভিণীর খাদ্য লঘু, পরিমিত ও পুষ্টিকর ... উচিত; গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার গুরুপাক দ্রব্য ... মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়। অস্বাভা... আহারে গর্ভিণীর অভিলাষ জন্মিলে, তাহা তা... দেওয়া উচিত নহে। গর্ভিণীর পোষাক পাতলা ... উচিত। এই সময়ে তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম ... যত্নসহকারে পালন করিবেন। সামান্য শারী... পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।"

"গর্ভবতী রমণী নিয়মিত ভাবে স্নান ও গাত্র... করিবে এবং মানসিক সমস্ত প্রবৃত্তি সংযত রাখি... বিশেষ যত্ন করিবে। কোন রিপুকেই প্রশ্রয় দিবে...

(18) "Dr Thomas Bull, M, D. says;—"Still there is abundant evidence to prove that the indulgence by the mother in luxurious and unwholesome articles of diet not only injures her health, but seriously interferes with the growth and vigour of her offspring." (See Hints to Mothers, P 26.)

(19) এ সম্বন্ধে ডাক্তার মেরিমেন্ একটি দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন :—

"একটি গর্ভবতী রমণী অতিশয় আদা খাইতেন। তাঁহার সন্তানটি প্রসব হওয়ার পর দেখা গেল যে, ঐ সন্তান অতীব দুর্ব্বল হইয়াছে ও তাহার শরীরের নানাস্থানে চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইয়াছে। এই শিশুটি কয়েক সপ্তাহ পরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।"

Dr. Merriman gives the following striking example of the fatal effects of such indulgence upon the child;—"A young woman married to a ginger-bread maker took a fancy, during her first pregnancy, to chew ginger. The quantity of this spice which she thus consumed was estimated at several pounds. She went full time, and had a favourable labour: but child was small and meagre, its skin discoloured, and rough, much resembling furfuraceous desquamation that takes place ... scarlatina. The child continued in an ill state ... health for several weeks, and then died." ... Hints to Mothers, by Dr. Bull, M D. p. 27)

(20) Thus, a woman may consider herse... mother, not only from the birth of her child ... even from the moment of conception. ... that important epoch her duties commence—d... amongst the most sacred and dignified ... humanity is called upon to perform." "But if ... careful management be important for the mo... health. it is equally so for the health of the c... (See Hints to Mothers, by Dr. Bull, M D., P. ...

... ও পবিত্র মনে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে এবং ...শা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কালহরণ ...রিবে।"

বিখ্যাত সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস ... এম্-ডি মহোদয় "তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ ...স্থ্যতত্ত্বে" লিখিয়াছেন :—

"গর্ভবতী স্ত্রীর মল-মূত্রের বেগধারণ করা অব্যবস্থা; ...হার কারণ এই যে, মূত্রাশয় ও মলাশয় অধিক পূর্ণ ...কিলে জরায়ুর উপরে চাপ পড়ে ও তাহাতে ঐ ...ের বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয়, পেষণ দ্বারা উহাতে নানা ...কার বেদনা উপস্থিত হয়, জরায়ু স্থানচ্যুত হইয়া যায় ...বং সময়ে মল মূত্র ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।"

"গর্ভবতী স্ত্রীর যানারোহণ ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ—এই ...টি অতিশয় অপকারী। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে ...থাৎ হঠাৎ আছাড় খাইলে, উদরে আঘাত লাগিলে অধিকক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণ করিলে, গর্ভপাত হইতে ...রে।"

"গর্ভবতী রমণী গৃহকর্ম্মে রত থাকিবেন। একান্ত ...বিমুখ হওয়াও অস্বাস্থ্যকর। সচরাচর দৃষ্ট হইয়া ...কে যে, যাঁহারা গর্ভাবস্থায় গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, ...হারা যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে সন্তানের মুখ দেখিতে পান; ...র যাঁহারা আলস্যে কালক্ষেপ করেন, তাঁহাদিগকে অনেকক্ষণ বেদনা সহ্য করিতে হয়,—কখন কখন ...সব কার্য্যের নিমিত্ত ঔষধ ও অন্যান্য কঠিন উপায়ও ...বশ্যক হইয়া থাকে।"

"গর্ভবতী স্ত্রী কোন কারণেই অধিক রাত্রিজাগরণ ...রিবেন না। উহাতে পিত্তবৃদ্ধি, শিরোবেদনা, ...গ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।"

সূতিকাগৃহ।

বর্ত্তমান সময়ে সূতিকাগৃহের দোষে বহুসংখ্যক শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কেহ কেহ ...লেন যে আমাদের দেশে কোন কালেই সূতিকাগৃহের সুবন্দোবস্ত ছিল না। যাঁহারা ভুলিয়াও একবার আপনাদের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন না তাঁহারা যে ঐরূপ নানা কথা বা মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে সূতিকা-গৃহের দোষে এ দেশের বহু সংখ্যক শিশু যে অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুদের এইরূপ ভীষণ অকাল-মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে খ্যাতনামা ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "ধাত্রীশিক্ষা" নামক গ্রন্থে, বিখ্যাতনামা সিবিল সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু এম্-ডি মহোদয় ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় 'ন্যাশনেল ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকায়, ডাক্তার বার্চ্চ মহোদয়, এবং খ্যাতনামা ৺অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে বিস্তারিত ও তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এস্থলে "ধাত্রীশিক্ষা" হইতে সংক্ষেপে ২।১টি কথা মাত্র উল্লেখ করিব। যদু বাবু লিখিয়াছেন :—

"একটী দোষ হচ্চে আঁতুড় ঘরের মেজে ভিজে স্যাঁৎসেতে রাখা। শুধু এই দোষেই অর্দ্ধেক আঁতুড়ের ছেলে মারা পড়ে।"

"রোয়াক কি উঠানের খানিকটা, গোটাকতক খেজুরপাত কি খানকতক দরমা দিয়ে অমনি যোগে-যোগে ঘিরে, তারই মধ্যে পোয়াতি আর পোয়াতির বাছাকে এই দুরন্ত হিমে ফেলে রাখে!"

আমরা এস্থলে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা হইতে সূতিকাগৃহ কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে ও তাহাতে কি কি দ্রব্য রক্ষা করিতে হইবে, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিব। মহর্ষি আত্রেয় লিখিয়াছেন :—

"প্রাক্ চৈবাস্যা নবমান্মাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েদ-পহৃতাস্থিশর্করাকপালে দেশে প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাগ্দ্বারমুদগ্দ্বারং বা।"

অর্থাৎ গর্ভিণীর নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিবে। সে স্থান হইতে অস্থি, শর্করা (কাঁকোর), কপাল (খাপরা) প্রভৃতি আবর্জ্জনা অপসরণ করাইবে। আর সূতিকাগারের মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট

রূপ ও উৎকৃষ্ট গন্ধ-বিশিষ্ট হওয়া উচিত। অপর, সূতিকাগৃহের দ্বার উত্তর দিকে অথবা পূর্ব্ব দিকে করা কর্ত্তব্য।

"তত্র বৈষানং কাষ্ঠানীং—।"

অর্থাৎ সেই গৃহের বসন (পিড়ি ও খট্যাদি), আচ্ছাদন (বেড়া), এবং পিধান (কপাট) ইত্যাদি বিল্ব, তিন্দুক (গাব), ইঙ্গুদ, ভল্লাতক, বরুণ (যজ্ঞডুম্বুর) এবং খদির এই সমুদায়ের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হওয়া উচিত ; এবং মনোযোগপূর্ব্বক ঋতুসুখের অনুসরণক্রমে ঐ গর্ভিণীর নিমিত্ত অগ্নি, সলিল, উদূখল, বর্চ্চঃ-স্থান (মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান), স্নানভূমি এবং রন্ধনগৃহ প্রস্তুত করাইবে।" (21)

"তত্র সর্পিস্তৈলমধুসৈন্ধব—।"

অর্থাৎ সূতিকাগৃহে ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, কাল-লবণ, বিড়ঙ্গ, গুড়, দেবদারু, শুঁঠ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বচ, শ্বেত সর্ষপ, লশুন, চাউলের কুঁড়া, চাউলের ক্ষুদ, কদম্ব, মসিনা, ভূর্জ্জপত্র, মৈরেয়, সুরা এবং আসব এই সমুদায় দ্রব্য সর্ব্বদা সন্নিহিত রাখিবে।

(21) "The bedroom of a lying-in patient should be large and airy, and, if possible, communicate with another room. It should have a fireplace for fire in winter, which in the summer should be made in the adjoining apartment. Of all rooms in the house it should be the room least exposed to noise." (See Hints to Mothers, by Dr. Bull. P. 153.)

"The bed must be "guarded," as it is popularly called, that is, so arranged as to preserve it with certainty from being soiled or injured." (See Ditto. P. 155.)

"Stimulants and cordials, such as wine, spiced gruel, &c. &c.—be ready for immediate use." (See Ditto, P. 190.)

"All articles of clothing—should be so arranged that they may be found in an instant. A little fresh, unsalted, lard ; Nice twine, five threads, blunt-ended scissors, pins, bandage, a piece of waterproof sheeting, oiled silk, common oil-cloth table-cover, blanket and sheet over the right side of the bed." (See Lady's Manual, by Dr. Ruddock. P 187.)

তথাশ্মানৌ—।"

অর্থাৎ সূতিকাগৃহে শিল, নোড়া, উদূখল, মুষল, গরু, একটী, সুবর্ণ এবং রৌপ্য-নির্ম্মিত দুইটী তীক্ষ্ণ সূচী এবং লৌহনির্ম্মিত কতকগুলি অস্ত্র, বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত দুইখানি পর্য্যঙ্ক, অগ্নি জ্বালিয়া রাখিবার জন্য তিন্দুক ও ইঙ্গুদ কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবে। এতদ্ভিন্ন যে সমুদায় স্ত্রী অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, এইরূপ রমণী এবং কর্ম্মঠ, কার্য্যকুশল, অতি ক্লেশসহিষ্ণু, প্রিয়দর্শন স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিবে। গর্ভিণীর মনে যে কোন বিষয়ে ভয়ের উদ্রেক হয়, এরূপ কথা বলিবে না। (22)

"ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসে—।"

অর্থাৎ তাহার পর নবম মাসে শুভদিনে শান্তি ইত্যাদি দেবারাধনা সুসম্পন্ন করিয়া, পবিত্র গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রবেশ করিতে বলিবে। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ঐ গৃহে প্রশান্ত চিত্তে বাস করিবে।

সুশ্রুত-সংহিতায় লিখিত আছে :—

"বিল্ব, বট, গাব ও ভেলা এই চারি প্রকার কাষ্ঠ দ্বারা সূতিকাগারের পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করিবে। সূতিকাগারের ভিত্তি উত্তমরূপে লেপন করিবে, তাহার দ্বার পূর্ব্ব অথবা দক্ষিণদিকে হইবে। ঐ গৃহ দীর্ঘে আট হাত ও প্রস্থে চারি হাত হইবে এবং রক্ষা ও মঙ্গল-সম্পন্ন হইবে।" (23)

(22) "There should also be in the bag suitable needles, and blunt-pointed scissors &c. The should be provided in the room hot and water, thread for tying the funis, an abdominal binder and a supply of diapers." (See A. Manual of Midwifery, by A. L. Galabin, M. A. M. D. &c.)

"A nurse should be intelligent (that is, possessed of good common sense), and gentle in her general manner, active, and physically able to do all that is required of her, and lastly vigilant." ... well, too, when she has been a mother herself that she may be able, from experience, to sympathise with that class of suffering she is called upon to alleviate." (See H. M. by Dr. Bull P. 148.)

"Deafness in a nurse is a great evil. (See

প্রসবের পূর্ব্বে ও প্রসবের সময় যে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহাও মহর্ষি আত্রেয় বলিয়া গিয়াছেন। যথা :—

"আবীপ্রাদুর্ভাবে তু—।"

অর্থাৎ গর্ভিণীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, ভূমিতে কোমল শয্যা পাতিয়া তাহার উপর শয়ন করাইবে। গর্ভিণী সেই শয্যায় শয়ন করিলে, পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত রমণীগণ তাহার নিকট উপবেশন করিবে এবং গর্ভিণীকে সরল উপদেশ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে থাকিবে। (24)

"দারুণব্যায়ামবর্জ্জনং হি গর্ভিণ্যাঃ—।"

অর্থাৎ মহর্ষি আত্রেয় গর্ভিণীর সম্বন্ধে দারুণ (অতি শ্রমসাধ্য) ব্যায়াম পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বলিয়াছেন। কঠোর ব্যায়ামে গর্ভিণীর ও সন্তানের গুরুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে। (25)

"অথাস্যৈ দদ্যাৎ—।"

অর্থাৎ অনন্তর গর্ভিণীকে গন্ধ গ্রহণ করার জন্য কুড়, এলাচ, মাঙ্গলিক বচ, চিত্রক এবং লাটকরঞ্জ চূর্ণ প্রদান করিবে এবং ভূর্জ্জপত্রের ধূম গ্রহণ করিতে বলিবে। তাহার পর ঈষদুষ্ণ তৈল গর্ভিণীর কটিতে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে এবং উরুতে অতি মৃদুভাবে নিম্নাভিমুখে মর্দ্দন করিবে। যখন গর্ভস্থ সন্তান গর্ভিণীর উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্তি ধারণ করে, সেই সময় প্রসূতি প্রসববেদনায় অস্থির হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে পর্য্যঙ্কে আরোহণ করাইয়া কুন্থন করিতে বলিবে। (26)

(23) খ্যাতনামা সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু এম্ ডি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শাস্ত্রমতে সূতিকাগার মনোহর হওয়া উচিত ; কিন্তু আধুনিক সূতিকাগৃহে এমন কোন পদার্থ বা গুণ দৃষ্ট হয় না, যাহাতে প্রসূতির মন আকৃষ্ট হয়। বরং তিনি কখন ঐ গৃহ হইতে বাহির হইবেন, এই চিন্তাতেই অধিকক্ষণ মগ্ন থাকেন। কিন্তু বাস্তবিকই ঐ গৃহ মনোহর হওয়া উচিত। কারণ মানসিক কষ্ট হইলে প্রসূতির নানা প্রকার গুরুতর পীড়া জন্মে। সূতিকাগৃহ পাকা নির্ম্মিত হইলে, ১০×৭×৭ হস্ত, আর কাঁচা হইলে ১০×৬ ×৭ হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত উহা শুষ্ক, দ্বার অ য়তন-বিশিষ্ট ও জন-কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত হইলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই মঙ্গলকর হয়।" (স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ১৭ পৃষ্ঠা দেখুন)

(24) "The conversation ought ever to be cheerful and encouraging ; and there can be no possible reason why it should be otherwise." (See Ditto P. 150)

(25) "Violent exercise or exertion——* * all or any of these will sometimes produce so much disturbance of the nervous and muscular systems as seriously to affect the well-doing of the child." (See Ditto P. 113.)

(26) "Great pain in the back will be complained of during the labour ; and as pressure with the hand is thought to alleviate it, most urgent, from time to time, will be the request to have it made. This support, however, must be given with care. (See Ditto. P. 162.)

ক্রোধ।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা মানব-শরীরের যতগুলি আভ্যন্তরিক শত্রুর পরিচয় পাইয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহারা ষড়রিপুকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, এবং মানুষকে এই ষড়রিপু হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই ষড়রিপুর মধ্যে দ্বিতীয় রিপু—ক্রোধ শারীরিক স্বাস্থ্যের ঘোর শত্রু। আজ আমরা এই ক্রোধরিপুর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাহি।

ক্রোধ যেমন মানুষের শরীরের রক্তকে খারাপ করে, আমাদের স্নায়ুগুলিকে যেমন বেদনা দেয়, অস্থিগুলিকে যেমন কাঠিন্য প্রদান করে, জীবনী-শক্তির

যেমন বিশৃঙ্খলা ঘটায়, আর কোন মানসিক অবস্থাই এতটা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

ক্রোধ যেমন আমাদের প্রবলতম মানসিক শত্রু, আমরা সেইরূপ অত্যন্ত বেশী পরিমাণে এই রিপুটির বশীভূত হইয়া থাকি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্রোধের প্রভাব যে কত বেশী, আমরা সকল সময়ে তাহা উপলব্ধি করিতেও পারি না। কেবল বড় বড় ব্যাপারে নহে,—অনেক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ব্যাপারেও আমরা ক্রোধের প্রভাব এড়াইতে পারি না। পরিবারের অন্যান্য লোকের অনেক কাজেই সময়ে সময়ে আমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। আমরা যেখানে বাস করিয়া থাকি, সেখানকার নানা অসুবিধা প্রায়ই আমাদের ক্রোধের কারণ হইয়া উঠে। বাড়ীর বাহিরেও যাহাদের লইয়া আমাদের কারবার করিতে হয়, তাহাদের ব্যবহারও সকল সময়ে আমাদের পক্ষে প্রীতিকর হয় না,—বরং অনেক সময়েই অপ্রীতিকরই হইয়া থাকে। সমাজে মিশিবার সময়ে, কর্ম্মস্থলে, ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে নানা রকমে আমাদের হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হইতে পারে। বাহিরের লোকদের নিকট হইতে আমরা যে রকম ব্যবহারের প্রত্যাশা করিয়া থাকি, হয় ত সকল সময়ে সে রকম ব্যবহার পাই না; কাজেই আমাদের ক্রোধ হয়। যাহাদের নিকট হইতে সম্মানের প্রত্যাশা করা যায়, তাহাদের কাছ হইতে সেটুকু না পাইলে মন ক্ষুণ্ণ হয়। অনেক সময়ে তাহারা হয় ত আমাদের গুণের সমুচিত সমাদর করে না; কিম্বা হয় ত বুঝিবার ভুলে কেহ হয় ত আমাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে। অথবা হয় ত কেহ আমাদের সম্বন্ধে অপরের কাছে মিথ্যা দুর্নাম করিয়া বসে; সে সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে অনাদৃত হইয়া আমাদের মেজাজ চটিয়া যাইতে পারে। দরিদ্র বলিয়া কাহাকেও উপেক্ষা করা হইলে, কিম্বা যেখানে সমান ব্যবহারের প্রত্যাশা করা যায়, সেখানে কৃপাপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইলে, ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। কেহ আমাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার করিলেও আমরা রাগিয়া যাই। কাহারও বা আচার ব্যবহার আমাদের মনের মতন হয় না। কেহ বা ভণ্ডামির পরিচয় দিয়া থাকে। কেহ অবিবেচনা পূর্ব্বক এমন একটা কাজ করিয়া বসে, [illegible] অপরের হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক করে। কাহারও [illegible] এমন বিশৃঙ্খল যে, দেখিলেই রাগ হয়। কেহ বা [illegible] পূর্ব্বক অপরের মনে কষ্ট দিতে ভালবাসে। কাহারও স্বার্থপরতা এত বেশী যে, তাহাতে অপরের ক্ষতি [illegible] এইরূপ নানা কারণে সংসারী লোকের রাগ [illegible] পারে। এই সকল কারণ এড়াইবার যো নাই; দোষে-গুণে জড়িত মানুষ।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি [illegible] সব সময়ে বেশ মধুর হয় না। হয় ত স্বামীর একটা বদভ্যাস থাকিতে পারে, স্ত্রী যাহা পছন্দ করে না। কিম্বা স্ত্রী যে ভাবে থাকিলে খুসী থাকে, স্ত্রী হয় ত সকল সময়ে সেই ভাবে করিয়া চলিতে পারে না। মনে করুন, স্ত্রী হয় ত বায়ুগ্রস্তা। আর স্বামী হয় ত শৈশব কাল হইতে ভাবে লালিত পালিত হইয়াছে, যাহা ঠিক [illegible] গ্রস্তের পক্ষে অরুচিকর। এমন স্ত্রীর কপালে স্বামী জুটিলে উভয়েরই জীবন তিক্ত হইয়া [illegible] স্ত্রী হয় ত প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীকে সতর্ক করে যে, শুচিতার যেন কোন ব্যাঘাত ঘটানো না হয়। হয় ত স্ত্রীর অনুরোধ পালন করিতে চেষ্টা [illegible] কিন্তু শৈশবের অভ্যাসবশতঃ সকল সময়ে স্ত্রীর উপ[illegible] তাহার মনে থাকে না। সময়ে সময়ে সে হয় ত [illegible] করিয়া বসে। এবং স্ত্রীর নজরে পড়িলেই [illegible] বাধিয়া যায়।

কিম্বা হয় ত এমনও হইতে পারে যে, [illegible] আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিষয়ে স্বামীর মত হয় ত গোঁড়া; এদিকে স্ত্রী পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে—গোঁড়ামির ধার ধারে [illegible] তাহার ধর্ম্ম ও সামাজিক মতামত খুব উদারভাবের। এইরূপ স্থলে এই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। ক্রোধ ও [illegible] এই সংসারে প্রবলভাবে রাজত্ব করে। তাহার ফলে [illegible]র অশান্তি।

বাড়ীর অন্যান্য লোকের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। [illegible] একজনের কেমন এক একটা স্বভাব দাঁড়াইয়া [illegible] যাহা অপরে মোটে পছন্দ করে না। সংশোধনের [illegible] ফলপ্রসূ হয় না। কাজেই রাতদিন খিটিমিটি। [illegible] হয় ত বড় অপরিষ্কার; সে রাত দিন বাড়ী ঘর [illegible] নোংরা করে। আবার অপর কেহ হয় ত এত নোংরা [illegible] দেখিতে পারে না। নোংরা তাহার চক্ষুঃশূল। কাজেই সে সর্ব্বদা অপরের কৃত নোংরা পরিষ্কার করিতে [illegible] হয়; এবং মনে মনে ও প্রকাশ্যে বিরক্ত হয়। বাড়ীর কোন ছেলে হয় ত অগোছাল। সে তাহার [illegible] জিনিস পত্র গুছাইয়া সাবধান করিয়া রাখিতে পারে না। [illegible] কোন্ জিনিস কোথায় রাখে তাহা মনে থাকে [illegible]। তার পর কোন জিনিসের দরকার হইলে, [illegible] অপরের জিনিস লইয়া টানাটানি করে। যাহার জিনিস [illegible] তাহার কাজেই রাগ হয়। বাড়ীর কাহারও হয় ত [illegible] এমন অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলিবার সময় সাবধান [illegible] হইয়া চলে না—কাদা বা অন্য নোংরা জিনিস মাড়াইয়া [illegible]। সেই কাদা-নোংরা শুদ্ধ জুতা বাড়ীর বাহিরে পরিষ্কার না করিয়া বাড়ীতে ঢুকে এবং উঠান, দালান, [illegible] প্রভৃতির মেঝে ধূলা কাদায় ভর্ত্তি হইয়া যায়। [illegible] সেই কাদা নোংরা অপরকে পরিষ্কার করিয়া মরিতে হয়। নিত্য এমনি পরিষ্কার করিতে হইলে রাগ হয় বই কি। যাহাকে পরিষ্কার করিতে হয়, সে কাজেই ব্যাজার হয়। হয় ত তোমার ছোট ভাই তোমাকে মান্য করিয়া কথা বলে না; কিম্বা হয় ত সে কুসঙ্গে মিশিয়া অসভ্য কথা শিখিয়া আসিয়া বাড়ীতে তাহার আবৃত্তি করে। কাজেই তুমি রাগ না করিয়া থাকিতে পার না। অথবা হয় ত তোমার বড় ভাই কি বোন এমন অহঙ্কারী যে, তোমাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কাজেই তোমার মনে স্বভাবতঃই কষ্ট ও রাগ হইতে পারে। তোমার কোন ভাই হয় ত তোমার মোজা যোড়াটা তোমাকে না জানাইয়াই পরিয়া বাহির হইয়া গেল। তার পর তোমার

বাহিরে যাইবার সময় তুমি মোজা খুঁজিয়া পাও না—সমস্ত বাড়ী তোলপাড় করিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিলে। ইহাতে যেমনি বিরক্তি—মানসিক কষ্ট, তেমনই কাজের ক্ষতি—তোমার হয় ত একটা দরকারী কাজে যাওয়া হইল না, কিম্বা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কোন কাজই হইল না।

কাহারও হয় ত এমন স্বভাব আছে যে, সে ঘরের মধ্যে ঢুকিবার সময় বা ঘর হইতে বাহির হইবার সময় এমন জোরে দরজা খুলিবে, বা এমন ধাক্কা দিয়া দরজা বন্ধ করিবে যে, তাহাতে প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন হইয়া বাড়ীর অপর লোকদিগের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিবে। তাহাকে শত সহস্র বার নিষেধ ও সাবধান করিলেও, সে কিছুতেই তাহার এই বদ্ স্বভাব শোধরাইতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বাড়ীর লোকে বিরক্ত না হইয়া করে কি। কাহারও বা হয় ত লেখা-পড়ায় এমন অনুরাগ যে, সে তাহার বই শ্লেট দোয়াত কলম কাগজ খাতা সমস্ত বাড়ীময় বহন করিয়া বেড়াইবে; এবং যেখানে সেখানে বসিয়া লেখা-পড়ায় অত্যধিক অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ দোয়াত কলম ভাঙ্গিবে কালী ছড়াইবে ও গা-ময় মাখিবে, বই খাতা ছিঁড়িবে; তার পর হয় ত বই শ্লেট প্রভৃতি না তুলিয়াই—যেখানে বসিয়া ছিল, সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়াই অন্য একটা কাজে চলিয়া যাইবে। ইহাতে বাড়ীর অপর লোকদের অসুবিধা হইলেও, সে তাহা খেয়াল করিবে না। কাহারও সাজ-পোষাকের আড়ম্বর এত বেশী যে, তাহার সঙ্গে বা তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোথাও যাইতে হইলে, অপর লোকে লজ্জা অনুভব করে। কাজেই রাগও হয়।

বাড়ীর বাহিরেও রাগের কারণ অল্প নহে। অনেক সময়ে এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়িয়া যাইতে হয় যে, কোনরূপেই ক্রোধ দমন করা যায় না। অর্থের অস্বচ্ছলতা ঘটিলে, প্রতিবাসী মন্দ হইলে, বাসগৃহ পুরাতন, ভাঙ্গা-চোরা হইলে, কিম্বা দেখিতে বিশ্রী হইলে, কিম্বা পল্লী ভাল না হইলে, মনে মনে অসন্তোষ

পোষণ করিতে হয়। আমাদের সাজ পোষাক, খাদ্য, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সকল সময়ে আমাদের মনের মত জুটে না। ইহাতে মন সদাই বিরক্ত থাকে। আমাদের চেহারা যদি সুন্দর না হয়, কিম্বা সুন্দর চেহারা থাকা সত্ত্বেও যদি আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সেই সৌন্দর্য্যের অনুপাতে মানানসই না হয়, তাহা হইলেও আমাদের রাগ হয়। সমাজে সভায় যদি লোকে আমার অপেক্ষা অপরকে বেশী খাতির করে, তাহা হইলেও আমাদের হিংসা হয়, রাগও হয়।

তার পর, আমাদের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আমাদের মধ্যে অনেককে এমন পেশা অবলম্বন করিতে হয়, যাহা তাহাদের মনের মত নয়; কিন্তু উপায় নাই—বাধ্য হইয়াই সেই কাজ করিয়া যাইতে হয়। আবার সমস্ত দিন রাত পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমি হয় ত এই পরিমাণ অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারিতেছি না, যাহাতে নিজের এবং পরিবার-বর্গের ও আশ্রিতগণের দেহে কায়ক্লেশে প্রাণটা বজায় রাখিতে পারি; অথচ আমার সামনে আমার ধনী প্রতিবাসী, একটুও পরিশ্রম না করিয়া, পায়ের উপর পা দিয়া, পৈত্রিক অর্থে নবাবি চালে চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় সহজেই কি মনে হয় না যে, ভগবন্, কি পাপে আমার এমন দুর্দ্দশা, আর পূর্ব্বজন্মের কোন্ পুণ্যফলে ঐ লোকটা অমন সুখভোগ করিতেছে। ভগবন্, তোমার এ কি অবিচার! এই অসন্তোষ, এই ক্রোধ খুবই স্বাভাবিক এবং যত্রতত্র দেখা যায়। কখনও হয় ত বা চাকুরীতে বেতন যথেষ্ট; কিন্তু মুনিব কিম্বা উপরওয়ালা অন্য কর্ম্মচারীরা দুর্ম্মুখ—কারণে অকারণে সদাই তিরস্কার অসদ্ব্যবহার করে। এরূপ অবস্থায় ক্রোধ সংবরণ করিয়া নিজেকে সংযত রাখা প্রবল মানসিক শক্তি না থাকিলে সম্ভব হয় না। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, যাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া কাজ করিতে হয়, সেই সহকর্ম্মীদের মধ্যে সকলে ঠিক মনের মত নয়। ইহাও বিরক্তির একটা কারণ। অনেক সময়ে হয় ত আমাদের খুব বেশী মেহনত করিতে হয়; কিম্বা আমাদের কর্ম্মস্থল আমাদের বাড়ী হইতে অনেকটা দূর—যাতায়াতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

দাম্পত্য জীবনেও আরও অনেক গোলযোগ ঘটিতে পারে। কোন স্ত্রী দেখিতেছে, তাহার সইয়ের স্বামী কত রোজগার করে; সইকে কত গহনা গড়াইয়া দেয়; তাহার স্বামী তেমন রোজগারী নয় বলিয়া তাহাকে কিছুই গহনা দিতে পারে না কেন? কিম্বা সে দেখে, তাহার প্রতিবেশিনীর স্বামীর যেমন কাছে কত খাতির, কত মান; লোকে তাহাকে কত ভালবাসে, কত আদর করে, কত স্নেহ করে, কত শ্রদ্ধা করে; আর তাহার স্বামীকে কেহ পুছে না। কেন এমন হয়? অথবা, কাহারও স্বামী হয় ত দিনের মধ্যে এত বেশীক্ষণ বাহির থাকে, যে, স্ত্রী দিনের মধ্যে একবার স্বামীকে কাছে পায় না, এমন কি স্বামীর দেখা পর্য্যন্ত পায় না; স্বামীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বা সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা কহিবার সুযোগ পায় না। আবার কাহারও স্বামী হয় ত এমন কুণো, মুখচোরা, এমন অমিশুক যে, সে বাড়ী হইতে বাহির হইতে চায় না—সর্ব্বদা ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটায়, সমাজে মোটেই মিশে না। এই উভয় জাতীয় স্বামীই স্ত্রীর প্রিয় হইতে পারে না। এই সকল কারণে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। তাহার ফলে রক্ত গরম হইয়া শরীর খারাপ করে।

দৈনন্দিন জীবনে এত রকমের রোগের কারণ ঘটিতে পারে, এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের এতটা ক্ষতি ঘটিতে পারে,—ইহা অনেকে ধারণা করিতে পারে না। কেহ হয় ত নিজেকে সচ্চরিত্র বলিয়া মনে করে এবং তাহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু সচ্চরিত্র হইলেও লোকে সকল সময়ে ক্রোধের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না, সুখীও হইতে পারে না। অশান্তি ঘটিলেই তাহার ফল ক্রোধ, বিরক্তি। সময়ে সময়ে একটু ক্রোধের কারণ ঘটিলেই যে শরীর নষ্ট হইবে,

লোকে সহজে বুঝিতে না পারিলেও, প্রত্যহই একটু একটু করিয়া যে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তাহা বৃথা যায় না। সারা বৎসর ধরিয়া, এবং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া, কৃপণের ধনের ন্যায় স্বাস্থ্যের উপর ক্রোধের বিষময় ফল সঞ্চিত হইতে হইতে ক্রমে তাহা বিরাট আকার ধারণ করে। এ সকলই কিন্তু মানব-মনের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। তাই সময় থাকিতে ইহার প্রতিকারের চেষ্টাও কেহ করে না। এক এক সময়ে লোকে দেহের মধ্যে এক এক প্রকার দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, এবং তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। আহার বিহারের কোন অনিয়ম নাই; অথচ, শরীর খারাপ হয় কেন? হয় ত সেদিন একটা বড় রকমের পারিবারিক কলহ হইয়াছিল; পরে তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এবং সমস্ত চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে। এই কলহজনিত ক্রোধ এবং মানসিক উত্তেজনা যে শারীরিক পীড়া কিম্বা যন্ত্রণার কারণ হইতে পারে, ইহা সাধারণ মানবের ধারণার অতীত। সেই জন্য অকারণে শরীর অসুস্থ হইয়াছে মনে করিয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। চিকিৎসক আসিয়া তাহার শরীরের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া, এবং সেদিনের সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়া, যদি পারিবারিক কলহকেই শারীরিক পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে সে এমন বিস্মিত হইয়া পড়ে যে, চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

সাধারণ লোকে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, এবং বিশ্বাস করুক আর নাই করুক—ক্রোধ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর, অনেক পীড়ার যে একটা মস্ত কারণ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহা অবিসম্বাদিত সত্য রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার স্বরূপ যদিও কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই বলিয়া ইহার যে কোনই প্রতিকার হইতে পারে না, তাহাও নয়। এই অপ্রত্যক্ষ বিপদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় আমাদের নিজেদেরই হাতে রহিয়াছে; অর্থাৎ ক্রোধ রিপুকে দমন করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। ক্রোধোৎপত্তির কারণ ঘটিলেও, মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের ন্যায়, কোনরূপেই ক্রুদ্ধ হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে রিপুজয় করা খুব ক্ষমতার কাজ, বীরত্বমূলক কাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম প্রথম অবশ্য ক্রোধ রিপুকে জয় করা সহজ হইবে না; কিন্তু মনকে দৃঢ় রাখিয়া চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে এই প্রবলতম রিপুটিকে জয় করিবার শক্তি অর্জ্জন করা যাইতে পারে। যাহাই ঘটুক না কেন, যতই ক্রোধের কারণ উৎপন্ন হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই মনকে বিচলিত হইতে দিব না, সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচলিত থাকিব—এইরূপ পণ করিলে, ক্রোধ আর আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারিবে না। ক্রোধ দমনের আর একটী উপায়, সন্তোষ। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় সন্তুষ্ট চিত্তে থাকা ক্রোধ দমনের অমোঘ মহৌষধ। ইহা ডাক্তার-খানায় কিনিতে পাওয়া যায় না,—ইহা সকলের অন্তরে অবস্থিত। কেবল অনুশীলনের দ্বারা ইহাকে আমাদের কাজে লাগাইতে হয়। আবার, কেবল নিজে সন্তুষ্ট থাকিলেই সকল সময়ে যথেষ্ট হইবে না। যাহাদিগকে লইয়া আমাদের ঘর করিতে হয়, তাহাদিগকেও ক্রোধ দমন করিতে শিখাইতে এবং ক্রোধ দমনের অভ্যাস করাইতে হয়। আনন্দ লাভের কোন অবসরই ছাড়িয়া দিতে নাই। সময় সময় বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করিতে হয়। কুচিন্তা বর্জ্জন করিয়া সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিলেও ক্রোধের হাত হইতে সময়ে সময়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। নিজে ত সন্তুষ্ট থাকিবই, পরন্তু, অপরকেও সন্তুষ্ট করিব, এবং সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিব—এই ভাবে চলিলেও ক্রোধোৎপত্তির কারণ অনেকটা কমিতে পারে। অপর লোকে যদি আমাকে মানসিক পীড়া না দিয়া থাকিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া ক্রোধ বর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের ক্ষতি করিয়াও যদি অপরকে সুখী করিতে পারা যায়,—ক্রোধের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা তাহাও শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে অন্য লোকের দিক হইতে আমার ক্রোধের কারণ ঘটিবে না;—ঘটিলেও, কম হইবে।

সর্ষপ তৈল।

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

সর্ষপের স্বরূপ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। ভারতে এরূপ কোন লোক নাই, যিনি সর্ষপ তৈল নিত্য ব্যবহার করেন না। ইহার অপরিহার্য্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার বাহুল্য ও ভৈষজ্য গুণের বিষয়ে আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে, ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ইহা আগ্নেয়, লঘুপাক ও দুর্গন্ধহারক। ইহা চক্ষের হিতকর। কাঁচা তৈল ভক্ষণে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

বাহ্য প্রয়োগে কণ্ডু ও শ্বিত্ররোগ আরোগ্য হয়। ভাব প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

দীপনং সর্ষপং তৈলং
কটুপাকি রসং লঘু।
লেখনং স্পর্শ বীর্য্যোষ্ণং
তীক্ষ্ণ পিত্তাশ্র দূষকং
কফ মেদোঽনিল
অর্শোঘ্নং শিরঃ কর্ণাময়াপহং।
কণ্ডু কোঠ ক্রিমি শ্বিত্র
কুষ্ঠ দুষ্ট ব্রণ প্রণুৎ॥

সর্ষপ বৃক্ষের কচিপাতা শাকরূপে আমাদের দেশে বহু লোকে আহার করিয়া থাকে। ইহা পলতা পাতার ন্যায় কথঞ্চিৎ পিত্ত প্রশমক গুণশালী ও মৃদু বিরেচক।

ইহার ফুল হইতে মধুমক্ষিকাগণ যে মধু সংগ্রহ করে, তাহা কমলা মধুর ন্যায় সুস্বাদু ও উপকারী; তাহাকে "মাঘী" মধু বলে। এই মধু শীঘ্র নষ্ট হয় না। দানা বাঁধিয়া দীর্ঘ দিন ভাল থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে অনুপানরূপে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

সুপরিষ্কৃত সর্ষপ অম্লাদি পাকে সম্বরারূপে ব্যবহৃত হয়। সর্ষপ বাঁটা অনেক প্রকার তরকারী পাকে ব্যবহার করা হয়। ইহার চূর্ণ দ্বারা আমাদের দেশে "কামন্দ" প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা মুখরোচক ও আগ্নেয়। বৈশাখ মাসের অক্ষয়া তৃতীয়া দিবস পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকেরা স্নানপূত হইয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক আচরণের সহিত "কামন্দ" প্রস্তুত করিয়া থাকেন। যত্ন করিয়া রাখিলে ইহা দীর্ঘ দিন ভাল থাকে। সর্ষপ চূর্ণ সহযোগে তেঁতুল গোলা আম প্রভৃতি শুষ্ক করিয়া চাটনি প্রস্তুত করা রাখা হয়।

সূক্ষ্ম সর্ষপ চূর্ণ "মাষ্টার্ড" রূপে ডাক্তারী চিকিৎসায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ও ইহার চূর্ণ সাহেবগণ ব্যবহার করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুস্নিগ্ধ সতিক্তক।
তীক্ষ্ণোষ্ণ কফবাতঘ্ন রক্তপিত্তাগ্নি বর্দ্ধন॥
রক্ষোহর জায়েৎ কণ্ডুং কুষ্ঠ কৌট ক্রিমি প্রণুৎ।
যথা রক্ত স্তথাগৌর কিন্তু গৌরো বরোমতঃ॥

অর্থাৎ সর্ষপ তিক্ত, কটুরস কটু বিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বাত নাশক, রক্ত, পিত্ত অগ্নি বর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন ও কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ক্রিমি গ্রহ-দোষ নাশক। ইহা রক্ত ও গৌরবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। কিন্তু গৌরবর্ণ শ্রেষ্ঠ।

আমাদের দেশে সর্ষপ তৈল গায়ে, মাথায়, এরূপ বহুল ভাবে ব্যবহার হয় যে, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সমস্ত শরীরে উত্তম রূপে তৈল মর্দ্দন করা হইয়া থাকে। ইহাতে শিশুর শরীর পুষ্ট হয় ও সংক্রামক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিলে শোণিতের গতিবৃদ্ধি হয় ও ত্বক কোমল ও উজ্জ্বল থাকে। ইহাতে চর্ম্ম-রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। শরীর স্নিগ্ধ ও সুস্থ থাকে। তৈল উত্তম রূপে শরীরে মর্দ্দন করিলে শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। ও অনেক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। হস্ত ও পদতলে তালরূপ তৈল মর্দ্দনে সর্দ্দিজনিত উপসর্গ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ শিশুদিগের তরুণ সর্দ্দিতে হস্ত ও পদতলে সর্ষপ তৈল মর্দ্দনে সর্দ্দিজনিত উপসর্গ দূরীভূত হয়। রাত্রে যাহারা খোলা যায়গায় নিদ্রা যায়, তাহাদের অঙ্গে গাত্রে তৈল মালিস করিয়া শয়ন করিলে মশার উপদ্রব কম হয় ও ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। স্নানের পূর্ব্বে অনেকক্ষণ শরীরে তৈল মর্দ্দন অভ্যাস করা ভাল। তাহাতে ক্রমে শরীরের মধ্যে তৈল প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বল শরীর সবল হয়। অনেক দূর হাঁটার পর পায়ে বেদনা হইলে তৈল মর্দ্দনে উপশম হয়। বাতব্যাধির বেদনায় তৈল মর্দ্দনে বেদনা দূরীভূত হয়। নিউমোনিয়া, প্লুরিসি ও যক্ষ্মা রোগে সর্ষপ তৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। গাত্রে খোস পাঁচড়া হইলে সর্ষপ তৈল মর্দ্দনে আরোগ্য হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীত কালেই সর্ষপ তৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে শীত কম বোধ হয় ও গাত্র চর্ম্ম ফাটিতে পারে না। একটী বংশদণ্ডকে যেমন তৈল মর্দ্দনে শক্ত ও পাকান যায়, শরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে শরীরও সেইরূপ দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলিয়াছে

অন্নাদষ্টগুণং পিষ্টং পিষ্টাদষ্টগুণং পয়ঃ।
পয়াদষ্টগুণং মাংসং মাংসাদষ্টগুণং ঘৃতং॥
ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনান্নতু ভক্ষণাৎ।

অর্থাৎ অন্ন হইতে আটা, আটা হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে মাংস, মাংস হইতে ঘৃত, এবং ঘৃত হইতে তৈল আটগুণ পুষ্টিকর। এই পুষ্টিকারিতাগুণ ভক্ষণে নহে মর্দ্দনে।

স্নানের পূর্ব্বে এক ফোঁটা সর্ষপ তৈল চক্ষে দিলে দৃষ্টিশক্তি প্রসন্ন থাকে।

কাণে কচু চোকে তেল্।
তাঁর বাড়ী না যৈও গেল্॥

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রবন্ধটী চলিত আছে। কিন্তু চক্ষে একটু ধরে বলিয়া এক্ষণে আর ইহা ব্যবহার করিতে কেহ রাজী হন না।

ঔষধার্থে সর্ষপ তৈল নানা প্রকারে ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কাটা ঘায়ে কাঁচা সর্ষপ তৈল দিলে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব বন্ধ ও বেদনা নিবারণ করিয়া ক্ষত আরোগ্য করে। পচা ক্ষতে সর্ষপ তৈল পচন নিবারক গুণ প্রকাশ করে ও দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ইহা অধিক ব্যবহারেও শোষিত হইয়া পারদ, কার্ব্বলিক এসিড ও আইডোফরমের ন্যায় বিষক্রিয়া প্রকাশ করে না।

ইহার গন্ধ তৃপ্তিকর। আইডোফর্ম্ম ও কার্ব্বলিক এসিডের ন্যায় ইহা দুর্গন্ধযুক্ত নহে। বরং ইহা দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

বালকদিগের সূত্রবৎ ক্রিমি রোগে সর্ষপ তৈল উত্তম ঔষধ। যে সকল বালকের গুহ্যদ্বার দিয়া ক্রিমি বাহির হইয়া উপদ্রব করে, তাহাদের গুহ্যমধ্যে সর্ষপ তৈলের পিচকারী দিলে ক্রিমির উপদ্রব কম হয়। আঙ্গুলে তৈল মাখাইয়া প্রতিদিন গুহ্যমধ্যে দিলেও উপকার হয়।

অর্শরোগে এই প্রকারে ২।৩ আউন্স সর্ষপ তৈল গরম করিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে অর্শরোগের উপশম হইয়া থাকে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগে গরম সর্ষপ তৈলের পিচকারী উৎকৃষ্ট। ২।৩ বার ব্যবহার করিলেই মল সহজে নির্গত হইয়া থাকে।

সর্ষপ তৈল দ্বারা দন্ত-ধাবন করিলে নানা প্রকার দন্তরোগ আরোগ্য ও দন্তমূল দৃঢ় হয় ও মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

তরুণ ও পুরাতন গণোরিয়া রোগে সর্ষপ তৈলের পিচকারী দিলে স্রাব বন্ধ হইয়া ক্ষত আরোগ্য করে।

কর্ণশূল ও কাণপাকা রোগে গরম সর্ষপ তৈল উত্তম ঔষধ।

কলিকাতায় যখন প্রথম বিউবোণিক প্লেগ দেখা দেয়, তখন সর্ষপ তৈল প্লেগের প্রতিষেধক বলিয়া দেশময় রাষ্ট্র হয়। ঐ সুযোগে কয়েকজন কবিরাজ মূর্চ্ছিত সর্ষপ তৈল প্লেগের প্রতিষেধক বলিয়া পেটেণ্ট বাহির করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

সর্ষপ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খৈল থাকে, তাহা অনেক কার্য্যে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই খৈল গাভীকে খাওয়াইলে তাহারা দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় ও গাভী সবল কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। জমির সাররূপে খৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। গাত্র ও চুল পরিষ্কারের জন্য বঙ্গ-ললনাগণ এখনও খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাবানের পরিবর্ত্তে এই স্বল্পমূল্যের ও সহজ প্রাপ্য খৈল গরীবের পক্ষে উত্তম উপকারী।

সর্ষপ তৈল উত্তম পচন নিবারক বলিয়া আমাদের দেশে অনেকে নানা প্রকার চাট্‌নি সর্ষপ তৈল মধ্যে রাখিয়া থাকেন। তাহাতে ঐ সকল দ্রব্য দীর্ঘ দিন টাট্‌কা ও ভাল থাকে। কাঁচা মৎস্য ও মাংস কিছুক্ষণ রাখিতে হইলে, তৈল মাখাইয়া রাখিলে তাহা শীঘ্র পচিতে পারে না।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ মহোপকারী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যটী আর খাঁটি মি... না। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ে এতই ভেজা... দেওয়া হইতেছে যে, ইহার উপকারিতা অপে... পরিবর্ত্তে অপকারিতা দোষই অধিক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের কলু (যাহাদের তৈলের এক চো... ব্যবসা ও তজ্জন্য কলু নামধারী, তাহারা) নানা প্রকার অল্প মূল্যের তৈলাক্ত ফল ও অন্যান্য ... মিশ্রিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করতঃ নিত্য ব্যা... সৃজন করিতেছে।

পল্লী গ্রামের কলুরা আইনের গণ্ডিতে বদ্ধ না... তাহাদের শাসন করিবার অধিকার কাহারও নাই... তাহারা লঙ্কা, বোচ, চিনাবাদাম, গুঁজি ও অন্যা... কতকগুলি গাছের ফল সর্ষপের সহিত মিশ্রি... করিয়া থাকে। সহরে যে সকল তৈলের কল আ... তাহাতে যে কত প্রকার ভ্যাজাল ব্যবহৃত হয় ত... সর্ব্বজনবিদিত। দেশময় এত আন্দোলন... আলোচনা—কিন্তু মানবের যে স্বাস্থ্য সকল সু... মূল, সেই মূলেই কঠোর কুঠারাঘাত হইয়া দি... দিন কত যে মানুষ আধিব্যাধিতে পীড়িত হই... জীবলীলা শেষ করিতেছে তাহা কয় জনের নয়ন... গোচর হইতেছে?

পল্লী-স্বাস্থ্য।

এবার দেবতা বড় বাদ সাধিয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে বারিপাত না হওয়ায় চারিদিক হইতে জলাভাবে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ...চৈত্রমাস শেষ হইতে চলিল, একবিন্দু বৃষ্টি হইল না। চতুর্দিকে ...জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, অনেক স্থানে কুলললনাগণকে এক মাইল ...দুই মাইল দূর হইতে জল আনয়ন করিয়া স্বামীপুত্রের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে এবং কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া চতুর্দ্দিকে কলেরা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে জলকষ্ট কি তাহা লোকে জানিত না; কিন্তু এবার হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছে! ...উপরি সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিরও অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে, চতুর্দ্দিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া কৃষকের আত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। ভগবানের উদ্দেশ্য কে বুঝিবে। (যশোহর)।

যশোহরে কেবল কলেরা নয়:—

সহরে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, সহরবাসী উচ্ছে ...টীকা লওয়ানের ব্যবস্থা করুন। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ যাহাতে রোগ বিস্তার লাভ করিতে না পারে তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করুন।

(যশোহর)।

গবর্ণমেণ্ট কুইনাইনের মূল্য কমাইয়া দিয়া দরিদ্র প্রজাসমূহের উপকার করিয়াছেন:—

কুইনাইনের মূল্য হ্রাস। গবর্ণমেণ্ট কমিউনিকে প্রকাশ, গত ...লা এপ্রিল হইতে পোষ্টাপিসে প্রতি টিউব কুইনাইন আট আনা ...স্থলে দুয় আনায় বিক্রয় হইতেছে।

(সঞ্জয়, খুলনা, যশোহর, কল্যাণী)।

জলাভাবে সর্ব্বত্র হাহাকার।—

জেলায় কোন কোন স্থানে সুবৃষ্টি, কোথাও সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। তবে অধিকাংশ স্থলেই বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। কিন্তু ...আবার সেই গ্রীষ্মাধিক্য! বৃষ্টির জন্য জলকষ্ট কিছুই হ্রাস হয় নাই। জেলার অধিকাংশ স্থলেই জলকষ্ট। বহু পুরাতন পঙ্কিল পুষ্করিণীর ...পানা আবর্জ্জনা গলিত জলও শুষ্ক হইয়াছে। জলের অভাবে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা আদি পীড়িত হইয়া হতভাগ্য জনগণ নীরবে ...ভাগ্যে আস্থা স্থাপন করিয়া ঐ জলই পান করতঃ মরিতেছিল, এখন তাহার অভাবেও মরিবে। যাহাদের মৃত্যুই অবধারিত, তাহাদের জন্য আর শোক কি? তাহাদের মরণই মঙ্গল।

(মেদিনীপুর হিতৈষী)।

নদীমাতৃক-বাঙ্গলা দেশের পল্লী-জননীদের কিরূপ জলকষ্ট দেখুন—

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির জন্য এবার এ অঞ্চলের সর্ব্বস্থানেই এরূপ ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে যে তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। লোকে ২ ক্রোশ ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জল আহরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। (পল্লীবার্ত্তা)।

আরও আছে—

জলাভাব—বৃষ্টি না হওয়ায় দারুণ গ্রীষ্মে সহরের অধিকাংশ কূপই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখন জল সরবরাহের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কোন উদ্যম দেখা যাইতেছে না। প্রতি বৎসর নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অধিবাসীদের অভাব অভিযোগ পূরণের কতকটা আশা থাকে। (মেদিনীপুর হিতৈষী)।

এবার মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনে গিয়া সেখানকার জলকষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। সেখানকার আত্মীয় স্বজনের পত্রেও জলকষ্টের কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে। জলকষ্টের উপর আবার—

সহরে বসন্ত—সহরে বসন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মৃত্যু সংখ্যাও মন্দ নহে। (মেদিনীপুর হিতৈষী)।

কলেরাও বহুস্থলে দেখা যায়—

গাইঘাটা থানার অধীন ঢেকাটায় বাজারে কলেরার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বনগ্রাম টাউনে কলেরা রোগ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে এই রোগে আর কোন লোক আক্রান্ত হয় নাই। (পল্লীবার্ত্তা)।

জলকষ্ট বলিলেই কলেরাও বুঝিতে হইবে। ইহা নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব—এতদঞ্চলের চারিদিকেই দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে লোকে পঙ্কিল ও দূষিত জল ব্যবহার করিয়া ওলাউঠাদি রোগে আক্রান্ত হইতেছে। মফঃস্বলের নানা স্থানে ইতিমধ্যে ওলাউঠাক্রান্ত হইয়া কয়েক ব্যক্তি মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। (নীহার)।

বসন্ত ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব—এগরা থানার নানাস্থানে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। পটাশপুর থানার অনেকস্থলে হাম ও কলেরা প্রভৃতি হইতেছে। নিউমোনিয়া এবং ঐ সমস্ত ব্যাধিতে অনেকে মারা যাইতেছে। (নীহার)।

সর্ব্বত্রই প্রায় সমান অবস্থা।—

ফরিদপুর জিলার চিকন্দা, দোমেলা, ভুবনপুর ও মাদুরা প্রভৃতি স্থানে কলেরার ভয়ঙ্কর প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

(ঢাকা প্রকাশ)।

একটু আশার কথা।—

মফঃস্বলের নানা স্থানে কলেরা রোগ হইতেছিল। আজকাল ইহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। (পল্লীবার্ত্তা)।

যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে।—

হুগলীতে বিসূচিকা ও বসন্ত। সম্প্রতি এই নগরীতে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই কারণে কয়েক দিবসাবধি ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি বন্ধ আছে। যাহাতে এই সংক্রামক রোগগুলি বিস্তৃত না হয় সে বিষয়ে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষগণের আর অধিককাল উদাসীন থাকা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নগরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সমূহ নিয়মিতরূপে পরিষ্কার করা পানীয় জলের বিশুদ্ধতা ও পায়খানা নর্দ্দমা প্রভৃতি মলমূত্রাদি নিকাশের স্থানগুলি পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আজকাল এই সহরে যে সমস্ত সাধারণ নালা ও নর্দ্দমা আছে তাহা আর পরিষ্কার হয় না। রাস্তার উপর আবর্জ্জনা স্তূপাকারে পড়িয়া থাকে এবং নালা নর্দ্দমাগুলি স্বাস্থ্যহানিকর ময়লায় পরিপূর্ণ থাকে। পূর্ব্বে গন্ধক, আলকাতরা, "ফেনাইল" প্রভৃতি বিশুদ্ধকারক দ্রব্য উপরি উক্ত নালা নর্দ্দমায় ব্যবহার করা হইত; কিন্তু আজকাল তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ টেক্স দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক যাহাতে উল্লিখিত বিষয়গুলি যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা একান্ত প্রার্থনীয়। (চুঁচুঁড়া বার্ত্তাবহ)।

আলোচনা।

কুইনাইনের মূল্য হ্রাস।—

এবার আমরা প্রথমেই পাঠক-পাঠিকাগণকে একটী শুভ সংবাদ দিবার সুযোগ লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম, কুইনাইনের একচেটিয়া ব্যবসায়ে গবরমেণ্ট অত্যধিক লাভ করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশের গরীব প্রজাদের ম্যালেরিয়া নিবারণের একমাত্র অবলম্বন কুইনাইন বিক্রয় করিয়া লাভের প্রত্যাশা করা গবরমেণ্টের উচিত নহে। আমাদের আন্দোলনের ফলেই যে হইয়াছে তাহা আমরা বলিতেছি না, তবে মোটের উপর, গবরমেণ্ট কুইনাইনের মূল্য কমাইয়া দিয়াছেন। মফস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ, বঙ্গীয় গবরমেণ্টের তরফ হইতে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে পোষ্টাফিসে কুইনাইনের যে নল ॥০ আনা বিক্রি হইত,—১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উহা ।৵০ আনা দরে বিকাইবে। আমাদের বোধ হয় ইহাতেও গবরমেণ্টের প্রচুর লাভ থাকিবে। আমাদের বিশ্বাস, কুইনাইন বিক্রয় করার বিষয়ে গবরমেণ্টের ব্যবসায়-বুদ্ধি সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গবরমেণ্ট যখন ম্যালেরিয়া নিবারণ করিয়া প্রজা রক্ষা করিতে পারেন না, তখন কুইনাইন বিক্রয় করিয়া একটী পয়সাও লাভ করা গবরমেণ্টের উচিত নহে; উহা সম্পূর্ণ পড়তা দামে বিক্রয় করা উচিত। কুইনাইন বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করা কোন ক্রমেই ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। আর যদি কুইনাইনের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতেই হয়, তাহা হইলে লাভের সমগ্র অংশটাই ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে ব্যয় করা উচিত। এই টাকায় অনেক গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে, অনেক গ্রাম কিয়ৎ পরিমাণে ম্যালেরিয়াশূন্য হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির কথা উঠিলেই সরকারের ধনাগারে অর্থাভাব হয়। অথচ, কুইনাইনের ব্যবসায়ে গবরমেণ্ট অর্থলাভ করিতেও ছাড়েন না। ব্যাপারটা দেখিতে শুনিতে অতি বিশ্রী। আমাদের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয় কথায় কথায় ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গবরমেণ্টের নিদারুণ অর্থাভাবের কথা জানাইয়া, ম্যালেরিয়া নিবারণ জন্য প্রজাদের উপর নূতন কর স্থাপনের বা টাকা ধার করিবার ভয় দেখাইতেও ছাড়িতেছেন না। এই যে কুইনাইন বিক্রয় করিয়া এত টাকা লাভ করা হয়, সেই টাকার এক পয়সাও ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে ব্যয় করিবার কথা ত কই তাঁহার মুখ দিয়া এ পর্য্যন্ত বাহির হইল না! ট্যাক্স বসাইতে হয় বসান, ঋণ করিতে হয় করুন;—মোট কথা, ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্রীত্ব সার্থক করুন। নচেৎ শুধু আস্ফালন আর ভাল দেখায় না।

টিউব ওয়েল।

বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় নিদারুণ জলাভাব ঘটিয়াছে। কলিকাতার কর্পোরেশন আর সহর-বাসীদের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না,—স্পষ্টই অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। যখন মিউনিসিপ্যাল শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সহরে বহু পুকুর ও পাতকূয়া ছিল, নানা রকম ওজর আপত্তি করিয়া মিউনিসিপ্যালিটী ঐ সকল কূপ ও পুষ্করিণীর মালিকদিগকে সেগুলি নিজ ব্যয়ে বুজাইয়া ফেলিতে বাধ্য করিয়াছেন। সহর প্রায় কূপ ও পুষ্করিণী-শূন্য হইয়াছে; এবং এখন কর্ত্তারা পস্তাইতেছেন। সহরে পুকুর থাকিলে অনেক খোলা জায়গা থাকে; অবাধে বায়ু চলাচলের অনেক সুবিধা থাকে, লোকের বসতি অনেক কম থাকে; দায়ে অদায়ে পুকুর হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। কোথাও আগুন টাগুন লাগিলে যথেষ্ট জলের অভাবে দমকল ভাল কাজ করিতে পারে না। কাছে পুকুর থাকিলে, a stitch in time saves nine হিসাবে, অগ্নির সুত্রপাতেই স্থানীয় লোকেরা দু'চার ঘড়া জল ঢালিয়া দিয়া অনেক আগুনই নিবাইয়া ফেলিতে পারে। রন্ধন ও পানের জন্য পরিশ্রুত জল ব্যবহার করিলে, ঘর দোর ধোওয়া প্রভৃতি গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে পুকুরের জল স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। তাহা হইলে অক্ষম মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে সহরবাসীর পরিষ্কার জলের দাবী অনেকটা কম হয়। দশ বিশ কোটী টাকা খরচ করিয়া জল সরবরাহ করিবার বিভীষিকাও দেখিতে হয় না। সে যাহা হউক, গতস্য শোচনা নাস্তি। পুকুর কূপ যখন সমস্ত বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে, তখন ত আর উপায় নাই। পুকুর বোজানো জায়গাগুলিতে বড় বড় প্রাসাদ বা দরিদ্রের বস্তী তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। এখন কেহ ইচ্ছা করিলেও এবং মিউনিসিপ্যালিটি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বা গবরমেণ্ট অনুমতি দিলেও, এমন কি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেও, আর একটীও পুকুর কাটাইবার মত এক কৌটাও জায়গা নাই। অথচ দারুণ জলাভাব—উপায় কি? মিউনিসিপ্যালিটী যখনই যে কোন পুকুরের মালিককে পুকুর বুজাইতে বাধ্য করিয়াছেন, তথনই প্রায় অস্বাস্থ্যের ওজর করিয়াছেন। কেবল চাঁপাতলার গোলদীঘি বুজাইবার সময়—উহাতে মানুষ ডুবিয়া মরে, অতএব উহা বিপদজ্জনক—এইরূপ একটী ওজর করা হইয়াছিল,—যেন পটলডাঙ্গার গোলদীঘি, হেদুয়ার দীঘি ও লালদীঘিতে কেহ কখনও ডুবিয়া মরে নাই! আমাদের মনে হয়, অস্বাস্থ্যের ওজর মিথ্যা ওজর মাত্র—উহা একটুও যুক্তি বা বিচারসহ নহে। কেন, যে উপায়ে গোলদীঘি, লালদীঘি, হেদুয়ার পুকুরের জল পরিষ্কার রাখা হয়, প্রাইভেট পুকুরগুলিও কি সেই উপায়ে পরিষ্কার রাখা চলিত না? আইনের বলে মিউনিসিপ্যালিটী যথন পুকুরগুলি বুজাইয়া দেওয়াইতে পারেন, তথন কি পুকুরের মালিকদিগকে নিজ নিজ পুকুর পরিষ্কার রাখিতে বাধ্য করিতে পারিতেন না? সে যাহা হউক, নিতান্ত অবিবেচনা সহকারে পুকুরগুলি বুজাইয়া দেওয়ায় এখন মিউনিসিপ্যালিটী ও সহরবাসী

উভয়েই মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাই টিউব ওয়েলের কথা উঠিয়াছে। টিউব ওয়েল করাইতে কি ব্যয় পড়িতে পারে, তাহার কথা, টিউব ওয়েল হইতে যে জল উঠিবে, তাহার স্বাস্থ্যকরতার কথা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা চলিয়াছে, সংবাদপত্রে রীতিমত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যে মিউনিসিপ্যালিটী অস্বাস্থ্যের ওজর করিয়া পুকুরগুলি বুজাইয়া দিয়াছেন, সেই মিউনিসিপ্যালিটী 'ফিলটার্ড ওয়াটারে'র নামে যে জল সহরবাসীকে সরবরাহ করিতেছেন, তদপেক্ষা, আমাদের মনে হয়, গভীর করিয়া টিউব ওয়েল খনন করাইতে পারিলে, অনেকটা বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইবে। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে যে সকল কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই সকল কল সংলগ্ন যত সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের ময়লা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, কলিকাতা কর্পোরেশন যে ফিলটার-করা জল সহরবাসীকে সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিতে যতই পরিষ্কার ও নির্ম্মল হউক না কেন, তাহা যে রোগ-বীজাণুশূন্য (bacteriologically pure) হইবে, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। মিউনিসিপ্যালিটী কৃত্রিম ফিলটার অপেক্ষা ধরিত্রীর স্বাভাবিক ফিলটার অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে বলিয়াই ভরসা করা যায়। এজন্যে কলিকাতা অঞ্চলে দুই চারি হাত খুঁড়িলে যে জল পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য, তাহা তেমন বিশুদ্ধ হইবে না। কিন্তু ১৫০ বা ২০০ ফিট গভীর করিয়া টিউব ওয়েল খনন করাইলে, deep strataর জল অনেকটা বিশুদ্ধ হইবে বলিয়াই মনে হয়। টিউব ওয়েল খনন করাইতে সহরবাসীদের কিছু অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে হইবে বটে, কিন্তু উপায় কি? টিউব ওয়েল খনন করাইলে, অন্ততঃ পানীয় ও রন্ধনের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর হাত-তোলা হইয়া থাকিতে হইবে না—ইহা বিশুদ্ধ "স্বরাজ" হইবে সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমরা টিউব ওয়েলের সমর্থন করি। এখন টিউব ওয়েল খনন করাইবার পক্ষে মিউনিসিপ্যালিটী, একটা না একটা ওজর তুলিয়া, আইনের ভয় দেখাইয়া, সহরবাসীকে বাধা না দেন, ইহাই প্রার্থনা।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল | ২য় সংখ্যা

জীবাণু-রহস্য। (৪)

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্

এ পর্য্যন্ত আমরা শিখিলাম কি কি? আমরা শিখিলাম যে, জীবাণু দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও ভীষণ শক্তিশালী। আমরা দেখিলাম, জীবাণুরা কি খায়, কিসে বাঁচে। কিসে মরে, আমরা বুঝিলাম, জীবাণুরা আমাদের উপকারও যেমন করে, অপকারও তেমনি করে; এবং আমরা বেশ বুঝিলাম, জীবাণুরা দেহে প্রবেশ করিয়া ব্যারামের সৃষ্টি করিলে কি কি উপায়ে আমরা ব্যারামমুক্ত হইতে পারি।

এইবার জীবাণুদিগকে একে একে ধরিয়া দুই একটি কথা বলিব।

ম্যালেরিয়া-জীবাণু।—ইহারাও চর্ম্মচক্ষের অগোচর। ইহারাও পরাঙ্গপুষ্ট জীব—অর্থাৎ, এই জীবাণুরা চরিয়া বেড়ায় না—কোনও না কোন জীবের রক্তে বাস করে, আর সেই রক্তের সারভাগ খাইয়া রক্তের ধ্বংস সাধন করিতে থাকে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জীবাণুর জীবনের একার্দ্ধ মশকীর দেহে কাটে, অপরার্দ্ধ অপর যে কোনও প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে কাটে। অর্থাৎ, যে লোকের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়, তাহার জ্বর হইবার কারণ, তাহার রক্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়া জীবাণুর জন্মগ্রহণ। যে মুহূর্ত্তে মানুষের রক্তে লক্ষ লক্ষ জীবাণু জন্মগ্রহণ করে, সেই মুহূর্ত্তেই কম্প উপস্থিত হয়। এই জন্ম প্রায় ২৪, ৪৮ বা ৭২ ঘণ্টা অন্তর হইয়া থাকে; এই জন্য, প্রত্যহ প্রায় একই সময়ে, অথবা একদিন অন্তর, অথবা ২ দিন অন্তর, একই সময়ে জ্বর আসে। যখন কোন লোকের রক্তে যথেষ্ট সংখ্যক ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া যায়, সেই সময়ে যদি কোনও এনোফিলিস্ মশকী সেই লোককে কামড়ায়, তবে সেই মশকীর দেহে যথেষ্ট সংখ্যক ম্যালেরিয়া-জীবাণু ঢুকিয়া যায়। এইখানে মশকীর রক্ত-পান সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিব। মশকদিগের মধ্যে পুরুষ

যে গুলি, তাহারা দিবাচর এবং গলিত উদ্ভিদের রস পান করে। মশকীরা নিশাচরী এবং রক্তপায়ী। জোঁক, মশকী, ছারপোকা প্রভৃতি রক্তপায়ী জীবদিগের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আছে। অনেকেই জানেন যে, রক্ত অতি সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায়। যেরূপ অতীব সূক্ষ্ম নলের ভিতর দিয়া রক্তপায়ী জীবেরা রক্ত পান করে, সে নলের ভিতরে রক্ত যাইয়া জমাট বাঁধলে, সেই জীবের রক্তপান করা চিরকালের মত বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য, ভগবান্ রক্তপায়ী জীবদিগের লালাতে এমন একটি পদার্থ দিয়াছেন, যাহার ফলে রক্ত জমাট বাঁধে না। সে কারণেই, জোঁক পড়িয়া গেলেও, রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। এখন বেশ করিয়া প্রণিধান করিয়া দেখ, যখন মশকী কাহারো রক্ত পান করিতে চাহে, তখন সে তাহার ওষ্ঠের দুপাশের ছুরিকাযন্ত্র গায়ে বিদ্ধ করে। বিদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এক ফোঁটা লালা সেই বিদ্ধ স্থানে ঢালিয়া দেয়। এই লালা ঢালার ফলে, বিদ্ধ স্থানের রক্তবিন্দুটি আর জমাট বাঁধে না। কাযেই মশকী সানন্দ চিত্তে রক্তপান করিতে থাকে। বস্তুতঃ মশকী দংশনের ফলে স্থানীয় জ্বালাবোধ ও স্ফীতির কারণই এই লালা। দংশন কালে, মশকী যখন দষ্ট স্থানে এই লালা ঢালে, তখন তাহার মুখের লালার সঙ্গে, অসংখ্য ম্যালেরিয়া-জীবাণু দষ্টব্যক্তির রক্তের মধ্যে যাইয়া পড়ে; এবং যখন মশকী রক্ত পান করে, তখন সে সেই রক্তের সঙ্গে অসংখ্য ম্যালেরিয়া-জীবাণু নিজ দেহমধ্যে টানিয়া লয়। কাযেই, এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর গাত্রে দংশন করিয়া সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন কালীন, মশকীই—ঐ রোগের জীবাণুকে বহন করিয়া থাকে। সুখের বিষয় এই যে, যে-সে মশকী এই কায করিতে পারে না। এনোফিলিস্ জাতীয় মশকীই এই কার্য্য করিতে পারে। এখন বেশ বুঝা গেল ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, অপর একজন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর দেহ হইতে

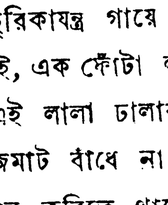

এনোফিলিস জাতীয় মশকীর দংশনের ফল। ম্যালেরিয়া

জ্বরের কম্পের কারণ, রক্তের মধ্যে হঠাৎ লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জন্ম। অতএব ম্যালেরিয়া সারাইবার একমাত্র উপায়—ঐ জীবাণুদের জন্মের আগে হইতে যথেষ্ট কুইনাইন খাওয়ান। আর বড় গলা করিয়া বলিতেছি যে, পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া জ্বর নাশ করিবার একমাত্র ঔষধ—কুইনাইন। কুইনাইন যথেষ্ট পরিমাণে পড়িলে (অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জীবাণুকে ঝাড়ে-বংশে নষ্ট করিতে পারে এমন পরিমাণে কুইনাইন পড়িলে) ম্যালেরিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য মিথ্যা ফিভার মিকশ্চার খাওয়াইয়া নষ্ট করিও না—জ্বর আসিবার আগে বা যখন সবচেয়ে বেশী—সেই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়, জ্বরে বিস্তরে সকল সময়ে, যথেষ্ট মাত্রায় কুইনাইন রোগীকে রোগমুক্ত করেন।

কালাজ্বর।—এই ব্যারামও অনেকটা ম্যালেরিয়ার মত। ইহার জীবাণুরা বেশীর ভাগ প্লীহার আশ্রয় করিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-জীবাণু যেমন মশকী দংশনের ফল, কালাজ্বর তেমনি ছারপোকা (মৎকুণ) দংশনের ফল। ম্যালেরিয়া জ্বরেও রক্ত দুষ্ট হয়, কালাজ্বরেও তাই। ম্যালেরিয়া কুইনাইন প্রয়োগে যায়; কালাজ্বর, এন্টিমণি নামক একটি ঔষধের ব্যবহারে যায়—তবে বহুদিন ধরিয়া উহার ইন্‌জেক্‌সন্ করাইতে হয়।

আমাশয়, টাইফয়েড্, কলেরা।—এই মধ্যে অ্যামিবা কোলাই বা সিগার জীবাণু প্রবেশ করিয়া আঁতে বা অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া আমাশয় ব্যারাম হয়। খাদ্যের বা পানীয়ের সঙ্গে টাইফয়েড রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়া, ক্ষুদ্র বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে ক্ষত সৃষ্টি করিলে, টাইফয়েড বা বাতশ্লেষ্মা বিকার ব্যারাম হয়। খাদ্যের বা পানীয়ের সঙ্গে কলের কমা-জীবাণু উদরস্থ হইলে, কলেরা বা ওলাউঠা ব্যারাম হয়। ফলতঃ, এই তিনটি খাদ্য বা পানীয় হইতে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে, আমাশয়

প্রাণহারী; আমাশয় কষ্টদায়ক পীড়া; টাইফয়েড যেমন ভোগায় তেমনি বিপজ্জনক। এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। জীবাণুরা আমাদের দেহে এক যায়গায় আশ্রয় করিয়া ব্যারাম আরম্ভ করিলেও, তাহারা বাস্তবিক সমস্ত দেহকেই পীড়িত করে। প্লেগে কুচকি হয়, নিউমোনিয়ায় বুকে সর্দ্দি হয়, টাইফয়েডে পেটে ঘা হয়—কিন্তু এই প্রত্যেক ব্যারামে, স্থানীয় রোগের সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত দেহ জ্বরে বা বিষে জর্জ্জরিত হয়, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই আবশ্যকীয় কথাটি সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে। এইবার আবার টাইফয়েড, কলেরা ও আমাশয়ের কথা বলিব। অ্যামিবা কোলাই নামক জীবাণু-ঘটিত আমাশয়ে, এমেটিন নামক ইপিকাকের সার ইন্‌জেক্ট করিলে, উদরস্থ ঐ জীবাণুগুলি একেবারে মরিয়া যায়। কিন্তু সিগার জীবাণু-ঘটিত আমাশয়ে, অ্যান্টিডিসেণ্টারিক সিরামের ইন্‌জেকসন্ লওয়া চাই এবং তৎসঙ্গে ম্যাগনেসিয়া সালফেটের জোলাপ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সিরাম নির্গত করাইয়া, তদ্দ্বারা জীবাণুগুলিকে ধৌত করিয়া নিষ্কাশন করা আবশ্যক। টাইফয়েড্ জ্বরে, যতদিন রোগীর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যান্টি-টাইফয়েড-টক্সিন্ সৃষ্ট হইতেছে, ততদিন রোগীর আরোগ্য হইবার সুযোগ নাই; এই জন্য এই রোগে, ঐ সিরাম ইন্‌জেক্‌সন দিলে কতকটা কায হয়—কিন্তু পূরাপুরি হয় না। কলেরার কথা স্বতন্ত্র। কলেরায় মৃত্যু ঘটে, শরীর হইতে অত্যধিক পরিমাণে জল হঠাৎ বাহির হইয়া যায় বলিয়া। ঐটি প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ত নহে—রক্তের জলীয়াংশ এবং উহাতে রক্তের সার পদার্থও প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই জন্য, যত শীঘ্র এবং যত যথেষ্ট জল রোগীর দেহের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে, ততই রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা। যখন চতুর্দ্দিকে কলেরা হইতে থাকে, তখন কলেরার অ্যান্টি-টক্সিক সিরাম ইন্‌জেক্‌সন্ লইলে পাঁচ ছয় মাসের জন্য ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

ক্ষয়কাশ।—যে লোকের ক্ষয়কাশ হয়, তাহার বুকের ভিতরে ঘা হয়। এই লোকের কাশের সঙ্গে, ঐ রোগজীবাণু বাহির হয়। তাহার থুথু গয়ারেও ঐ জীবাণু থাকে। এই জন্য, ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর এঁটো খাইলে, বা তাহার কাশিবার সময়ে তাহার সম্মুখে থাকিলে, অথবা তাহার ব্যবহার করা জিনিষ পত্র ব্যবহার করিলে, ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। বেশ নজর করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যখন কোনও লোক কাশে, তখন তাহার মুখ হইতে সজোরে, সূক্ষ্ম থুথুর কণা মাখান হাওয়া বাহির হয়। ঐ হাওয়া মুখ হইতে ঠিক সোজা লাইনে বাহির হয়; এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী যায়গা জুড়িয়া লয়। আগেকার গ্রামোফোণের সঙ্গে ভেঁপুর মত যে একটা বড় চোঙা লাগান থাকিত, অনেকটা সেই আকার ধারণ করিয়া, মুখ হইতে সূচী-ঘন-ক্ষেত্র বা মোচার আকারে থুথুর ফোয়ারা বাহির হয়। যে কোন লোক এই ক্ষেত্রের মধ্যে নাক মুখ লইয়া আসে, তাহার শ্বাসগ্রহণকালীন ঐ রোগীর থুথু মাখান নিঃশ্বাস বায়ু বুকের মধ্যে যায়। বলা বাহুল্য যে ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীর থুথুতে ও নিঃশ্বাস বায়ুতে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষয়কাশ রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা। এমন অবস্থায়, ক্ষয়কাশ-গ্রস্ত রোগী যতবার কাশে ততবারই তাহার কাশির সঙ্গে অসংখ্য ক্ষয়কাশের জীবাণু বাহির হয়। সেই থুথু ও জীবাণু রোগীর বিছানা, কাপড় চোপড়, ঘরের মেঝে, দেওয়াল প্রভৃতিতে আস্তে আস্তে জমিতে থাকে। রোগীর হাতে বই, খাতা, কাগজ প্রভৃতি যাহা থাকে, তাহাতেও ঐ থুথু ও জীবাণু জমিতে থাকে। এই রোগীর কাশের সময়ে তাহার সম্মুখে যে বসে, তাহারও বুকের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করে। এই জীবাণু বুকের মধ্যে যেখানে আশ্রয় লয়, সেখানে ঘামাচির মত একটি ফুস্কুড়ির সৃষ্টি করে—এই দানাদার ফুস্কুড়িকে ইংরাজিতে টিউবারকেল্ কহে। যে জীবাণু এই টিউবারকেল্ উৎপাদন করে, তাহাকে টিউবারকেল্ জীবাণু (T. B.) কহে।

একটি ফোঁড়া যেমন সামান্য ফুস্কুড়ি হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বড় হয় এবং তাহার ভিতরটা ফোঁপরা হইয়া পুঁয জমে, ক্ষয়কাশের ফুস্কুড়ির ও ঠিক সেই মত পরিণাম। এইজন্য রোগীর কাশে, পুঁযের মত গয়ার উঠে, জ্বর হয়, সে রোগা হয়। সকল ক্ষয়কাশ গ্রস্ত রোগীর মুখ দিয়া রক্ত উঠে না। কারণ, বুকের মধ্যে যে ঘা বা ক্ষত হয়, সেই ঘা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে যদি কোনও বড় শিরার কাছে যাইয়া সেই শিরাটিকে ক্ষত করিয়া বসে, তবেই শিরার গাত্র ভেদ হওয়ায়, রক্তস্রাব হয়—নতুবা হয় না। এই সঙ্গে জানিয়া রাখা ভাল যে, টিউবারকেল জীবাণু বা T. B. শুধু বুকেই ক্ষত সৃষ্টি করে না—পেটের অন্ত্রে (নাড়ীভুঁড়িতে), হাড়ের ভিতরে ঘা করে। পেটের ভিতরে টিউবারকেলের ব্যাধি (টিউবারকুলোসিস্) হইলে সাধারণতঃ অজীর্ণ বা গ্রহণীর মত বোধ হয়—পুরাতন ডিস্পেপসিয়া নামে চলিয়া যায়। সে ব্যারাম সকল সময়ে ধরা পড়ে না। হাড়ের ভিতরে ক্ষত হইলে, তাহাকে কেরীজ বলে। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে টিউবারকেল জীবাণু যে যে যায়গায় ধরে, সে সে যায়গায় ঔষধ পৌঁছান অসম্ভব। এই জন্য এ ব্যারামের ঔষধ নাই। টিউবারকেল জীবাণু হইতে ভ্যাক্সিন্ করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহাতে সুফল পাওয়া যায় না—কোন কোনও স্থলে ব্যারাম বাড়িয়া যায়, অপর স্থলে যাপ্য থাকে মাত্র, সারা সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ। যাহাদের ক্ষয়কাশ হইয়াছে তাহারা নড়িলে চড়িলেই কতকটা টিউবারকেল টক্সিন্ রক্তে মিশিয়া যায়; তাহার ফলে রোগীর কষ্ট ও জ্বর বাড়ে। এজন্য ঐ রোগে, রোগীকে চুপ্ করিয়া শোয়াইয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু চুপ করিয়া শোয়ার ফলে যদি কিছুকালের জন্য গায়ের উত্তাপ নর্ম্যাল থাকে, তবে প্রত্যহ সামান্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিশ্রম করাইলে যে টকসিন রক্তে মিশে, তাহার ফলে রোগীর রক্ত অ্যান্টি-টক্সিন্ আপনা-আপনিই সৃষ্টি করিয়া লইয়া রোগীকে আরোগ্যের পথে তুলিয়া দেয়। অতএব, কি অবস্থায় রোগী একদম্ নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়া থাকিবে এবং কি অবস্থায় ক্রমশঃ পরিশ্রম করিবে তাহা সুচিকিৎসক ব্যতীত ... দিবেন। কড় মাছের যকৃতের তৈল হইতে প্রস্তুত মরুয়েট অব সোডা ইন্জেক্সনে সময়ে সময়ে উপকার পাওয়া যায়।

নিউমোনিয়া, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ—এই সকল ব্যারামগুলি স্থান বিশেষে জীবাণুর উপদ্রবের ফলে হইলেও, এই কয়টি ব্যাধিতে মানুষের হৃৎপিণ্ড শীঘ্র এত বেশী রকমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, রোগীর প্রাণ সহজেই যায়। যদি কোন রকমে এই ব্যারামে রোগীকে বাচাইয়া রাখা যায়, (অর্থাৎ তাহার হৃৎপিণ্ড কায বন্ধ না করিয়া বসে) তবে রোগীর দেহে আপনা আপনি যথেষ্ট অ্যান্টিটক্সিন্ উৎপন্ন হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। এই জন্য এই ব্যারাম গুলিতে অ্যান্টিটক্সিক্ সিরাম ইন্জেকসন্ দিতে পারিলে ভাল হয়।

ইরিসিপেলাস (বিসর্প), সেপটিসিমিয়া (রক্তদুষ্টি), কার্ব্বঙ্কল্ (পৃষ্ঠব্রণ)।—এ ব্যারামগুলিতে ইন্জেক্সন্ দিলে বড়ই কায হয়—অধিকাংশ স্থলে ছুরি ধরিতেই হয় না। রোগের প্রথম ও ... অবস্থায় অ্যান্টিটক্সিক্ সিরাম এবং কমের অবস্থায় ভ্যাক্সিনই বেশ।

ডিফ্থিরিয়া (ঘুংড়ি)—এই ব্যারামে অ্যান্টিটক্সিক্ সিরাম অমোঘ।

গণোরিয়া (মেহ)।—এই ব্যারামে শুধু ... খাওয়াইলে বা পিচকারী দিয়া ধুইলে রোগ আরাম হয় না। এই জন্য সেই সঙ্গে ভ্যাক্সিন্ চালান চাই। স্মরণ থাকে যেন যে গণোরিয়ার পুঁয ও ক্ষত শুধু গণোককাস্ জীবাণু কর্ত্তৃক হয় না—তৎসঙ্গে আরো ৩৪ জাতের জীবাণু থাকে। এই জন্য এই ব্যারামে পাচমিশেলী জীবাণুর ভ্যাক্সিন্ ইন্জেকসন করিলে তবে কায পাওয়া যায়।

বসন্তের টীকা।—ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সঙ্গে কয়েকটি কথা বেশ করিয়া স্মরণ রাখিবার ... বলি:—

(১) মল, মূত্র, রক্ত প্রভৃতির পরীক্ষা করান ভাল; কিন্তু অন্ততঃ কলিকাতায় ঐ সকল পরীক্ষা যে ভাবে হইয়া থাকে, তাহাতে সকল পরীক্ষার ফলের উপরে কেহ যেন সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করেন। উহারা মাত্র কতক পরিমাণে বিশ্বাস্য।

(২) সকল রোগের ইন্জেক্সন্ (সিরাম বা ভ্যাক্সীন্) চিকিৎসা বাহির হয় নাই।

(৩) যতগুলি ইন্জেক্সন্ বাহির হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলি তেমন কার্য্যকরী নয়।

(৪) পয়সার লোভে, শুধু শুধু, ইন্জেক্সন্ দিও না—এ পাপ কলিকাতায় বড়ই প্রবল।

মাছির কথা।

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

অবতরণিকা।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত মাতুলালয় কলিকাতায় অবস্থান কালীন্ মশা-মাছির অত্যাচারে উত্যক্ত হ'য়ে গেয়েছিলেন—

"রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কল্কাতায় আছি।"

কবিশেখর কালিদাস রায়ও সেদিন "বসন্তের চিঠিতে" লিখেছেন—

"বাংলা দেশের বসন্তে হায়
কোনোরূপে বেঁচে আছি।
হেথা—কোকিল এবং ভোম্‌রা চেয়ে
অনেক বেশী মশা মাছি।"

দেশ-বিদেশের আরো দু'চার জন কবি—যাঁদের কাব্য-কলার নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় এই দুটি জীব যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মেছিল, তাঁরা কাব্যের মধ্যে দু'চার পংক্তিতে বা এক একটি স্বতন্ত্র কবিতায় এদের নামকে অমর করে গিয়েছেন। কবিদের কথা ছেড়ে দিই, আমাদের মত "মাছি-মারা" কেরানী ও সহর পল্লীর গরীব গৃহস্থদের নিতান্ত গদ্যময় জীবনকেও যে এরা কতখানি অতিষ্ঠ ও অসহনীয় ক'রে তুলেছে, তার অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা বোধ হয় কারো পেতেই বাকী নেই!

মশার কথা বারান্তরের জন্য পৃথক রেখে, আমরা আজ মাছি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

মাছির শ্রেণীবিভাগ

মাছি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—(১) বন-মক্ষিকা ও (২) গৃহ-মক্ষিকা। আফ্রিকার "জী-জী" মাছি, (Tse-Tse Fly), কাচ-মাছি মৌমাছি প্রভৃতি এই বন মক্ষিকার অন্তর্গত; এরা কদাচ গৃহস্থের নিকটে আসে; তবে বর্ষা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এরা কখনো কখনো মানুষের গৃহাবাসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এরা নারদ ঋষির মত বড় সহজ-কোপা। এদের হুল্ দিয়ে মানব শরীরে বিষ প্রবেশ করাবার, মশার মত রক্ত শোষণ করবার ও কামড়াবার বেশ ক্ষমতা আছে। অথচ গায়ে ফুলের পরাগ মাখে এবং গুণ্ গুণিয়ে মধু সংগ্রহ ক'রে, ব'লে, পৃথিবীর কবিকুলের লেখনীর মুখে এই মধুমক্ষিকা জাতি কত

খোরাকই না যুগিয়েছে! মৌমাছি ও কাক্-মাছি বা কাচ-মাছিদের দেহের শক্তি অসাধারণ—শোনা যায়। একবার একজন কীট-শক্তি-অনুসন্ধিৎসু সাহেব একটা কাচ-মাছিকে (Blow Fly) দিয়ে একশ' সত্তর গ্রেণ ওজনের একখানা খেলাঘরের ছোট মালগাড়ী টানিয়েছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মাছিটির নিজের ওজন ছিল মাত্র এক গ্রেণ!

আফ্রিকা মহাদেশে Sleeping Sickness বা "ঘুমপাড়ানো রোগ" নামক এক প্রকার ব্যাধি দেখা যায়; এই রোগ এখন ইয়োরোপের দু' এক স্থানেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা কচ্ছে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে,—এতে রোগীর কোন কর্ম্ম করার উদ্যম বা জাগ্রত থাকার শক্তি একেবারে লোপ পায়—কেবলই নিদ্রাতুর হ'য়ে পড়ে; তার পর রোগী কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ একদিন মহানিদ্রার কোলে ঢ'লে পড়ে। উপরিউক্ত জী-জী মাছির দংশন দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। এনোফেলিস্ রসিয়াই (Anopheles Rosii) নামক মশক যেমন হুলের দ্বারা মানব-শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশ করিয়ে দেয়, জী-জী মাছি সেইরূপ ঘুমপাড়ানো রোগের বীজ দেহ মধ্যে উপ্ত ক'রে দেয়।

Musca Domestica Puperim Life Leave right.

গৃহ মক্ষিকা, তাহার ডিম ও মূককীটাবস্থা।

সাধারণতঃ আমরা গৃহের মধ্যে ও চতুঃপার্শ্বে যে সকল মাছি দেখি ও যাঁদের মধুর "ভনভন্" ধ্বনি শুনে কাণ ও প্রাণকে পরিতৃপ্ত করি, বলা বাহুল্য—তারা গৃহ-মক্ষিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। বাটীর ভিতর যে সকল মাছি (Musca Domestica) সচরাচর দেখা যায়, সৌভাগ্য বশতঃ কামড়াতে বা হুল বিদ্ধ কর্‌তে পারে না। এঁরা কেবল অযাচিত ভাবে মানুষের ভন্‌ভনিয়ে ঢ'লে পড়েন, অপ্রীতিকর ভাবে স্পর্শ দেন এবং বড় জোর দু'পাঁচটা মারাত্মক রোগের বীজ সংবহন করেন; এই গুণ ছাড়া গৃহ-মক্ষিকা যদি হুল্ বিঁধিয়ে বিষ ঢালবার সুবিধা ও সুযোগ পেতো তাহ'লে নিশ্চয়ই মানুষকে অহোরাত্র "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছেড়ে লোটা-কম্বল সম্বল ক'রে একধারে বেরিয়ে পড়্‌তে হ'ত।

সাধারণ গৃহ-মাছির গাত্র-বর্ণ হলুদ রঙের—তার উপর কালো কালো ডোরা কাটা, কতকটা জিরাফ গায়ের মত। মাথাটি একটা চ্যাপটা সরষের মত মাঝে একটা ত্রিকোণাকার কালো দাগ, মুখের দিক ঈষৎ ছুঁচালো—রঙ্ মেটে লাল্। এদের আকার অন্যান্য মাছির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। এই শ্রেণীর আর এক প্রকার মাছি আছে—যাদের চলিত নাম

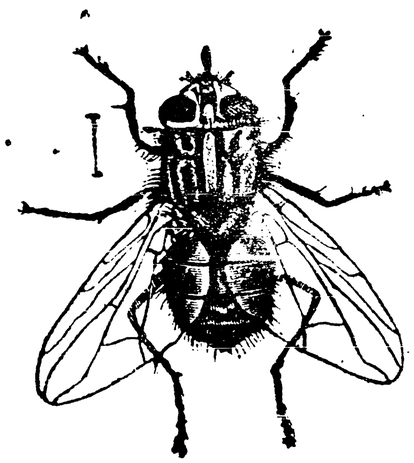

The Stable Fly or Biting House Fly.

আস্তাবলের মাছি।

"গুবরে মাছি" (Stomoxys Calcitrans) তারা দেখতে প্রায় সাধারণ মক্ষিকারই মত

মানুষকে দংশন কর্‌তে জানে। এই গোষ্ঠির এক দল মাছি (Sepsis Violecea) আছে—

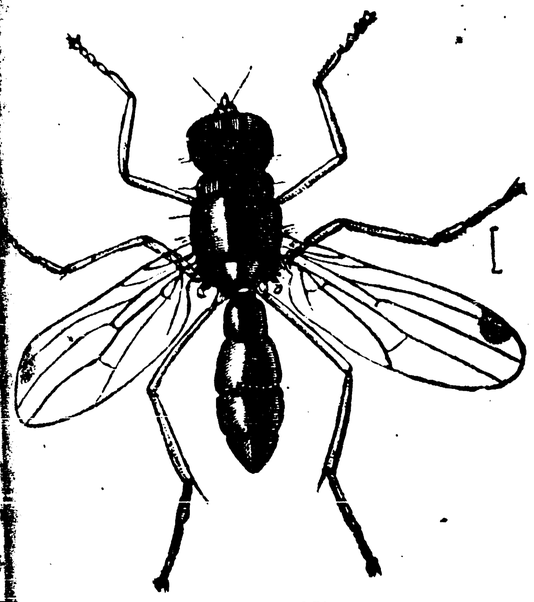

The Dung Fly.

দের পশ্চাৎভাগ অনেকটা বোলতার মত, মাথাটি গোলাকার ও পক্ষপুট দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই দুটি জাতি ঘোড়ার আস্তাবল, গোয়ালঘর প্রভৃতি স্থানে আপনাদের বংশ বৃদ্ধি করে; কারণ ঘোড়ার বিষ্ঠা, গোময়, পলিত খড়-কুটা ও তৃণ-পত্রের গাদার মধ্যেই এদের জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য সঞ্চিত থাকে ও এই গুলির মধ্যেই এরা ডিম পাড়ার সুবিধা পায়। আর এক রকমের মাছি দেখা যায়—ইংরাজীতে যারা Cluster Fly নামে অভিহিত হয়। এরা হেমন্তকালে মাঝে মাঝে এসে দলে দলে গৃহ পূর্ণ করে। সাধারণ গৃহ-মক্ষিকার চেয়ে এরা আকারে কিছু বড়, পেটের দিকটা ক্রস-কবা চক্‌চকে কালো ডাবি জুতোর মত দেখায়। সারাগাত্রে অতি সূক্ষ্ম হল্‌দে রঙের লোম ছড়ানো। আহার্য্যবস্তুর ভোগ দখল নিয়ে ক্লাষ্টার মাছিদের সঙ্গে গৃহ-মাছিদের প্রায়ই তুমুল লাঠিবাজী চ'লে থাকে; শেষে ক্লাষ্টারকুলই জয়ী হ'য়ে খাসদখল ক'রে নেয়। কিন্তু এ সুখ তাদের বেশী দিন সহ্য হয় না; হঠাৎ একদিন এক অজ্ঞাত মহামারী (Funguous disease) এদের বস্তির মধ্যে এসে যদু-বংশ-ধ্বংস লীলা অভিনয় কত্তে সুরু করে। আর গৃহ-মাছিরা তাই দেখে বোধ হয় আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, আনন্দের উচ্চরোলে "বল হরি হরি বোল" দিতে দিতে, তাদের মুক্ত আত্মার স্বর্গ-গমনের পথ সরল করে দেয়। এই সময় লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যায়, জানালার সার্সির গায়ে বা অন্য কোন স্বচ্ছ-মসৃণ স্থানে এরা ছট্‌ফট্ ক'রে ঘুরে ঘুরে মর্‌ছে, আপনাদের চারিপাশে এক প্রকার শ্বেত জলীয় বাষ্প উদ্গীরণ কর্‌ছে।

আর এক জাতীয় মাছি আছে, এদের গায়ের রঙ্ স্বচ্ছ নীল কিম্বা সবুজ। পাশ্চাত্য পতঙ্গ-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ এর এক দেড়-গজী নাম রেখেছেন—Calliphora Erythrocephela; বাঙ্‌লা ভাষায় এর নাম "অয়স্কান্ত মক্ষিকা" বা "নীলমণি মাছি" রাখা যেতে পারে। তবে নামকরণটা প্রায় "কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের" মত হ'য়ে পড়্‌ল; কারণ, এরা সাধারণতঃ গৃহস্থের পুরীষ বা কীট পতঙ্গাদির গলিত শব হ'তে উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় মাছির আবার প্রকার-ভেদ আছে। এরা গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষার প্রথমে প্রায়শঃ প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকা আম-কাঠাল প্রভৃতির প্রতি দুশ্ছেদ্যরূপে প্রণয়াকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বোল্‌তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রে অনেক সময় এরা ময়রার মিষ্টান্নের ভাগও গ্রহণ করে; আবার কখনও বা কসাইয়ের দোকানে গিয়ে মাংসের উপর একাধিপত্য করে।

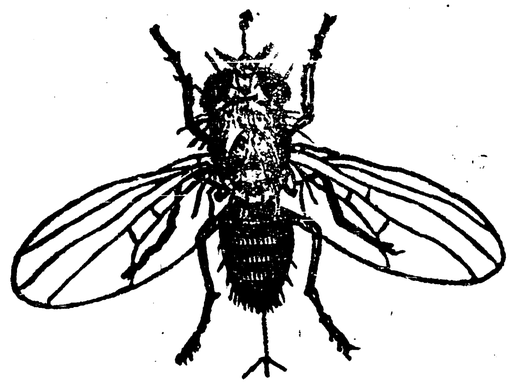

The Fruit Fly.

নীলমণি জাতীয় আর এক ধরণের মাছি (Drosophila ampelophula) আছে। এরা সাধারণতঃ অৰ্দ্ধ পক্ক আমের মধ্যে পরভৃতের মত ডিম পেড়ে রেখে চলে যায়। যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে শতকরা নব্বইটি পাকা আমের মধ্যে এক প্রকার সাদা সাদা পোকা দেখা যায়; এরা উপরোক্ত মক্ষিকা-শাবকের পূর্ব্বাবস্থাপন্ন জীব (Larvae) ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমের আভ্যন্তরিক উত্তাপে ডিম ফুটে এইরূপ লম্বাকার ছানা হয়। তার পর আমের শাঁস খেয়ে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ'য়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ছানাগুলি মাছির আকার ধারণ করে। তারপর আমের ভিতর দিয়ে সিঁধ কেটে বাহিরের আলোয় বেরিয়ে আসে।

গৃহ-মক্ষিকা পর্য্যায়ের আরো অনেক প্রকার মাছি আছে; প্রয়োজনাতিরিক্ত বোধে যে সকলের উল্লেখ বা আলোচনা হ'তে নিরস্ত হ'লাম।

জন্ম-রহস্য।

সাধারণতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মাছি বহু পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে। শীত-প্রধান দেশে বা গ্রীষ্মসঙ্কুল দেশে ভরা শীতের সময় এরা আদৌ বাঁচ্‌তে পারে না। প্রবল বর্ষার দিনে মাছির প্রতাপ কতকটা ক'মে আসে বটে, কিন্তু উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন ক'রে নির্ব্বিবাদে নিদ্রা দিতে বা ডিম পাড়্‌তে ছাড়ে না। কীট-পতঙ্গ-তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন—অধিকাংশ মাছি সাপের মত শীতটুকু গৃহের ফাটলে, খড়ের গাদার নীচে, বা অন্য কোন আবর্জ্জনাময় নিভৃত স্থানে অভুক্ত ও ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। তখন এরা ডিম পাড়ে না, বা এদের কোন সন্তান সম্ভাবনা হয় না। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে শীতকালে একটা বড় লোহার জাল বেষ্টিত খাঁচার মধ্যে কতকগুলি মৌমাছি ধ'রে রাখা হ'য়েছিল; দেখা গেল—যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় খাঁচাটি সর্ব্বদা তাপযুক্ত রাখায় অধিকাংশ মক্ষিকাই ৫০ দিন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তারপর ক্রমশঃ মরতে সুরু করল। দেশান্তরের সংগৃহীত বৃক্ষলতাদি সজীব রাখার জন্য একপ্রকার কাচ-মণ্ডিত প্রকোষ্ঠ (Green house) থাকে, তার মধ্যে একবার কতকগুলি মৌমাছিকে ... করে রেখে দেখা গেল যে, তারা ঠিক গ্রীষ্মকালের পরিপূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে আপনাপন কার্য্য সাধন ক... সমস্ত শীতকালটা তাদের মাথার উপর দিয়ে চ'লে ... —তা তারা জান্‌তেও পাল্লে না। আমেরি... মক্ষিকা-তত্ত্ব-বিশারদ্ বিশপ, ডাভ ও পার্ম্যান সাহেব (Messrs. Bishop, Dove and Parman) ... করেছেন যে মাছিরা শীতের চার-পাঁচ মাস কাল কিড়া ও গুটি অবস্থাতেই যাপন করে, পূর্ণ (Natural full size) অবস্থায় এরা শীতের প্র... কদাচ সহ্য কর্‌তে পারে না।

Musca Domestica বা সাধারণ গৃহ... সচরাচর ঘোড়া, গরু, শূকর, মুরগী ও মানুষের ... উপর ডিম পাড়ে; তা'ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর রন্ধনাগারের পরিত্যক্ত শাক-পাতা বা তর্... খোসা, পলিত প্রাণী-দেহ ও উদ্ভিদাদিতেও এরা পাড়্‌তে অনভ্যস্ত নয়। এক একটি স্ত্রী-মাছি একবারে ১২০টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে ও একদিনে ... বার থেকে ৪ বার পর্য্যন্ত প্রসব কর্‌তে পারে। মাছিদের অন্তঃসত্ত্বাবস্থার কাল তিন হ'তে পাঁচ ... পর্য্যন্ত; তার পর প্রসব বেদনা উপস্থিত হ'লে কতকগুলি সমবয়সী প্রসূতি জুটে একস্থানে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি শ্বেতবর্ণের—ঠিক যেন একটি কামিনী ধানের চাল। এক প্রান্ত অপর ... হ'তে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকার। ডিমগুলি ফুটতে ২... থেকে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। উপযুক্ত শৈত্য... পেলে এরা ৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফুটে পড়ে। কিড়া... কীটের রূপ (maggots) নিয়ে এরা ডিম থেকে বহির্গত হয়; তখন দেখ্‌তে এদের কতকটা যেন ... ছোট ছোট চালের পোকার মত দেখায়। ... ও বর্ষাকালে গোবর গাদায় বা ভিজে ঘুঁটের ... কতকটা উঁইয়ের মত এক প্রকার লম্বা লম্বা পো... অসংখ্য পরিমাণে দেখা যায়,—সেগুলি এই কীট অবস্থা-পন্ন মাছি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ২।৩ দিন কীটের অবস্থায় নানারূপ ময়লা খেয়ে নিজেদের দেহ পুষ্ট করে নিয়ে, শেষে গুটিপোকার অবস্থায় (Pupation period) পরিণত হ'তে আরম্ভ করে। তখন, এদের দেহের

মাছির গুটি অবস্থা (স্বাভাবিক আকার)।

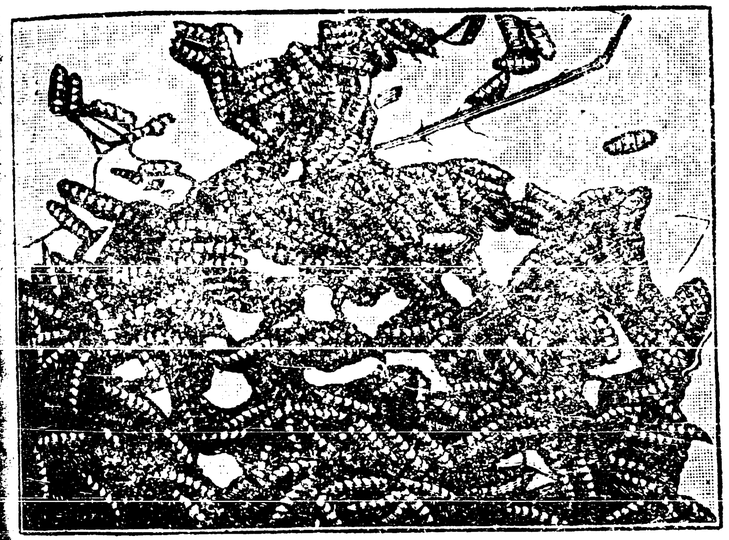

উপরিভাগ সঙ্কুচিত ও অপেক্ষাকৃত শক্ত হ'তে থাকে, গায়ের রঙ শ্বেত হ'তে বাদামীতে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন এদের চ'লে হেঁটে বেড়াবার ক্ষমতা প্রায় রহিত হ'য়ে যায়; এই সময় মক্ষিকা শাবকদের ঘুমন্ত অবস্থা বলা যেতে পারে। এইরূপ গুটির অবস্থায় এরা তিন থেকে দশ দিন পর্য্যন্ত থেকে, শেষে নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত হয়ে, বিশ্বের আলোয় বেরিয়ে চোখ মেলে চায়। শোনা যায়, এইরূপ গুটির অবস্থায় এরা একাদিক্রমে চার পাঁচ মাস কালও থাক্‌তে পারে। যা হোক, ডিম্বাবস্থা থেকে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হ'তে সাধারণতঃ এদের ১২ দিনের বেশী সময় লাগে না। খোলস পরিত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই যে এরা উড়্‌তে পারে—তা' নয়; কিছুক্ষণের জন্য পক্ষ-বিস্তার করে এরা পায়ে হেঁটে বেড়াতে থাকে। তার পর আলো ও বাতাস লেগে পাখা রীতিমত শক্ত হ'লে উড়্‌তে আরম্ভ করে। তার পর পুরুষ শাবক-মাছি ৩।৪ দিন যেতে না যেতেই গর্ভ-সঞ্চার কত্তে সমর্থ হয়; সুতরাং মাসে দুইবার ক'রে মাছিদের বংশবৃদ্ধি হয়। হাউয়ার্ড সাহেব স্থির করেছেন—একটি মাছি থেকে ৪০ দিনে ১ কোটি ২ লক্ষ বংশধর জন্ম গ্রহণ কর্‌তে পারে এবং এই বংশধরগুলিকে একত্র ক'রে যদি দাঁড়ীপাল্লায় চড়ান যায়, তা'হলে তাদের ওজন হয় প্রায় দশ মণ। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

রোগ-বীজাণু বহন শক্তি।

অতিরঞ্জন কাঁচের (Magnifying glass) সাহায্যে দেখ্‌লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মাছির সর্ব্ব গাত্রে—বিশেষতঃ শুঁড় ও পা ছয়টিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম সংযুক্ত আছে। রোগ বীজাণু-পূর্ণ মল-মূত্রাদিতে উপবেশন করলে স্বভাবতঃই ওদের নিম্ন-গাত্রে ও শুঁড়ে রোগ বীজাণুগুলি ফুলের পরাগের মত

[মাছির একটি পায়ের সামান্য অংশ খুব বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। এই সামান্য অংশটুকুতে কত শত শূঁয়া রহিয়াছে।]

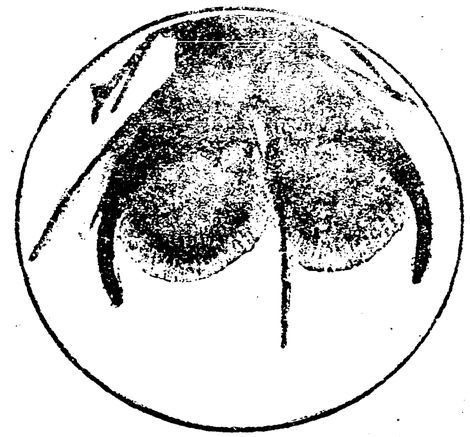

সংলগ্ন হ'য়ে যায়। তার পর যখন গৃহস্থের আহার্য্য-সামগ্রীর উপর উড়ে বসে, তখন ঐ রোগ

বীজাণুগুলি খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে ঝ'রে পড়ে এবং যে ব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করে, তার শরীরে বীজাণুগুলি সঞ্চালিত হ'য়ে নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি করে। অন্নবহা নাড়ীর মধ্যেই (Alimentary canal) রোগবীজাণুগুলি (Bacteria) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও অধিক দিন জীবিত থাকে; সুতরাং মাছির বমন ও বিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রোগবীজাণুগুলি নিঃসন্দেহে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হ'তে পারে। মাছি যত বেশী আহার করে ততবেশী মলত্যাগ করে; একবার আহারের পর এক ঘণ্টার মধ্যে এদের ৪ বার মল ত্যাগ করতে দেখা যায়। তার উপর মাছি মাঝে মাঝে উদর মধ্য হ'তে এক প্রকার লালা (Vomit spots) উদ্গীরণ করে; এরূপ করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—কোনরূপ শক্ত আহার্য্যকে লালা দ্বারা দ্রব করে, পরে শুঁড় দিয়ে লালা-মিশ্রিত নরম খাদ্যটিকে শোষণ করে। একটি মাছির কার্য্য কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, কোন কঠিন পদার্থের উপর হুল্‌টি স্থাপন ক'রে, মাছি ঐরূপ জলবৎ পদার্থ বমন কচ্ছে এবং পরে আবার তা আপন উদরে শোষণ ক'রে নিচ্ছে। খাদ্য দ্রব্যগুলি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-বিশিষ্ট ঢাকা বা জালের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলেও মাছির রোগ-বীজাণু প্রচারের হাত হ'তে অব্যাহতি নেই; কারণ ঢাক্‌নার উপর ব'সে যদি মাছি মলত্যাগ করে, তাহ'লে জাল বা ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে তা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে প'ড়ে সেগুলি দূষিত করতে পারে।

যেখানে অস্থায়ী ভাবে কুলি-মজুররা বস্তি গড়ে বা যুদ্ধযাত্রী সৈন্য-সামন্তদের শিবির পড়ে, সে সকল স্থানে মল-মূত্রাদি পরিত্যাগের সুশৃঙ্খলা বা পরিষ্কারের সুব্যবস্থা প্রায়ই ঘ'টে উঠে না; সুতরাং মাছিদের পক্ষে এই সকল দীর্ঘ সঞ্চিত মল-মূত্র থেকে ব্যাধি-বীজ মানুষের আহার্য্য-সামগ্রীর উপর চালান্ করার রীতিমত সুবিধা হয়। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড্ জ্বরের (Typhoid) মহরম উপস্থিত হয়। এই রোগের বীজাণু (Bacill... Typhosis) রোগীর রক্ত, মূত্রস্থলী ও অন্ত্র... অবস্থান করে, এবং মল-মূত্রের সহিতই রোগীর দে... মধ্য হ'তে বাহিরে এসে থাকে; এমন কি রো... রোগমুক্ত হ'লেও বহুদিন পর্য্যন্ত তার মল-মূত্রের ম... টাইফয়েড বীজাণু বিদ্যমান থাকে।

এইরূপ উপায়ে মাছিরা ওলাউঠা, রক্তাতিসা... শিশুদের গ্রীষ্মকালীন্ উদরাময় প্রভৃতি পাকস্থলী... প্রদেশজনিত রোগের বীজ সংক্রামণ করে। তা'ছাড়া... যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ, গো-স্ফোটক (Anthrax), ব... এমন কি কুষ্ঠ-ব্যাধি পর্য্যন্ত গৃহ-মাছির "পদপল্লবমুগল... আশ্রয় ক'রে স্থান হ'তে স্থানান্তরে সংবাহিত হয়।

স্বাভাবিক শত্রু।

প্রাণী জগতের মাছির কয়েকটি স্বাভাবিক শ... আছে। তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে—কাঁকড়া বি... মাকড়সা ও টিক্‌টিকি। পোকা ও গুটি অব... এরা প্রচুর পরিমাণে নানা কীট-পতঙ্গাদির উদরে... স্থান পায়। এই অবস্থায় মাছি, গুব্‌রে পোকা... টিক্‌টিকির প্রধান আহার। তা'ছাড়া বাদুড়, চামচিকা... পেচক প্রভৃতি নিশাচর পক্ষীরাও এদের সাম্‌নে পে... উদরসাৎ কত্তে সঙ্কোচ বোধ করে না—এইরূপ ... যায়। তার উপর কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে এরা ... প্রকার মহামারী (Empusa Muscae) দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দমন ও নিবারণের উপায়।

১। পর্দ্দা ও জাল—যে সকল মাসে ... যে সকল দেশে মাছির উৎপাত বেশী, সে সকল দেশে পাকের ঘর ও ভাঁড়ার ঘরের জানালাগুলি ক্ষুদ্র ছি... বিশিষ্ট লোহার জাল দিয়ে আচ্ছাদিত রাখা উচিত। আজকাল কলিকাতার কতকগুলি মোদকের দোকানে এইরূপ ছিদ্রযুক্ত জাল সন্নিবেশিত আলমারীতে খা... দ্রব্য রক্ষিত হ'তে দেখা যায়। শয়ন কক্ষের দরজা-জানালায় পর্দ্দা টাঙিয়ে রাখা উচিত। যাঁদের ...রেচে কুলায়, তাঁরা খস্‌খসের পর্দ্দা টাঙাবেন্, তদ্‌ভাবে কাপড় বা চটের পর্দ্দা টাঙালে ক্ষতি নেই। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় এগুলি জলে ভিজিয়ে টাঙিয়ে দিলে সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও গরম বাতাসের হাত হ'তে ত আত্মরক্ষা করা যায়ই,—তা'ছাড়া মাছি ভায়ারাও অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ রকমে কাবু হ'য়ে পড়েন; কারণ অন্ধকারের মধ্যে এদের উদ্যম ও দৃষ্টিশক্তি দুই ই ক'মে আসে। সেই জন্য মশক মহাশয়দের মত এঁদের নিশা অভিসারে বাহির হ'তে প্রায়ই দেখা যায় না; তবে কখনো কোনদিন দুই একটি মক্ষিকা আঁধারের মধ্যে গায়ের উপর উড়ে প'ড়ে, ছেলেদের সেই "কানা মাছি ভোঁ-ভোঁ, যারে পা 'তারে ছোঁ"—ছড়াটির সার্থকতা উপলব্ধি করিয়ে দেয়।

২ বিষ ও ফাঁদ—পাশ্চাত্যে ও আমেরিকায় মাছি মারবার ও নিবারণ করবার নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করা হ'য়েছে; তার মধ্যে মাছি-কাগজ (Fly paper), বিষ ও মাছি-ধরা ফাঁদই (Fly traps) উল্লেখযোগ্য। মাছি-কাগজে একপ্রকার মিষ্ট আঠা সংযুক্ত থাকে; মিঠার লোভে মাছির দল তার উপর উড়ে বস্‌লেই তাদের পা, পাখ্‌না ও শুঁড়গুলি আঠায় আবদ্ধ হ'য়ে যায়;—তখন একেবারে "নট্‌-নড়ন্‌-চড়ন্" আর কি?

মাছিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে হ'লে একটি অগভীর ডিশে চা-চামচের এক চামচ "ফরমালিন্"এর (Formalin) সঙ্গে একটু চিনি বা গুড় ও ছটাকখানেক জল কিম্বা দুধ মিশিয়ে মাছির আড্ডায় রেখে দিতে হয়। এইরূপ অল্প মাত্রায় ফরমালিন্ ভ্রমক্রমে মানুষের পেটে গেলে কিছু অপকার করে না। আর্সেনিক প্রভৃতি সেঁকো বিষ দিয়ে মাছি মারার চেয়ে এই প্রক্রিয়াটি অনেক নিরাপদ ব'লে মনে হয়। Aniline, Potassium Cyanide, Paris Green প্রভৃতি আরো বহুতর মাছি-মারা বিষ আছে, সেগুলি সচরাচর গৃহে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

শীত ঋতুর শেষাশেষি সময়—মাছিদের ডিম পেড়ে বংশ-বৃদ্ধি করবার পূর্ব্বে যদি আস্তাবলে, গোয়াল ঘরে বা ভাঁড়ারে মাছি-ধরা-কল পেতে রাখা যায়, তাহ'লে অনেক উপকার দর্শে। বাজারে নানাপ্রকার মাছি-ধরা-কল আছে; তার মধ্যে জাপানী কলগুলির দামও কম, অথচ বেশ কার্য্যকরী।

৩। অন্যান্য বিধান—টাট্‌কা পাইরেথ্রাম্ (Pyrethrum) চূর্ণ পোড়ালে ঘরের মাছি একেবারে বিনষ্ট হয়। বেশী পরিমাণে ধুনা গন্ধক পোড়ালেও মাছি কতকটা কাবু হ'য়ে পড়ে, আঠালু ধুমে ডানা মেলে উড়তে না পেরে, তারা "ন যযৌ ন তস্থৌ"বৎ হ'য়ে পড়ে। মাছির ডিম বা পোকা অবস্থায় যদি রীতিমতভাবে 'কেরোসিন্' তেল, চূণের জল কিম্বা 'ফিনাইল্' (Phenyle) ঢেলে দেওয়া যায়, তা'হলে তাদের অঙ্কুরেই বিনাশ সাধন করা যায়।

যে ঔষধে অস্থায়ী ভাবে রোগ আরাম করে, তার চেয়ে স্থায়ী ভাবে রোগ-নিবারক ঔষধই অনেক ভাল (Prevention is better than cure)। উপরি উক্ত উপায়গুলি ঠিক অস্থায়ী ভাবে রোগ-নিবারক (Curative measures) ঔষধের মত। গৃহ ও গৃহপার্শ্ব থেকে মাছিকে একেবারে দূরীভূত করতে হ'লে ও তাদের প্রাণঘাতিকা আতিথেয়তার কবল হ'তে মুক্ত থাক্‌তে হ'লে, বাড়ীর ভিতরও সদা সর্ব্বদা যথোচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত; গরুর গোয়াল বা ঘোড়ার আস্তাবলে কখনো মাটির বা কাঠের মেজে রাখ্‌তে নেই, সুর্‌কী-ইট-পাট্‌কেলের ভালরকম দুর্‌মুস্ ক'রে তার উপর সিমেণ্ট দিয়ে এঁটে দেওয়াই উচিত। গোয়াল বা আস্তাবলে কখনো গোময় বা ঘোড়ার বিষ্ঠা জম্‌তে দেওয়া ভাল নয়; প্রত্যহ কোন দূরবর্ত্তী স্থানে সেগুলি ফেলে দেওয়া উচিত। যদি তদ্দ্বারা জমিতে সার দেওয়ার অভিলাষ থাকে, তাহ'লে ২।৩ দিন অন্তর (গ্রীষ্মকালে—প্রত্যহ) সেগুলি মাটির উপর পাতলা ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া ভাল। পশুদের 'নাদান্', গামলা বা অন্যান্য আহার্য্য-পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট

ভিজা খইল, বিচুলি, দানা প্রভৃতি দিনের পর দিন জমা ক'রে পচ্তে দেওয়া উচিত নয়; ইহা পশুদের শরীরের পক্ষেও অনিষ্টজনক এবং মাছিদেরও বংশবৃদ্ধির পথ সরল ক'রে দেয়।

অনেক স্থানে পশু বিষ্ঠাগুলিকে প্রত্যহ স্থানান্তরিত করার নানা অসুবিধার জন্য Dust Bin ও কাঠের পিপের মধ্যে জমা ক'রে রাখা হয়। পল্লীগ্রামে কোন কোন বাড়ীর পার্শ্বে এক একটা ছোট খানা বা 'খোন্দল্' কেটে তার মধ্যে এগুলি প্রত্যহ ফেলে দেওয়া হয়। এই সকল পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনার মধ্যে যাতে মাছিরা ব'সে ডিম পাড়্তে না পারে এবং মাছির ডিম বা পোকা যাতে সহজে বিনষ্ট হয় অথচ পুরীষের উর্ব্বরতা দানের শক্তি কিছুমাত্র না কমে—এইরূপ ভাবের একটি ঔষধ আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ ও কীটতত্ত্ববিশারদগণ পরামর্শ ও পরীক্ষা ক'রে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন। এই ঔষধটি হ'চ্ছে—Hellebore 'হেলেবোর্' গাছের শুষ্ক শিকড় চূর্ণ (Veratrum Viride); হেলেবোর্ লতা আমাদের দেশে দু'এক স্থানে অপ্রতুল নয়। হেলেবোরের (বাঙ্লা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই) আর এক ইংরেজী নাম Hemlock; এই গরল পান ক'রে গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহামতি সক্রেতিস্ কারাগারে প্রাণত্যাগ ক'রেছিলেন। পনের সের জলে একপোয়া আন্দাজ হেলেবোরের চূর্ণ ভাল ক'রে গুলে একটা মাটির কলসীতে একদিন রেখে দিতে হয়। তার পর সেই পনের সের সংমিশ্রিত জল, দেড়মণ দু'মণ আন্দাজ বিষ্ঠাসারের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে, শতকরা ৮৮ থেকে ৯৯টি মাছির ডিম বা পোকা ম'রে যায়। স্ত্রী-মাছিরা প্রসব-বেদনায় পেট ফুলে মর্লেও সেস্থানে আর ভুলেও পদার্পণ করে না।

বোরাক্স বা সোহাগা নামক আর একটি রাসায়নিক পদার্থ চূর্ণ ক'রে ঐরূপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে সমান ভাবে গোবর গাদার উপর ছড়িয়ে দিলে, মাছি বৃদ্ধি পেতে পারে না; এটিও সারের কোন গুণ নষ্ট করে না।

পাড়াগাঁয়ে যাঁরা গোয়ালাদের গো-শালা এবং তার চারিপার্শ্বে গোময়ের কদর্য্য স্তূপগুলি একবার প্রত্যক্ষ ক'রেছেন, তাঁরা বোধ হয় ঐ সকল স্থানে মাছি কিরূপ সংখ্যাতীত ভাবে জন্মাতে ও সাঙ্ঘাতিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, তার একটা মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছেন। ডাস মশা ও নীলমণি জাতীয় মাছি [illegible] গৃহপালিত পশুদের যে কতরকম ব্যাধি জন্মে [illegible] পারে, তার ঠিকানা গয়লা বা গো-বৈদ্য [illegible] কাছে বোধ হয় অবিদিত নেই; অথচ তার যথোচিত [illegible] প্রতিকারের পথে পা ফেল্তে অনেকেই আলস্য [illegible] করেন। এই মাছি শুধু গরুর দেহেই ব্যাধি [illegible] ক্ষান্ত থাকে না, পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ রোগের বীজ [illegible] সকল প্রায়ই দুধের কেঁড়ে-কলসীর মধ্যে সংক্রামিত [illegible] ক'রে দিয়ে থাকে। সুতরাং দুধে যাতে মাছি বস্তে না পারে, গোপদের সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক [illegible] রাখা উচিত এবং গৃহস্থদেরও ঐ দুধ খুব সাবধানে [illegible] রীতিমত জ্বাল্ দিয়ে পান করা উচিত।

ইন্দুর, বিড়াল, মশা, মাছি প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে [illegible] আমরা যতটা "নিরীহ আপদ" ব'লে মনে [illegible] প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। আমাদের আহার্য্য [illegible] ভাগ বসিয়ে, কাণের কাছে সানাই বাজিয়ে, গায়ের [illegible] উপর উড়ে ব'সে বা হুল্ ফুটিয়ে রক্ত শুষেই যে [illegible] আমাদের চরম উত্যক্ত করে—তা' নয়। এরা পৃথিবীর [illegible] শতকরা ১০ জনের মৃত্যুর অন্যতম পরোক্ষ কারণ [illegible] শুনে চম্কে উঠ্বারই কথা বটে! কিন্তু দেখা [illegible] এজগতে বাহিরের শত্রুর চেয়ে ভিতরের শত্রুই [illegible] প্রবল ও মারাত্মক। যাঁরা এই ঘরসন্ধানী বিভীষণ [illegible] গৃহ-মক্ষিকাদের আজ যমরাজের গুপ্তচর বা C. I. D. [illegible] ব'লে চিন্তে পাল্লেন, তাঁরা আজ হ'তেই এই ক্ষুদ্র [illegible] জীবের বিরুদ্ধে 'জিহাদ্' (Crusade) ঘোষণা করুন [illegible] তাঁরা সর্ব্বদা মনে রাখুন্ যে, মাছিকে তাঁরা মারতে ত্রুটি কর্লে, মাছি তাঁদের মার্তে ত্রুটি কর্বে না।

স্বাস্থ্য ও আনন্দ।

[illegible] "লা পর ঘোড়া, ন, ঘোড়া পর লা ?" ইহা একটী [illegible] প্রবচন। ইহার কোন মীমাংসা হয় না। কারণ, [illegible] ঘোড়াকে নৌকার উপর তুলিয়া লইয়া নদী [illegible] হইতে হয়; আবার কখনও ঘোড়ার পিঠের উপর [illegible] নৌকা তুলিয়া দিয়া এক নদী হইতে স্থল পথে অন্য [illegible] নদীতে যাইয়া আবার নৌকা ভাসাইতে হয়। সেই [illegible] বিচক্ষণ লোকেরা সিদ্ধান্ত করিয়া কহিলেন যে, [illegible] কভ্ভি লা পর ঘোড়া, আউর কভ্ভি ঘোড়া [illegible] লা।"

[illegible] সেইরূপ, আগে কার্য্য তার পর কারণ, না আগে [illegible] কারণ, তার পর কার্য্য? ইহারও কোন নিশ্চিত [illegible] মীমাংসা হয় না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ [illegible] সুখানি চ" এর ন্যায় কার্য্য ও কারণ একটা চাকার [illegible] অংশ; সেই চাকা ঘূর্ণায়মান; তাহার কোন [illegible] নাই। একবার দেখা যায়, কারণ আগে, কার্য্য [illegible] পিছে, আবার দেখা যায়, কার্য্য আগে, কারণ পিছে। [illegible] কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ এমনই জটিল, যে, সর্ব্বত্র [illegible] সর্ব্বদা কোন বিশেষ একটাকে প্রাধান্য দেওয়া [illegible] না।

[illegible] স্বাস্থ্য ও আনন্দের সম্বন্ধও ঠিক এইরূপ। জীবন [illegible] রকম করিয়া উপভোগ করিতে হইলে, জীবন-যাত্রায় [illegible] আনন্দলাভ করিতে হইলে, শরীর সুস্থ, শারীর যন্ত্রসমূহ [illegible] উত্তমরূপে কার্য্যক্ষম থাকা দরকার,—ইহা প্রায় লোকেই [illegible] জানে। শরীর অসুস্থ থাকিলে, যতই আনন্দের কারণ [illegible] থাকুক না কেন, একটুও আনন্দ লাভ করা যায় না,— [illegible] আনন্দ-সাগরে ভাসমান থাকিলেও অসুস্থ শরীর বেদনা [illegible] দিতে থাকে। চাকাটা ঘুরাইয়া দিন, দেখিবেন, শরীরকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ—শারীর-যন্ত্র সমূহকে কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে গোড়ায় কিছু আনন্দ চাই। মন [illegible] না থাকিলে, শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাস্থ্য যেমন আনন্দের মূল, আনন্দও তদ্রূপ স্বাস্থ্যের কারণ।

শরীর রক্ষা করিতে হইলে শীতল পরিষ্কার বায়ু সেবন করা দরকার। শীতল জলে স্নান করিলে শরীরের যন্ত্রসমূহ উত্তেজিত হয়; তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারে। সময়ে সময়ে উষ্ণ জলে স্নান করাও দরকার হয়। স্নানকালে উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিলে লোমকূপ সকল পরিষ্কার হয়, ত্বকের নিম্নে রক্তসঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি হইয়া শরীর বেশ সতেজ হয়, বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। যাহা শরীরে সহজে সহ্য হয়, পাকস্থলীকে ভারাক্রান্ত করিয়া বেদনা না দেয়, সহজে হজম হয়, এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। বস্ত্র এমন হওয়া উচিত, এবং তাহা এমন ভাবে পরিধান করা কর্ত্তব্য যে, অক্লেশে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলে, হস্তপদাদি অনায়াসে সঞ্চালন করা যায়। শরীর রক্ষার জন্য এ সকলই অপরিহার্য্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন একটি জিনিষ আছে, শরীরকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাখিবার পক্ষে যাহার ক্ষমতা ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সে জিনিসটি হচ্চে আনন্দ। যদি এমন কোন কাজ করা যায়, যাহাতে মনে প্রকৃত আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সমস্ত শরীরে এমন একটা তেজ ও স্ফূর্ত্তি জন্মে, যাহা উপযুক্ত খাদ্যই বলুন, বস্ত্রই বলুন, কিম্বা জল বা বায়ুই বলুন, কোনটিই তেমন ভাবে দিতে পারে না। মনে করুন, আপনি আপনার বালক পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি কামনায়, তাহাকে সবল, দৃঢ়কায়, বলবীর্য্য সম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য, তাহাকে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতে আদেশ করিলেন। সে পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য প্রত্যহ যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতে লাগিল। তাহার শরীরের উন্নতিও হইতে লাগিল।

আর দেখুন. আপনার প্রতিবাসী আপনারই পুত্রের সমবয়সী এবং তাহারই সমান স্বাস্থ্যসম্পন্ন তাঁহার পুত্রকে একটী ফুটবল কিনিয়া দিলেন। সে অপর কয়েকটী বালকের সঙ্গে মিলিয়া প্রত্যহ এক আধ ঘণ্টা করিয়া ফুটবল খেলিতে লাগিল। ৩।৪ মাস পরে আপনি আপনার প্রতিবাসীর পুত্রের সঙ্গে আপনার নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যের তুলনা করিয়া দেখুন; দেখিবেন, আপনার পুত্রের অপেক্ষা আপনার প্রতিবাসীর পুত্রের স্বাস্থ্য অনেকটা বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে এমন একটী তরুণ, লালিচে আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা আপনার পুত্রের কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না। এই যে পার্থক্য, ইহা কেন ঘটিল বলুন দেখি? ব্যায়াম স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু ফুটবল খেলায় ব্যায়ামের সঙ্গে যে আনন্দটুকু পাওয়া যায়, শুধু ব্যায়ামে তাহার একান্ত অভাব। বস্তুতঃ, কেবল কর্ত্তব্য পালনের খাতিরে যাহা কিছু করা যায়, তাহাতে যতখানি ফল পাওয়া যায়,—তাহার সহিত যদি আনন্দের সংযোগ হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অনেক বেশী ফল পাওয়া যায়। কথিত আছে, একজন ধনী মহাজন ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অতি শ্রমে স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলেন। তাঁহার চিকিৎসক তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁহাকে "গোল্‌ফ" খেলিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি নিয়মিত ভাবে গোল্‌ফ খেলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ গোল্‌ফ লিঙ্কের (গোল্‌ফ ফেলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ময়দান) ভিতর কয়েক মাইল করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি দেখা গেল না। ক্রমে তিনি ডাক্তারের উপদেশ ভুলিয়া গেলেন; গোল্‌ফ খেলার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। গোল্‌ফ খেলায় তিনি আমোদ পাইতে লাগিলেন। তখন—কেবল তখনই তাঁহার প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতি লক্ষিত হইতে লাগিল। যতক্ষণ তিনি চিকিৎসকের উপদেশে কর্ত্তব্য বোধে গোল্‌ফ খেলিতেছিলেন, গোল্‌ফ খেলায় বিশেষ কিছু আমোদ পাইতেন না, ততক্ষণ কোন ফলও পান ... ক্রমে যখন উহার সহিত আমোদের যোগ হইল, ... বাস্তবিক কাজ আরম্ভ হইল।

যাঁহারা চিরদিন সহরবাসী, তাঁহারা যদি ... দুই চারি দিনের জন্য কিম্বা দুই এক মাসের জন্য ... গ্রামে ভ্রমণ ও বাস করিতে যান. তাঁহাদের তখন ... আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁহারা যাহাই ... তাহাই তাঁহাদের ভাল লাগে,- তাহাতেই ... আমোদ পান। সুতরাং এই দুই মাসেই তাঁহা... স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু যাঁহারা চির... পল্লীগ্রামবাসী, তাঁহাদের পল্লীভবনে কোন নূ... বা আমোদজনক কিছুই থাকে না। কাজেই ... জীবন তাঁহাদের কাছে একঘেয়ে হইয়া পড়ে। ... তাঁহারা যখন দু'দশ দিনের জন্য সহরে বাস ক... আসেন, তখন সহরের বৈচিত্র্য তাঁহাদের হৃদয়ে ... অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করে, যে, পল্লীভবনে ... সহস্র বৎসর ধরিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে ... তাঁহাদের অদৃষ্টে জুটে না। স্বাস্থ্যের হিসাবে ... হইতে পল্লীগ্রাম সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই বলিয়া ... সহরে লোকে বাস করে না? কেমন করিয়া পারে... কারণ, সহরে অনেক প্রকার আমোদ প্রমো... বন্দোবস্ত আছে। একঘেয়েত্ব দূর করিবার ... সহরে অনেক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যায়। ... সহরে লোকে বাস করিতে পারে, এবং বাঁচি... থাকে। এই আমোদ প্রমোদ, এই বৈচি... না থাকিলে মানুষ একদিনও বোধ হয় সহরে ... করিতে চাহিত না, এবং পারিতও না। সহ... নিয়মানুসারে সহরবাসীগণকে সর্ব্বদাই প্রায় কর্ম্মে ... থাকিতে হয়। কিন্তু দিনান্তে কর্ম্মের অবসরে সহ... যথেষ্ট আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকায়, একঘেয়ে... কর্ম্ম-জীবনের ক্লান্তি দূর করিতে পারিয়া লোকে এ... রকম করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারে। সন্ধ্যা... লোককে চাকুরী বা ব্যবসায়ের খাতিরে সমস্ত দিন ... গৃহ হইতে দূরে কর্ম্মস্থলে যাপন করিতে হয়। সন্ধ্যা... তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রী-পুত্রের ... লোকন করিয়া তাহাদের সস্নেহ সশ্রদ্ধ সেবা যত্ন ... লাভ করিয়া সকল পরিশ্রম, সকল ক্লেশ ভুলিয়া ...। আর গৃহিণী সমস্ত দিন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। ... সন্ধ্যাকালে প্রিয়-সমাগমে, প্রিয়তমের স্পর্শে ...রে পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষ যদি শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ...বস্ত করেন, তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন মাত্র ... হইবে; এবং শ্রমজীবীরাও তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্যের ...ংশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাহাদের আরও একটা ... আছে। সেটা আনন্দ। কর্ম্মের অবসরে ... আমোদ প্রমোদ লাভের আকাঙ্ক্ষা মানব মনের ...রণ ধর্ম্ম। শ্রমজীবীরা দরিদ্র হইলেও, সমস্ত ...ের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটু আনন্দ পাইবার ...র একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। কর্ম্মশালার ...পক্ষ শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ষোল ... পালন করিতে চাহিলে, তাহাদের জন্য একটু ...োদ প্রমোদের বন্দোবস্ত করা তাঁহাদের উচিত; ... এটাও তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে, যদিও ... তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহিবেন না। তাহা ...লেও, যদি তাঁহারা শ্রমজীবীদের প্রীতি সম্পাদনের ... কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন, তাঁহাদেরও তাহাতে ... আছে; এবং ইহার জন্য যদি কিছু ব্যয় স্বীকার ...রিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। কারণ, এই ...ন্দোবস্ত করিলে, শ্রমজীবীরা তাঁহাদের এমন অনুরক্ত ... উঠিবে, এবং এমন কার্য্যক্ষম অবস্থায় থাকিবে ..., সহজ অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে যতখানি ...জের প্রত্যাশা করা যায়, তদপেক্ষা অনেক বেশী ... পাওয়া যাইবে। তাহাতে, আমোদ প্রমোদের ...ন্দোবস্ত করার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, সে ব্যয় ...োষাইয়া গিয়া কিছু লাভই থাকিয়া যাইবে।

এদেশে কলকারখানার শ্রমজীবীদের বড় দুর্দ্দশা। ...আইনানুসারে কর্ত্তৃপক্ষ হয় ত তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার ... নাম মাত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাহাদের নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন না; করা উচিত কিম্বা আবশ্যক বলিয়াও মনে করেন না। সেই জন্য আমাদের শ্রমজীবীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। প্রায় কলকারখানার কাছেই নিম্ন শ্রেণীর গণিকালয়, তাড়িখানা, মদের দোকান থাকে। শ্রমজীবীরা আমোদ করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে গণিকালয়ে আশ্রয় লয় এবং তাড়ি ও মদ্য পান করে। ইহাতে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষের কত ক্ষতি ও অসুবিধা হয়, তাহা যে তাঁহারা বুঝিতে না পারেন এমন নয়। তথাপি তাঁহারা শ্রমজীবীদিগকে এই পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন না। তাঁহাদের হাজার ক্ষতি হউক, তাঁহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। কিন্তু যদি তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রমজীবীদের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে উহারা পাপ হইতে ত রক্ষা পায়ই; পরন্তু কর্ত্তৃপক্ষও লাভবান হইতে পারেন। তাড়ি বা মদ খাইয়া মাতাল হইয়া তাহারা ঝগড়া বিবাদ করে না; গণিকালয়ে গিয়া কুৎসিত রোগগ্রস্ত হয় না; অপর সুস্থ লোকদের মধ্যে সেই রোগ ছড়াইবার সুযোগও পায় না; মাতাল হইয়া কার্য্যে গরহাজির হইয়া মনিবকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার সুবিধাও পায় না।

মানুষের আন্তরিক প্রকৃত আনন্দের বাহ্য বিকাশ তাহার প্রাণ-খোলা হাসি। যে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে জানে, রোগ তাহাকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। জরা তাহার কাছে ঘেঁসিতেও পারে না। হাসি যে কতখানি স্বাস্থ্যকর, তাহা চিকিৎসক-মাত্রেই অবগত আছেন। আর, ইহার উল্টা—বিষাদ যে মানুষকে কত দ্রুত কেমন প্রবল ভাবে ক্ষয় করিয়া ফেলে, তাহাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। যে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ হাসে, যে অবসর পাইলেই হাসে, তাহার শীর্ণ শরীর পুষ্ট হয়, এবং অচিরে সে স্থূলকায় হইয়া উঠে। সুমিষ্ট সঙ্গীত, তানলয়বিশুদ্ধ বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিলে, প্রাণে যে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, সেই আনন্দ

সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া বলকারক ঔষধ পথ্যের কাজ করে। তাহার শরীরে প্রবল বেগে ও দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হইয়া ব্যায়ামের কাজ করে। মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনের ফলে শরীরে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কাম ক্রোধাদি রিপুচয় প্রবল হইলে রক্তের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা কে না জানেন? সেইরূপ আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি নিচয়ও শরীর মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে এবং ঘটিয়া থাকে। আনন্দ আমাদের দেহে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করে, তাহা আমাদের পক্ষে পরম মঙ্গলকর।

শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক রকম পরামর্শ দিয়া থাকেন। শ্বাস গ্রহণ, প্রশ্বাস ত্যাগ, ভোজন, নিদ্রা, স্নান, পোষাক পরিচ্ছদ, ব্যায়াম প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি পালন করিতে উপদেশ দেন। ইহাদের সহিত আনন্দ, কলহাস্য যোগ করা যাইতে পারে। কেবল আনন্দ উপভোগ করিয়া মানুষ সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করা চাই। কিন্তু ইহাদের সহিত আন্তরিক আনন্দের সংযোগ হইলে, উহাদের কার্য্য করিবার শক্তি বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। মনে করুন, আপনি বেশ পুষ্টিকর ও সুখাদ্য ভোজন করিতে বসিয়াছেন। এই ভোজন কালে আপনার চিত্ত যদি কাম, ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত থাকে, কিম্বা সে সময়ে যদি আপনার মন গভীর দুঃখ, উদ্বেগ বা ভয়ে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে, ঐ সুখাদ্য ভোজনেও কি আপনার শরীরের কোন উপকার হইবে মনে করেন? পক্ষান্তরে, আপনি যদি হৃষ্ট চিত্তে, প্রসন্ন মনে, আনন্দ সহকারে হাসিতে হাসিতে ভোজন করেন, তবে স্বভাবতঃ খাদ্য আপনার যে উপকার করিতে পারিত তাহার শতগুণ বেশী উপকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ প্রত্যেক শারীর ক্রিয়ার সময়ে আপনার মনের অবস্থা যেরূপ থাকিবে, তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। যদি আপনার মন ভারাক্রান্ত থাকে, তবে ক্ষতি হইবে। আর যদি সুপ্রসন্ন অন্তরে হাসি তামাসার ভিতর দিয়া আপনার জীবনের কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া জীবনকে পূর্ণ রূপে উপভোগ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। নির্দ্দোষ আনন্দ অনেক রকমেই পাওয়া যাইতে পারে। খেলা, গান বাজনা, চিত্রকলার চর্চ্চা প্রভৃতির নিত্য, অবিচ্ছেদ সহচর—আনন্দ। চেষ্টা করিয়া নিজেকে সুখী রাখার অভ্যাস করিলে, সুখ কাহাকেও বঞ্চিত করে না। সুখ, আনন্দ এক একটা মানসিক বৃত্তি। জড় জগতের অবস্থার উপর উহা একটুও নির্ভর করে না। উহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। চেষ্টা করিলে, ইচ্ছা করিয়া অভ্যাস করিলে, মনকে এমন ভাবে তৈয়ার করা যায় যে, সন্তোষ, তৃপ্তি, আনন্দ স্বভাবে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। তখন কোন দুঃখ কষ্ট, কোন অভাব, কোন বিপদ-আপদ সে মনকে বিচলিত করিতে পারে না। যাহার চিত্ত এমন সদানন্দ সে জীবন্মুক্ত হিসাবে মুক্ত পুরুষ। যোগী-ঋষিরা এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভের জন্য কতই না তপস্যা, কতই না ধ্যান ধারণা করিয়া থাকেন। ইহা লাভ করা অসম্ভব নয়, তবে চেষ্টা, আয়াস, অভ্যাস-সাপেক্ষ। কিন্তু এমন এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আর কোন দুঃখ নাই। ইহারই চরম পরিণতি- সৎ চিৎ-আনন্দ ব্রহ্ম

পড়ান না পীড়ন করা?

এদেশে মুড়ি মিছরির এক দর। যে ছেলেটি ক, খ পড়ে, সেও উদয়াস্ত বই মুখে করিয়া থাকিবে, আবার যে এম্-এ পড়িবে সেও সারাদিন পড়িবে। পনর, কুড়ি মিনিটের বেশী কচি ছেলেদিগের মন স্থির থাকিতে পারে—এ কথা, কয় জন তথাকথিত শিক্ষকও এদেশে জানেন? কচি-ছেলেদের মাথাটা ঘানি নয়, তাহাদের দেহ ইট-কাঠের তৈয়ারি নয়।

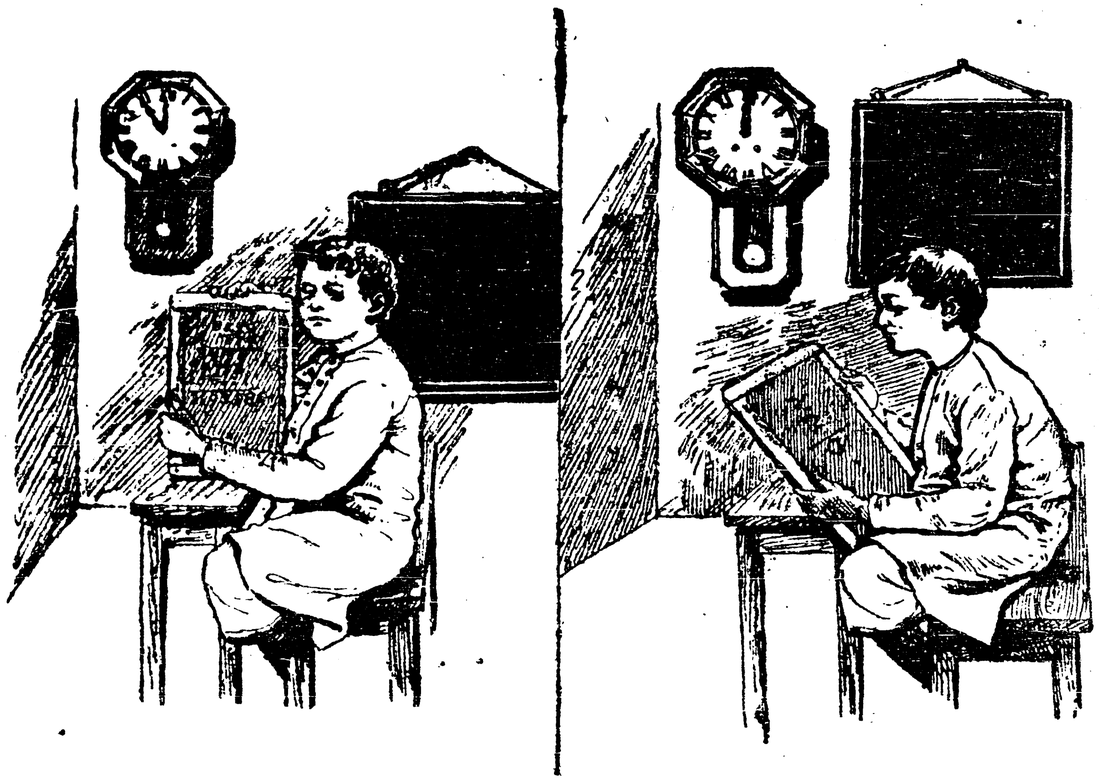

বাঁদিকের ছবিতে দেখুন যে, স্কুল সাড়ে দশটার সময় বসিয়াছে, এবং ছেলেটি ১১টার সময় একটি বড় গুণের অঙ্ক নির্ভুল কসিয়াছে। ডানদিকের ছবিতে দেখুন যে, ক্রমাগত সাড়ে দশটা থেকে পড়ার জন্য তাহার এতটা অন্যমনস্ক ভাব আসিয়াছে যে, সে ২+২=৫ লিখিয়া বসিয়াছে। শিক্ষক ও অভিভাবক মহাশয়েরা এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। যদি ছেলেকে যথার্থ মানুষ করিতে চাহেন, তবে তাহাকে "বিদ্যাশিক্ষা" নামক আকমাড়া কলে নিয়ত পিষিবেন না।

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

রোগ হয় কেন ?

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

রোগ হয় কেন ? এ কথার সহজ উত্তর—প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ কায করিলেই রোগ হয়। ভগবানের আদেশ মানিয়া না চলিলেই পাপ হয়। এই দুইটি বলা অত্যন্ত সহজ ; কিন্তু কাযে ইহাদিগকে বুঝান বড় শক্ত। শক্ত বলিয়া কোনও কায ফেলিয়া রাখিলে, তাহার সমাধান হয় না। এই জন্য যত সহজ কথায় সম্ভব, বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এই যুগের যে মানুষ, সে কতগুলি ব্যাপারের ফল, তাহা কি কেহ কখনো ভাবিয়াছেন ? আজ এই যে আমি কথা কহিতেছি, এই আমি (আধ্যাত্মিক আমি নহি, লৌকিক আমি) অন্ততঃ তিন প্রস্থ কার্য্য-পরম্পরার ফল। প্রথমতঃ, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, প্রকৃতি-প্রবৃত্তি, সুঅভ্যাস-কুঅভ্যাস, বিদ্যা-অবিদ্যা (লৌকিক অর্থে) এই সমস্ত জিনিবের সমষ্টি ফল আমি। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে যে ব্যারাম, যে সু বা কুঅভ্যাস, যে প্রবৃত্তি, যে খাদ্য, যে বিদ্যাচর্চ্চা, যে সংস্কার প্রভৃতি আমার পূর্ব্বপুরুষগণ করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহার কিছু-না-কিছু আমাতে বর্ত্তাইবেই। অর্থাৎ ভাষা কথায়, আমার পূর্ব্ব-পুরুষরূপ দুধের আমি ক্ষীর হইয়া জন্মিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমি যে যুগে, যে দেশে, এবং যে প্রকার পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে জন্মিয়া মানুষ হইয়াছি, সে সকলের সমষ্টি-ফলও আমি। বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া আমার চর্ম্ম কৃষ্ণ, আমার ঘাম সহজেই হয়, ভাত খাইলেই আমি ভাল থাকি, বেশী মাংস বা রুটি খাইতে ভালও লাগে না এবং হজমও করিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, আমি স্বকৃত সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফল। আমি যদি মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা গোঁয়ার হই, তবে অসুখ ও বিপদ পদে পদে ঘটিবে। আমি যদি নিজ দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রভৃতি বুঝিয়া মানিয়া চলি, এবং কোনওরূপ জ্ঞানকৃত অত্যাচার না করি, তাহা হইলে আমার অসুখ হইবে না।

এইবার বুঝিবার চেষ্টা করিব—আমার অসুখ হয় কেন ? যাঁহারা আমি (লৌকিক অর্থে) এই কথাটির সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা তত সহজে বুঝেন নাই, তাঁহাদিগকে কথার উত্তর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতেছি।

রোগের প্রথম কারণ—পৈতৃক কা... অস্বাস্থ্যতা। অর্থাৎ ধাতু বা রক্তগত দোষের যে যে ব্যারাম হয় সেইগুলি। কাহারো সন্ধির ..., কাহারো কুৎসিত ব্যারামের ধাতু, কাহারো পৈতৃক ... করা রোগের ফলে মৃগীর ব্যারাম হয়, ইত্যাদি। ... রাখিতে হইবে যে, পিতামাতা হইতে সাক্ষাৎ ... রোগের বীজ অতি অল্পই সংক্রামিত হয়—রোগী ... প্রবণতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে পি... মাতার ক্ষয়কাশের ব্যারাম থাকিলে, পুত্র নিজ ... ক্ষয়কাশ বা ক্ষয়কাশ রোগের বীজ লইয়া আসে না, সে সেই রোগপ্রবণতা লইয়া জন্মায় মাত্র। ... পাঁচজনের যেখানে বা যে অবস্থায় থাকিলে, ক্ষয়... হয় না, সেই ব্যক্তির সেই অবস্থায় পড়িলে বা ত... থাকিলে ক্ষয়কাশ হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা।

রোগের দ্বিতীয় কারণ—যথেষ্ট আহারের ... আহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে অনেক কথা বলিবার ... এখানে মোটামুটি কথাগুলি বলিয়া রাখি। ... পেট ভরিয়া টাটকা খাবার খাইতে পাইলেই ... যে যে খাদ্যে অভ্যস্ত, সে সেই খাদ্য খাইয়া, যদি ... বল ও পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য বজায় রাখিয়া, ... স্ফূর্ত্তিতে থাকিতে পায়, তবে বলিব যে, সেই ... তাহার যথার্থ ও যথেষ্ট খাদ্য। যে কোনও গতিকে দেহটিকে বজায় রাখাই যথেষ্ট নহে ;—নিজের ন্যায্য পরিশ্রম করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য দেয় এবং পরিশ্রম করিবার পরও শরীরে স্ফূর্ত্তি জন্মায়—এমন ভাবের খাদ্য ...য়া চাই। যে দেশের লোকেরা বেশ খাইতে পায়, সে দেশে ব্যারাম খুবই কম—এবং সে দেশের লোকের ব্যারাম ধরিলে, তাহারা ভোগেও খুব কম। আমাদের দেশে সকলে পেট পুরিয়া দুবেলা খাইতে পায় না—এই জন্য আমাদের দেশে ব্যারামে পঙ্গপালের মত লোকে মরিয়া যায়। এই একই কারণে গরীব দুঃখীরাই বেশী বেশী মারা পড়ে। কোনও খাদ্য কোনও লোকের পক্ষে যথেষ্ট কি না, তাহা বুঝিবার উপায় কি ..., তাহা উপরে বলিয়াছি—শরীরের সামর্থ্য পরিশ্রমের ...তা ও শরীরের স্ফূর্ত্তি। কি কি গুণ থাকিলে খাদ্য উপকারী হয় তাহার স্থূল কথা এই—খাদ্য ...সম্ভব টাট্‌কা হওয়া চাই, সহজে হজম হওয়া চাই, ..., ঘি, শাকসব্জী তাহার মধ্যে থাকিলে ভাল হয়। আমাদের এদেশে খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণে যেমন উদাসীন, ডাক্তারেরাও তেমনি মূর্খ। শেষের কথাটি আমি ...শে জোর গলায় বলিতেছি। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহারা ঔদরিক, তাঁহারা খাবারের আস্বাদ, আকৃতি ...গঠন এবং পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হইলেও, খাদ্য দ্রব্যের উপাদান সম্বন্ধে উদাসীন। এবং কি রোগীর পথ্য, কি গর্ভিণীর পথ্য, কি জন সাধারণের ...—এই সকল অবস্থাতেই সাধারণের ঔদাসীন্য ...বহ। খাওয়াটা একটা আপদ-বালাই, খাওয়া ...নে পেটের গর্ত্ত বুজান—এই দুইটি আমাদের দেশের লোকের ধারণা ; এমন কি, তথাকথিত শিক্ষিত লোকের ধারণা! আর ডাক্তার প্রভুরা—তাঁহারা বিলাতী ...কে যে সকল আহার্য্যের বিবরণ আছে, তাহাও ...রূপে শিখেন না এবং দেশীয় খাদ্য সম্বন্ধে সগর্ব্বে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা দেখান। অথচ খাদ্যই দেহ ধারণের ও দেহ-পুষ্টির ও দেহ-রক্ষার প্রধান সহায় ;—যে ... ভাল খায় তাহার রোগ কোথায় ?

রোগের তৃতীয় কারণ—কুসংস্কার। যে দেশে যত কুসংস্কার, সে দেশে তত রোগের বাহুল্য। আঁতুড় হইতে আরম্ভ করিয়া চিতাশয্যা পর্য্যন্ত আচার ও রীতিনীতির ঠেলা আমাদের দেশে বড় কম নয়। আঁতুড়ে ময়লা রাখার জন্য পেঁচোয় পাওয়া (ধনুষ্টঙ্কার), ঘরের গ্যাসে (কার্ব্বনিক অ্যাসিড দ্বারা) বিষাক্ত হইয়া মারা পড়া, প্রসূতির বাঁকা জ্বর (পিউয়ার-পারাল ফিভার) এদেশে ভূরি ভূরি দেখা যায়। শৈশবে, খাওয়ানর দোষে যকৃতদোষ বা আমাশয় বা পেটের অসুখ ; যৌবনে লেখাপড়ার চাপে, এবং যৌবনসুলভ কুৎসিত অভ্যাসের ফলে—এবং রমণীদিগের পক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া, বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসব করিয়া ও নিত্য দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ; বার্দ্ধক্যে হঠাৎ ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে আহারাদির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বা অহিফেন বা মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে ;—এই সকল কারণে কত লোকই অকালে জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হয় ! একমাত্র উদাসীনতাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল। এ দেশে সকলেই কতক কতক বিষয়ে এক একটি ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এ ক্ষণভঙ্গুর দেহের চিন্তা, এ অস্থায়ীর জন্য স্থায়ী চিন্তা—কি বিষম ঘৃণার কথা। ধর্ম্মভূমি ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুচ্ছ দেহকে ভাল রাখিবার চিন্তা অতীব পাপ কায। আবার আর এক দিক দেখুন ;—দেহ ভাল ও নীরোগ রাখিবার জন্য চিন্তা ত কেহ করেনই না—কিন্তু আপনার এতটুকু সামান্য রোগ হইতে শিবের অসাধ্য যে কোনও রোগ হউক দেখি, আপনি আপনার গণ্ডগ্রামেও দশ সহস্র উপযাচক চিকিৎসক ও ব্যবস্থাপক পাইবেন। অথচ আমাদিগের অজ্ঞতা আকাশচুম্বী। আমরা জলকে নারায়ণ বলি ; কিন্তু যে জল পান করি, সেই জলেই শৌচত্যাগ করি। আমরা বাতাসকে জীবন বলি ; কিন্তু ঘরের জানালার বহর গবাক্ষমাত্র এবং সেই জানালাও সর্ব্ববিধায়ে বন্ধ করিয়া রাখি। আমরা কাপড় ছাড়ি কথায় কথায়—কিন্তু ময়লা কাপড়ের পরিবর্ত্তে ময়লা কাপড়ই

ব্যবহার করি। কোথাও ভাত সমেত থালা বসাইলে মাত্র সে জায়গা এঁটো হয় বলিয়া মনে করি; কিন্তু সমস্ত সহরের ধূলি যে মিষ্টান্নের উপরে মিনিটে মিনিটে জমিতেছে, সেই রাস্তা ও নর্দ্দামার ধূলি মাখা সন্দেশ রসগোল্লা নিজেরাও খাই এবং অপর লোককে খাওয়াইয়া তাহাকে সম্মানিত করি। কলিকাতায় বাস করিয়া যাঁহারা পাচক ও দাসী রাখেন, তাঁহারা যে নিত্যই বারবণিতা ও তৎসহজাত যাবতীয় কুৎসিত দ্রব্যাদির সঙ্গ করিয়া ধন্য হন, এ কথা তাঁহারা সকলেই সুস্পষ্ট ভাবে জানিলেও, চোখ বুজিয়া সহিয়া যান। এ সকলকে সংস্কার বলিব, না অজ্ঞতা বলিব, না ভোগ-বিলাসিতাজনিত কাপুরুষতা বলিব, তাহা বুঝিতে পরিলাম না। ফল কথা, এই ভাবে অসংখ্য কারণ-নিচয় অহরহ সমস্ত দেশ জুড়িয়া ঘটিতেছে; এবং তাহার ফলে নিত্য রোগ বাঙ্গালার নিত্য বিগ্রহ স্বরূপ হইয়া ভোগরাগ আরতি গ্রহণ করিতেছে।

রোগের চতুর্থ কারণ—জ্ঞানকৃত পাপ। চুরুট হইতে চরস পর্য্যন্ত এবং চা হইতে মদের পাচন (Punch) পর্য্যন্ত লোকে স্বেচ্ছায় সেবন করিতেছে। গৃহে সতীলক্ষ্মী থাকিতেও এবং অর্থভাবের অজুহাতে "আইবড়" (?) কার্ত্তিক থাকিয়া, লোকে নানা রকম কুৎসিত ব্যারামকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন প্রদান করিতেছে। যে-সে হুঁকায় ধূমপান করা, যে-সে পাত্রে চা-পান করা, যে-সে সাঁনকিতে যা-তা মাংস ভোজন করা, যে-সে রমণীর মুখামৃত পান করা—এ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যায় না। ক্ষুধার সময়ে না খাইয়া, অক্ষুধার উপরে অর্দ্ধ-সিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, ইংরাজের গোলামী করিয়া, অর্দ্ধাহারে, বা পূর্ণাহারের পর হাঁপাইতে হাঁপাইতে রেলেরগাড়ী ধরিতে যাওয়া, বাবুয়ানির খাতিরে গরমের সময়ে দুপুরবেলা মর্কট সাজা (aping the European in dress,) লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভোজনে হিন্দু-সাহেবী ও মোগলাই রন্ধনের বিবিধ ভোজ্য খাওয়া, কথায় কথায় নিজের ঔষধ সেবন করা—শরীরের উপরে আর কত অত্যাচারের তালিকা দিব? এই সকল অভ্যাসের কবির কথায় শুনুন—

বিলাস, ব্যসনে সুখ, কিন্তু প্রাণ যায়!
ভোজনে ব্যারাম, পানে বিষ দেহে যায়
বিবেকে চাপিয়া উঠে আনন্দ তুফান;—
ক্রমে সেই বিবেকের না থাকে সন্ধান!

রোগের পঞ্চম কারণ—মন। দেহ নষ্ট হইলে মন নষ্ট হয় না। সংস্কার ও প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে মনের সৃষ্টি। সেই মনের যে কতদূর ব্যাপকতা শক্তি তাহা আমরা ভুলিয়া যাই! পাশ্চাত্য আজও মনকে যথার্থ সমাদর করিতে শিখে এ দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসা-পদ্ধতি, যাহা ইংরাজ প্রবর্ত্তিত, তাহাতে মনের সত্তা ও স্থান কোথায়, তাহা জানিতে দেওয়া হয়ই না,—পরন্তু, জানাইবারও সুযোগ পর্য্যন্ত রাখা হয় নাই। আমরা তাই দিকে মন না দিয়া, ভোগায়তন এই শরীরটাকে সর্ব্বস্ব করিয়াছি। অথচ মন যতটা শরীরের উপ কায করে, তেমন খুব কমই জিনিষ করে। সহজে ভয় পাই, আশা বা আকাঙ্ক্ষা করিতে নাই, সহ্য করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। দুর্ব্বলতাই রোগের মূল। মন সবল থাকিলে, ভাল থাকে। মনের জোরে কদভ্যাস দূর করা যায়ই, ব্যারামকেও অনেক সময়ে দূর করা হিষ্টিরিয়া বা বায়ুরোগ ত ধরিতে গেলে রোগই মনের ব্যাধি। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (Neurasthenia) অনেকটা মনের উপরে নির্ভর করে। মনকে লক্ষ্য করিয়াই হিন্দু কত কায করিয়াছে, আর আজ আমরা নূতন করিয়া কাঁচা পাশ্চাত্যদিগের নিকটে সে কথা শুনিয়া হইতেছি।

প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা।*

প্র, নং ১।—ছানার জলের গুণ কি কি? কি কি দ্রব্য দ্বারা ছানা তৈয়ারী করা উচিত? জল কিরূপ উপকারক? (সু, দা, গুপ্তা, কুমিল্লা)

উ, নং ১।—গরম দুধে ছানার দম্বল দিয়া আসল ছানা তৈয়ারী হয়; অথবা গরম দুধে টক্ রস দিলে ছানা জমিয়া যায়। প্রথমটি আসল ছানা, শেষটি নকল ছানা। আসল ছানার উপরে চাপ দিলে যে জল বাহির হয়, তাহা প্রায় সাধারণ জলের মত—ঈষৎ লবণাক্ত। উহার গুণ বিরেচক। নকল ছানার জলে দুধের সার পদার্থ কিছুই থাকে না—উহা বেশী পরিমাণ খাইলে শরীর খারাপ হয়। যেখানে ক্রমাগত অজীর্ণ বা হজম বা পেটফাঁপা হয়, সেইখানেই এই নকল ছানার জল" ব্যবহৃত হয়। ছানার জলে দুগ্ধ-শর্করা ও লবণাংশ কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহা অতি সহজে হজম হয় এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি করে।

প্র, নং ২।—অনেক শিশু রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া দাঁতে কড়্-মড়্ আওয়াজ করে; পূর্ণ বয়স্ক লোকেরাও ঘুমাইলে এরূপ দাঁতের আওয়াজ হয়—তাহার কারণ কি? (সু, ল, দাস গুপ্তা, আড়ারিয়া পূর্ণিয়া)

উ, নং ২।—ছেলেরা ঘুমাইয়া দাঁত কড়্কড়্ করে অনেক কারণে করে। যথা, বদ হজম, দাঁত উঠার সময় মাড়িতে শুড়শুড় বোধ, ক্রিমি, কাণে খোল কট্কটানি হইলে, "মুদো" থাকিলে। অনেক সময় পাশ ফিরিবার সময়ে দাঁতে দাঁতে হঠাৎ লাগিয়া যাইয়া শব্দ হয়। মানসিক উদ্বেগও একটি কারণ। কচি ছেলেদেরও যে কারণে দাঁত কড়মড়ানি হয়, যুবকদিগেরও প্রায় সেই কারণ। (গত বর্ষের ১২শ সংখ্যা স্বাস্থ্য-সমাচারে ১২৮ পৃষ্ঠায় "শিশুর খারাপ অভ্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।)

প্র, নং ৩।—শিশুর যদি মাতৃস্তন্যে পেট না ভরে তবে উহার সঙ্গে কয়েকবার গরুর দুগ্ধ দিতে হইলে, তাহা কি প্রণালীতে দেওয়া উচিত? (সু, দাস গুপ্তা)।

উ, নং ৩।—মাতৃস্তন্য যথেষ্ট না থাকিলে মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ম্যালেরিয়া, রক্তাল্পতা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ থাকিলে তাহা সারাইয়া লইতে হয়। মাতাকে বেশ করিয়া দুধ ও তাহার সঙ্গে সাগু, ওটমিল, সুজি প্রভৃতি দিলে, অথবা ল্যাক্টাগন্ নামক ঔষধ খাওয়াইলে, স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। যদি এসকল করা অসম্ভব হয়, তবে মাতৃস্তন্য যখন দিবেন তখন পেট ভরিয়া তাহাই দিবেন। বাকী সময়ে পেট ভরিয়া গোদুগ্ধ ও সমান ভাগ সাগু মিশাইয়া দিবেন। গড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন। ছেলে যখন কাঁদিবে, তখন মাই দিলেন, অথবা নিজ সুবিধা মত দিলেন, এরূপ করা ভুল। দিতে হয় ত পেট ভরিয়া প্রত্যেকবারে খাওয়াইবেন; তবে তিন চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান প্রশস্ত। তাহার মাঝে এক ফোঁটা কিছু দিবেন না। রাত্রি ১০ হইতে ৪টা—ইহার ভিতরে কিছুই খাওয়াইবেন না।

প্র, নং ৪।—ইঁদুরের জ্বালায় বড়ই উত্যক্ত হচ্ছি, মারবার কোন উপায় বলে দিতে পারেন কি? (নি, বা, বসু, নড়াইল)।

উ, নং ৪।—বাজারে ইঁদুর মারিবার নানারূপ কল পাওয়া যায়; অনেকে জাঁতি কলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পান। তা'ছাড়া ইঁদুরকে বিষ প্রয়োগে মারা যায়। ডাক্তারখানা হইতে ৪ আউন্স "বেরিয়াম কার্ব্বনেট্" নামক একপ্রকার বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়া তার সহিত চার আউন্স বিস্কুটের গুঁড়া, খানিকটা

* এখন হইতে প্রতি মাসে প্রশ্নোত্তরের জন্য দুই তিন পৃষ্ঠা পৃথক রাখা হইবে ও পাঠক-পাঠিকাগণের জিজ্ঞাস্যগুলির অল্প কথায় উত্তর দিয়া সমাধান করা হইবে। যে প্রশ্নের উত্তর দুই চার কথায় বুঝান সম্ভব হয় না, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর বারান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। একমাত্র স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোন বিষয় ইহাতে আলোচিত হইবে না। প্রশ্নগুলি সর্ব্বসাধারণের উপযোগী, যথোচিত সংক্ষিপ্ত ও মীমাংসা-যোগ্য হওয়া চাই। স্বাস্থ্য-সমাচার সম্পাদক।

পাঁটার চর্ব্বি (তদভাবে—ভাতের মণ্ড) ও পাঁচ ছয় ফোঁটা মৌরির তৈল বা আরক মিশ্রিত করিয়া, ছোট ছোট বড়ি পাকাইয়া ইঁদুরের গর্ত্তে বা ভাঁড়ার ঘরের কোণে-কোণে রাখিয়া দিতে হয়। এই বড়ি খাইলে ইন্দুর সবংশে ধ্বংস হইবে।

প্র, নং ৫।—(ক) আমাদের সামাজিক শাস্ত্রে বলে যে, দুগ্ধ ও মাংস একত্র আহার করিতে নাই—তাহা হইলে গোমাংসবৎ হয়। বাস্তবিক কি ইহার কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য আছে? (খ) যোগ-শাস্ত্রোক্ত সর্ব্ব কর্ম্মকারক ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়ী ত্রয়ের অস্তিত্ব ও উপকারিতা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কতদূর স্বীকার করেন? ইংরাজী শারীরস্থানে ইহাদের কি নাম দেওয়া হইয়াছে? (গ) স্বভাবতঃ দেখা যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস কখনও উভয় নাসারন্ধ্র দিয়া এক সময়ে প্রবাহিত হয় না; কখনও বাম নাসা দিয়া কখনও বা দক্ষিণ নাসা দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহার কোন প্রকৃতিগত নিয়ম আছে কি? (গো, চ, ঘোষ, ঝিনাইদহ, যশোহর)।

উ, নং ৫।—(ক) দুগ্ধ ও মাংস একত্র আহারে শরীরের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে বিশেষ কোন অপকার না হইলেও, সহজে পরিপাকের কতকটা বিঘ্ন ঘটে বটে। যখনই কোন খাদ্য আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে নীত হয়, তখনই তাহার মধ্যে পাচক রস খাদ্যের উপাদান অনুযায়ী এক একরূপে পরিণত ও সংমিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যকে জীর্ণ ও পরিপাক করে। এই সকল জারক রসের নাম—পেপ্‌সিন্, রেনিন্, হাইড্রোক্লোরিক এসিড্, প্রভৃতি। উপযুক্ত পরিমাণে পাচক রসের অভাব হইলে আমাদিগের অজীর্ণ, পেটের অসুখ প্রভৃতি জন্মে। মাংস উদরস্থ হইলে অত্যধিক পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়; কিন্তু দুগ্ধে প্রথমতঃ রেনিন্ রসের ক্রিয়া আবশ্যক হয়, পরে অন্ত্রমধ্যে গিয়া যৎসামান্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ সাহায্যে পরিপাক হয়। তার উপর মাংস সম্পূর্ণ পরিপাক হইতে ৩।৩॥ ঘণ্টা সময় লাগে; কিন্তু দুগ্ধ পরিপাক হইতে ১॥। ২ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কাজে কাজেই দুগ্ধ, মাংসের পরিপাক প্রতীক্ষায় প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে করিতে বিকৃত দশা (Fermentative change) প্রাপ্ত হয়। ফলে,—বদহজম ও পেটের অসুখ করিতে পারে। (খ) অল্পদিন হইল পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই তিনটি নাড়ীর উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাদের বিশেষতঃ ইড়া ও পিঙ্গলার বিশেষ কার্য্যকারিতা কি ও কতদূর তাহা কার্য্যতঃ এখনও ঠিক জানিতে উঠিতে পারেন নাই। ইড়া ও পিঙ্গলার নাম Right and Left sympathetic Narve Plexus এবং সুষুম্নার নাম Spinal Cord দেওয়া হইয়াছে। (গ) শ্বাসগ্রহণ কালে কখনও দক্ষিণ নাসা দিয়া কখনও বাম নাসা দিয়া বায়ু গৃহীত হইতে দেখা যায়। দয়াময় ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল এরূপ যে, আমাদের শরীরের যে যে ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রম করে, সেইগুলি এক এক জোড়া করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন; যেমন দুই হাত, দুই পা, দুই কাণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র প্রভৃতি। প্রায়ই দেখা যায়, একটি কাজ করে, তখন অন্যটি বিশ্রাম করে। আমরা দুই পা কখনও একসঙ্গে ফেলিতে পারি না; এক পদ বাড়াই, তখন অন্য পদ বিশ্রাম করে। দক্ষিণ হস্তে যখন কোন কার্য্য করি, তখন বাম হাত স্বভাবতঃ বিশ্রাম করিতে চায়। অনুমান হয়, চক্ষু ও কর্ণ একজন অন্যজনকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে বিশ্রাম গ্রহণের অবসর খোঁজে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী পড়িয়াছি,—শিকারে যাইবে, ব্যাধের—"একচক্ষু নিদ্রা যায়, অন্যচক্ষু জাগে।" শরীর রক্ষার জন্য কার্য্য ও বিশ্রাম যুগপৎ আবশ্যক। নাসারন্ধ্র যখন বায়ু ভিতরে গ্রহণ করে, তখন তাহার কার্য্য হয়; আবার যখন প্রশ্বাস ফেলে, তখন তাহার বিশ্রাম। এইরূপে নাসারন্ধ্রদ্বয়ও পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য ও বিশ্রাম করিয়া থাকে।

পল্লী-স্বাস্থ্য।

আজ প্রথমেই একটী সুসংবাদ লইয়া পল্লীস্বাস্থ্যের আলোচনা আরম্ভ করিতেছি—

যশোহরে গ্রাম্য উন্নতি।

যশোহর জেলা সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া ও কলেরার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু ম্যালেরিয়া ও কলেরার উৎপত্তির কারণসমূহ দূরীভূত করিতে পারিলে যে যশোহর স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইতে পারে, তাহা মধুরাপুরনিবাসী কয়েকটি যুবক দেখাইতেছেন। ইহারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া একটি গ্রাম্য সভা স্থাপন করেন এবং সেই চাঁদার টাকা হইতে গ্রামের মধ্যে ১৫৪টা কূপের মধ্য হইতে ১০১টার মূলোৎপাটন করেন। ইহার ফলে গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আলোক ও বাতাস প্রবেশ করিতে পারিতেছে। এই বাঁশঝাড় তুলিবার আগে গ্রামবাসীরা সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিতে পাইত না। তাহার পর সভ্যেরা অন্য দুই স্থান হইতে মাটী লইয়া বাহিরটি ডোবা বা খানা বুজাইয়া দেন। ফলে মাটি লইবার জন্য যে দুই স্থান খোঁড়া হইয়াছিল, সেই দুইটি পুষ্করিণীর উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে একটি স্নানের ও অপরটি জলপানের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। গ্রামের রাস্তা তাঁহারা কয়েকটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার ফলে গ্রামের মধ্যে যাওয়া আসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাহার পর ইঁহারা গ্রামে একটি হাট প্রতিষ্ঠা করায়, লোকের অভাব অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। তাঁহারা দুইটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন; একটিতে বালকগণ, ও অন্যটিতে বালিকাগণ পড়ে। ইহা ছাড়া গ্রামের বাহিরে তাঁহারা বাঁশের ঝাড় রোপণ করিয়াছেন, এবং পুষ্করিণীর তীরে নারিকেল বৃক্ষাদি রোপণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা করার পর হইতে গ্রামের স্বাস্থ্য অনেক প্রকারে ভাল হইয়াছে। (পল্লীবার্ত্তা)

God helps those who help themselves. যাহারা নিজেরা নিজেদের কাজ করে, শ্রীভগবান তাহাদিগের সহায় হ'ন। এইরূপে নিজেরা কাজ করিলেই তাহা যথার্থ কাজের মত কাজ হইবে। কেবল পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিলে, কোন কালেই পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে না। বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে যুবকগণকে কবে এইরূপ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে দেখিতে পাইব? আমরা প্রত্যেক গ্রামের কর্ম্মী যুবকগণকে যশোহরের ঐ মহাপ্রাণ যুবকগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলে বাঙ্গালায় অচিরে তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য-শ্রীসম্পদ ফিরিয়া আসিবে। Example is better than precept. যশোহরের যুবকগণ কথা ছাড়িয়া প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া বাঙ্গালার সম্মুখে যে মহৎ দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা সমগ্র বঙ্গদেশের নিকটে ধন্যবাদার্হ।

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও জলাভাবের যাহা অনিবার্য্য ফল—কলেরা, আরম্ভ হইয়াছে। কলেরার বহর কিরূপ তাহাও দেখিয়া লউন—

ওলাউঠার ভীষণ প্রাদুর্ভাব—দীর্ঘকাল বৃষ্টির অভাবে চারিদিক জলশূন্য হওয়ায় স্থানে স্থানে ওলাউঠার ভীষণ প্রাদুর্ভাব চলিয়াছে। খলসীবেড়্যা গ্রামে সম্প্রতি ওলাউঠায় কয়েক ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং আরোও কয়েকজন উহাতে আক্রান্ত হইয়াছে। আমাদের বাসুদেবপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"ভবানীচক, তাজপুর ও গণেশ্বরপুর এই তিন গ্রামে ওলাউঠায় শতাধিক লোক মারা গিয়াছে এবং সম্প্রতি অর্দ্ধ শত নরনারী উহাতে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রচণ্ড রৌদ্রে জলাশয় সমূহ শুষ্কপ্রায় হওয়ায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে এই রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হইতেছে। তার পর চিকিৎসক ও সুচিকিৎসার অভাবে মৃত্যু এবং আক্রান্তের সংখ্যা এরূপ বাড়িয়াছে। শ্রীমান্ আশুনাথ দাস, বৈকুণ্ঠনাথ পাড়্যা, প্রসন্নকুমার সাউ ও দীনকৃষ্ণ পাড়্যা প্রভৃতি কয়েকটী উৎসাহী যুবক প্রাণপণ যত্নে দরিদ্র রোগীগণের সেবা আদি এবং আবশ্যক হইলে শবদাহ পর্য্যন্ত করিতেছেন। যুবকদের এই সৎকার্য্য প্রশংসনীয়। এই সকল ওলাউঠাক্রান্ত পল্লীতে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে দু'একজন ডাক্তার পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত আমরা জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। (নীহার)

মেদিনীপুরের কলেরার পরিচয় পাইলেন ত! এইবার মৈমনসিংহের অবস্থা কেমন দেখুন—

ইতিপূর্ব্বে মৈমনসিংহ কলেরার আক্রমণ একটু কমিয়াছিল দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে এইবার ইহা দূরীভূত

হইবে। কিন্তু ফলে বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। এখন নগরের প্রায় সকল অংশেই এই রোগের আক্রমণ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে।

(ঢাকাপ্রকাশ)

কলেরা সম্বন্ধে আরও যৎকিঞ্চিৎ—

রাণীর সহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। রাণীর দীঘির জলই সহরের বার আনা লোকে পান করিয়া থাকে। এই রাণীদীঘির জলে না কি রোগের বীজাণু দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপালিটী হইতে এ বিষয়ে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন জন্য মিউনিসিপালিটী হইতে কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। মিউনিসিপালিটীর সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক।

(ত্রিপুরা হিতৈষী।

কলেরা চারিদিকে—

কলেরা—

বরিশালে ২১৪টী কলেরা দেখা দিয়াছে। কলের জল ব্যতীত নিত্য ব্যবহার্য্য জল অত্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সেবকগণ অহোরাত্র রোগীদের সেবা করিতেছে। (বরিশাল হিতৈষী)

সহযোগী "বরিশাল হিতৈষী" আরও একটা অভিযোগ করিয়াছেন। সেটিও প্রণিধানযোগ্য—

স্বাস্থ্যরক্ষক—

অত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ৩০০—২০—৫০০৲ বেতনে জলাবাড়ী নিবাসী বাবু যোগেন্দ্র দত্ত এম-বি, ডি-পি, এইচ্‌কে স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার-নিযুক্ত করিয়াছেন। সুখের কথা—কিন্তু ডাক্তারে কি স্বাস্থ্য রক্ষা করে—না পানীয় জল ও স্বাস্থ্যকর আহার্য্যে স্বাস্থ্য রক্ষা করে? এই বাবদে প্রায় ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে—ইহাতে ২০টা পুকুর হইত।

ঠিক কথা। মোটা মাহিনায় স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী কি কাজ করিতে পারেন? তিনি কেবল পরামর্শ দিতে পারেন মাত্র—এবং সে পরামর্শ যে সু-পরামর্শ, তাহাও অস্বীকার করি না। কিন্তু কেবল পরামর্শ দেওয়া ছাড়া তিনি বেশী আর কি করিতে পারেন? তিনি যে পরামর্শ দিবেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অর্থ চাই। সে অর্থ কোথায়? অর্থের অভাবই যে প্রকৃত অভাব। দেশের স্বাস্থ্য যে কি কারণে নষ্ট হইতেছে, তাহা ত কাহারও অজ্ঞাত নহে। এবং কি উপায় করিলে নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা যায়, তাহাও সকলেই জানে। [illegible] পরামর্শের অভাবে যে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হই[illegible] তাহা নহে। অতএব কেবল পরামর্শ পাইবার [illegible] স্বাস্থ্য-রক্ষক কর্ম্মচারীর নিয়োগ অনাবশ্যক। [illegible] ঐ টাকায় যথার্থ স্বাস্থ্যোন্নতিকর অনেক আসল [illegible] হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে [illegible] অর্থব্যয় করিয়া কেবল নিষ্ফল পরামর্শ ক্রয় করি[illegible] সন্তুষ্ট থাকিতে হয়—পরামর্শ মত কাজ করিবার [illegible] অর্থ কোন কালেই জুটে না। ইহা কোন [illegible] নীতি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

দেশের সাধারণ স্বাস্থ্যেরও একটু আধটু স[illegible] লওয়া আবশ্যক—

বঙ্গে সংক্রামক রোগ।

স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে:—১৯১৯ সনের ১৪ই এপ্রিল তারি[illegible] সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশে ৬টী জেলায় [illegible] মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ বাড়িয়াছে—মেদিনীপুর ১১[illegible] হুগলী ৪—৫, খুলনা ৫৯—৬০, দিনাজপুর ৭—১০ [illegible] ২—৪, ময়মনসিংহ ৪২—৯০, ২৪পরগণায় ৭৯—৭৪, কলিকা[illegible] ১৪৮—৭৩, নদীয়া ৩৫—২৭, মুর্শিদাবাদ ১২—৪, ফরি[illegible] ৫৮—৩৬, বাখরগঞ্জ ৫৪—৫৩, ঢাকা ১৪—১২, নোয়া[illegible] ১৩—১১তে নামিয়াছে। বসন্ত রোগের প্রকোপ কমি[illegible] কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা ২৫, ২৪ পরগণা ৬, মুর্শিদাবা[illegible] নদীয়া ৫, ময়মনসিংহ ৪, মেদিনীপুর ৩ এবং দিনাজপু[illegible] আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ১০ জন প্লেগে মৃত্যুমুখে [illegible] হইয়াছে।

(ঢাকা প্র[illegible]

বাঙ্গালার কোথায় যে স্বাস্থ্যের অবস্থা [illegible] খানি ভাল তাহার কোন সন্ধান মিলিতেছে [illegible] সর্ব্বত্রই একই অভিযোগ—রোগ, আর [illegible] আর রোগ—

এবার বৃষ্টির অভাব হেতু জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই [illegible] ফলে কলেরা, রক্তামাশয় রোগের প্রবল্য ঘটিয়াছে। তাহাতে [illegible] কত লোক যে অকালে কালের কবলে নীত হইয়াছে এবং [illegible] কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? জেলার জনসাধারণ পানী[illegible] অভাব হেতু একেবারে বিপন্ন—উপায়হীন হইয়া দিনে দিনে [illegible] আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতেছে। ফলে বহু পল্লী শ্মশানে [illegible] হইতে চলিয়াছে। জেলা বোর্ডের এমন শক্তি নাই যে [illegible]অভাব পূরণ করিতে পারে। এ বিষয়ে সরকারের সহায়তা [illegible]র অন্য উপায় নাই। (যশোহর)

যশোহরে একটু ভাল কাজের নমুনা পাওয়া [illegible]—

[illegible]কষ্ট নিবারণের জন্য যশোহর জেলাবোর্ড বনগ্রাম মহকুমায় [illegible]স্থানে ১০টি কূপ খনন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] থানার নানাস্থানে ৩টা, সায়সায় ৩টা, মহেশপুর থানায় ২টা [illegible] খনন করা হইয়াছে। (পল্লীবার্ত্তা)

[illegible] বহুব্যয়ে অনর্থক স্বাস্থ্যকর্ম্মচারী নিয়োগের অপেক্ষা [illegible] অল্প করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠান করিলে বেশী [illegible]কার আছে।

এবার বাঙ্গালায় যেমন অনাবৃষ্টি, যেমন জলাভাব, [illegible]নি কলেরা। কলেরাই এবার বাঙ্গালায় প্রধান [illegible]। জলাভাবে দূষিত জল পানে এই রোগ [illegible]ন হয়—

[illegible] ওলাউঠা ও বসন্তের প্রকোপ—তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম [illegible]র নন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে অনেকে [illegible] যাইতেছে। তমলুক ও পাঁশকুড়া থানার স্থানে স্থানে বসন্তের [illegible]র্ভাব হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলাবোর্ড হইতে নন্দীগ্রামে [illegible]উঠা চিকিৎসার জন্য দুই জন ডাক্তার পাঠান হইয়াছে। [illegible], জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সারওয়ার্দ্দী মহাশয় [illegible] অফিসারের সহিত গত মঙ্গলবার উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া [illegible]ছেন। (নীহার)

কলেরার প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টও যে বিলক্ষণ [illegible]লিত হইয়াছেন, তাহা সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ [illegible]তেছে—

বঙ্গদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা।

ঢাকা জিলায় বহু স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বঙ্গীয় [illegible]মেণ্টের হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট বিগত ১০ই এপ্রিল তারিখে যে [illegible] প্রচার করিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

[illegible] দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি ও উত্তাপের দরুণ বঙ্গদেশের বহুস্থানে [illegible] প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে; তদ্দরুণ বঙ্গীয় হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক উহার নিবারণকল্পে প্রতিষেধক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হইতেছে।

বিগত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মিনিষ্টার, ঢাকা জেলাস্থ লৌহজঙ্গ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, এই মর্ম্মে সংবাদ পান। তাঁহার উপদেশ মতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার ঢাকা জিলায় কলেরার প্রতিষেধক কার্য্যে নিয়োজিত হন, যেহেতু ঢাকা জিলা বোর্ডে কোনও হেল্‌থ অফিসার নাই। কলেরাগ্রস্ত স্থানসমূহে এবং নারায়ণগঞ্জস্থ লাঙ্গলবন্দ মেলা উপলক্ষে যে জনসমাগম হইবে তাহাতে কলেরা দেখা না দেয় তজ্জন্য প্রতিবিধান কল্পেই উক্ত এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত কলেরা দমনকল্পে সত্বর ঢাকায় দুইজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং দুইজন সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরিত হয়। হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের ব্যয়ে ঐ স্থান-সমূহে প্রতিষেধক ঔষধাদি প্রেরিত হয়। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে সম্প্রতি যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে সংক্রামিত স্থানসমূহে যে সমস্ত ডিস্পেন্সারী আছে তাহার ডাক্তারগণকে সাহায্য করিবার জন্য কতিপয় এপিডেমিক ডাক্তার ঐ স্থান-সমূহে প্রেরিত হইয়াছে। পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার পৃথক্ রিপোর্ট দ্বারা জানাইয়াছেন যে অধিকাংশ পল্লীই কলেরা সংক্রামিত, তবে প্রতিষেধক অনুষ্ঠানের ফলে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে স্থানীয় লোকগণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অপেক্ষা উপশমক ঔষধের উপর অধিক আস্থাবান্।

যেহেতু পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার মনে করেন যে অবিলম্বে প্রতিষেধক অনুষ্ঠানে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে উক্ত সংক্রামক ব্যাধি ভীষণভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে এবং ফলে বহু লোকক্ষয় হইবে; এ জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল এলেকামধ্যে কিম্বা পল্লীসমূহে কোনও কলেরা হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ কল্পে উক্ত ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত উপায় সমূহ যাহাতে ত্বরায় অবলম্বিত হয় তৎপ্রতি তৎপ্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে উক্ত বিভাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত সার্কুলারাদিও বিতরিত হইয়াছে। লোক্যাল বোর্ড সমূহে যাহাতে হেল্‌থ অফিসার এবং স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টরগণ সত্বর উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিষেধক ঔষধাদি প্রাপ্ত হন তজ্জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট নিজব্যয়ে যে সমস্ত মুদ্রিত প্রতিষেধক উপায় সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী বিতরণ করিয়াছেন তাহাতে সুফল হইতে দেখা গিয়াছে।

উল্লিখিত মর্ম্মে রেলওয়ে কোম্পানী, ইন্‌ল্যাণ্ড ষ্টীমার কোম্পানী, ভারতীয় জুটমিল্‌স্ এসোসিয়েশন, দার্জ্জিলিং প্লাণ্টারস্ এসোসিয়েসন,

ডুয়ার্স প্লাণ্টার্স এসোসিয়েসন, আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অব হেল্থ, কলিকাতা কর্পোরেসন, ও পোর্ট কমিসনার্স প্রভৃতি সমস্তেও উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। যাহারা মুদ্রিত ও প্রতিষেধক উপায় সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী চাহিয়াছেন তাহাদের উহা বিনা ব্যয়ে দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত জেলা বোর্ডে কোনও হেল্থ অফিসার নাই তাহাদের সত্বর উপযুক্ত হেল্থ অফিসার নিযুক্ত করিবার [illegible] বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হেল্থ ডিপার্টমেণ্টের [illegible] এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ এই সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে [illegible] উদগ্রীব আছেন এবং সতর্কতার সহিত ইহার ফলাফল [illegible] দাঁড়ায় তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

আলোচনা।

গ্রামবাসীর অজ্ঞতা স্বাস্থ্যের অন্তরায়।—

বাঙ্গালার পাবলিসিটি অফিসার বা প্রচার বিভাগের কর্ত্তা এই মর্ম্মের একটী মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন যে, গ্রাম্য লোকদের অজ্ঞতা নিবন্ধন কলেরা রোগের বিস্তৃতি নিবারণের চেষ্টা সফল হয় না। এই মধুর মন্তব্যটি বর্ণে বর্ণে সত্য। পাবলিসিটি অফিসার মহাশয় বলিতেছেন, এখন অনেকেই জানেন যে, কলেরা রোগীর দেহ-নিঃসৃত দূষিত পদার্থসমূহ স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে শোধিত করিয়া লইলে কলেরা রোগ বিস্তৃত হইতে পারে না। কিন্তু পল্লীগ্রাম অঞ্চলে এখনও এমন অনেক লোক আছে, যাহারা এই গোড়ার মোটা কথাটাও জানে না, এবং বুঝে না। ঠিক কথা। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা গ্রামবাসিগণের ব্যবহারের জল ঔষধ দ্বারা শোধিত করিয়া দিলে, এবং কলেরা রোগের বিষদুষ্ট রোগীর দেহ-নিঃসৃত পদার্থ সকল শোধিত করিবার পর স্থানান্তরিত করিলে, কলেরা রোগের প্রভাব হ্রাস হইতে পারে। অজ্ঞ গ্রামবাসীরা এই তত্ত্বটুকু বুঝে না বলিয়া এইরূপ প্রতিষেধক কার্য্যে বাধা দিয়া থাকে। সুতরাং কলেরা রোগ নিবারণ করিতে হইলে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কি? সকলেই স্বীকার করিবেন, সেই প্রথম কর্ত্তব্য—দেশবাসীর অজ্ঞতা দূর করা। কিন্তু সে পক্ষে সরকার কতদূর কি করিয়াছেন, করিতেছেন, এবং করিবার মতলব করিয়াছেন? দেশের শতকরা [illegible] ৯৫ জন লোক বর্ণজ্ঞানহীন। এই সমস্ত লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করা,—আর কোন ক[illegible] না হউক, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যও—[illegible] সরকারের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য নহে কি? ইহা [illegible] করিয়া,—স্বাস্থ্যরক্ষার ও স্বাস্থ্যোন্নতির মত কিছু [illegible] অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহা নিষ্ফল [illegible] না কি? অজ্ঞ, মূর্খ দেশবাসী সরকারের [illegible] সৎ প্রচেষ্টা, সমস্ত শুভ উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিয়া [illegible] ব্যর্থ করিয়া দিবে না কি? সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা বি[illegible] না করিয়া, ৫০০০ টাকার স্থলে ১০০০০ টাকা [illegible] বেতনে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী, এবং সহস্র সহস্র মুদ্রা [illegible] অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর নিয়োগও ব্যর্থ হইবে না [illegible] সরকার যখন তখন এদেশবাসীর মূর্খতার [illegible] দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটি ঢাকিবার [illegible] করেন। অথচ, দেশবাসীর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা [illegible] লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য শিক্ষা বি[illegible] কোন ব্যবস্থাই করিতে চান না—কেবলই অর্থা[illegible] দোহাই দিয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাবগুলা চাপ[illegible] থাকেন। লোককে আগে শিক্ষিত করিবার ব্যব[illegible] করিলে, অজ্ঞতা, মূর্খতা দূর করিবার উপায় অব[illegible] করিলে, যতই কেন স্বাস্থ্য-মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী [illegible] করা হউক না, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্ন[illegible] [illegible] যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক না কেন, আসল [illegible] বেশী কিছুই হইবে না। মূর্খ লোকে বাধা দিবেই [illegible] সরকারের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইবেই। অতএব যে [illegible] আগে করা কর্ত্তব্য, তাহাই আগে করা হউক—[illegible] শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা হউক। তার পর [illegible] কাজের সময় আসিবে এবং কাজ সহজে সফলও [illegible]বে।

[illegible]লিকাতায় কলেরা।—

এবার বৃষ্টির অভাব ও গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ বাঙ্গলার [illegible] স্থানেই কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী [illegible]য়াছে। কলিকাতাও বাদ পড়ে নাই। কলিকাতার [illegible]স্থ্য-কর্ম্মচারী (Health Officer) মহাশয়ও তাঁহার [illegible] সাপ্তাহিক রিপোর্টে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, গ্রীষ্মাধিক্য, [illegible]বৃষ্টি, এবং যথেষ্ট জলের অভাবই এই বৃদ্ধির কারণ। [illegible] নিবারণের জন্য, কলেরা রোগীদের চিকিৎসার [illegible], যে সকল ব্যবস্থা এবং অভাব অভিযোগ আছে, [illegible]পোর্টে সেই সকল কথার আলোচনা হইয়াছে, [illegible] সুখী হইলাম। যে সকল কলেরা কেস [illegible] অফিসার মহাশয়ের গোচরে আসিয়াছিল, [illegible] সকল স্থলে কোন্ কোন্ সূত্রে রোগের উৎপত্তি [illegible]য়াছিল, সে সম্বন্ধেও যথাসাধ্য অনুসন্ধান হইয়াছিল। [illegible] ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, গঙ্গাস্নানের [illegible] ১৫ জন, কলিকাতায় যে ময়লা জল পাইখানা [illegible] ড্রেণ ধুইবার জন্য ও রাস্তায় ঢালিবার জন্য সরবরাহ [illegible] হয়, সেই জল ব্যবহার করার ফলে, ও পাতকুয়ার [illegible] ব্যবহার করার ফলে ৬ জন, কলেরা রোগীর [illegible] আসিয়া ৬ জন, খাবারের দোষে ১৮ জন এবং [illegible] জল ব্যবহার করার ফলে কয়েকজন, আদি [illegible] জল ব্যবহার করার দরুণ ৩জন, পচা পুকুরের [illegible] সংশ্রবে ৪ জন, কলেরায় আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ [illegible]নতঃ জলের দোষেই—অর্থাৎ নির্ম্মল জলের অভাবেই [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের কলেরা হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে কলেরা রোগ দূর করিতে হইলে, তাহা হইলে, সর্ব্বাগ্রে জলের সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। গঙ্গাস্নান বা গঙ্গার জল ব্যবহার করার দরুণ যে সব কলেরা কেস হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারের উপায় কর্ত্তাদের হাতে। গঙ্গার জল কি কি কারণে দূষিত হইয়া পড়িয়া রোগ উৎপাদনে এবং রোগের প্রসার বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করিয়া থাকে, তাহাও সরকারী রিপোর্ট হইতেই দেখাইয়া দিতেছি। ভারত-গবর্ণমেণ্টের পাবলিক হেল্থ কমিশনার মহাশয় তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে, গঙ্গার জল যে যে কারণে দূষিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। গঙ্গার জল যে সকল কারণে দূষিত হয়, তাহার অনুসন্ধান গত বৎসর আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে। তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই। তবে কতকগুলি কারণ যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহা এই এই—(১) কলকারখানার সেপ্টিক ট্যাঙ্ক হইতে নিক্ষিপ্ত ময়লা ও অন্যান্য আবর্জ্জনার দ্বারা গঙ্গার জল দূষিত হয়। (২) গঙ্গার ধারে শত শত মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সেই সকল মিউনিসিপ্যালিটীর ড্রেণের জল এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী যে সকল স্থলে মিউনিসিপ্যালিটী নাই, এমন সকল স্থানেরও ড্রেণের জল ও ময়লা গঙ্গায় আসিয়া পড়ে। (৩) তা ছাড়া ৮৮টি যায়গার সমস্ত আবর্জ্জনা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হয়। (৪) বহু স্থান ব্যাপিয়া লোকে গঙ্গাতীরে মলমূত্র ত্যাগ করে। (৫) যাহারা দিন রাত নৌকায়, ষ্টীমারে, জাহাজে বাস করে তাহাদের পাইখানা গঙ্গাবক্ষ। সুতরাং গঙ্গা বেচারীর আর অপরাধ কি? গঙ্গার জল বিশুদ্ধ রাখা সহজ কথা নহে। কঠোর রাজশাসন ভিন্ন এটী হইবার যো নাই। গঙ্গার জল যাহাতে কেহ অপবিত্র না করে, সেজন্য খুব কড়া আইন চাই। আবার কেবল আইন রচনা করিলেই হইবে না,—সেই আইন যাহাতে কেহ লঙ্ঘন করিতে না পারে, সেজন্য উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থাও করিতে হয়। সুতরাং ব্যাপার অতি বিরাট। তথাপি, ইহা করাও অত্যন্ত আবশ্যক, এবং করিতেই

হইবে। নহিলে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না। কাজটা খুব কঠিন বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভবও নয়। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে, উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতকটা পরিমাণেও যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন এক সময় ছিল যখন জলকে নারায়ণ জ্ঞানে লোকে গঙ্গাজল অপবিত্র করা হইতে বিরত থাকিত। কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়। ধর্ম্ম-বিশ্বাস এখন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর বিশেষতঃ, যাহারা জলকে নারায়ণ জ্ঞানে পবিত্র ভাবে দেখে না, এমন বহু ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক দেশময় ছড়াইয়া বাস করিতেছে। তাহাদের কাছে ঐ দোহাই দেওয়া চলে না। আইন চাইই চাই। তবে একটা মুস্কিলের কথা এই যে, গঙ্গা কোন একটী প্রদেশ বিশেষের অন্তর্গত নহে; সুতরাং কোন একটী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় একটা আইন পাশ করাইয়া লইলেই হইবে না,—গঙ্গায় জলের বিশুদ্ধিতা রক্ষা পাইবে না। এই আইন খোদ ভারত-গবর্ণমেণ্টকেই রচনা করিতে হইবে। আশা করি, তদন্ত শেষ হইয়া তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বাস্থ্যের খাতিরে অচিরে আইন রচনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

মৈমনসিংহে মেডিক্যাল স্কুল।—

এবার মৈমনসিংহে মেডিক্যাল স্কুল না হইয়া [illegible] না। মৈমনসিংহের ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন। সার শ্রী[illegible] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলায় জেলার জে[illegible] মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের কথা বিবেচনা করিবার জ[illegible] যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, সেই কমিটি স্থির ক[illegible] ছেন, সুরেন্দ্রবাবু যে ৫।৬টি স্থানে মেডিক্যাল [illegible] স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৈ[illegible] সিংহের মেডিক্যাল স্কুলটি গঠন করা কর্ত্ত[illegible] চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থীদিগের হাতে-কলমে, চিকি[illegible] বিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল স্কুলের সঙ্গে অ[illegible] একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হাসপাতাল থাকা আব[illegible] মৈমনসিংহে একটী চমৎকার হাসপাতাল আ[illegible] বিশেষতঃ মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য যে অর্থ সক[illegible] আগে দরকার, মৈমনসিংহ মেডিক্যাল স্কুলের [illegible] সেই টাকার কিয়দংশ যোগাড় হইয়াছে। কিং এড[illegible] মেমোরিয়াল ফাণ্ড কমিটি ইতোমধ্যেই সাড়ে বার হা[illegible] টাকা এই স্কুলের জন্য দান করিয়াছেন, এবং আ[illegible] টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মৈমনসিং[illegible] জেলাবোর্ড স্কুলের জন্য জমি কিনিয়া দিয়াছেন। [illegible] মেণ্টও মৈমনসিংহে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্র[illegible] মঞ্জুর করিয়াছেন। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২৯ সাল { ৩য় সংখ্যা

দাঁতের কথা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

লোক মতের অভাব।—আমাদের দেশে একটা কথা আছে—"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না"। এ কথাটা যে-সে লোকে বলিয়া থাকে বটে, এবং অন্য অর্থেই বলিয়া থাকে; কিন্তু, সত্য সত্যই দাঁতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলে, ইহার যে কি গভীর, কি সুদূরনিবদ্ধ অর্থ আছে, তাহা খুব কম লোকেই বুঝে এবং বোধ হয়, কেহই বুঝিবার চেষ্টাও করে না।

"দাঁত অতি তুচ্ছ জিনিষ—এত বড় দেহের কোথায় কোন্ অন্তরালে যে দাঁতগুলা পড়িয়া আছে, সেজন্য এত মাথা ব্যথা কেন?"—অনেকেই এইরূপ ভাবিয়া থাকেন; এবং দৈবাৎ যন্ত্রণা বা পীড়াদায়ক হয় বলিয়া, দাঁতের কথা অনেকের মনেই হয় না। কাযেই, দাঁতের কথা শুনিবার জন্য লোকেদের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু যদি আজ বলি, যে খারাপ দাঁতের দোষে লোকের জীবনটাই মাটি হইয়া যায়, তাহা হইলে সে কথা শুনিয়া কেহ শিহরিয়া উঠিবেন কি না—জানি না, তবে অনেকেই অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন—সন্দেহ নাই; এমনিই অধঃপাতে আমরা যাইতেছি! দুইটা ব্যঙ্গ কৌতুক বা নভেলি কথা বলিলে অনেক শ্রোতা জোটে; দুইটা কবিতার ও প্রত্নতত্ত্বেরও পাঠক জোটে; কিন্তু মুমূর্ষু, রোগে জীর্ণ, ব্যারামের লীলাভূমি এ বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্য-কথা পাড়িলেই লোকে মুখ বাঁকায়—আবার তাহার ফলও তাহারা হাতে হাতে পায়।

দাঁতের কথা অতি ক্ষুদ্র হইলেও জীবনের পক্ষে বড় সামান্য কথা নহে। কিন্তু আসল দাঁতের কথা বুঝিতে হইলে, গোটা কতক রাসায়নিক কথা ও দেহতত্ত্বের কিছু জানিতে হয়। সেইগুলাই প্রথমে বলিব।

শারীরিক অবস্থার উপরে দাঁতের ভাল মন্দ নির্ভর করে।—একই জমিতে আম ও নিম গাছ জন্মে—অথচ দুইয়ের আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, আস্বাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের দেহে যে রক্ত চলাচল করিতেছে, সেই একই রস হইতে মাংসের মত কোমল ও দন্তের মত কঠিন পদার্থ সৃষ্ট হইতেছে। যেমন উৎকৃষ্ট জমি, উৎকৃষ্ট সার ও প্রাণপণ যত্ন পাইলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলের উন্নতি ঘটে, তেমনি ভাল আহারের উপরে দন্তের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। আমাদিগের শরীরের সকল যন্ত্রকে সুস্থ রাখিবার জন্য, রক্তে নানা জাতীয় লাবণিক পদার্থ (Chemical Salts) থাকে। আমরা যত রকমের লবণ (Salts) ভুক্ত দ্রব্যের সহিত আহার করি, তন্মধ্যে তিনটির নাম সকলেরই জানা আছে—সোডিয়াম ক্লোরাইড্ (Sodium Chloride বা যে লবণ আমরা রন্ধনে ব্যবহার করি), লৌহ-ঘটিত লবণ (Iron salts) ও চূণজাতীয় লবণ (Calcium Salts)। চূণজাতীয় লবণ (Calcium Salts) হইতে দন্ত ও অস্থি গঠিত হয়। ইহা যে শরীর রক্ষার্থ নিতান্ত আবশ্যক, তাহা ইতর প্রাণীরাও অবগত আছে। পক্ষীশাবক যে ডিমের মধ্যে থাকে, সেই ডিমের খোলাটি চূণ-জাতীয় লবণে গঠিত। এইজন্য, পক্ষীরা ডিম পাড়িবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই, অতি আগ্রহের সহিত চূণ-জাতীয় লাবণিক পদার্থ (যথা, গুগ লি, শামুক, ডিমের ভাঙা খোলা প্রভৃতি) খাইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ এসব কথা জানেও না এবং জানা দরকারও মনে করে না। অথচ বৎসরে বৎসরে মানুষ সন্তানের জন্ম দেয়!!!

দাঁত এক রকম হাড় বিশেষ। হাড়ে প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ আছে—লবণ ও জিলেটিন। যদি এক খণ্ড হাড় লইয়া উগ্র দ্রাবকে (strong acid) সিক্ত করা হয়, তবে, তাহাতে চূণ-জাতীয় যে লবণ (Calcium Salts) থাকে, তাহা ঐ দ্রবে বাহির হইয়া আইসে। একখণ্ড হাড়কে অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে সিদ্ধ করিলে, তাহা হইতে জিলেটীন (gelatin) নামক আমিষ জাতীয় (nitrogenous) পদার্থ নির্গত হয়। ফল কথা এই যে, জিলেটীনের সঙ্গে যদি চূণ-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট না থাকে, তবে হাড় তেমন শক্ত হয় না। যে শিশুর হাড় শক্ত হয় না, অল্প বয়স হইতে তাহাদিগের পা বাকিয়া যায়। আবার, যে কারণে শিশুদিগের হাড় শক্ত হয় না (অর্থাৎ রক্তে চূণ জাতীয় পদার্থ কম হইলে), সেই কারণেই সেই-সেই শিশুর দাঁত তেমন মজবুত হইতে পায় না। তাই বলিতে ছিলাম যে, যেমন, জমির সার কম হইলে তেমন প্রচুর ও ভাল ফসল হয় না, তেমনি শিশুর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে চূণ-জাতীয় লবণ না থাকিলে শিশুর দাঁত তেমন মজবুত হয় না।—শিশুর রক্তে চূণজাতীয় লবণের অভাবে, তাহাদের দেহের গঠন ও বৃদ্ধি তেমন হয় না; সেই অবস্থাকে রিকেটস্ (rickets) নামক ব্যারাম কহে।

দাঁতের গঠন।—এক্ষণে দাঁতের গঠন কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক। মুখ হাঁ করিলে দাঁতের যেটুকু দেখা যায়, তাহার নিচের অংশের প্রায় আরও তত আছে—দেখা যায় না, কারণ সেটুকু মাংসের (মাড়ির) মধ্যে ঢাকা থাকে। যখন দাঁত পড়িয়া যায় উপড়াইয়া ফেলা হয়, তখন সেই অংশটাকে লইয়া পরী-

মাড়ির মধ্যে দাঁত বসান রহিয়াছে।

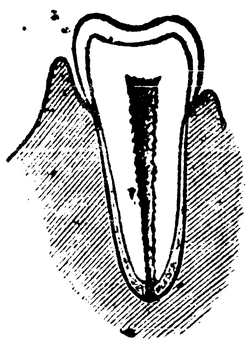

করিলে দেখা যায় দাঁতের উপরের অং বেশ ধপ্‌ধপে সা চক্‌চকে এবং অ কঠিন; এইটিকে এ মেল (enamel) ব দাঁতের নিচের অং যেটি মাংসের ম লুকান থাকে, সেটি হাড়ের মত, রং এবং সামান্য চক্‌চকে, তেমন শক্ত নয়—এটি ডেণ্টিন্ (dentine) বলে। এগুলি দাঁতের বাহিরের আবরণের নাম। যদি দাঁতটিকে সাবধানে লম্বালম্বি চেরা যায়, তবে দেখা যাইবে, তার ভিতরটি ফাঁপা এবং খুব নরম মাংসে ভর্ত্তি—ইহাই দাঁতের মজ্জা বা শাঁস (tooth pulp)। এই মজ্জার মধ্যে শিরা স্নায়ু প্রভৃতি থাকে। শিরা দ্বারা (arteries, veins and lymphatics) দাঁতের পুষ্টি সাধনোদ্দেশ্যে, দাঁতের ভিতরের গহ্বর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন করে, এবং স্নায়ুর (nerves) সাহায্যে দাঁতের বোধশক্তি (sensation) ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ, যেটাকে চিবাইতে হইবে তাহা কঠিন কি কোমল, ঠাণ্ডা কি গরম, এই সকল অনুভূতি ঘটিয়া থাকে। ফল কথা, দাঁতের মাঝখানটা তল্‌তলে নরম, তাহার বাহিরের আবরণ যেটুকু মাংসের ভিতরে ঢাকা থাকে সেটিও তেমন শক্ত নয়, এবং দাঁতের যে অংশ-দ্বারা চিবান কায হয়, সে অংশটুকু দেখিতে ও কাযে পাথরের মত। এখন এই এনামেল বা পাথরের মত চক্‌চকে অংশের প্রধান গুণ, এই যে যেমন ইহা পাথরের মত সুদৃশ্য ও কঠিন, তেমনি ইহার বিশেষ দোষ এই যে, প্রথমতঃ ইহা একবার ক্ষয়িয়া যাইলে বা ভাঙিয়া যাইলে পুনরায় আর গড়ে না—ক্ষয়িতই থাকিয়া যায়; এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা সামান্য টক বা অ্যাসিড (acid) লাগিলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবার মাংসে ঢাকা ডেণ্টিনের মস্ত দোষ এই যে, ইহাতে হাওয়া লাগিলে ইহা শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত (carious) হইতে থাকে। এই দুইটী কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ, সুস্থ দেহে যাহাকে আমরা দাঁতের মাড়ি (gum) বলি, তাহা এই ডেণ্টিন্‌কে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। মাড়ি ক্ষয়িয়া গেলে ডেণ্টিন বাহির হইয়া পড়ে এবং সহজেই নষ্ট হইবার অবকাশ পায়।

দাঁত সম্বন্ধে আর একটি আবশ্যক কথা:—আমাদের সাধারণতঃ দুই দফা দাঁত উঠে,—৬ মাস হইতে ১½ বৎসরের মধ্যে "দুধে দাঁত" (Milk teeth) উঠে এবং ৬ বৎসর বয়স হইতে ২৫।২৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত "আসল দাঁত" (Permanent teeth) উঠে। যে-যে বয়সে যে-যে দাঁত উঠে, তাহার নাম ও বয়সের তালিকা নিম্নে দিলাম:—

	সংখ্যা	দাঁতের নাম	কত বয়সে উঠে।
দুধে দাঁত	১	নিচের পাটির, মাঝের, ছেদন দন্ত (incisor)	৪ হইতে ৭ মাস
	২	উপরের ,, পাশের, ঐ ঐ	৭ ,, ৯ ,,
	২	,, ,, মাঝের, ঐ ঐ	৮ ,, ১০ ,,
	২	নিচের ,, পাশের, ঐ ঐ	১০ ,, ১২ ,,
	৪	সম্মুখের (উভয় পাটির) পেষন দন্ত (molar)	১২ ,, ১৫ ,,
	৪	উভয় পাটির শ্ব-দন্ত (canine)	১৮ ,, ২৪ ,,
	৪	,, ,, পিছনের পেষণ দন্ত (molar)	২০ ,, ৩০ ,,
আসল দাঁত	৪	উভয় পাটির প্রথম পেষণ দন্ত (molar)	৬ হইতে ৭ বৎসরে
	২	নিচের ,, মাঝের ছেদন দন্ত (incisor)	৭ ,, ৮ ,,
	২	উপরের ,, ,, ,, ,,	৭ ,, ৮ ,,
	৪	উভয় পাটির পাশের ,, ,,	৮ ,, ৯ ,,
	৪	,, ,, সম্মুখের দ্বি-শির দন্ত (bicuspids)	৯ ,, ১০ ,,
	৪	,, ,, শ্ব-দন্ত (canine)	১০ ,, ১৩ ,,
	৪	,, ,, পশ্চাতের দ্বি-শির দন্ত (bicuspid)	১০ ,, ১২ ,,
	৪	,, ,, দ্বিতীয় পেষণ দন্ত (molars)	১১ ,, ১২ ,,
	৪	,, ,, তৃতীয় ঐ ঐ	১৪ ,, ২৭ ,,

যুবকের মুখের ভিতরে দাঁতগুলি সাজান রহিয়াছে।

[এই তালিকাদ্বয় মৎপ্রণীত Outlines of Medical Jurisprudence, 5th edition, হইতে উদ্ধৃত]

এইখানে কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, দুধে দাঁতের বেলায় (milk teeth) ছেদন দন্তই (incisor) প্রথমে উঠে; আসল দাঁতের বেলায় (Permanent teeth) প্রথম-পেষণ দন্তই (first molar) প্রথমে উঠে। যদি কোনও শিশুর এক বৎসর পর্য্যন্ত একটিও দাঁত না উঠে, তাহা হইলে সেই শিশুটীকে ব্যারামী, রুগ্ন বা অসুস্থ বলা যায় না। খুব সুস্থ ও সবল দেহেও এক বৎসর বয়সে প্রথম দন্তোদ্গম হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, সাধারণতঃ, চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই আসল দাঁতগুলি প্রায় সবই বাহির হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ, আমরা সকলেই ভুলিয়া যাই যে, এই সকল দাঁতগুলিকে সারাজীবন খাটিতে হয়—বিরাম নাই, ছুটি নাই, বদলি নাই। অর্থাৎ যে দাঁত (আসল) একবার উঠিলে আর উঠিবে না, যে দাঁত লইয়া সারা জীবন আমাদিগকে কাটাইতে হইবে, যে দাঁত ভাঙ্গিলে গড়ে না, ক্ষয়িলে বা পড়িয়া গেলে জন্মের মত যায়—সেই দাঁতের সঙ্গে আমরা কত দুর্ব্যবহারই না ক[illegible] এবং তাহার কথা জানিবার কৌতূহ[illegible] আমাদের হয় না!!!

খাবারের কথা।—দাঁতের কথা বলিতে গেলে, যাহাকে লইয়া দাঁতের সার্থক[illegible] সেই খাবারের কথা একটু না বলিলে [illegible] না। আমরা যাহা খাই, তাহা হইতে রক্ত হয়। কাজেই, খাওয়ার দোষে বা রক্তের দোষ বা গুণ হয়। খাওয়ার গুণ সকল বিশদভাবে বুঝাইতে গেলে অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই জন্য সং[illegible] আসল সিদ্ধান্তগুলি বলিয়া যাইতেছি। [illegible] মতঃ, আমাদের (বাঙ্গালীদের) মধ্যে পুরু[illegible] যেমন খাইবার জন্য লোলুপ, মে[illegible] তেমনি চিরকাল খাওয়ায় এক র[illegible]

কচিছেলের চোয়ালের মধ্যে দাঁত লুকাইত রহিয়াছে—অর্থাৎ এখনো উঠে নাই।

স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বঞ্চিতা। পুরুষেরা [illegible] খাটিবার অজুহাতে দুধ, ঘি, মাছ, মাংস এবং [illegible] বাটীতে থাকিলে, অনেক সময়ে "পরের পেটে [illegible] অর্থাৎ অতি-ভোজন করিবার সুযোগ ছাড়েন [illegible] পুরুষেরা যেমন অবস্থাপন্ন হউন না কেন, স্ত্রী[illegible] দিগের অপেক্ষা ভাল খান। রমণীরা খাও[illegible] একটা মস্ত লজ্জার ব্যাপার বলিয়া মনে করে[illegible]

[illegible]রে সকলকে দিয়া বাকী যাহা কুলায়, তাহাতেই [illegible]দিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। দুধ, ঘি, ভাল [illegible]রিয়া একটু ডাল বা মাছ—এগুলি রমণীর ভাগ্যে [illegible] জোটে। অথচ না রমণীরা জানেন, না পুরুষেরা [illegible], যে রমণীর আহারের উপরে, রমণীর স্বাস্থ্যের ও [illegible] শিশুদিগের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, [illegible]াদিগের মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে যে, [illegible]দ্যের জিনিষ" বেশী বেশী খাওয়াইলেই পুষ্টি সাধিত [illegible] সহরের কাহারো-কাহারো ধারণা আছে যে, [illegible] কোনও ফুড বা (patent milk বা malted food) বা ভাইব্রোণা (Vibrona) বা ম্যানোলা (Manola) বা বাইনো-হাইপোফসফাইট্স্ (Byno-hypophosphites) প্রভৃতি কোনও-না-কোন [illegible] খাওয়াইলেই, শরীরের বেশ পুষ্টি হয়। [illegible] উভয় ধারণাই ভুল—বিশেষ করিয়া শেষের [illegible]গুলি। লৌহ সেবনে রক্তের উপকার হয় [illegible], যদি কেহ লোহার কড়ি-বরগা কামড়ায়, [illegible] বাতুলতা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি [illegible] করিতে পারুক আর না পারুক, তাহার শরীরে [illegible] অভাব হউক আর না হউক, কতকগুলা [illegible] জিনিষ" খাওয়াইয়া পুষ্টিলাভের চেষ্টাও তদ্রূপ [illegible]দ্দীপক। কাহার শরীরে কি জাতীয় পুষ্টির [illegible], সেই অভাবের মাত্রা কিরূপ, কি আকারে [illegible] অভাব পূর্ণ করিলে শরীরের কোনও কষ্ট হইবে [illegible]—এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া তবে পুষ্টির জন্য [illegible] করিতে হয়। তৃতীয়, মুখের অস্তিত্বের কথা [illegible]—এমন কি চিকিৎসকেরাও বিস্মৃত হই। এই [illegible], যত্ন করিলে, "পদ্মগন্ধ" আর অযত্ন করিলে, [illegible] পায়খানা" হইয়া দাঁড়ায়। কি-কি ভাবে অযত্ন [illegible] মুখ পায়খানায় পরিণত হয়, (oral sepsis), তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

[illegible]শেষ কথাটি বলিয়া তাহার পরে পুনরায় দাঁতের [illegible] পাড়িব। যদি একটা বটবৃক্ষের বীজ হাতে [illegible] পরীক্ষা করা যায়, তাহার মধ্যে সহস্রশীর্ষ লক্ষমূল বটবৃক্ষের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহা দেখিতে না পাওয়া গেলেও, ঐ বীজের মধ্যে যে বিরাট বৃক্ষের সমস্তটুকুই নিহিত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষ যখন ভ্রূণ (fœtus) অবস্থায় মাতৃ-গর্ভে বাস করে, তখনিই তাহার ছেদন দন্তের প্রস্তরবৎ অংশ (enamel of incisors) শ্ব-দন্তের ঊর্দ্ধাংশ (upper portion of canines), প্রথম-পেষণ দন্তের সম্পূর্ণটা (whole of first molar) এবং দ্বিতীয় পেষণ দন্তের কিয়দংশ (a portion of second molar) তৈয়ারি হইয়া যায়! অর্থাৎ আসল দাঁতের যে দাঁতটা সর্ব্ব প্রথমে উদ্গত হইবে, সাড়ে ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সেটি লইয়া শিশু জন্মায়—অবশ্য তখন শিশুর মুখে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না; শিশুর ছয় বৎসর বয়সে সেই দাঁতটিকে বাহিরে দেখিতে পাই। এই সঙ্গে অবশ্য ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সদ্যোজাত শিশুর চোয়ালে কোথায় এই ভাবী প্রথম-পেষণ-দন্ত লুক্কাইত থাকে, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারি না; কিন্তু বাস্তবিকই তৎকালে এই দাঁতটি অতীব ক্ষুদ্রাকারে বর্ত্তমান থাকে। আসল দাঁতের অগ্রণী এই দাঁত,—এই দাঁতের ভাল-মন্দের উপরে অপর সকল আসল দাঁতগুলির ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। আর এই দাঁত জন্মায় কখন—যখন আমরা ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃ-জঠরে বাস করিতেছি! কাজেই, গর্ভকালীন মাতার স্বাস্থ্য ও খাদ্যাখাদ্যের উপরে ভ্রূণের বা ভবিষ্যৎ বালকের দাঁতের হিতাহিত নির্ভর করে।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়।—এই বারে একে একে দাঁত সম্বন্ধে আবশ্যক কথাগুলির আলোচনা করিব।

প্রথম কথা।—যদি ভাল (সুস্থ, সবল, সুদৃশ্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী) দাঁত পাইতে চাও, তবে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মাতার আহারের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। গর্ভকালীন জননীর স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহা করিতে হইবে। জননীর পরিপাক-যন্ত্রের যদি কোনও পীড়া থাকে, অথবা তাঁহার দাঁত

বা মুখের কোনও পীড়া থাকে, সযত্নে তাহার চিকিৎসা করাইবে। টাটকা সুপক্ক ফল, ভাল দুধ ও সুপাচ্য আহার যথেষ্ট (কিন্তু অতি মাত্রায় নয়) পরিমাণে দিতে হইবে। সেই সঙ্গে জননীর শারীরিক পরিশ্রমের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জন্মাইবার পরে, মাতৃ-স্তন্য ভিন্ন অপর কোনও খাদ্য শিশুকে দিবে না—জঘন্য, বাসি, অশেষ রোগের আকর, অযথা প্রশংসায় বহু প্রশংসিত কোনও "বিলাতী ফুড", malted milk food বা "গাঢ় দুগ্ধ" (Condensed Milk) দিবে না। দেখা গিয়াছে যে, যে ছেলেরা মাতৃ-স্তন্য পায় তাহাদিগের দাঁত বড়ই মজবুত হয়; আর যাহারা গো দুগ্ধ, ফুড্ প্রভৃতি খায়, তাহাদিগের দাঁত আদতে ভাল হয়ও না, থাকেও না। কয়েক প্রকারের দুধ ও "ফুডের" তুলনা করিয়া দেখুন :—

	ছানা	মাখন	শর্করা	লবণ
মাতৃ-স্তন্য	২·২৯	৩·৮১	৬·২০	০·৩০
গো-দুগ্ধ	৩.৫৫	৩·৬৯	৪·৮৮	০·৭১
ছাগী দুগ্ধ	৪·৩০	৪·৭৮	৪·৪৬	০·৭৫
অ্যালেনবারী নং ১ ফুড	৯·৭	১৪·০	৬৬·৮৫	—
ঐ নং ২ ,,	৯·২	১২·৩	৭২·১	—
ঐ নং ৩ ,,	৯·২	১·০	৮২·৮	—
হর্লিকের ফুড্	১৩·৮	৯·০	৭০·৪	—
মেলিন্স ফুড্	৭·৯	—	৮২·২	—
নেস্‌লের ফুড্	৯·৮৫	৩·৬৭	৭৯·৬১	—
গ্ল্যাক্‌সো	২২·২	২৭·৪	৪১·০	—
সুইস্ দুগ্ধ	৯·৯৩	৮·৮৫	৬৩·৭০	—

[উক্ত তালিকাটি মৎপ্রণীত "Outlines of Hygiene and Public Health" হইতে উদ্ধৃত।]

উপরোক্ত তালিকাটি দেখিলে মাতৃ-স্তন্যাপেক্ষা ফুডগুলির উৎকর্ষই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাতৃ, গো, ছাগী প্রভৃতির দুগ্ধে যে "শর্করা" আছে তাহা দুগ্ধ-শর্করা (lactose); সে শর্করা পরিপাক করিতে শিশুর পক্ষে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু ফুড-গুলিতে যে শর্করা আছে তাহা অনেক স্থলে শ্বেতসার (বা শালি) জাতীয় (unconverted starch state) বা শর্করা (cane sugar) এবং এই শ্বেতসার ও শ[illegible] শিশুর পক্ষে (অন্ততঃ প্রথম-প্রথম) সম্পূর্ণরূপে [illegible]পযোগী। আর একটি স্মরণযোগ্য কথা এই যে, কোনও জীবের দেহের পুষ্টির জন্য টাট্‌কা খাদ্য [illegible] প্রয়োজনীয়; কোনও ফুড বা টিনে-ভরা দুধ টাট্‌[illegible] থাকে না; কাযেই, সে সব "ফুড্" খাইয়া পেট ভ[illegible] পারে, প্রাণ রক্ষাও হইতে পারে, কিন্তু দেহের [illegible] ও বৃদ্ধি তাহা হইতে সম্ভবপর নয়।

যাহা হউক এইটি বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হই[illegible] যে, দন্তোদ্গমের কাল পর্য্যন্ত যে শিশুরা পুরাপুরি [illegible] স্তন্য পায়, তাহাদিগেরই দাঁত বেশ মজবুত [illegible] এই জন্য স্তন্যপান হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা [illegible] দর্শিতার কাজ।

দ্বিতীয় কথা।—যদি দাঁত ভাল করিয়া রা[illegible] চাও, তবে কখনো মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিও [illegible] "হাঁ-করা ছেলে" বলিয়া বাঙ্গালায় একটি অবজ্ঞার [illegible] আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য নাসাপথেই হওয়া চা[illegible] কারণ, আমরা যখন নিশ্বাস বায়ু টানিয়া লই, তখন [illegible] বায়ুর সঙ্গে অসংখ্য রোগ জীবাণু আমাদিগের শ্বাসপ[illegible] প্রবেশ করিতে পারে; ভগবান্ আমাদিগের শ্বাসপ[illegible] এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, শ্বাস গ্র[illegible] কালে, বায়ুর সমস্ত জীবাণুই আমাদিগের না[illegible] ভিতরে আটকাইয়া যায়—বাস্তবিক যেমন ছাঁক[illegible] সাহায্যে ময়লা জল ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা যায়, তেম[illegible] শ্বাস কালীন বায়ুস্থিত যাবতীয় জীবাণু নাসাপ[illegible] রহিয়া যায়। যদি মুখ খুলিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করা [illegible] তবে বায়ুস্থিত যাবতীয় জীবাণু মুখের মধ্যেই র[illegible] যায়, এবং কতক কতক জীবাণু বক্ষোগহ্বরের ভিতর[illegible] ঢোকে। যে সব জীবাণু মুখের ভিতরে আটক[illegible] তাহারা দাঁতের ও দাঁতের মাড়ির, টন্‌সিলের ও গ[illegible] ভিতরে নানারকমের ব্যারাম সৃষ্টি করে। মুখ খুলিয়া শ[illegible] প্রশ্বাস লওয়ার ফলে, তালু (টাক্‌রা) ক্রমশঃ চির[illegible] মত, উঁচু হইয়া বাঁকিয়া যায়, (highly arch[illegible]

[illegible]); তাহার ফলে, দাঁত তেমন পরিপাটি ভাবে [illegible] থাকিতে পায় না এবং তালু উচু হইয়া যাওয়ায় [illegible] ও বুদ্ধির প্রাথর্য্য কমিয়া আসে। এইজন্যই [illegible]বুদ্ধি বালকদিগকে "হাঁ-করা ছেলে" বলে। ছেলেদের [illegible] খুলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবার প্রধান কারণ, নাকের [illegible] বা নাসাপথের পিছন দিকে ছোট ছোট আঙ্গুরের গোছা-করা আব (adenoids) জন্মায় বলিয়া। [illegible] কোন ছেলে অপরের দেখাদেখি অভ্যাসবশতঃও [illegible] খুলিয়া নিঃশ্বাস ফেলে; কাহারো টন্‌সিল বড় থাকে [illegible] মুখ খুলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লয়। যাহা হউক, মুখ হাঁ [illegible] নিঃশ্বাস ফেলা সাধারণতঃ নাসাপথের আংশিক [illegible]রোধ বা তজ্জাতীয় নাক বা মুখ বা গলার অপর [illegible]রামের ফল, এবং হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলিলে ক্ষয়কাশ, [illegible]কাশির ধাতু প্রভৃতি কঠিনতর ব্যারাম হয়। হাঁ-করা [illegible]লেদের দাঁত কখনো ভাল থাকিতে পারে না। অনেক [illegible]মাতার মনে ধারণা আছে যে, দিনে মুখ হাঁ করিয়া [illegible]শ্বাস ফেলাই; দোষের কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় রাত্রে [illegible] হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলার কোনও দোষ নাই। সে [illegible] ভ্রমাত্মক। সকল লোকেরই জানা থাকা [illegible]চিত যে, যদি কোনও ছেলে ক্রমাগত মুখ হাঁ করিয়া [illegible] প্রশ্বাস লয়, তবে সে ছেলেটি সুস্থ নয়, কিম্বা [illegible] বেশী দিন সুস্থ থাকিবে না।

তৃতীয় কথা।—দাঁতকে সুস্থ রাখিতে হইলে, প্রত্যহ [illegible] প্রত্যেক মুহূর্ত্তে দাঁতকে পরিষ্কার রাখা চাই। (১) [illegible] মাজিলে দাঁত পরিষ্কার থাকে। খড়ির মিহি গুড়া, [illegible]পারি বা হরীতকীর ভষ্ম, বাজারের তৈয়ারী টুথ [illegible]উডার প্রভৃতি দাঁত মাজিবার পক্ষে ভাল। কিন্তু কার্ব্ব-[illegible] বা তজ্জাতীয় উগ্র জীবাণু-নাশক ঔষধ নিত্য ব্যব-[illegible]রের ফলে, আমাদের মুখের ভিতরে হিতকারী (benign [illegible]rm) যে সকল জীবাণু থাকে, তাহারা মরিয়া যায়। [illegible]নেকেই জানে না যে, মানুষের মুখে, যোনি পথে, পেটের ভিতর, অন্ত্রের মধ্যে কতক কতক মিত্র জীবাণু [illegible] সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে;—সেগুলি সেখানে থাকার ফলে, [illegible]জাতীয় বা রোগোৎপাদক কোনও জীবাণু তৎপথে প্রবিষ্ট হইলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কাযেই, যে সে মিত্র-জীবাণু নাশক ঔষধ ঘটিত এমন কোনও মাজন নিত্য ব্যবহার করা উচিত নয়। তামাকের গুলের গুঁড়া, ঘুটের ছাই, লঙ্কাসিদ্ধ বা লবণ মিশ্রিত সর্ষপ তেল প্রভৃতি দ্বারা মাড়ি ছড়িয়া যায় বলিয়া, ঐ সকল মাজনও বেশী দিন ব্যবহার করা উচিত নয়। টুথ-ব্রাস নানা রকমের আছে। বির-স্থলের (bristle) বুরুসই সস্তা ও সহজ-লভ্য। ব্যাজারের লোমের (badger hair) বা রবারের তৈয়ারী টুথব্রাসের দাম বেশী ও সহজ-লভ্য নয়। টুথ ব্রাসের সুবিধা এই যে, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে উহার আঁইসগুলি ঢুকিয়া দন্ত-দ্বয় মধ্যবর্ত্তী খাবারের যে কণাগুলি লাগিয়া থাকে, তাহা বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু সকল টুথব্রাস তাহা করে না; পরন্তু কঠিন হইলে, টুথব্রাস ব্যবহারে অন্ততঃ প্রথম-প্রথম দাঁতের মাড়ি ছড়িয়া যায় ও ফুলিয়া উঠে। বুরুসেও যে কুফল বা সুফল—দাঁতনেও তাই; তবে কিছু কম বেশী। ফল কথা, দাঁতন বা খাঁজকাটা টুথব্রাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা সকলে টুথব্রাসকে ভাল করিয়া পরিষ্কার রাখি না এবং অনেক স্থলে একাধিক লোকে একই টুথব্রাস ব্যবহার করিয়া ভুগিয়াছে,—দেখিয়াছি। (২) দাঁতমাজা সম্বন্ধে নানা রকমের দোষ দেখা যায়। কেহ কেহ নিদ্রাভঙ্গের পরেই দাঁত মাজেন। কেহ কেহ বাসি মুখে চা, পান প্রভৃতি খাইয়া, স্নানের পূর্ব্বে দাঁত মাজেন। কেহ কেহ শুধু আঙ্গুল ঘসিয়াই দাঁত মাজা-কায সাঙ্গ করেন। এ সকল হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দাঁত মাজিবার একটা প্রথা আছে বলিয়াই যেন উহাকে "যেন তেন প্রকারেণ" মাজা হয়—দাঁত মাজার আবশ্যকতা বা উপকারিতা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেই অজ্ঞ। দাঁতকে ভাল রাখিতে হইলে, প্রাতে শয্যাত্যাগের পর একবার এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার ঠিক্ পূর্ব্বেই আর একবার সকলেরই রীতিমত দাঁত মাজা উচিত। ইহা ছাড়া অতি সামান্য কিছু খাইলেও, তৎক্ষণাৎ এবং পানসুপারি খাইবার পরেও খুব ভাল করিয়া 'কুলকুচি' করিয়া মুখ ধোওয়া উচিত।

(৩) খাবারের পরে দুই দাঁতের মাঝে এবং মাড়ি যেখানে দাঁতের গায়ে লাগিয়াছে—এমন যায়গায়, খাবারের কুচি লাগিয়া যায়। এই দুই যায়গা হইতে, নরম খড়িকার কাঠি বা তুলা বা রেসমী সুতার নুটি প্রভৃতি দ্বারা ময়লা বাহির করিয়া ফেলা উচিত। যখনিই কিছু আটকাইবে তখনিই উঠাইয়া ফেলা চাই—নচেৎ পরে তাহার দ্বারা অনিষ্ট হয়। মুখ ধুইবার সময়ে, এই কারণে, যথেষ্ট জল লইয়া বারবার ভাল করিয়া কুলকুচি করা উচিত। কুলকুচি করাটা বাজে কায নয়—উহার উপরে দাঁতের ভাল মন্দ নির্ভর করে। (৪) দাঁত পরিষ্কার রাখিবার আর একটি উৎকৃষ্ট উপায়—প্রত্যেক গ্রাস খুব ভাল করিয়া চর্ব্বণ করা। আহারের সম্বন্ধে নিয়ম এই :—যে জিনিষটিকে আহার করিবে, সেটিকে মুখের মধ্যে যতক্ষণ পার চিবাইবে;—চিবাইতে চিবাইতে, আহার্য্য দ্রব্যটি যতক্ষণ একেবারে এমন তরল হইয়া না পড়ে যে, আর তাহাতে চিবাইবার কিছু পদার্থ থাকে না—বরং চিবাইতে যাইলে, সেটি হঠাৎ হড়াৎ করিয়া গলার নিচে নামিয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিবান চাই। এইরূপ করিয়া চিবাইলে মুখে এত বেশী লালা ক্ষরিত হয় যে, কুলকুচি করিয়া মুখ পরিষ্কার করার সমান কায হয়—খাবারের এমন একটুও কণা থাকে না যাহা কোথাও লাগিয়া থাকিতে পারে। এ কথাটা যাহা বলিলাম, তাহা এতটুকুও অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। যে লোক এইভাবে চিবাইয়া খায়, সে অল্প আহারেই পরিতৃপ্ত হয় এবং তাহার রসনা প্রত্যেক গ্রাসের ষোল আনা রসাস্বাদ করিয়া থাকে। এইরূপে চিবাইয়া খাইলে, তিনটি লাভ আছে।—প্রথমতঃ, খাদ্যের পূর্ণ মাত্রায় রসাস্বাদন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, দাঁতের ফাঁকে বা মাড়ীর গায়ে লাগিতে পারে—এমন খাবারের কুচিটি পর্য্যন্ত থাকে না। তৃতীয়তঃ, খাবার সময়ে ভালরূপ রসাস্বাদন হওয়ায়, খাইবার লালসা কমিয়া আসে—যেটুকু খাওয়া যায় তাহাতেই পরম তৃপ্তি হওয়ায়, অতি ভোজনের আশঙ্কা থাকে না এবং ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল দুইটি কারণ উপস্থিত হইয়া যাহার ফলে তাড়াতাড়ি খাওয়া ভিন্ন ধীরে ধীরে ঘটিয়া উঠে না। প্রথম কারণটি,—কায়ের দ্বিতীয় কারণটি—রন্ধনের দোষ। আমাদের চিরকালই মধ্যাহ্নে, স্বচ্ছন্দ মনে ভোজনের বিধান কিন্তু ইংরাজ এত গোঁড়া যে, এদেশে আসি নিজদেশের আচার ব্যবহার বদলায় নাই—ঠিক বেলাটিই কায কর্ম্মের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া কাযেই স্কুলের ছাত্রই হও আর বিলাতি ঢংয়ের নে অধ্যাপকই হও, চাকুরিজীবীই হও আর স্বাধীন জীবীই হও, ইংরাজের রাজত্বে নাকে-মুখে গুঁজিয়া খাইয়া সকলকেই দৌড়াইতে হয়। কিন্তু ইচ্ছা যে আমরা সময় করিয়া লইতে পারি না, এ কথা বিশ্বাস করি না। এখনকার হিন্দু, ভোজন করা হয় আপদ বালাই বলিয়া মনে করেন, নহে ত ভোগের কায বলিয়া গণনা করেন—কেহই করণে শ্রীভগবানের প্রসাদ গ্রহণরূপ পুণ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবেন না। কাযেই ফলও হাতে মিলিতেছে। তাহার পরে, রন্ধনের কথা। ব্যতীত সকল জীবই বিনা-রন্ধনে ভোজ্যদ্রব্য করে। রন্ধন করিলে, খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত নরম নরম দ্রব্য বেশীক্ষণ চর্ব্বণ করা যায় না, চর্ব্বণের আবশ্যকতাও কমিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে যে সকল আদিম অধিবাসী আছে, কাঁচা মাংস ও কাঁচা ফলমূল-আহারী হইলেও, তাহাদের দাঁত মাজা ও মুখ ধোয়ার অভ্যাস থাকিলেও, তাহাদিগের দাঁত আমাদিগের (সুসভ্য লোকদের) দাঁতের অপেক্ষা অনেক গুণে ও সবল। বোধ হয়, এই কারণেই, এদেশে আমরা সুপারি, দারুচিনি প্রভৃতির মত কঠিন পদার্থের (alkali) গুণযুক্ত চুণ খাইবার প্রথা আছে। আজ পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াই আজ বিলাতী বিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক বার

প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে শক্ত জিনিষ শিক্ষকের সম্মুখে চিবাইতে হয়। এদেশে চাল-কড়াই-মটর চিবানর প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। অথচ আজ বিলাতে সেই জন্যেই তাহারা "কেঁচে গণ্ডুষ করিতেছে"। এদেশে গলা সরু চালের ভাত আর মাছের ঝোল" খাইতে খাইতে আমরা রসাতল-তলাতলে যাইতে বসিয়াছি; বিদেশে "বুকড়ি চাল" একটা বিভীষিকার কথা! তাই কি দাঁত থাকিতে আমরা তাহার মর্য্যাদা বুঝিয়াছি?

চতুর্থ কথা।—মুখ যেন কখনো টকিয়া না যায়। মিষ্ট জিনিষই খাই, আর টক্ জিনিষই খাই,—আমরা যাহা কিছু খাই না কেন, তাহার কণা মুখের ভিতরে থাকিলে ক্রমশঃ তাহা হইতে টকরসের (acid) সৃষ্টি হয়। ভাত, ডাল, আলু, মাছ, মাংস, ডিম, দুধের সর—যাহার যতটুকুও কণা মুখে থাকে, তাহা হইতেই সেখানে অম্লরস উৎপন্ন হয়। দাঁতের পাথরের মত এনামেলে এই অম্লরস লাগিলেই, এনামেল ক্ষয় হইতে থাকে। যেখানে এনামেল একটু ক্ষয়িয়া যায়, সেখানে আর এককোঁটা অম্লরস সঞ্চিত হইলে সেই এনামেল আরোও ক্ষয়িয়া যায়—এই রকমে মাঝে মাঝে বা নিত্য একটু একটু করিয়া ক্ষয়িয়া, এনামেলটির কোনও যায়গা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমশঃ এনামেলের ফুটার ভিতর দিয়া টকরসটুকু ভিতরকার ডেণ্টিনে পৌঁছায় এবং ডেণ্টিন্ ছিদ্র হইলেই, দাঁতের ভিতরকার শাঁসে (pulp) সেই টকরসটুকু গিয়া লাগে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শাঁসের ভিতর স্নায়ু (sensitive nerves) আছে। স্নায়ুর কায, বোধ-উৎপাদন করা। কাযেই—কোন গতিকে দাঁতের শাঁসে সেই অম্লরস পড়িলেই, সেটায় বেদনা অনুভূত হয়—দাঁত কন্‌কন্ করে। দাঁতের শাঁসের স্নায়ু বাহির হইয়া পড়িলে, এমন কি সামান্য একটু ঠাণ্ডা জলপান করিলেও, দাঁত কন্‌কন্ করে। আশা করি, এখন বেশ বুঝা গেল যে, কেমন করিয়া, এককণা ভাত বা তরকারী হইতে একফোঁটা অম্লরস সৃষ্টি হইয়া, চিরকালের মত দাঁতটিকে জখম করিয়া দেয়। অবশ্য এ কার্য্য একদিনে হয় না—বহুকাল ধরিয়া হয়। এই জন্যই, মুখ পরিষ্কার রাখার এত আবশ্যকতা,—মুখ পরিষ্কার রাখিলে মুখে টক্ বা অম্লরস আদতে সঞ্চিত হইতে পায় না। পানে চুণ থাকে; চুণ ক্ষার (alkali) জাতীয়; এই জন্য পান খাইলে মুখ টকিবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু পান খাইয়া মুখ ভাল করিয়া না ধুইয়া ফেলিলে, পানের কণাও পচিয়া ক্রমশঃ টকরসের সৃষ্টি করে। তবে অনবরত পান খাইতে থাকিলে, মুখ টকিয়া যায় না বটে, অপরিষ্কার থাকার ফলে দাঁতের অন্য ব্যারাম হয়। পান বা মুখশুদ্ধি (সুপারি, হরীতকী, এলাইচ, লবঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিলে, মুখে প্রচুর ক্ষার-ধর্ম্মী লালা ক্ষরিত হয়—তাহার ফলে মুখ কুলকুচি করার কায হয় বলিয়া, মুখশুদ্ধির এত আদর। কিন্তু যে মুখশুদ্ধিই ব্যবহার কর না কেন, উহা ব্যবহারের পরেই মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা চাই। নতুবা সারারাত সেই মুখশুদ্ধির কণা পচিয়া টকরসের সৃষ্টি করিবে—সারাদিনে যে কায করিয়াছিল, সারারাত্রে তাহা নষ্ট করিবে।

পঞ্চম কথা।—মুখে জীবাণুর চাষ আবাদ করিও না। দাঁত মাজিবার সময়ে বা অন্য কারণে মাড়ি ছড়িয়া বা ঘষিয়া গেলে, সেই ছড়া মাড়ির ভিতর দিয়া রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে। দাঁতের এনামেলের ফুটা দিয়া দাঁতের শাঁসে পর্য্যন্ত রোগ জীবাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারে। দাঁতের যেখানে মাড়ি লাগিয়াছে, সেখানে উভয়ের মাঝে ফাঁকের মধ্যে খাবারের কণা ঢুকিলে, তদুৎপন্ন অম্লরস ক্রমশঃ নিচের দিকে (দাঁতের গোড়ার দিকে) যায়; সেই পথে রোগ জীবাণুও যাইতে পারে। কাযেই, দাঁত সংহার করিবার জন্য জীবাণুরা ঢুকিবার তিনটি পথ পায়—দাঁতের কোথাও এনামেল বা ডেণ্টিন ভেদ করিয়া ছিদ্র হইলে, দাঁতের মাড়ি ছড়িয়া গেলে, দাঁত ও মাড়ির মাঝখান দিয়া। জীবাণুরা যেখানে খাবার পায় সেইখানেই যাইতে চায়। কাযেই জীবাণুরা ঐ তিনটি পথের একটি কোথাও পথ পাইলে সেইখানে বাসা বাঁধে। দাঁতের যে ছিদ্র-পথ

ধরিয়া জীবাণু প্রবেশ করে, সে যায়গাটা কালো দেখায়—আমরা বলি দাঁতটাতে "পোকা ধরিয়াছে।" অনেকে পয়সা খরচ করিয়া বেদেদের দ্বারা "দাঁতের পোকা" বাহির করাইয়া লয়। বলা বাহুল্য যে, দাঁতের "পোকারা" রোগের জীবাণু—এত ক্ষুদ্র "পোকা" যে তাহাদিগের একলক্ষটি একত্রিত হইলে তবে একটি বিন্দুর মত দেখায়। অথচ বেদেরা জ্যান্ত পোকা দেখাইয়া লোক ভুলাইয়া পয়সা লয়। এখন এই জীবাণুদিগের সম্বন্ধে দু'চার কথা জানা চাই—এবং সামান্য "দাঁতের পোকারূপে" থাকিয়া তাহারা দাঁতের, মুখের ও সারা দেহের কি কি অনিষ্ট করে, তাহা বলিতেছি।

জীবাণু-তত্ত্ব।—জীবাণুরা যেখানেই থাকে সেইখানেই অতিমাত্রায় বংশ বৃদ্ধি করে এবং জীবাণুরা যেখানে বংশ বৃদ্ধি করে। সেখানকার রস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং নিজ দেহ হইতে এক প্রকারের বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করিতে থাকে। কাযেই, এই তিনটি জিনিষের একত্র সমাবেশ আমাদিগের পক্ষে কত অনিষ্টকারক, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে:—অসম্ভব বংশ বৃদ্ধি, আশ্রয়দাতার দেহ রস হইতে আহারের যোগাড় এবং বিনিময়ে নিজেদেরই দেহ হইতে বিষ নিঃসারন। শুধু যদি আশ্রয়-স্থান হইতে জীবাণুরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত থকিত, তাহা হইলে তত ভাবনার কারণ ছিল না। তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানিক অনিষ্ট যথেষ্টই করে—সে ক্ষতি সামান্য নয় বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ক্ষতি করে—তাহাদের বিষ আমাদের রক্তে মিশাইয়া। একটু ভাবিয়া দেখিলে আমরা বেশ দেখিতে পাই যে, নিউমোনিয়া রোগীর বুকের ফুস্‌ফুসে (ফুল্কায়) প্রদাহ হয়,—কিন্তু রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে সেই জীবাণু-জাত বিষ (toxin) কর্ত্তৃক রোগীর হৃৎপিণ্ড বিষাক্ত হইয়া জখম ও দুর্ব্বল হইবার ফলে; প্লেগে কুঁচকিতে ফোঁড়া হয়, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কুঁচ্‌কির ফোড়ার মধ্যে থাকিয়া, জীবাণুরা যে বিষ তৈয়ারী করে, তৎকর্ত্তৃক রোগীর হৃৎপিণ্ড ত্বরিত অতিমাত্রায় দুর্ব্বল হওয়ার ঠেলায় রোগীর প্রাণ যায়; ক্ষয়কাশে ফুস্‌ফুসে ক্ষত ফোঁড়া হয়, কিন্তু সেই ফোঁড়াস্থ জীবাণু-নিঃসৃত বিষের ফলে রোগী মারা পড়ে। এই কথাটি বেশ করিয়া ধারণা করা চাই যে—জীবাণুরা দেহের কোথাও না কোথাও প্রবেশ করিয়া আস্তানা ঠিক করিয়া লয়;—এবং সেই আস্তানার নাম অনুসারে রোগের প্লেগ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি নামকরণ হয় বটে; কিন্তু দেহে যেখানেই রোগজীবাণুরা আশ্রয় লাভ করুক না কেন রক্তের সঙ্গে মিশিয়া সেই বিষ সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে এবং অসলে রোগের জন্য যে ক্ষতি হয় তাহার ফলে না সেইরূপে দেহ বিষাক্ত হওয়ার ফলে, শারীরিক সাধারণ দৌর্ব্বল্য বা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা জন্মিয়া রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত যাইবার সম্ভাবনা ঘটে।

জীবাণু দ্বারা দাঁতের ক্ষতি।—এইবারে মুখা করিয়া জীবাণুরা কোথায় কি করে তাহার বর্ণ করিব। মুখের মধ্যে দাঁত ও মাড়ির কথাই আ বলিব। মাড়ি যদি ছড়িয়া যায়, অথবা মাড়ি কোনও ক্ষত হয়, তবে সেই পথ ধরিয়া অ্যামি (amœba) বা পুঁযজনক ষ্ট্রেপটোককাই (strepto-cocci) জীবাণু তথায় প্রবেশ করে। দাঁত ও মাড়ি সংযোগ-স্থলটি বেশ ফাঁক হইয়া গেলে,সেখা দিয়াও ঐ জীবাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারে। পথ দিয়াই জীবাণু প্রবেশ করুক, সে তথায় যাইয়া জন্মাইতে থাকে। ঐ পুঁয দাঁত ও দাঁতের মাড়ি—এ দুইয়ের মাঝে জমে এবং তথা হইতে গায়ে ব নানা রকমের পীড়ার সৃষ্টি করে। দাঁতের মা উপরে সামান্য চাপ দিয়া দাঁতের এনামেলের দি ঠেলিলে, দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থল পুঁয বাহির হয়। এই ব্যারামকেই পাইয়োরি এল্‌ভিওলেরিস্ (Pyorrhœa Alveolaris) বলে আমাশয়, পুরাতন গ্রহণী, অজীর্ণ, বাত প্রভৃতি পাইয়োরিয়া হইতেই আরম্ভ হয়।

আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, কেমন ক অম্লরসের ফলে দাঁতের এনামেল ক্ষয় হইয়া,

দাতের শাঁস পর্য্যন্ত একটি ফুটার সৃষ্টি হয়। দাঁত হইলেই, তথায় জীবাণুরা উপস্থিত হয় এবং সেই ছিদ্র ধরিয়া দাঁতের ভিতর পর্য্যন্ত পৌছায়। দাঁতের বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু দাঁতের নিবেশ সম্বন্ধে কোনও কথা বলি নাই। (৩ নং ছবি দেখ) আমাদের দুই পাটি চোয়াল আছে, তাহাতে ষোল ষোল করিয়া বত্রিশটি গর্ত্ত (alveolus) আছে। এক একটি গর্ত্তমধ্যে একটি করিয়া দাঁত বসান থাকে। প্রত্যেক দাঁতের শিকড় (root) দিয়া, শিরা, (artery) ধমনী (veins), স্নায়ু (nerves) ও লসিকা রসবাহী শিরা (lymphatics) দাঁতের ভিতরে গিয়াছে। দাঁতের চারিদিকে এক প্রকারের সূক্ষ্ম ও শক্ত আবরক তন্তু থাকে, তাহাকে Peri-odontal membrane বা দন্তাবরক বলা যায়—ইহাই প্রকৃতপক্ষে চোয়ালের মধ্যে—দাঁতের ঘরের ভিতরে দাঁতটিকে আটকাইয়া রাখে।

এখন বেশ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, দাঁত ও মাড়ি—এই দুইয়ের ফাঁক দিয়া অথবা দাঁতের পাথরের মত এনামেলের গা ভেদ করিয়া যদি কোনও জীবাণু প্রবেশ করে, তবে সে কি করিতে পারে? সেরূপ হওয়ার এই এই ফল:—

(১) দাঁত ও দাঁতের মাড়ির মাঝে পুঁয নির্গত হওয়া। (২) দাঁতের শাঁসের ভিতরে কন্‌কনানি সৃষ্টি হওয়া। (৩) দাঁতের শাঁস ভেদ করিয়া, চোয়ালের যে গর্ত্তে দাঁতটি বসান আছে, সেখানে পুঁয সৃষ্টি করিয়া, দাঁতের গোড়ায় স্ফোটক উৎপাদন করা। (৪) অল্প অল্প করিয়া জীবাণুজাত বিষ দাঁতের শাঁসের লসিকা দ্বারা সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়া।

দাঁতের দোষে মারাত্মক ব্যায়রামের সৃষ্টি।—এবার, দুই এক কথায়, এইগুলির গুরুত্ব বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ, দাঁতের ও মাড়ির মাঝে যখন-তখন সামান্য পুঁয জমিলে, তাহার দরুণ রোগী কোনও যন্ত্রণা না পাইলেও হইতে পারে; কিন্তু সে যখনই কিছু খায়, প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে ঐ পুঁয তাহার উদরস্থ হয়। এইরূপ হওয়ার ফলে, ডিস্‌পেপসিয়া, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি হয়। এবং এইখান দিয়া, ক্রমাগত, এইরূপ ভাবে পুঁয উদরস্থ হওয়ার ফলে, সে ব্যক্তির শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ হয়—এবং এই রকম লোকেই সহজে ক্ষয়কাশ পীড়ায় অভিভূত হয়। দাঁতের মাড়ির ফাঁকে পুঁয জমিয়াই হউক, অথবা দাঁতের শাঁস ভেদ করিয়া দাঁতের লসিকা শিরা দ্বারা রক্তে শোষিত হইয়াই হউক—রক্তে ক্রমাগত পুঁয বা জীবাণুঘটিত বিষ যাইবার ফলে—হৃৎপিণ্ডের দোষ, বাত, অজীর্ণ প্রভৃতি হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি অত্যন্ত রোগপ্রবণ হয়—বিশেষ করিয়া বুকের রোগের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। চোয়ালের মধ্যে দাঁতের জন্য যে ছোট ছোট বত্রিশটা গর্ত্ত আছে, তাহারই মধ্যে দাঁতগুলি বসান থাকে—অর্থাৎ সেখানে বাড়্‌তি যায়গা এতটুকু নাই; এইজন্য, দাঁতের শিকড় ভেদ করিয়া চোয়ালের গর্ত্তে পুঁয আসিলে, সেখানে অত্যন্ত ঠাসাঠাসি হয়—কাযেই দাঁতের যন্ত্রণায় রোগী পাগল হইয়া পড়ে। এই যায়গায় পুঁয হইলে, যদি মাড়ি ভেদ করিয়া পুঁয বাহির হইতে পারে, তবেই রোগীর নিষ্কৃতি—নতুবা গাল ভেদ করিয়া বাহিরের দিকে গর্ত্ত করিয়াও পুঁয বাহির হয়। যদি সহজে সে পুঁয বন্ধ হয় ত—রক্ষা; নতুবা চোয়ালের যে গর্ত্তে পুঁয হইয়াছিল সেই গর্ত্তের প্রাচীরের মরা হাড়টুকু যতদিন না গলিয়া পুঁযের সঙ্গে বাহির হয়, ততদিনই গালে শোষ হইয়া থাকে। এরূপ বেশী দিন থাকিলে, গলার বীচি ফুলে ও হয় ত ক্রমশঃ পাকিয়া উঠে।

অতএব বেশ বুঝা গেল, সামান্যরূপে মুখ অপরিষ্কার রাখার ততটা কুফল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—মুখ অপরিষ্কার থাকে কি কি কারণে?—শাক সব্জী, ফল মূল, চাল ডাল খাইলে মুখে অম্লের সৃষ্টি হয় এবং অনবরত মিষ্ট দ্রব্য বা অত্যন্ত টক্ জিনিষ খাইলে মুখে অম্লরসের বাহুল্য হয়। খুব বেশী সিদ্ধ করিয়া রাঁধিলে ভাল করিয়া না চিবানর জন্য, খাদ্য-কণা মুখের মধ্যে দাঁতের ফাঁকে রহিয়া যায়। যাহারা ভাল করিয়া মুখ ধোয় না বা দাঁত মাজে না, তাহাদিগেরও মুখ

অপরিষ্কার থাকে। মুখ হাঁ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেও মুখের মধ্যে রাশি রাশি জীবাণু ঢোকে।

আমাদিগের কর্ত্তব্য :—এখানে কর্ত্তব্য কি ?

প্রথম কর্ত্তব্য।—দাঁত পরিষ্কার রাখিবে। দাঁতের সকল পিঠই ঘষিয়া মাজিবে—যতবার কিছু খাইবে ততবার সযত্নে মুখ ধুইবে। পান, দোক্তা, "সুখা", "খৈনি", জরদা, সূর্ত্তি প্রভৃতি ত্যাগ করিবে।

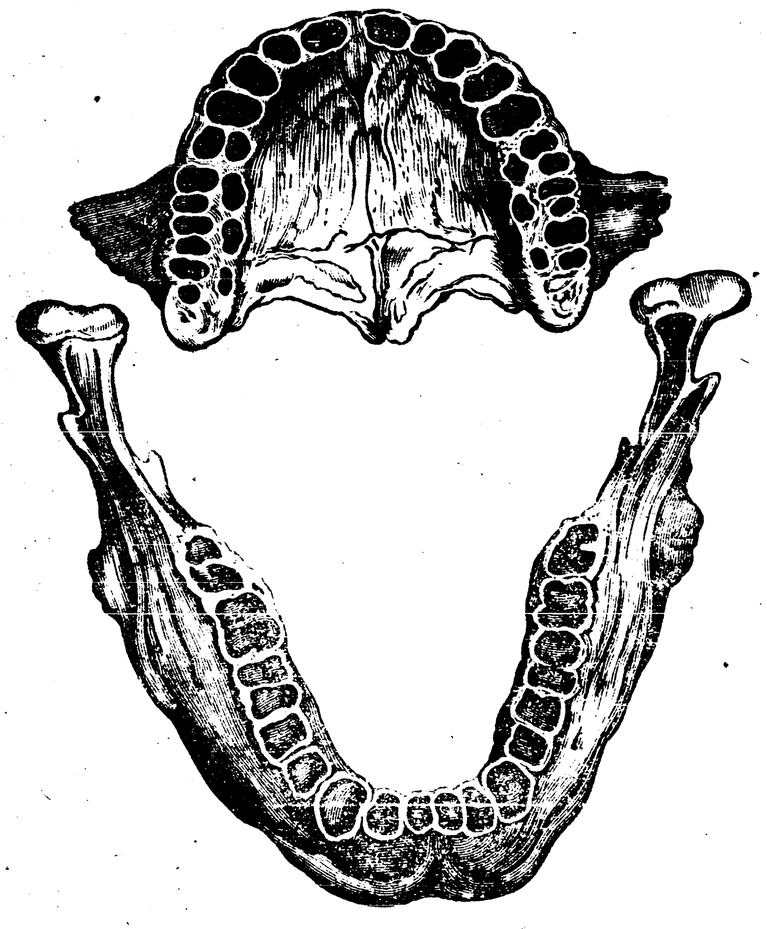

উপরের ও নিচের পাটির চোয়ালের মধ্যে বত্রিশটি দাঁতের বত্রিশটি ঘর।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।—খুব নরম কোন জিনিষ প্রত্যহ খাইবে না। সুপারি, চাল-কড়াই প্রভৃতি চিবানর অভ্যাস রাখিবে।

তৃতীয় কর্ত্তব্য।—মিষ্টান্ন কম খাইবে। খাইয়াই খুব ভাল করিয়া মুখ ধুইবে।

চতুর্থ কর্ত্তব্য।—সময়ে, সহজপাচ্য, সুখাদ্য খাইবে; পরিশ্রম রীতিমত করিবে; মুক্ত বায়ু নিত্য সেবন করিবে—অর্থাৎ সর্ব্বদা শরীর পালনে যত্নবান্ হইবে।

পঞ্চম কর্ত্তব্য।—কখনো মুখ হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবে না।

ষষ্ঠ কর্ত্তব্য।—দাঁতের কোথাও ব্যথা হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করাইবে।

এদেশের লোকের ব্যবহারের জন্য টিংচার আইয়োডিন খুব ভাল। ইহা সহজ প্রাপ্য ও সুলভ। কয়েক ফোঁটা জলে গুলিয়া কুল্লি করিলে, এবং যে দাঁতে ব্যথা, সেই দাঁতের যেখানে কাল দাগ হইয়াছে সেইখানে, দাঁত ও মাড়ির সংযোগ স্থলে, এই দুই যায়গায় টিংচার আইয়োডিন লাগাইলে, অনেক সময়ে অতি সহজেই দাঁতের রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। এই ঔষধ দু-দশ ফোঁটা পেটে গেলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

কচি ছেলেরা অতি অল্প বয়স হইতেই দাঁত মাজিতে আরম্ভ করিবে। যাহাদের অত্যন্ত মিষ্ট খাওয়া অভ্যাস, তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বা প্রত্যহ সোডা বাই-কার্ব্বনেটের কুল্লি করাইলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। পান, দোক্তা, চুরুট ও তামাকে—দাঁতের শূলব্যথায় সাময়িক উপকার হইলেও, আখেরে তাহাদের দ্বারা দাঁতের অপকারই বেশী হইয়া থাকে।

[এই প্রবন্ধ পাঠকালে, আমার লিখিত "জীবাণু রহস্য" নামে যে প্রবন্ধ চতুষ্টয় ১৩২৮ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে, এবং ১৩২৯ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যত্ন করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য।]

ধূমপান—(তামাক)।

লেখক—শ্রীচক্রধর সাহা।

আলস্য, অজ্ঞানতা ও ব্যসনপ্রিয়তার সঙ্গে বৈদেশিক ব্যবসাদারের বিষাক্ত প্রলোভনের সংমিশ্রণে সুরাপান আমাদের দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এতাধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, সেই স্রোতের সত্বর প্রতিরোধ করিতে না পারিলে এই দুর্দ্দিনে দেশের বহু লোকের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুর্গতির একশেষ হইবে। কিন্তু ধন্য মহাত্মার যাদুকর মন্ত্র। যাহার প্রথম উচ্চারণেই সমাজের নিম্নতম স্তরে উহার প্রভাব এমনি তড়িদ্বেগে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে, নিতান্ত পানাসক্ত মেথর, ধাঙ্গড়, কুলী মজুর প্রভৃতি প্রতিজ্ঞা করিয়া এক মুহূর্ত্তে জীবনগত অভ্যাস দূরে পরিহার পূর্ব্বক মহাত্মার কল্যাণপ্রদ পতাকা তলে সমবেত হইতেছে। মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতি উগ্র মাদক সেবনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া যে জাতির নিরক্ষর শ্রেণী একদিনে পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করিতে পারে, সে জাতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুগ্র নেশার দাসত্ব পরিত্যাগ করা যে অতীব সহজ ও সম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই আজ অন্য সকল মাদকদ্রব্যের ছাড়িয়া আমাদের দেশব্যাপী তাম্রকুট-ধূমপানের অভ্যাস সম্বন্ধে দুই চারিটী কথার উল্লেখ করিয়া ইহার সম্যক্ পরিহার সম্বন্ধে আলোচনায় শিক্ষিত সুধীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

যদিও তামাক খাওয়াটা আমাদের দেশে প্রায় সোণে যোল আনা লোকের মধ্যেই প্রচলিত এবং কেহই ইহাকে তেমন ক্ষতিজনক মনে করে না, কিন্তু ইহার অনিষ্টকারিতা কোন দিক দিয়াই তুচ্ছ মনে করা চলে না। শারীরিক স্বাস্থ্যহানি ইহাতে যতদূর হয় তাহা শরীরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাতে উপকারের কিছুমাত্র সম্ভাবনা তো নাই-ই; বরং শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিশেষ বিশেষ যন্ত্রে ইহার ব্যবহার হইতে এরূপ বিষক্রিয়া ও আবর্জ্জনার সঞ্চার হয়, যে তাহা ভাবিলে উহার ক্ষণিক নেশার সাময়িক সুবিধাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসু বলেন "যে কোন আকারে তামাক ব্যবহৃত হউক না কেন, উহা বিষাক্ত পদার্থ। তামাকের মধ্যে নিকোটিন (Nicotine) নামক একটী তরল প্রবল বিষধর্ম্মযুক্ত পদার্থ আছে। ইহার একবিন্দু মাত্র উদরস্থ হইলে প্রাণ হানি হইবার সম্ভাবনা।" পরিশ্রম করিয়া তামাক খাইতে না পাইলে তামাকে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের যে একটা বিশেষ অস্বস্তি বোধ হয়, তাহা কেবলই তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসের ফল। তামাক যে একটী মাদক দ্রব্য তাহাও এই বিষয় হইতেই সহজে প্রমাণিত হয়। শ্রমজীবীদিগের মধ্যে তামাক খাওয়ার অভ্যাসের ইহাই একমাত্র সমর্থন-যোগ্য কথা হইলেও, সংযত-চিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে এ যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই। যাঁহারা কেবল মানসিক পরিশ্রম করেন, সেরূপ ভদ্রলোকের পক্ষে যে তামাক খাওয়ার অভ্যাস দোষ ভিন্ন আর কিছুমাত্র ফলপ্রদ বা সুবিধার বিষয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন ভদ্রগৃহে ও ভদ্র সমাজে তামাক খাওয়া কেবল একটা ব্যসন বা বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিবার কোনও হেতু নাই।

অনেকে বলেন, গৃহাগত অতিথি বা আত্মীয় স্বজনদের অভ্যর্থনা ও প্রীতিদান জন্য আমাদের দেশে তামাক একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। যেন কোন আপনার লোক বা অতিথি বাড়ীতে আসিলে, সময়োচিত জলযোগ ও আহারাদির ব্যবস্থা করিলেও, তামাকের অভাবে সে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়! অথবা প্রতিবেশী বা দূরস্থ অথবা নিকটস্থ কেহ গৃহে উপস্থিত হইলে, একটা কিছু খাইতে বা পান করিতে

না দিলেই যেন অভদ্রতা হয়! সেই অভদ্রতার নিরসন জন্য দুই চারিবার "তামাক দে রে" না বলিলে যেন কতই অসৌজন্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে, বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, এমনও হইয়া থাকে যে, তামাকের জন্য ভৃত্যকে ফাঁকা আহ্বান করিয়াও সৌজন্য সম্বন্ধে বেশ একটা কপটতার চাল দেওয়া হয়। এ সমস্তই যে দেশের নৈতিক আদর্শের পক্ষেও একটা খুব বিকৃত চিত্র ও কলঙ্ক, তাহাও বলা বাহুল্য। এ সমস্ত যে দেশব্যাপী বহুকালের কু-অভ্যাসের ফল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ বা মত ভেদ হইতে পারে না। একটা মাদক দ্রব্যে ভদ্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা কি ভদ্রতার অপপ্রয়োগ নহে? যদি আমার গৃহের কাহারও তামাক খাওয়ার অভ্যাস না থাকে, ও সেই জন্য গৃহে উহার উপকরণ হুকা কল্কি ও তামাক প্রভৃতি কিছু না থাকে, তখন একজন তামাকসেবী আগন্তুক গৃহে আসিলে উভয় পক্ষেরই যে কত অসুবিধা ঘটে, তাহা তো আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমি যেমন সেই আগন্তুকের নেশার বস্তু না যোগাইতে পারিয়া তাহার বিরাগভাজন ও লজ্জিত হইব, তৎসঙ্গে সেই আগন্তুকের নেশার বশ্যতাও তাহাকে তখন এমনি অভিভূত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিবে যে, কোন প্রকারে ছুটিয়া গিয়া নিকটস্থ কোন তামাকের আড্ডায় উপস্থিত হওয়াই তাহার একমাত্র চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হইবে! কেবল একটা অনাবশ্যক নেশার বন্ধন ও খাতিরেই যে এইরূপে ও অন্য নানা প্রকারে লোকের কত মনঃপীড়া, অসুবিধা ও কার্য্যহানি ঘটিয়া থাকে, তাহা একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই অতি সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অন্য সকল দিক ছাড়িয়া দিয়া, তামাক খাওয়ার যে ব্যয়টা আপামর সাধারণ লোক বহন করিয়া থাকে, কেবল তাহাই ভাবিয়া দেখিলে, এই দুর্দ্দিনে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে এ অভ্যাস পরিত্যাগের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইবে। এমন কোন গরিব লোক নাই যে, তামাকের জন্য মাসে তাহার অন্ততঃ দুই চারি-আনা পয়সা [illegible] না হয়। আহারের জন্য কুড়ি টাকা ব্যয়ের [illegible] নেশার জন্য কুড়ি পয়সা ব্যয়ও যে অপব্যয় ও অক[illegible] তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? সমগ্র দেশে [illegible] তামাক খাওয়ার জন্য যে অর্থ প্রতি বর্ষে ব্য[illegible] তাহার পরিমাণ ভাবিলে এই অর্থকৃচ্ছ্রতার দি[illegible] স্তম্ভিত হইতে হয় না কি? যে জাতি সকল প্র[illegible] দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসী, তা[illegible] পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সামাজিক বন্ধন ছেদে[illegible] চেষ্টায় বিমুখতা নিতান্তই হাস্যজনক বিষয় নহে কি? যদি আমরা প্রত্যেক লোকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই [illegible] এই তামাকের নেশা ও তজ্জন্য ব্যয়টা আমরা ছাড়ি[illegible] তবে ইহা তৎক্ষণাৎ ছাড়িতে কোন ক্ষতি বা দুঃখ[illegible] হইবেই না। বরং আমরা একটা অতি নো[illegible] ও কদর্য্য দ্রব্যের সংশ্রব হইতে আমাদের অন্তর[illegible] বহিরিন্দ্রিয় বিশেষকে নির্ম্মুক্ত করিতে, পারি[illegible] আত্মশ্লাঘাই আসিবে। ত্যাগের অভ্যাসে অভ্যস্ত হই[illegible] ও ত্যাগের শুভ ফললাভ করিয়া, একদিকে আম[illegible] যেমন ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত ও ধন্য হইব, অ[illegible] দিকে তেমনি উত্তরোত্তর অধিকতর কঠোর সাধনায় সি[illegible] লাভের সোপান প্রাপ্ত হইব। আমাদের প্রত্যা[illegible] স্বরাজ লাভের পক্ষে ইহাও একটী সোপান তুল্য হইবে[illegible] মহাত্মার মুখের বা লেখনীর এক অক্ষর দ্বারাই আ[illegible] এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। দিনের পর দি[illegible] দেশের যে ঘোর সমস্যা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে [illegible] কোন ক্ষুদ্র বা নগণ্য কু-অভ্যাসকেও প্রশ্রয় দেওয়া [illegible] আমাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে। যখনি যে ব্যক্তি[illegible] যাহা ঠিক বলিয়া মনে করিবেন তাই কার্য্যে পরিণ[illegible] করিতে চেষ্টা করা এখন সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

তামাক খাওয়ার প্রত্যক্ষ অহিত ব্যতীত আনুষঙ্গিক অনিষ্টও কম নহে। অনেক সময় একটান তামাকের লোভে লোক নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজেরও সময় ও সুযোগ হারাইয়া ফেলে। হয় তো তামাকের আশা[illegible] বসিয়া থাকাতে, অথবা সেই গোলযোগে ভুলিয়া [illegible]

[illegible]তে, খেয়া নৌকা ছাড়িয়া গেল, ট্রেণ বা ষ্টীমার [illegible] গেল। অনেকে গুরু ভোজনের পরে উপবেশনে [illegible] হইয়া শয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক তামাকের মাধুর্য্য [illegible]দন করিতে করিতে নিদ্রার ছলনায় মশারি, [illegible] কিম্বা ঘর বাড়ী ও পাড়া শুদ্ধ পোড়াইয়া দেন। [illegible] তামাক খাওয়ার জন্যই আগুনের হাঁড়ি ঘরে [illegible]তে হয়। পল্লী অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁচা [illegible] কাঁচা চাল ও কাঁচা দেয়াল। বাঁশের দরজা বা [illegible]কাঠির বেড়া গরিবের কুটীরে পনর আনা স্থলে [illegible]। এই সব গৃহের অগ্নিকাণ্ড প্রায়ই তামাক [illegible]র আনুষঙ্গিক ব্যাপার।

[illegible] গরিবের গৃহ-প্রাঙ্গণে দুই চারিটী শাক-সব্জীর [illegible] করিলে অনায়াসে সদ্যোজাত তরকারী খাইয়া [illegible]পুষ্টি ও শরীর সুস্থ হওয়ার আশা ছিল, সেখানে [illegible]গুলি তামাকের গাছ রোপণ করিয়া তাহার [illegible] দ্বারা স্বাস্থ্য নাশ ও একটা নেশার বিস্তারে [illegible]তা করা হইতেছে।

[illegible]ণী গৃহে তামাক খাওয়ার উপকরণ ও ব্যয় এবং [illegible] ভৃত্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ কত যে বাজে খরচ ও [illegible] দ্রব্যাদির প্রয়োজন, তাহা সকলেই জানে। [illegible]নুসারে কত প্রকার সোণা রূপা, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও [illegible] পশমের হুঁকা কল্কি নল প্রভৃতি ও কত মূল্যবান [illegible]যুক্ত সুগন্ধী তামাকের ব্যবহার হেতু প্রতিদিন [illegible] ঘটা হইয়া থাকে, তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞান অনেক [illegible] লোকেরই আছে। মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়-[illegible] ভদ্র ঘরেও এই সব দ্রব্য সম্ভারের ক্রয় ও [illegible]বারের নিমিত্ত বেশ এক শ্রেণীর ব্যয়ের বরাদ্দ [illegible]ছে। স্বচ্ছল অবস্থার লোক ব্যতীত, যাহাদের [illegible]জনের দ্বারা অতি কষ্টে সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, [illegible]রেও অশন বসন শিক্ষা চিকিৎসাদির ব্যয়ের [illegible]মাক খাওয়ার ব্যয়টা বহু কষ্টে বহন করিবার [illegible] পাকিয়া গিয়াছে, গরিব লোকের তো কথাই [illegible] কৃষক শ্রেণীর বালক বৃদ্ধ যুবা নির্ব্বিশেষে [illegible] দিন রাত্রি এই তামাকের ধূম পানে এতই অভ্যস্ত, যেন ইহার সাহায্য ব্যতীত তাহাদের এক দিনও চলে না। যাহার ঘরে পর্য্যাপ্ত ধান চাউল ও টাকা কড়ি আছে, তাহার তো কথাই নাই। কিন্তু যে দিন-মজুর চারি গণ্ডা পয়সার জন্য সারাদিন পরের দ্বারে খাটিয়া খায়, তাহারও দুই এক পয়সার তামাক না হইলে দিন চলে না। এ বিষয়ে অভাব বোধ বা স্বভাবের দোষে চুরি পর্য্যন্তও সে স্থলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সত্য বটে প্রতিবেশীর মধ্যে কেহ কাহারও গৃহে উপস্থিত হইলে, এই তামাক খাওয়ার নামে একটা অভ্যর্থনার সুযোগ ঘটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের অধিকাংশ লোকই জানে না যে, এই বিকৃত অভ্যর্থনার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের কত অনিষ্ট তাহারা করিয়া থাকে। নৈতিক অবনতি এতদূর হয় যে, যে লোক কোন গৃহের জল স্পর্শ করিতে নারাজ, এক কলকি তামাক চাহিয়া খাইতে তাহারও সঙ্কোচ নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেখানে কেহ তামাক খাইতেছে, সেখানে রাস্তার লোক বিনা আহ্বানে, বিনা প্রয়োজনে কেবল অভ্যাস দোষে অম্লান মুখে সমীপস্থ হইয়া ঐ হুকার প্রসাদ প্রাপ্তির জন্য সতৃষ্ণ নেত্রে উপবেশন করে। তখন গৃহ-স্বামীর মনের অবস্থাও কেহ লক্ষ্য করে না যে, এই অনাহূত অতিথির সৎকারে তাহার মনে কতটা আনন্দ বা বিরক্তির উদয় হয়।

কিন্তু হায়! ইহার ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা এতাধিক ও তাহাদের মোহ ও ব্যূহ এত অভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য যে মুষ্টিমেয় প্রতিবাদকারীর ক্ষীণ কণ্ঠ ও দুর্ব্বল লেখনী এ সংগ্রামে নিতান্তই নগণ্য। অপর সাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শিক্ষিত চিন্তাশীল ও সহৃদয় ব্যক্তিরা যদি একটু অকপট যত্ন করেন, তবে একদিনে না হইলেও ক্রমশঃ এই পাপ ব্যাধি সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারে। এটী তো একটী লোভনীয় মিষ্ট খাদ্য বা আরামপ্রদ পানীয় নহে। বরং একটী অতি কদর্য্য ও ন্যাকারজনক বিষাক্ত দ্রব্য

শারীর সৌন্দর্য্য।

স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য। তিষ্ঠ পাঠক! কথাটা ভাবিয়া, বুঝিয়া দেখ। পুরুষের স্বাস্থ্য, বা স্বাস্থ্যবান পুরুষ, বলবীর্য্যসম্পন্ন বীরপুরুষ,—কথাগুলি শুনিতে বেশ। কিন্তু সুস্থকায়া, বলশালিনী স্ত্রীলোক—কথাটি আরও সুন্দর। কারণ, স্ত্রীজাতি যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জননী! কিন্তু এমনই অবস্থা, যে, জাতির সকলেই কেবল পুরুষের স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, সৌভাগ্য, সম্পদ, সুবিধা, অসুবিধার কথা লইয়াই ব্যস্ত। পুরুষজাতি কিসে সুখে, ভোগ বিলাসে থাকিবে, সংসারের সকল প্রকার কাম্য বস্তু লাভ করিবে ও উপভোগ করিবে, তাহাই স্ত্রী-পুরুষ—সকলেরই চিন্তার বিষয়। সামাজিক আচার, ব্যবহার, প্রথা—সকলই পুরুষের সুখের জন্য। পুরুষজাতির পান হইতে চূণটি খসিলেই আর রক্ষা নাই—একেবারে হুলস্থূল ব্যাপার। কিন্তু মাতৃজাতি, নারীজাতি, বীর-প্রসবিনী স্ত্রীজাতির কথা চিন্তা করিবার কেহ নাই। স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, নচেৎ, সন্তান যে দুর্ব্বল, রুগ্ন, ক্ষণজীবী হইবে, তাহা উপলব্ধি করাও যেন নিষ্প্রয়োজন।

পিতা সন্তানের জন্ম দেন বটে, তিনি সুস্থকায় না হইলে সন্তানও যে সুস্থ দেহে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না তাহাও সত্য বটে, কিন্তু জননী গর্ভধারণ করিবার পর, সুস্থ, নির্দ্দোষ বীজ গ্রহণ করিবার পর, দশ মাস দশ দিন ধরিয়া স্বীয় শোণিতের সারাংশ দিয়া সেই বীজকে পোষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার শরীর সুস্থ না থাকিলে সুস্থকায় সন্তান প্রসূত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বীজ উত্তম হইলেও যেমন ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি না থাকিলে সতেজ বৃক্ষ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না, জননী সুস্থ না থাকিলে, সন্তানও সেইরূপ সুস্থ দেহে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে না। জনক সুস্থ বলবীর্য্য সম্পন্ন হইলেও, রুগ্না নারীতে সন্তান উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিলে, গর্ভপাত বা অকাল প্রসব অথবা মৃত সন্তান প্রসূত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। পক্ষান্তরে, জননী যদি সুস্থকায়া হন, তিনি যদি জনকের ন্যায় বলবীর্য্য তেজশালিনী হন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানও যে বলবীর্য্যসম্পন্ন হইবে, ইহাত স্বতঃসিদ্ধ কথা। বস্তুতঃ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মতে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের দৈহিক পুষ্টি পরিণতি ও উন্নতি জননীর উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। নিকৃষ্ট জীব জন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতির বংশ রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই সত্যটি সহজেই উপলব্ধ হইবে। এই বিষয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণী জীবজন্তু ও উদ্ভিদ যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ও নিয়ম কানুনের অধীন, মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ হইলেও, সেও সেই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ও নিয়মকানুনের অধীন। জীব বলিয়াই মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। বিবর্ত্তনবাদের নিয়মের ব্যভিচার ঘটাইলে অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় মানবেরও দৈহিক অবনতি ঘটিবেই। এই কারণেই, এক এক শ্রেণীর পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এক এক সম্প্রদায়ের এক এক জাতীয় মানুষেরও তেমনি অস্তিত্ব লোপ হইতেছে। Survival of the fittest বা যোগ্যতমের উর্দ্ধর্ত্তন প্রকৃতিরই নিয়ম। এই নিয়মেই মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীবাণু রাজ্যেরও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়েরই স্বাস্থ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলে, আদর্শ সন্তান প্রজননের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সভ্য মানব কেবল পুরুষ জাতির স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছে; স্ত্রীলোক ক্ষীণকায়া, রুগ্না হইলেও তাহার গর্ভ উৎপাদন করিতে কেহ ইতস্ততঃ করেন না; সেই গর্ভের পরিণামে যে কিরূপ রুগ্ন সন্তান প্রসূত হইতে পারে, তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। কিন্তু প্রাচীন স্পার্টান জাতি প্রকৃতির এই নিয়মটির মর্ম্ম উত্তমরূপে উপলব্ধ করিয়াছিল। তাই সুস্থ, বলবীর্য্যসম্পন্না নারী ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোককে স্পার্টানরা বিবাহ করিত না, বা এরূপ পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিত না। এবং রুগ্ন সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে, সন্তান-বাৎসল্য বিসর্জ্জন দিয়া, রুগ্ন সন্তানকে পর্ব্বত শিখরে মাংসাশী পক্ষীগণের আহারার্থ নিক্ষেপ করিয়া আসিত।

জাতিকে যদি বলবীর্য্য-সম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, জীবন-সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের কি চাই? কোন্ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? তাহাই আজ সভ্য জগতের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছে, অনেক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে, অনেক ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিয়াছে, জাতির কোন্ কোন্ স্থানে কি কি ত্রুটি আছে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। কি বিজেতা, কি বিজিত, উভয় পক্ষই উত্তমরূপে নিজ নিজ জাতীয় দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, ক্ষত—সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে। তাই পৃথিবীর প্রায় জাতিসমূহ ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে নূতন আদর্শ জাতিতে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কি এই শুভক্ষণে নিদ্রিত থাকিব?

এখন আমরা কি চাই? আমরা চাই সুমাতা। স্বাস্থ্য, বল, বীর্য্য সম্পন্না জননী। জননীর দেহ সুস্থ না থাকিলে, পিতার বীজ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সুস্থ-দেহ সন্তান লাভের আশা নাই। জননীর দেহের শোণিত লইয়া যে বীজ পুষ্ট ও ভ্রূণে পরিণত হয়, সেই জননীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, তাহার শোণিতও কি দূষিত হইবে না? এবং সেই শোণিত হইতে যে ভ্রূণ দেহের পুষ্টি ও পরিণতি ঘটিবে, সেই সন্তান কি সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করেন? সেইরূপ, জননী যদি বলবীর্য্য সম্পন্না হ'ন, তাহা হইলে, সন্তানও কি সুস্থ ও সবল হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে না? অতএব, বলবীর্য্য-সম্পন্ন সুস্থকায় সন্তান লাভ করিতে হইলে জননীর দেহকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক শিশুরই,—কি পুত্র, কি কন্যা,—সুস্থ দেহে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্মগত অধিকার আছে। সৃষ্টিকর্ত্তাও এমনই সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সন্তান দুর্ব্বল হয়। সন্তানের দৌর্ব্বল্য, অসুস্থতা, রুগ্ন অবস্থা জনক জননীর দোষেই ঘটিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া জননীর অসুস্থ অবস্থাই সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। সুতরাং জননী—মাতৃজাতিই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্যলাভের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। দৈহিক স্বাস্থ্য ও পরিণতি, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতিরই অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয়। শিশু জন্মের সংখ্যাধিক্য,—লোক সংখ্যা বৃদ্ধিই জাতির মঙ্গলের জন্য একমাত্র কাম্য নহে। চাই সুস্থ, সবল, দৃঢ়কায়, বীর্য্যবান্ সন্তান। তা' তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও ক্ষতি নাই। বহু সন্তানের জননীত্ব লাভই শ্রেষ্ঠতম গৌরবের বিষয় নহে। সন্তান-সংখ্যা অল্প হইলেও, তাহারা যদি নীরোগ, সবল, দীর্ঘজীবী, বীর্য্যবান্ হয়, তাহাই অধিকতর গৌরবের বিষয়। অতএব আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়—বংশধরগণের প্রসূতিগণের—জননীগণের স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা। সামাজিক বলুন, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বলুন, লোক ব্যবহার সম্বন্ধীয় বলুন—যেরূপ ব্যবস্থা করিলে আমাদের জননীদের দৈহিক উন্নতি ঘটিতে পারে, তাহাই আমাদিকে সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বন করিতে হইবে। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অতঃপর আমাদের সামাজিক, ব্যবহারিক, লৌকিক, ঐহিক, পারলৌকিক সকল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বিবাহ।—উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লোক-সৃষ্টির জন্য নর নারী উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। মানব-জীবনে বিবাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। অনেক দিক

ভাবিয়া, অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়। বিবাহের উপর জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে। বিবাহের উপর যখন সমাজের (Community) মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে, তখন প্রত্যেক বিবাহের বিষয়ে সমাজের ভালমন্দ দেখিবার অধিকার আছে এবং থাকাও কর্ত্তব্য। আমাদের সমাজের একটা নিয়ম এই যে, পুত্র কন্যা উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে। এই বয়স ছাড়া ছেলে মেয়ের বিবাহ দিবার সময় আর কোন বিষয় বড় একটা বিবেচনা করিয়া দেখা হয় না। সন্তানকে, বিশেষতঃ কন্যাসন্তানকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া সংসারী করিয়া দেওয়া এদেশে পিতা মাতার একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই; এবং এক্ষেত্রে আর কোন বিষয় দেখিবার দরকার নাই; পুত্র কন্যার শারীরিক অবস্থা এত বড় একটা গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কি না তাহাও বিবেচনা করা অনাবশ্যক! কন্যা কাণা হউক খোঁড়া হউক, ক্ষীণ-দৃষ্টি হউক, চিররুগ্ন হউক, ক্ষয়কাশ-গ্রস্তা হউক,—বিবাহ তাহার দিতেই হইবে—নহিলে জাতি যাইবে। তার পর তাহার যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাও চিররুগ্ন হইলেও কোন ক্ষতি নাই। তাহাদেরও আবার যথা সময়ে বিবাহ হইবে, সন্তানাদিও হইবে। এইরূপে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। হউক তাহা, তথাপি বিবাহটা দেওয়া চাইই চাই। নহিলে যে জাতি যায়!

কিন্তু হিসাবমত, পীড়িত, রুগ্ন সন্তানের বিবাহ দেওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। শরীরে কোন প্রকার রোগ থাকিলে, পুত্র-কন্যা বিবাহিত হইবার, সন্তানের জনকত্ব ও জননীত্ব লাভের অযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মার্কিন দেশে এইরূপ একটা প্রস্তাব হইয়াছিল যে, বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নর নারীর দৈহিক অবস্থা বিবাহিত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় আছে কি না, তাহা ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে। যথোচিত পরীক্ষার পর ডাক্তার যোগ্যতার সম্বন্ধে সার্টিফিকেট না দিলে কেহই বিবাহ করিতে পাইবে না। এইরূপ আইনে অন্য দিকে অসুবিধা বিস্তর দেখিয়া আইনটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সুপ্রজনন বিদ্যার (Eugenics) দিক হইতে দেখিলে, এই আইনটি খুব সঙ্গত হইত। এরূপ আইনের যে একটা আবশ্যকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমেরিকায় আজকাল কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ আইন থাকিলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা খুবই কমিয়া যায়, নরনারীর গার্হস্থ্য জীবন সুখের হয়; সুস্থদেহ, সবল সন্তান জাত হইয়া গৃহটিকে সুখ, শান্তি ও আনন্দময় করিয়া তুলে।

বর্ত্তমান কালে যাঁহারা সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতে চাহেন, তাঁহারা যে বলেন, নারী জাতিকে পুরুষ জাতির তুল্য অধিকার দিতে হইবে,—নারীজাতিও সর্ব্ব প্রকার পৌরুষব্যঞ্জক আচরণ করিবেন,—এই সকল কথায় আমরা সায় দিলেও, ষোল আনা সায় দিতে পারি না। সমাজ-বিপ্লবপন্থীরা চাহেন যে, নারীজাতি পুরুষদের মত আচরণ করিতে গেলে, তাহারা যদি গৃহধর্ম্ম পালন না করে, সন্তান গর্ভে ধারণ না করে, শ্রীভগবানের প্রজা রক্ষা না করিতে চায়, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই কথাটিতে আমাদের ঘোর আপত্তি আছে। আমাদের বিশ্বাস, নারী যতই পৌরুষ-সম্পন্না, পুরুষ-পরুষ-ভাবাপন্না হউন না কেন, তথাপি, তাঁহারা নারী; গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেবল নারীরা কেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করা কি পুরুষেরও কর্ম্ম নয়? এবং তাঁহারা কি তাহা পালন করেন না? রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি ঘটিত সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াও, সংসারী ও গৃহস্থ হইতে তাঁহাদের আপত্তিও নাই, এবং কোন বাধা বিঘ্নও নাই। সেইরূপ, নারীরা রাজনীতিক, সমাজনীতিক ও বাণিজ্য-নীতিক ব্যাপার সমূহের আলোচনা ততটুকু করুন, যতটুকুতে তাঁহাদের গৃহধর্ম্ম পালনে ব্যাঘাত না ঘটে। গার্হস্থ্যধর্ম্মও একটা ধর্ম্ম বটে, এবং সৃষ্টি রক্ষা করিতে

হইলে সে ধর্ম্ম পালন করাও দরকার। শ্রীভগবান নারীজাতিকে পুরুষজাতির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবার উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াছেন। সেই জন্য নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই জন্যই আমাদের সমাজে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে, অর্থাৎ উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারী হইতে হইলে, নারীকে জননীত্ব লাভ করিতেই হইবে। এই জননীত্ব লাভ নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। জননীত্ব লাভ করিলেই জননীকে সন্তান পালন করিতে হইবে। সন্তান যদিও নারী ও পুরুষের সমান স্নেহের ও যত্নের পাত্র, তথাপি, সন্তান পালন কার্য্যে নারীই সমধিক উপযুক্ত। ইহাই বিধির বিধান। বিধাতাপুরুষ এই জন্য নারীর স্তনে ক্ষীর দিয়াছেন, হৃদয়ে বাৎসল্য, স্নেহ, মমতা প্রদান করিয়াছেন। সন্তান পালন কার্য্য শিক্ষা-সাপেক্ষ। উপযুক্ত ভাবে সন্তান পালন করিতে হইলে, সন্তানের স্বাস্থ্য, তথা জননীর নিজের স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ, যে জননীর স্তন্য পান করিয়া শিশু পুষ্ট ও বলিষ্ট হইবে, সেই জননীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে শিশুর সুস্থ থাকিবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে নারীকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইবে; নচেৎ সন্তান পালন তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে, বিবাহের পর তাঁহারা সন্তান পালনের উপযুক্তা হইবেন। অনেক স্থলেই দেখা যায়, জননীর স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃই শিশু চিররুগ্ন হইয়া অকালে জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে, এবং বিবাহের পর গর্ভধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিলে, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে উপযুক্তরূপে লালন পালন করিলে, শিশু-মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া যাইতে পারে; অকাল-মৃত্যু সমাজ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে। সত্য কথা বলিতে গেলে, মানব-শিশু দেবতা তুল্য। এই নবীন আগন্তুকের অভ্যর্থনার সুবন্দোবস্ত করিয়া না রাখিলেই, অভিমানী শিশুরা বেশী দিন পৃথিবীতে বাস করিতে চাহে না। এজন্য জননীকে এই এই আয়োজন করিতে হয়; যথা, তাঁহার ফুস্‌ফুস্ যাহাতে সবল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা চাই। তাঁহাকে দীর্ঘ-নিশ্বাস গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। তিনি সুপবিত্র পুষ্টিকর খাদ্য মাত্র গ্রহণ করিবেন। খোলা যায়গায় শারীরিক পরিশ্রম করিবেন। দাসদাসীর বাহুল্য বশতঃ যদি তাঁহাকে গার্হস্থ্য কার্য্যে তাদৃশ পরিশ্রম করিতে না হয়, তাহা হইলে তাঁহার কিছু কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করা তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী, এমন কি, অপরিহার্য্য বলিলেও চলে। দরিদ্র ঘরের নারীরা যেমন সহজে সুস্থ ও সবল সন্তান প্রসব করে, ধনীগৃহে তেমনটি হয় না। কারণ, দরিদ্রা রমণীরা দাস দাসী রাখিতে পারেন না,—শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য তাঁহাদিগকে নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁহাদের সন্তানরা সুস্থ ও সবল হইয়া জন্মগ্রহণ করে, এবং সুপ্রসব দরিদ্রের ঘরেই সুলভ। পক্ষান্তরে, ধনী-গৃহের রমণীগণকে বিশেষ কোন শারীরিক শ্রম করিতে হয় না বলিয়া, অলসতা বশতঃ তাঁহাদের সন্তান তেমন হৃষ্ট পুষ্ট বা সবল হয় না, এবং প্রসবকালেও তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। নারীর মানসিক অবস্থা সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। তিনি স্বামী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, এবং স্নেহাস্পদদিগের প্রতি স্নেহশীলা থাকিবেন। এইভাবে নবীন অতিথির রাজতুল্য অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে, তবে শিশু দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও বলবান হইবে। সাধারণ ভাবে নারীদিগকে এই ভাবে জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দিলে, জাতির ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—ভবিষ্যতে প্রত্যেক নরনারী দৈহিক স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতে পারিবে।

আমাদের সমাজে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে অত্যন্ত

অযথা ভাবে পক্ষপাত করা হয়। ছেলেকে যতটা আদর যত্ন করা হয়, মেয়েকে ততোধিক অযত্ন, অবজ্ঞা অবহেলা করা হয়; এবং এই অন্যায় পক্ষপাতটুকু করেন প্রধানতঃ মেয়েরাই। কিন্তু, না,—আর তাহা চলিবে না। মেয়েদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে; ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সমান যত্নে লালন পালন করিতে হইবে। একজনকে বেশী আদর করিব, আর একজন অনাদরে অযত্নে অবহেলায় বাড়িয়া উঠিবে—ইহা আর কোন মতেই চলিবে না। ছেলের জন্য যেমন যেমন ভাবে পোষাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা, দীক্ষা, খাওয়া, পরার বন্দোবস্ত হইবে, মেয়ের জন্যও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে,—এক চুলও এদিক ওদিক হইলে চলিবে না। আমাদের দেশে আদর, যত্ন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—সবটাই ছেলের প্রাপ্য। আর মেয়ে যেন বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে। কেন,—এতটা পক্ষপাত কিসের জন্য? যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের জননী, বীর-প্রসবিনী—তাঁহারা যদি অযত্নে পালিত হয়েন, তাহা হইলে জাতির ভবিষ্যতে সুমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

ছেলে ভাল খাইবে, ভাল পরিবে,—মেয়ে যা' পাইবে,—তাই খাইবে—ব্যাটাছেলেদের পাত-কুড়ান খাইয়া জীবন ধারণ করিবে—আর এইরূপে তাহারা বীর প্রসবিনী, বীরের জননী, বীর ধাত্রী হইবে—ইহার আশা করা কি বিড়ম্বনা নয়? ছেলেকে যে ভাবে মানুষ করা হয়, তাহাতে তাহার শরীরের পুষ্টিলাভ ও বল সঞ্চয়ের সুবিধা হয়; তাহার দেহ দৃঢ়, কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রমশীল হইয়া থাকে। আর মেয়ে যে ভাবে পালিত হয়; তাহাতে সে ক্ষীণাঙ্গী, শ্রমবিমুখ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া গোছের হইয়া থাকে। ইহা ঠিক নয়। অবশ্য জননীকে কন্যার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার দেহ ঠুন্‌কো এবং পল্‌কা হইবে কেন? তাহারও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কোন হানি না করিয়া যাহাতে শরীর দৃঢ়, সুপুষ্ট, বলশালী হয় তাহাই করিতে হইবে,—তেমনি ভাবেই তাহাকে লালন পালন করিতে হইবে। আর ছেলের বেলা যে সকল স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন হয়, মেয়ের বেলায় ত তাহা সর্ব্বাগ্রেই করা আবশ্যক। সুসন্তান গঠন করিতে হইলে যাহা যাহা করা দরকার, তাহা যেমন ছেলের সম্বন্ধে করিতে হইবে, ঠিক তাহার সমান ওজনে মেয়ের সম্বন্ধেও করিতে হইবে। তবে নর নারীর দাম্পত্য জীবনে সমন্বয় ঘটিবে,—তাহাদের জীবন কল্যাণময় ও মধুময় হইবে।

মেয়ের বয়স যখন বারো বৎসর হইবে, তখন মায়ে-ঝিয়ে একটা বোঝাপড়ার সময় আসিবে;—মেয়ের প্রতি মায়ের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য উপস্থিত হইবে। অবসর সময়ে মা মেয়েকে সস্নেহে, সাবধানে বুঝাইয়া দিবেন যে, অচির ভবিষ্যতে তাহার দেহের একটী অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। জননীত্ব লাভের এই সূচনায় কন্যা যেন ভয় না পায়, যেন কোন রকমে বিচলিত না হয়, জননী তাহা দেখিবেন। মেয়েকে বুঝাইয়া দিবেন, অতঃপর তাহার শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া সে নারী হইতে চলিয়াছে। এই প্রাথমিক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনটি কিরূপে তাহার সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, জননী তাহা ধীরে ধীরে, সাবধানে, সযতনে বুঝাইয়া দিবেন। কন্যা-সন্তানের প্রতি ইহা জননীর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য। নারী-জীবনের এই সন্ধিক্ষণটি যত্নসহকারে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই সময়েই তাহার নানা রকম পীড়া হইতে পারে। যদি বেদনা বোধ হয়, রক্তাল্পতা ঘটে, আক্ষেপ উপস্থিত হয়, কিম্বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। নচেৎ সে চিররুগ্ন হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কষ্ট পাইতে থাকিবে। বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাহার আভ্যন্তরিক যন্ত্র-তন্ত্রাদির কোন বিকৃতি ঘটিয়াছে কি না। যদি কোন যন্ত্রতন্ত্র স্থানচ্যুত হইয়া থাকে, তবে গোড়াতেই তাহাকে স্বস্থানে স্থাপন করিয়া দিলে, অনেক রোগ,

এমন কি, অকাল মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।

এই পরিবর্ত্তনের সময় বালিকাকে খুব সাবধানে রাখিতে হয়। সে যতক্ষণ খোলা হাওয়ায় থাকিতে পারে, ততই তাহার পক্ষে ভাল। বেশী পরিশ্রম, যাহাতে তাহার ক্লান্ত বোধ হইতে পারে, সর্ব্বথা পরিহার্য্য। তাহাকে পুষ্টিকর লঘুপাক খাদ্য দিতে হইবে। নিদ্রা এবং বিশ্রাম তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। যদি সে এ সময়ে স্কুলে কিম্বা কলেজে পড়াশুনা করে, তবে তাহাকে যেন বেশী পড়াশুনা করিয়া মাসিক পরিশ্রম করিতে দেওয়া না হয়। কয়েকদিন এইরূপ সাবধানে থাকিবার পর সন্ধিক্ষণটা কাটিয়া গেলে, আবার সে তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস মত সকল কাজ কর্ম্মই করিতে পারে।

বালিকা যদি রুগ্ন, দুর্ব্বল, পরিশ্রম-কাতর, খুঁৎখুঁতে সদা বিরক্ত হয়, তবে তাহার বিবাহ দিলে তাহার দাম্পত্য জীবন সুখময় হইবে না; অধিকন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী জীবন—তাহার স্বামীর জীবনও চির দুঃখময় হইয়া উঠিবে। রুগ্না স্ত্রীর সেবা করিতে করিতে তাহার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইবে। কিন্তু নারী যদি সুস্থকায়, বলবান, সদা সন্তুষ্ট চিত্ত, স্বামী ও শ্বশুর গৃহের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-সম্পন্না হন, তাহা হইলে তাঁহার দাম্পত্য জীবন কত মধুর হইতে পারে; তিনি নিজেও সুখিনী হন, স্বামী ও স্বামীর পরিবারবর্গকেও সুখী করিতে পারেন। তাঁহার সংসারটিকে তিনি স্বর্গে পরিণত করিতে পারেন।

নারী অযথা বেশ-ভূষার আড়ম্বর করিবেন না। অনেকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা আছে, স্ত্রীজাতির বেশ-ভূষার আড়ম্বর স্বামীকে, তথা পুরুষ জাতিকে প্রীতি দান করিবার জন্য। কিন্তু কি পরিমাণে বেশ ভূষায় বা অলঙ্কারে নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, সে জ্ঞানটুকুর অভাব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সেইজন্য তাঁহারা বস্ত্র ও অলঙ্কার বাহুল্যে তাঁহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে ম্লান ও কুৎসিত করিয়া ফেলেন। দেহের বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দুই একখানি রঞ্জিত বস্ত্র, একটী সেমিজ, কিম্বা তাহার উপর হয় ত একটী জামা, এবং সামান্য দুই চারিখানি অলঙ্কারে অনেকেরই দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার উপর আরও বস্ত্রালঙ্কার চড়াইলে, তাঁহাদের অতি বিশ্রী দেখাইতে পারে। অনেকে লাবণ্য বৃদ্ধির জন্য রুজ, পাউডার, কসমেটিক প্রভৃতি বিবিধ অঙ্গরাগও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নারী সৌন্দর্য্যের যথার্থ সমজদার, তাঁহাদের চক্ষে এই কৃত্রিম অঙ্গরাগ অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে। রমণীগণের এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, ভগবান রমণীগণকে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। স্বাস্থ্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। শরীর সুস্থ থাকিলে, মন প্রফুল্ল থাকিলে, স্বভাবতঃই তাঁহাদের দেহে লাবণ্য ঢলঢল করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে যিনি এই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিতা, তিনি হাজারই অঙ্গরাগের উপ-করণ সংগ্রহ করুন না কেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য এক কণাও বৃদ্ধি পাইবে না, বরং তাঁহাকে আরও কুৎসিত দেখাইবে। বস্তুতঃ, যাঁহাদিগকে কৃত্রিম অঙ্গরাগের সাহায্যে নিজেদের দেহের লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, নারী-জগতে তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যহীনা আর কেহ নহে।

নারীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য তিনি কতক কতক গৃহ কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে পারিলে ভাল হয়। গৃহস্থ ঘরে এত বেশী কাজ কর্ম্ম থাকে না, যাহা পুরমহিলারা ভাগাভাগি করিয়া লইয়া সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারেন। রান্না-বান্না, বাসন-মাজা, বাটনা বাটা, জল তোলা, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখা, প্রভৃতি গৃহকর্ম্মগুলি পুরমহিলাদের স্বহস্তে করাই উচিত; দাসদাসীর সাহায্য যত কম লইতে হয় ততই ভাল। নিয়মিত ভাবে গৃহ-কর্ম্মগুলি নিজেরা করিয়া লইতে

পারিলে যে অল্প-স্বল্প পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে শরীর চির-সুস্থ এবং লাবণ্য চির-অক্ষুণ্ণ থাকে। অলসতা সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। অবশ্য পরিবার বৃহৎ হইলে দাসদাসীর সাহায্য না লইলে চলে না, —অনেক আবশ্যক কর্ম্ম অসম্পন্ন থাকে। তথাপি, দাসদাসী থাকিলেও এই নিয়মে চলা উচিত যে, যতটা পারা যায়, নিজেরা করিবেন,—বাকীটুকু দাসদাসীর দ্বারা করাইয়া লইবেন। কিন্তু বড়-মানুষী দেখাইবার জন্য, কিম্বা অলস প্রকৃতির দরুণ কর্ম্ম-বিমুখ হইলে নিজেরই সমূহ ক্ষতি, নিজের স্বাস্থ্যেরই সর্ব্বনাশ করা হয়। দাসদাসী কেবল সাহায্যকারী মাত্র থাকিবে; সর্ব্বতোভাবে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার ভার তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অলসভাবে বসিয়া থাকা উচিত নয়। তাহা হইলে শারীর যন্ত্র সকল মরিচা ধরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, দেহ রোগপ্রবণ হইয়া পড়িবে, সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

এইভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে, বয়স যতই হউক না কেন, নারী মাত্রকেই চির-যৌবনা দেখাইবে। অকাল বার্দ্ধক্য তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারিবে না। যৌবন বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিলাসিনী রমণীরা কি না করিতে পারেন? কতই না কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন? অথচ, যৌবন চিরকাল বাঁধিয়া রাখিবার উপায় কত সহজ এবং সকলেরই কেমন আয়ত্তাধীন। এটুকু জানা থাকিলে কাহাকেও অর্থব্যয় করিয়া যৌবন ক্রয় করিবার বার্থ চেষ্টা করিতে হয় না।

রোগ সংক্রামণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে দু'এক কথা।

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব-বিশারদ পরম বিদ্যোৎসাহী ডাক্তার শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্, মহাশয় তাঁহার "জীবাণু-রহস্য" নামক সুচিন্তিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বিশদভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানব-দেহের অধিকাংশ মারাত্মক ব্যাধির মূলে বিভিন্ন প্রকারের (Microbes, micro-organisms, bacilli, bacteria, germs etc.,) বীজাণু বা জীবাণুগণের অস্তিত্ব ও কার্য্যশক্তি বর্ত্তমান্। কয়েকটি বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন জীবাণু কিরূপে সুস্থ দেহে রোগ সঞ্চারিত করে ও কি উপায়ে তাহাদের বিনাশ সাধন সম্ভবপর হয়, তাহা তিনি দুই চারিটি কথায় তাঁহার প্রবন্ধটির শেষ অধ্যায়ে বেশ গুছাইয়া পরিত্যক্ত করিয়াছেন। এখন এই জীবাণুগুলির রোগ সংক্রামণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আরো দু'চারটি কথা বলিলে, বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের মূল্যবান্ প্রবন্ধের অমর্য্যাদা করা বা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—আশা করি।

'সংক্রামণ' কথাটির ধাতুগত অর্থ—স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন। এখন রোগ সম্বন্ধে সংক্রামণ কথাটির অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে—'দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চার'। মানুষ, যেমন দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতে হইলে, পাল্কী, গাড়ী বা ট্রেণের সাহায্য গ্রহণ করে, কিম্বা কোন নদী পার হইতে হইলে ফেরী ষ্টিমার, নৌকা বা সেতুর সহায়তা লয়, সেইরূপ রোগ বীজাণুগুলির একদেহ হইতে অন্য দেহে গমন করিবার সময় নিশ্চয়ই কোন তথাকথিত যান বা বা বাহনের প্রয়োজন হয়। এই যান বা বাহনগুলি কি কি? যথা,—বিষ্ঠা, মূত্র, কফ, বমন, বায়ু, নখ, লোম, থুথু, আহার্য্য, পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র,

বিছানা, মশা, মাছি, ছারপোকা, তেলাপোকা, ইঁদুর প্রভৃতি।

এই রোগ-বীজাণু-তত্ত্ব (Bacteriology) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আধুনিক গবেষণার ফল; কিন্তু এ সম্বন্ধে ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরে এক কথায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। রোগের মূল গভীরভাবে নির্ণয় করিতে গিয়া পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বিজ্ঞানবিৎগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ রোগই সংক্রামক এবং এই সকল রোগ এক এক জাতীয় জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। জল, স্থল, বায়ু, ব্যোম প্রভৃতি সকল স্থানেই এই বীজাণুগণ বিচরণ করে এবং ইহারা কেবল যে মানব শরীরে রোগ উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে—তাহা নহে; জগতের সৃষ্টিস্থিতিতেও ইহারা যে কতখানি প্রয়োজনীয় অংশের অভিনয় করে, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ রমেশবাবু গত বৈশাখ সংখ্যার 'স্বাস্থ্য-সমাচারে' সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বীজাণুগুলি যদিও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান্, তথাপি মানবদেহে আশ্রয় লাভ করিতে ইহারা সবচেয়ে বেশী যত্ন করে এবং সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে; মানব দেহের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুষ্টিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। কতকগুলি আগাছা ও লতার লতা যেরূপ সহকার বৃক্ষের আশ্রয় ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ কতকগুলি রোগ বীজাণু আছে—যাহারা জীব-দেহের আশ্রয় ব্যতীত মোটেই বাঁচিতে পারে না। মনুষ্য দেহের বিভিন্ন রস (রস বা serum, রক্ত, মাংস, মেদঃ, ও মজ্জা *) হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া এই সকল জীবাণু জীবন-ধারণ ও সংখ্যাতীত ভাবে বংশ-বৃদ্ধি করে; এবং এক দেহ হইতে তাহারা নিজেদের পরিপুষ্টি লাভ করে, বিনিময়ে তাহাকে কি দেয় জানেন্?—নিজ দেহ নিঃসৃত টক্‌সিন্ (Toxin) নামক একপ্রকার উগ্র বিষ—যাহা দেহে সঞ্চারিত হইয়া রোগের সৃষ্টি করে, (এই বিষকেই বোধ হয় অথর্ব্ববেদে 'তক্‌ষণ্' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে)—এমনই অকৃতজ্ঞ তাহারা! এরা ছুঁচ হইয়া মানব শরীরে প্রবেশ করে, পরে 'ফাল্' হইয়া বাহির হইয়া আশ্রয়দাতারই সর্ব্বনাশ সাধন করে। শুধু রোগ জীবাণুর মধ্যে কেন, মানবজাতির মধ্যে,—ভারতের জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ত এরূপ অকৃতজ্ঞতার জলন্ত দৃষ্টান্ত বিরল নহে!

কার্য্য ব্যপদেশে মানুষকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন বা ভিন্ন ভিন্ন পথে—সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন যানে গমন করিতে হয়, রোগ-জীবাণুদিগের বেলায়ও তদ্রূপ। ভিন্ন ভিন্ন যানের নাম ত আগেই করিয়াছি; এখন কোন্ দেশে কে বসতি স্থাপন করিতে ভালবাসেন ও কোন্ পথে তথায় গমন করে, তাহার একটু পরিচয় দিই।

নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া (ঘুংড়ি), হাঁপানি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কাশি, প্লেগ, ক্ষয়কাশি (pulmonary phthysis) প্রভৃতির জীবাণু বায়ুপথে প্রায়শঃ নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া শ্বাসপথে, শ্বাসযন্ত্র বা ফুস্‌ফুসে আশ্রয় গ্রহণ করে। সভ্য জাতির বিমান যানের মত, এই রোগ-জীবাণুদের প্রধান যান্ হইতেছে নিঃশ্বাস এবং থুথু,—কফ্, হাই, হাঁচি, শ্লেষ্মা প্রভৃতির সঙ্গে ইহারা দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়।

কলেরা, আমাশয়, সান্নিপাতিক জ্বর (Typhoid fever), অন্ত্রদোষ জনিত বাতশ্লেষ্মা জ্বর (Enteric fever) প্রভৃতির বীজাণু জলপথে ও স্থলপথে আহার্য্য ও পানীয়রূপ যানে চড়িয়া উদর-দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের সহিত সাধারণতঃ মানুষের দেহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। মাছির শুঁড় ও 'পদপল্লবমুদারম্' আশ্রয় করিয়া ইহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে—গৃহ হইতে

* বীজাণুগণ অস্থি ও শুক্রধাতু হইতে কোন খাদ্য সংগ্রহ করে কিনা ও তদ্দ্বারা মানব-দেহের কোন ক্ষতি করিতে পারে কিনা এ বিষয়ে পাশ্চাত্যে ও আমেরিকায় এখনও পরীক্ষা চলিতেছে।

গৃহান্তরে পরিভ্রমণ করে এবং মাছিরই উদার অনুকম্পায় আহার্য্যের মধ্যে ঝরিয়া পড়িয়া মানুষের দেহের মধ্যে গমন করার সুবিধা ও সুযোগ পায়।

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, গোদ, ইরিসিপেলাস, সেপ্‌টিমিয়া ঘটিত রোগ, উপদংশ, কার্ব্বঙ্কল প্রভৃতির বীজাণু মানুষের রক্তের মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়; ইহারা সাধারণতঃ রোগীর দেহ হইতে মশা, ছারপোকা, আঠালু প্রভৃতি জীবন্ত যানের সাহায্যে সুস্থদেহে সংক্রামিত হয়।

হাম, বসন্ত (এই রোগ দুটি কোন বীজাণুর দ্বারা জন্মে কি না—সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে), ধনুষ্টঙ্কার, প্রভৃতির বীজাণু চর্ম্মচ্ছেদ ও ক্ষতাদির, (lesions and abrasions of the skin) সংস্পর্শে আসিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

রোগ-বীজাণুই বলুন আর মিত্র জীবাণুই বলুন, ইহারা সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান্ এবং ঐ সকল রোগ-বীজাণু অনাদিকাল হইতে দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। অনেক পাশ্চাত্য ডাক্তার বলেন—কেবল যে রুগ্ন ব্যক্তির দেহেই রোগের বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়—এমন নহে; সুস্থ দেহেও অনেক রোগের বীজাণু অল্প-বিস্তর প্রচ্ছন্নভাবে বাস করে; মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আহার-বিহারের ব্যভিচার প্রভৃতির ফলে ইহারা সজাগ ও প্রবল হইয়া উঠে, এবং তখনই রোগের সৃষ্টি হয়।

জীবাণুগণের আবাস ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মধ্যে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানবিদগণের যে মতভেদই থাকুক্ না কেন, অধিকাংশ রোগ যে এই জীবাণুজাতির দ্বারা উদ্ভূত ও সঞ্চারিত হয়, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় বা মতভেদ নাই। এই সকল রোগের প্রতিকার ও মানবদেহস্থিত রোগ-বীজাণুর বিনাশ সাধন করিবার জন্য নানা প্রকার ঔষধ ও ভ্যাক্সিন, য়্যান্টিটক্সিক প্রভৃতি ইন্‌জেকসন্ বাহির হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহাদের দ্বারা কতটুকু সফলতা লাভ করা যায়, তাহা এদেশের অনেক ডাক্তার ও রোগী ভালরূপই জানেন; ফল কথা, ইহাদের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে কোন উপকারই দর্শে না। এই জন্য এই সকল সংক্রামক ব্যাধিতে আজকাল অনেক ডাক্তার, ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে আরাম করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া, যাহাতে অন্যদেহে সেই সকল রোগের বীজ প্রবেশ করিতে না পারে—তাহারই উপায় নির্দ্দেশে মনোনিবেশ করিয়াছেন। রোগীর (বা নিরোগ ব্যক্তির) পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার না করা, কাহারও নিষ্ঠীবন, থুথু বা কফ না মাড়ান, সকলের সহিত এক পাত্রে ভোজন বা উচ্ছিষ্টাদি আহার না করা, এক বিছানায় শয়ন করিয়া কাহারও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গায়ে না লাগান, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, যতদূর সম্ভব মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যালোক সেবন করা, নিয়মিত আহার-বিহার-নিদ্রা-সহবাস প্রভৃতি করা,—এই সকল বিষয়ে সাবধান হইতে তাঁহারা সকলকে উপদেশ দিতেছেন। আমাদের সমাজের সদাচার বাহুল্য দেখিয়া, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদিগকে একদিন 'কুসংস্কারাপন্ন অসভ্য জাতি' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরগণ অধিকাংশ হিন্দু আচারের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া নিজ সমাজে তাহারই প্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। পরন্তু, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যে সকল 'দোদল্‌বান্দা' স্বদেশবাসী হিন্দুর আচার ব্যবহারগুলি "nasty trash and bosh" বলিয়া ঘৃণা ও উপেক্ষায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহারাও আজ তাঁহাদের পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-পিতাদের দেখাদেখি সেগুলির উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সুরু করিয়াছেন।

আমাদিগের ঋষিরাও, তথাকথিত অধুনা-আবিষ্কৃত বীজাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন বলিয়াই শৌচাচারের বন্ধনে এই সনাতন সমাজকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদিগের দেহ-শুদ্ধি, দ্রব্য-শুদ্ধি, আহার্য্য-শুদ্ধি, পানীয়-শুদ্ধি, বস্ত্র-শুদ্ধি, সূতিকাশৌচ, স্রাবাশৌচ জননাশৌচ, মরণাশৌচ

প্রভৃতি শুদ্ধি ও অশৌচ-প্রকরণের মূলে যে কত গভীর গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল নিহিত, তাহা এদেশের ডাক্তারগণ এখনও বুঝিতে না পারিলেও, বৈদেশিক ডাক্তাররা বিশেষভাবে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গৃহিণীকে কেন সারা গৃহ-প্রাঙ্গণ ও গৃহের আবর্জ্জনা সকল দূর করিতে হয়, গৃহ-গাত্র সকল উত্তমরূপ লেপন করিতে হয়, কেন পিতলের বাসন ছাই দিয়া—তামার বাসন অম্ল দিয়া মাজিতে হয়, কেন শৌচাচারের সময় প্রত্যেকবার পায়ুদেশ ও হস্তপদ মৃত্তিকা ও জলদ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়, কেন কফ, মল, মূত্রাদি স্পর্শ করিতে বা মাড়াইতে নাই, অপরের বস্ত্রাদি পরিধান ও অপরিমিত ভোজনাহার পাপ কেন, "মন্তমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্" কেন, নির্জ্জনে প্রশান্তমনে আহার করিতে হয় কেন, নখ, কেশ ও লোমাদির মধ্যে 'শমনদূত' প্রচ্ছন্ন থাকে কেন, প্রাত্যহিক স্নান ও দন্তধাবনের এত আবশ্যকতা কেন, বিছানা মাদুর নিয়মিত রৌদ্রে দিতে হয় কেন, * তিথি নক্ষত্র দেখিয়া বিভিন্ন ফলমূলাদি ভক্ষণ ও সহবাস করিতে হয় কেন—ইত্যাদি 'কেন'র সন্তোষজনক উত্তর আমাদের অনেকে না জানিলেও, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক মাথা ঘামাইয়া স্থির করিয়াছেন ও ইহাদের কার্য্যকারিতা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

দেব-কার্য্যাদি করিবার সময় আমরা 'নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ" অর্থাৎ 'অরাতিগণকে দগ্ধ করিলাম' বলিয়া পূজার বস্তু অগ্নিতে নিক্ষেপ করি, শ্রাদ্ধের সময় "নিহন্মি সর্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ" অর্থাৎ সমুদয় অপবিত্রাজনক অসুর দানবাদি বিনাশান্তর পিণ্ড পাতিবার স্থান-ভিক্ষা করি, মৃতদেহ দাহ করিবার সময় গোময়লেপিত ভূমির উপর জানু পাতিয়া উপবেশন করতঃ "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া প্রার্থনা করি, সূর্য্যোদয়ে "বিশ্বদৃষ্টং অদৃষ্টহা..." অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি-অগোচর আয়ুশক্রনাশক ও "আপদান্তম্ নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা"* বলিয়া স্তব করি, বিষ্ণুশর্ম্মার সেই উপদেশ "শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তং,"—এই সকলের মূলে কি প্রাচীন আর্য্যজাতির বীজাণুতত্ত্বের জ্ঞান নিহিত নাই?

হিন্দু শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার যে কেবলমাত্র সুস্থদেহীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—এমন নহে, পরন্তু রোগীর রোগোপশমের পক্ষেও যে ইহা প্রশস্ত ও প্রধান সহায়, তাহা ভগবান মনু, যাজ্ঞবল্ক, গৌতম, নারদ, চরক, ভৃগু, আত্রেয়, শুশ্রুত প্রভৃতি মহাজ্ঞানী পূর্ব্বপুরুষগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন; এবং এল্‌মার লি, রবিন্‌সন্, নিকোলস্, কাউয়ান্, টল্‌ষ্টয়, প্লিনি, পার্কার, ষ্টল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ এখন একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং এদেশীয় ডাক্তারগণ যদি জঘন্য বিদেশী "জ্যাম্" "জেলি" "জমাট দুগ্ধ" টিনে-আঁটা 'মিট্‌জুস্', মাছ, মাংস প্রভৃতি পথ্যের ব্যবস্থা না দিয়া এবং অসার "পেটেণ্ট" ও নিষ্ফল "ইন্‌জেকসন্" প্রভৃতির নাম ভুলিয়া গিয়া, কেবলমাত্র হিন্দু-শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত সহজ সুসাধ্য সদাচারগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে অনেক রোগী ও সুস্থদেহী উপরি উক্ত সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পান ও নিরাপদ থাকিতে পারেন। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত আহার, বিহার, কার্য্য ও বিশ্রামের নিয়মগুলি কতদূর বিজ্ঞানযুক্তি-সম্মত ও কিরূপে তাহারা রোগ দূরীকরণে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে—সে সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

* প্রায় রোগের বীজাণু যে সূর্য্যালোকে আদৌ বাঁচিতে পারে না—ইহা প্রমাণসিদ্ধ তথ্য।

আলোচনা।

সহবাস-সম্মতি বিল।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত বক্সী মোহন লাল প্রচলিত সহবাস-সম্মতি-আইনের সংশোধন কল্পে একটা নূতন আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন। এই বিলে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সহবাসে সম্মতি দিবার বয়স ১২ বৎসরের স্থলে চৌদ্দ বৎসর করা হউক। বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইবার পর সাধারণের মতামত সংগৃহীত হইতেছে। কোন কোন স্থলে এই প্রস্তাবিত বিলের প্রতিবাদ হইতেছে। আমরা এইরূপ প্রতিবাদের কোন সার্থকতা দেখিতে পাই না। ব্যবস্থাপক সভায় নূতন কোন আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইলেই যে তাহার প্রতিবাদ করিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; অথচ, দেখিতে পাই, ভালই হউক আর মন্দই হউক, নূতন আইনের প্রস্তাব উঠিলেই এক শ্রেণীর লোক যেন তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত আছেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রচলিত আইনে সম্মতির বয়স বারো বৎসর করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখনও, "হিন্দুধর্ম্ম যায়!"—বলিয়া মহা প্রতিবাদের রোল উঠিয়াছিল। প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইন পাশ হয়। অথচ, হিন্দুধর্ম্ম যায় নাই—আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সতীদাহ নিবারণের আইন প্রণয়নের সময়েও প্রতিবাদ কম হয় নাই। প্রতিবাদকারীরা ধর্ম্মহানির আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মের একটুও হানি হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, সহবাস সম্মতির বয়স ১৪ বৎসর করিলে কোন ক্ষতি হইবে না; বরং জাতি গঠনের হিসাবে, সুপ্রজনন বিস্তার (Eugenics) তরফ হইতে, সমাজের মঙ্গলই হইবে। আমরা আবার কেবল স্ত্রীজাতীর সহবাসে সম্মতির বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট নহি। আমরা বলি, পুরুষদেরও সহবাসের বয়সের একটা বাঁধাবাঁধি আইন হওয়া এবং প্রচলিত থাকা দরকার। ২৫ বৎসর বয়সের কম কোন পুরুষ স্ত্রী-সহবাস করিলে তাহার কঠোর দণ্ড হওয়া আবশ্যক। কেবল তাহাই নয়। আরও আইনের দরকার রহিয়াছে। স্ত্রী বা পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে উদ্যত হইলে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও শরীরের অবস্থা দাম্পত্য জীবনের উপযোগী কি না, তাহা একটী যোগ্য চিকিৎসক মণ্ডলীর (competent medical board) দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কাহাকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। সামান্য একটা জীবন-বীমা করিতে গেলে কত রকমে ডাক্তারী পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। আর বিবাহের মত একটা গুরুতর কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ডাক্তারী পরীক্ষার কথা এখনও যে কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না, ইহা বড় অশ্চর্য্যের বিষয়। শরীরের অক্ষম অবস্থায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে গিয়া কত নর-নারীর জীবন যে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, কত কুৎসিত রোগ যে সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার একটা statistics লইলে যে ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তাহা দেখিলে, কি গবর্ণমেণ্ট, কি জনসাধারণ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইবেন এবং আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। আমরা এই বিষয়ের প্রতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এইরূপ আইন হওয়া আবশ্যক কি না, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

চা ও ক্যান্সার।

আমরা বরাবরই চা-পান প্রথার বিরোধী; এবং সুযোগ পাইলেই চা-পান প্রথার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। চা কেবল একটা অনাবশ্যক নেশা মাত্র। তা' ছাড়া, উহা নানা রূপে শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। আমরা সেই সকল কথা এই

[স্বা]স্থ্য-সমাচারে বহুবার প্রকাশ ও আলোচনা করিয়াছি। [সম্প্র]তি চায়ের আর একটী গুরুতর দোষের কথা [শুনিতে] পাইয়াছে। বিলাতের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা [কে]হ মত প্রকাশ করিয়াছেন, চা পান করিলে [ক্যান্স]ারের রোগ হইতে পারে। ইহা বড় ভয়ানক [কথা]। কিন্তু চায়ের ব্যবসায় একটা পৃথিবীব্যাপী মস্ত [বড়] ব্যবসায়। বহু কোটীপতি ব্যবসায়ী এই ব্যবসায়ে [লি]প্ত। চা-পানে ক্যান্সার হয়, এই কথায় জনসাধারণ [আ]তঙ্কিত হইয়া চা-পান পরিত্যাগ করিতে পারে। [তাহা] হইলে চায়ের ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি। সেই [ক্ষ]তির আশঙ্কায়, স্বার্থহানির আতঙ্কে, চা-ব্যবসায়ীরা [চ]ঞ্চলিত হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং "চা-পানে ক্যান্সার [হয়"] এই মন্তব্যের প্রতিবাদও সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে। [সা]র লিওনার্ড রজার্সের ন্যায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও [প্র]তিবাদচ্ছলে বলিতেছেন, ক্যান্সার কেন হয়, তাহা [অদ্য]াপি স্থির হয় নাই। সুতরাং চা পান করিলেই [যে] ক্যান্সার হইবে, এমন কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। [কি]ন্তু সার লিওনার্ড রজার্স ইহাও বলিয়াছেন, প্রদাহ [ক্যা]ন্সারের একটা কারণ, এবং চা-পানে প্রদাহ হইয়া [থা]কে। সুতরাং চা-পান যে কেন ক্যান্সারের কারণ [হই]তে পারে না, তাহা বুঝা যায় না। সে যাহাই [হ]উক, কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন ইহার সম্বন্ধে [রী]তিমত তদন্ত ও পরীক্ষা হওয়া উচিত। তা'ছাড়া, [চা]-পানে ক্যান্সার যদি নাও হয়, তথাপি ইহাতে [শ]রীরের অন্য অনেক অনিষ্ট যে হইয়া থাকে, [ত]াহাতে ত কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ চা-পানে [শ]রীরের কোনই উপকার হয় না—উহাতে পুষ্টিকর [প]দার্থ এতটুকুও নাই। সুতরাং এই অনাবশ্যক [নে]শা যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভাল। আমরা বলি, [চা]কে আবগারি আইনের আমলে আনা হউক। [তা]হা হইলে চায়ের ব্যবহার কিছু কমিতে পারে।

[ক]ুল্পী বরফ!

[কু]ল্পিওয়ালা যখন হাকিয়া যায়—'কুল্পী বরফ'! তখন [ছে]লে-বুড়ো,—কাহার না জিহ্বায় রস সঞ্চার হয়? সেই কুল্পী বরফের ভাগ্য হঠাৎ ফিরিয়া গিয়াছে—তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনের নেকনজরে পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কুল্পী বরফ অখাদ্য! পচা, পরিত্যক্ত দুধ-চিনি ইহার উপকরণ। কুল্পী বরফ তৈয়ার করিবার টীনের খোল প্রত্যহ রীতিমত পরিষ্কার করা হয় না। এই টীনের খোলগুলির রং কালো—টীনের কোন লক্ষণই ইহাতে দেখা যায় না। খোলগুলি যে কতকালের জিনিস তাহা তাহার রূপ দেখিয়া বুঝিবার যো নাই—তাহার বয়স নির্ণয় করিবার কোন রকম কোষ্ঠি মেলা ভার। কলিকাতা কর্পোরেশনের বৈঠকে এই কুল্পী বরফের কথা উঠিয়াছিল। সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, খাদ্য-পরিদর্শকেরা (food inspectors) কুল্পী বরফ পরীক্ষা করিয়া (পরীক্ষার প্রণালীটা কিরূপ?—খাইয়া কি?) যদি খারাপ দেখেন, তবে সমস্ত কুল্পী নষ্ট করিয়া দিবেন। কেবল এই ব্যবস্থা করিয়াই মিউনিসিপ্যালিটী ক্ষান্ত হন নাই। খবরের কাগজে এই সিদ্ধান্ত-কথা প্রচার করিয়া দিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন পর্য্যন্ত! মিউনিসিপ্যালিটীর এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু একা কুল্পী বরফই কি অপরাধী? ঠক বাছিতে গাঁ ওজোড় হইয়া যাইবে যে! যে সকল অখাদ্য জিনিষ রূপান্তরিত হইয়া খাদ্য রূপে পুনঃ পরিণত হয়, তাহার যদি একটা তালিকা সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে সে তালিকা লম্বায়-চওড়ায়, আড়ে-ওসারে নেহাৎ ছোট হইবে না। আপাততঃ আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এখনই হাতে হাতে ইহার পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিবেন। এবার আমের ফলন প্রচণ্ড রকমের হইয়াছে—লোকে খাইয়া উঠিতে পারিতেছে না—অনেক আম পচিয়া যাইতেছে—কিন্তু নষ্ট হইতেছে না। আমওয়ালাদের বাজরায় পচা আম অনেকেই দেখিতে পাইবেন: কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর "ডাষ্ট-বিনে" (ময়লা

ফেলিবার বাক্সে) আমের আঁটি ছাড়া, ১টিও পচা আম দেখা যাইবে না। আম পচিয়া গেলে ফেলা যাইতেছে কি? রাম! তবে সে পচা আম কি হইতেছে—কোথা যাইতেছে? একটু অনুসন্ধান করিলেই মিউনিসিপ্যালিটী দেখিতে পাইবেন এবং জানিতে পারিবেন—ঐ পচা আম নিঙড়াইয়া ছেঁকিয়া উহার সহিত তেঁতুল ও গুড় মিশ্রিত হইয়া উহা শুকানো হইতেছে। আম ফুরাইলে ঐ পচা জিনিসটা ফিরিওয়ালাদের স্কন্ধে চড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, এবং 'আমসত্ত্ব' নামে ছেলেদের উদরস্থ হইয়া পীড়া উৎপাদন করিবে। মিউনিসিপ্যালিটী এক কাজ করুন—সকল রকম অখাদ্য, ভেজাল, পচা ও নোংরা খাদ্যের একটা তালিকা প্রস্তুত করুন,—কোন্ কোন্ নোংরা জিনিস কি রকম করিয়া রূপান্তরিত হইয়া আবার খাদ্যে পরিণত হয়, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করুন,—সেই সকল কুখাদ্য খাইলে কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে তাহা স্থির করুন,—কোথায় কাহারা কি প্রণালীতে কোন কোন অখাদ্য জিনিস প্রস্তুত করে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করুন। এই সকল কাজের পর এই সমস্ত বিবরণ সাধারণের গোচর করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করুন,—কর্পোরেশনের প্রজা নগরবাসীদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করুন। কেহ এরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব; এবং সাধারণ্যে যাহাতে তাহার সুপ্রচার হয়, সে পক্ষে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিব না।

শিশু-মঙ্গল।—

লেডী চেমসফোর্ড লীগের তত্ত্বাবধানে ভারতে মাতৃত্ব ও শিশু-মঙ্গল সংক্রান্ত ব্যাপারের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতের নানাস্থানে যে সকল শিশু-মঙ্গল সমিতি আছে, তাহারা সারা বৎসর ধরিয়া খাটিয়াছে খুব—কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুণ বাধা পাওয়াতে আশানুরূপ কাজ হয় নাই। কথাটা ঠিক বটে—লোকের অজ্ঞতায় এদেশের অনেক সদনুষ্ঠানেই বাধা উপস্থিত হয় এবং তাহা পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু এ রকম ত ঘটিবার কথা নয়! দেশের জনসাধারণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মূর্খ রহিয়াছে কেন? কেন দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক নিরক্ষর, বর্ণজ্ঞানহীন, মূর্খ? দেড়শতাধিক বৎসর বৃটিশ গবরমেণ্টের ও বৃটিশ জাতির শাসনাধীন থাকিয়াও এ দেশের লোক-সাধারণের মধ্যে শতকরা ৫ জনের বেশী লোক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইতেছে না কেন? প্রায়ই দেখি, দেশের লোকের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পরায়ণতার ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করা হয়। ইহা কি উচিত এবং সঙ্গত? লোক-শিক্ষার ভার যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, যাঁহারা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য দায়ী, যাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটিতে দেশের মূর্খত্ব ঘুচিতেছে না, অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের মুখেই বিশেষ করিয়া এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পওয়া যায়, যে, মূর্খ লোকে বাধা দেয় বলিয়া তাঁহারা অনেক সদনুষ্ঠানে সফলতা লাভ করিতে পারেন না। জন-সাধারণ তাঁহাদের এই অভিযোগের কি জবাব দেয় তাহা তাহারা জানেন কি? ভারতের কোটী কোটী নিরক্ষর মৌন মূক জনসাধারণ তাহাদের নীরব ভাষায় এই জবাব দেয় যে, তোমরা আমাদের মূর্খ বানাইয়া রাখিয়াছ কেন? আমাদের মূর্খতার জন্য তোমাদের শাসন-কার্য্যে কত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়—শাসন-কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না—তথাপি আমাদের মূর্খতা ঘুচাইবার ব্যবস্থা কর না কেন? আমরা বৎসরে বৎসরে শত শত কোটী টাকা ট্যাক্স দিতেছি—সেই টাকা সকল রকম বাবদেই খরচ করা হইতেছে; অথচ আমাদের লেখা পড়া শিখাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় না—শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কথা উঠিলেই তহবিলে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। অতএব আমরা কি করিব? মূর্খ আমরা—তোমাদের সদভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কু-সংস্কারের ফলেই আমরা তোমাদের সকল কাজে বাধা দিয়া থাকি। ইহা কি আমাদের দোষ? তবে কেন কথায় কথায় আমাদের মূর্খতার দোহাই দাও? আমাদের দেশে একটা শাস্ত্রীয় কথা আছে যে, বলি রাজা শত মূর্খের সহিত স্বর্গবাস করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতগণের সহবাসে পাতালে বাস করা পছন্দ করিয়াছিলেন। মূর্খতার দোষ যখন এত বেশী, তখন আগে আমাদের মূর্খতা দূর করা তোমাদের উচিত। তাহা না করিয়া কথায় কথায় আমাদের মূর্খতার দোহাই দাও কেন?

দ্রষ্টব্য।—স্থানাভাব বশতঃ বর্ত্তমান মাসে "পল্লী-স্বাস্থ্য" ও প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা ছাপা গেল না; এই মাসের প্রশ্নোত্তর আগামী শ্রাবণের সহিত একযোগে বাহির হইবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৯ সাল { ৪র্থ সংখ্যা

সংক্রামক রোগ ও তাহা নিবারণের ব্যবস্থা।

(জনৈক দীন-সেবক সঙ্কলিত)

সংক্রামক রোগের ভয় সকলকারই মনে প্রবল। কিন্তু ইহার ভয় যত, ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা, কৈ, এমন কি শিক্ষিত লোকেদের মধ্যেও ত তত দেখা যায় না। যা কিছু সাময়িক চেষ্টা হয়, তাহাও ভয়ে, এবং পুরাপুরি গোঁজামিল দেওয়ার হিসাবে!!!

কোন বাড়ীতে বা পল্লীতে কাহারও সংক্রামক পীড়া হইলে, ঐ বাটীর বা পল্লীর লোকেরা প্রায়ই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারা একবারও স্থির ভাবে চিন্তা করেন না। কিন্তু তাঁহাদের এই চিন্তাহীনতা বা মনবধানতা বশতঃ তাঁহারা কতই যে আপনাদের ও প্রতিবেশীদিগের বিপদ সংঘটন করেন তাহা বলা যায় না।

তাই সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ কালে কি করা উচিত, তাহাই কথঞ্চিৎ এখানে লিপিবদ্ধ হইল।

সংক্রামক পীড়া কেন হয় তাহা বলিবার আপাততঃ আবশ্যকতা নাই। হাম, বসন্ত, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড্, ম্যালেরিয়া, ক্ষয়কাশ, প্লেগ ইত্যাদি যে সংক্রামক রোগ, তাহা সকলেই জানেন। কোন বাটীতে কাহারও এইরূপ কোন সংক্রামক পীড়া হইলে, সেই বাটীর লোকদিগের প্রধানতঃ তিন প্রকার কর্ত্তব্য উপস্থিত হয়।

প্রথম কর্ত্তব্য—রোগীর প্রতি। রোগীর যাহাতে উত্তমরূপে চিকিৎসা এবং সেবা হয়, তাহা করা সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য; এবং তাহাকে এমন ভাবে রাখা উচিত, যাহাতে তাহার রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—আপনাদিগের প্রতি।

পরিবার মধ্যে কাহারও সংক্রামক পীড়া হইলে, পরিবারের অপর সকলেরই দেহে সেই রোগ সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা জন্মে। যাহাতে তাহা না হয় এবং যাহাতে তাঁহারা সকলেই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয় কর্ত্তব্য—প্রতিবেশীদিগের প্রতি।

প্রতিবেশী অর্থে যে কেবল বাটীর চতুঃপার্শ্বে যাঁহারা বাস করেন, তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। সংক্রামিত বাটীর লোকেরা যেখানে যাঁহাদের সংশ্রবে ক্ষণকালের জন্যও গমন করেন, তাঁহাদিগকেও প্রতিবেশী রূপে গণ্য করিতে হইবে। এই প্রতিবেশীগণের বাটীতেও সংক্রামক পীড়া হইলে, তাঁহাদের নিকট যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করা হয়, বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের প্রতিও সংক্রামিত বাটীর পরিজনদিগের সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রতিবেশী কাহারো বাটীতে কোন সংক্রামক পীড়া হইলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি না যে, তাঁহারা সেই রোগ আনিয়া আমাদের বাটীতে সংক্রামিত করিয়া দেন, সেইরূপ আমাদেরও বাটীতে সংক্রামক পীড়া হইলে, আমরাও যেন আমাদের বাটীর রোগ তাঁহাদের বাটীতে সংক্রামিত করিয়া না দিই—এটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। অপরের নিকট যে ব্যবহার প্রত্যাশা করি, অপরের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত,—এই যে সুনীতি, ইহা সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ কালে যেমন পালন করা বিশেষ আবশ্যক হয়, এমন বোধ হয় আর কোন কালেই নহে। কিন্তু এ বিষয়ে লোকের যে কতই অনবধানতা দৃষ্ট হয়—তাহা বলিতে পারা যায় না।

বাটীতে সংক্রামক পীড়া হইলে পরিজনদিগের মধ্যে কেহই মনেও ভাবেন না যে, তাঁহারা অন্যের রোগীর নিকট গেলে তাঁহাদেরও সেই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। অতএব তাহা করা কখনই উচিত নয়। সংক্রামক রোগের আক্রমণ কালে এরূপ উদাসীনতা যে কি ভয়ঙ্কর পাপ এবং অন্যায় তাহা বলা যায় না।

একবার লিভারপুলে আরক্তজ্বর (স্কার্লেট ফিভার) চারিদিকে ব্যাপৃত হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, মাত্র দুই ব্যক্তির বাটীতে সেই রোগ হইলেও, সেই দুই বাড়ীর লোকেরা কার্য্যোপলক্ষে ভাড়া গাড়ীতে পল্লীর অন্যান্য ব্যক্তির গৃহে যাতায়াত করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যেও সেই রোগ সংক্রামিত করেন, এবং বাড়ীতে সংক্রামক রোগ সত্ত্বেও সেই বাড়ীর দুই স্ত্রী-পুরুষ গির্জ্জায় গিয়া সাধারণ উপাসকদিগের মধ্যে বসিয়া সেই রোগের বীজ ছড়াইয়া আসেন। আবার কোন রোগ সংক্রামিত বাটীর গৃহ-দ্রব্যাদি বিক্রীত হওয়াতে রোগের সংক্রমণ ব্যাপক হইয়া পড়ে।

সংক্রামক রোগ কিরূপে ব্যাপক হয়, তাহার আরও একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। হল্ (Hull) সহরের কোন বাটীতে দুইটী শিশুর একবার বসন্ত রোগ হয়। শিশুদের বসন্ত রোগ হইলেও তাহাদের মাতা পিতা অপর একটী শিশুকে লইয়া এক প্রকাশ্য ধর্ম্মসভায় গমন করেন। ধর্ম্মসভাতেই তাহাদের তিনজনেরই জ্বর হয়। সেখান হইতে তখনই তিনজনকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। বাটী হইতে অপর দুইটী শিশুকেও সেই হাঁসপাতালে আনা হইল। কিন্তু মাতা পিতা যে শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া ধর্ম্মসভায় গিয়াছিলেন, হাঁসপাতালে আনিবার তিন ঘণ্টার মধ্যেই বসন্ত রোগে তাহার মৃত্যু হইল এবং মাতা পিতার অবিলম্বে বসন্ত রোগ দেখা দিল।

বাস্তবিক, সংক্রামক রোগের আক্রমণকালে কি করা কর্ত্তব্য তাহা না জানাতেই ঐ সমুদায় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, এবং সকলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করিলে, এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার প্রায় সম্ভাবনাই থাকিবে না; এবং দেশের যে কতই কল্যাণ সাধিত হইবে ও কত প্রকার ব্যাধির

প্রকোপ হইতেই যে দেশ রক্ষা পাইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে সকলেরই জানা উচিত যে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় রোগীর স্বতন্ত্রীকরণ (আইসোলেসন্ বা সেগ্রিগেসন্)। কি রোগী, কি তাহার পরিজনগণ, সকলকার পক্ষেই এই বিধি। কোন জাহাজে রোগ উপস্থিত হইলে সেই জাহাজকে যেমন বন্দরে ঢুকিবার পূর্ব্বে মধ্য সমুদ্রে দশ পনের দিনের জন্য আটকাইয়া (Quarantine) রাখা হয়, তেমনি যে বাড়ীতে কোনও প্রকার সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হয়, সে বাড়ীর লোকগণকে সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য লোক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা উচিত। অর্থাৎ কিছুকালের জন্য অন্যান্য সকলকার সহিত সে গৃহের লোকদিগের সংস্রব একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সংক্রামিত বাটীর বালকদিগকে, স্কুলে গিয়া সেখানকার অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে রোগের বীজ বপন করিয়া আসিতে দেওয়া, এবং বয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিজ নিজ কার্য্যস্থানের অন্যান্য সহকর্ম্মচারীদিগকে সেই রোগে সংক্রামিত করিতে যাওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ অসাবধানতা যে নিতান্তই অমার্জ্জনীয় পাপ তাহা বলা বাহুল্য। ইহা সর্ব্বতোভাবেই নিবারিত হওয়া উচিত।

সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকেও সর্ব্ব প্রথমেই তাহার অন্যান্য পরিজনবর্গ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করা বিধেয়। যে ঘরে তাহার অন্যান্য পরিজনেরা শয়ন করেন, তাহা হইতে যতদূর সম্ভব দূরস্থ পৃথক একটী ঘরে রোগীকে রাখা উচিত। পল্লীগ্রামে কাহারও বসন্ত হইলে, শীতলা দেবী রোগীর ঘরে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন এই সংস্কারে, সে ঘরে একজন ব্যতীত অপর কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় না এবং রোগীর নিকটেও অপরিষ্কার ভাবে সর্ব্বদা বড় কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। তাহার অর্থও অনেকটা ঐ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহা হউক, এই প্রথাই সংক্রামক রোগ নিবারণের প্রধান ঔষধ।

যে বাটীতে স্থানের সঙ্কীর্ণতা এরূপ যে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবার সম্ভাবনা নাই, সে বাড়ীর রোগীকে অবিলম্বে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। এদেশে হাঁসপাতালের বন্দোবস্ত এখনও তাদৃশ আশানুরূপ নয় বলিয়া, অনেকের তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আছে সত্য, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বাটীতে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা অসম্ভব সে বাটীতে থাকা অপেক্ষা হাঁসপাতালে যে অনেকাংশে রোগী ভাল থাকিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং আমাদের মনে হয়, বিলাতের ন্যায় এখানেও হাঁসপাতালের এমন সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত, যাহাতে ভদ্র শ্রেণীর লোকেরাও হৃষ্ট চিত্তে হাঁসপাতালে গিয়া চিকিৎসিত হইতে স্বীকৃত হইবেন। যাহা হউক, যে কোন প্রকারে সম্ভব রোগীকে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করা যে রোগ-বিস্তার নিবারণের এবং রোগীকে আরোগ্য করিবার প্রধান উপায়, ইহা সকলেরই জানা উচিত।

সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করা—ইহাই রোগ নিবারণের একমাত্র ব্যবস্থা। ইহাতে রোগীও আরোগ্য হয় এবং তাহার পরিজনগণও রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। সংক্রামক রোগের হাঁসপাতালও এইজন্য অন্যান্য হাঁসপাতাল হইতে যথা সম্ভব স্বতন্ত্র স্থানে স্থাপিত হয়। ইহাতে রোগের সংক্রমণ নিবারিত হয়। রোগ একই স্থানে আবদ্ধ করা হয়, এবং রোগের বিষ ব্যাপক হইতে দেওয়া হয় না।

এখানে বলা আবশ্যক, সংক্রামক রোগ এক প্রকার বীজাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বীজাণু এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত বা সংক্রামিত হইয়া রোগ বিস্তার করে। এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যতদূর সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস যে, এই বীজাণু সঞ্চালিত হইতে না পারিলে, এরূপ রোগ কখনই বিস্তৃত হইতে পারে না। তবে যে সময়ে সময়ে কোন কোন বহুদূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় নিভৃত প্রদেশবাসী

কৃষকের কুটীরেও সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, তাঁহারা তাহার কারণ এইরূপ অনুমান করেন যে, কোন দূর দেশ হইতে বায়ুযোগে বীজাণু সঞ্চালিত হইয়া এরূপ হয়। আরও, পবিত্র বায়ু সঞ্চালিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানের মধ্যেও আবর্জ্জনা, গলিত দ্রব্য বা অপবিত্র জল জমিয়া থাকিলে, সেখানেও সংক্রামক রোগের বীজাণু অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে মহামারি বিস্তৃত করিয়া থাকে।

সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা না করিলে কি ফল হয়, ডাক্তার রসেল-লিখিত নিম্ন-লিখিত বিবরণী পাঠ করিলে তাহা বিশদরূপে বুঝা যাইবে। ডাক্তার রসেল বলেন "২৩শে ডিসেম্বর একটী ক্ষুদ্র অপরিষ্কার বাড়ীতে চারিজন ব্যক্তির টাইফাস জ্বর হয়। এই ব্যারাম এক স্থানে লোকের সমাগম, অপরিচ্ছন্নতা ও দৈন্যের ফল। অনুসন্ধানে জানা গেল, বাড়ীর কর্ত্তা কিছুদিন পূর্ব্বে টাইফয়েড্ জ্বর (বাতশ্লেষ্মা বিকার) হইতে আরোগ্য লাভ করেন। যাহা হউক, বাড়ীর অবশিষ্ট পরিজনদিগকে স্বতন্ত্র একটি বাড়ীতে গিয়া থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়; কিন্তু তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। গৃহটী যথা সম্ভব পরিষ্কার করা হয়, এবং ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌টেণ্ট বা সংক্রামণ নিবারণী পদার্থ দ্বারা গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি ধৌত করা হয়। কিন্তু পরিজনবর্গের নিজ-নিজ পরিধেয় বসনাদিতে কোন প্রকারে হাত দেওয়া হয় নাই। ১৮ই জানুয়ারী একটী ছেলেকে এবং ১৪ই আর একটীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে হয়। আবার সংক্রামণ নিবারণকারী ঔষধের দ্বারা গৃহ ধৌত করা হয়। পরে উক্ত বাটীর একটী শিশু সন্তানকে লালন-পালনের জন্য এক প্রতিবেশীর নিকট রাখা হয়। কিন্তু ২২শে জানুয়ারী সেই প্রতিবেশীর দুই বয়স্থা কন্যাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে হয়। শিশুটীর পিতা টাকার জন্য বিবাদ করিয়া সেই প্রতিবেশীর নিকট হইতে উহাকে লইয়া অপর একজনের নিকট রাখিয়া আসেন। কিন্তু ৩০শে জানুয়ারী সেই শিশুটীরই টাইফয়েড হয়। এবং ১লা ফেব্রুয়ারী সেই রাস্তায় একটী অপরিষ্কার বাড়ীতে ছয়জন লোকের একেবারে উক্ত রোগ হয়। ঐ বাটীর গৃহস্বামী সময়ে সময়ে বস্ত্রাদি ধৌত করিত এবং ধৌত করিতে করিতে ছেঁড়া নেকড়া ও অন্যান্য পরিত্যক্ত পদার্থ কলের মধ্যে বা বিছানার নীচে ফেলিয়া রাখিত। এই মহিলার দূর সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় বহু দূরে এক অপরিষ্কার ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিত। তাহার এবং তাহার কন্যারও অবিলম্বে এই রোগ হয়।" কোন বাড়ীতে সংক্রামক পীড়া হইলে যে আমাদের দেশে ধোপার বাড়ী কাপড় কাচিতে দেওয়া হয় না, নাপিতের কাছে কামানো হয় না, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় না, নদীপার হইতে নাই,—তাহারও কারণ এই যে, ঐ সকল কায করিলে সংক্রামক পীড়ার বীজ অন্য লোকদিগকে আক্রমণ করে।

উপরিউক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, একটী লোকের বীজ হইতে সংক্রামিত হইয়া, আঠারজন ব্যক্তিকে সেই রোগে আক্রমণ করে। খুব সম্ভব পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিলে রোগ কখনই এত ব্যাপক হইত না।

অতএব রোগীকে সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করাই যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা যেন কেহ কখনও বিস্মৃত না হন।

রোগীকে স্বতন্ত্র ঘরে রক্ষা করিয়া, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন সে রোগের বীজ কিছুতেই বাটীর অন্যান্য ঘরে বা বাতাসের সাহায্যে অন্যত্র গমন করিতে না পারে। রোগীর ঘরটীকে স্বতন্ত্র একটী একজন লোকের হাঁসপাতালের ন্যায় গণ্য করিতে হইবে। এই গৃহের চারিদিকে সংক্রামকতা নিবারক দ্রব্য ছড়াইয়া এই গৃহটীকে অন্যান্য ঘর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। রোগীর ঘরটী রীতিমত সংক্রামণ নিবারক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিতে হইবে এবং সে ঘরের কাপড় তৈজসাদি অন্য ঘরে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেও তাহা করিতে হইবে। রোগীর যাহারা সেবা করিবে তাহারা যেন

বাটীর অপর কাহারও সহিত সংশ্রব না রাখে। অপর কোন সুস্থ ব্যক্তির সহিত রোগীর সংশ্রব একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। রোগ যেমন ভয়ানক রোগীর ঘরটীরও তেমনি সুবন্দোবস্ত করা উচিত। রোগ আরোগ্য হইলেও রোগীর ঘর, তাহার কাপড়, বিছানা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিশেষরূপে সংক্রামণ নিবারক ঔষধ দ্বারা সংশোধন করা বিধেয়।

কোন রোগ হইলে চিকিৎসককে ত ডাকিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রোগীকে স্বতন্ত্র ঘরে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। ইচ্ছা পূর্ব্বক অনেক শিশুকে রোগীর নিকট যাইতে দিয়া যে সহজে রোগ সংক্রামিত হইতে দেওয়া হয়, ইহার তুল্য অন্যায় কাজ আর কিছুই নাই। স্বাস্থ্যের ন্যায় অমূল্য নিধি দেহধারী ব্যক্তির আর কি আছে? কিন্তু সে স্বাস্থ্যকে সহজে নষ্ট হইতে দেওয়া কত বড় অন্যায় এবং অপরাধ তাহা বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, কি এ দেশে কি বিলাতে, অনেকের সংস্কার এইরূপ যে, বসন্তাদি সংক্রামক রোগ একদিন না একদিন হইবেই হইবে। কিন্তু এ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। সকলেরই জানা উচিত যে, সংক্রামক রোগ নিবারণ করা মানুষের যথেষ্টই সাধ্যায়ত্ত রহিয়াছে। রোগীকে প্রথমেই স্বতন্ত্র করিতে পারিলে এবং শীঘ্র শীঘ্র চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলে, এ রোগ অনেক পরিমাণেই নিবারিত হইতে পারে। এবং অন্য লোকও ইহা দ্বারা সংক্রামণ হইতে রক্ষা পায়। অতএব এ বিষয়ে কখনই কেহ যেন অবহেলা না করেন।

সংক্রামক রোগ কিরূপে সংক্রামিত হয়?

এক্ষণে সংক্রামক রোগের প্রকৃতি কি, তাহাই বলিব। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল, মূত্র, থুথু, গয়ার বা গুটিকার খোলস হইতে সেই সেই রোগের কারণভূত বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে; এবং এক এক প্রকার সংক্রামক রোগের এক এক রকম বিষাক্ত পদার্থ আছে। সেই বিষাক্ত পদার্থ কোন সুস্থ দেহে সংক্রামিত হইলে, সেই প্রকার রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। সংক্রামক রোগের বীজ বা বিষাক্ত পদার্থ এইরূপে রোগীর দেহ হইতে অন্য সুস্থ দেহে সঞ্চালিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। সুতরাং সংক্রামণ অর্থে রোগের বীজ বপন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রোগের এই বীজ বপন সম্বন্ধে প্রফেসার টিণ্ডেল বলেন যে, জীবনের বীজ যেমন এক জীবন হইতে আর এক জীবন উৎপাদন করে সংক্রামক রোগের বীজাণুও সেইরূপ। সামান্য একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন এক প্রকাণ্ড ওক বৃক্ষ জন্মিয়া আবার অনেক বৃক্ষের বীজ প্রসব করে, এবং একটী সামান্য বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে ওক-বন উৎপন্ন করে, সংক্রামক রোগের বীজাণুও ঠিক সেইরূপ এক জায়গায় অঙ্কুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নূতন বীজাণু সঞ্চার করে এবং সুস্থ মানবের দেহে আহার পান বা জীবন যাপনের উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপক হইয়া পড়ে। বংশবৃদ্ধি করিয়া ধানের বীজ হইতে যেমন গম হয় না, কেবল ধান্যই উৎপন্ন হয়,—তেমনি বসন্তের বীজাণু হইতে অন্য কোন সংক্রামক রোগ আর উৎপন্ন হয় না,—কিন্তু বসন্তই হইয়া থাকে; এবং বসন্তেরই বীজ প্রসব করিয়া থাকে। বাস্তবিক, মিস্ নাইট ইজেল যেমন বলেন যে, কুকুর বিড়ালের যেমন বংশ বৃদ্ধি হয়, সংক্রামক রোগের বীজাণু তেমনি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তবে এক বীজাণু হইতে ঠিক একই রকমের রোগ উৎপন্ন না হইয়া রোগের প্রকৃতি যে কোথাও কোথাও বিভিন্ন হয়,—একই মা বাপ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির যেমন সন্তান জীবদিগের মধ্যে জন্মিয়া থাকে, ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

পূর্ব্বে স্পর্শরোগ এবং সংক্রামক রোগ পৃথক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। রোগীকে প্রত্যক্ষ ভাবে স্পর্শ করিলে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগই স্পর্শরোগ, এবং যে রোগ বায়ুযোগে সঞ্চালিত হয়, তাহাই সংক্রামক

রোগ। কিন্তু এক্ষণে উভয়কেই একশ্রেণীভুক্ত করা হয়। সুস্থ ব্যক্তির নিঃশ্বাসের দ্বারা বা আহার, বা পানীয়ের দ্বারা তাহার রক্তে রোগের বিষ সঞ্চারিত হইলেই, কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; যথা, টাইফয়েড্ জ্বর, ওলাউঠা, ডিফ্‌থিরিয়া, আরক্ত জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি।

বিসর্প এবং রক্তদুষ্টির জ্বর প্রভৃতি কয়েকটী রোগ ক্ষত স্থানের স্পর্শে অন্য দেহে সঞ্চালিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কত রকমে যে সংক্রামক রোগ সংক্রামিত হয়, তাহা সম্যকরূপে নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান্‌বিদ্ পণ্ডিতের মতে, মূর্খতার পরিচয় মাত্র।

DISINFECTANT বা সংশোধক পদার্থ।

এক্ষণে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান্‌বিদ্ পণ্ডিতগণের সকলেরই সিদ্ধান্ত এই যে—সংক্রামক রোগের বিস্তার নিবারণের অন্যতম উপায়—সংক্রামণ নিবারক ঔষধ বা ডিসইন্‌-ফেক্‌ট্যাণ্ট। সুতরাং disinfectant কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে এবং যথার্থ কার্য্যকরী disinfectant কি কি তাহা জানা দরকার।

প্রথমতঃ disinfectant কি তাহা জানা দরকার। যে দ্রব্য দ্বারা রোগের বীজ নষ্ট হয় বা তাহার বিষাক্ততা চলিয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ disinfectant বলা যায়। এই সাধারণ অর্থে এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহার কার্য্য ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন Oxygen gas সংক্রামক বিষে মিশ্রিত হইয়া তাহার প্রকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। আবার অন্য কোন দ্রব্য আছে যাহাতে কোন বিষের বিষাক্ততা মাত্র নষ্ট করে। আবার অগ্নি এবং উত্তাপের ন্যায় disinfectant রোগের বিষ নানা প্রকারে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

এক্ষণে disinfectant কি তাহা বলা হইতেছে। সহজ-লভ্য disinfectant গুলির মধ্যে oxygen gas প্রধান। এই gas দ্বারা সকল প্রকার বিষাক্ত পদার্থই নষ্ট হয়। আমাদের চারিদিককার বায়ু ঐ gasএ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহা বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাহাকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে।

ঘরে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত হইলে oxygen gas তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। যে ঘরে বায়ু সঞ্চালিত না হয়, এবং যে ঘরে অনেক লোক বাস করে সেই ঘরেই প্রায় Typhus fever হয়। ঘরে বায়ু সঞ্চালিত হইতে দেওয়া Typhus fever নিবারণের প্রধান ব্যবস্থা। এই রোগের বীজ পাতালে যতক্ষণ বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে, ততক্ষণ এ রোগের সংক্রামণ ব্যাপক হইতে পারে না। কিন্তু বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই রোগ সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করে। বাস্তবিক, যে বায়ু-সাগরে আমরা জীবন যাপন করি ও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, সংক্রামক রোগের যে বীজ তাহাতে সঞ্চালিত হয়, এই বায়ু-সঞ্চালন দ্বারাই oxygen gas যোগে সেই রোগের বীজ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ডাক্তার উইলসন বলেন যে, প্রকৃতির আপন স্বাভাবিক ক্রিয়াতেই disinfectantএর অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। দূষিত গ্যাসসকল আপনা হইতেই প্রসারিত হইয়া থাকে; জীবদেহ নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ সকল আপনা হইতেই উদ্ভিজ্জে পরিণত হয়। বায়ুতে যে কিছু দূষিত পদার্থ থাকে, তাহা বৃষ্টির পতনে নিম্নে পতিত হয়। এবং তাহার মধ্যে অধিকাংশ পদার্থই oxygen gas যোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, এই সকল স্বাভাবিক disinfectantএর ক্রিয়া না থাকিলে, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা ফলপ্রদ হইত না। এবং সে সকল উপায়ও যে কার্য্যকর হয়—তাহারও কারণ, তাহারা প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট বিষ নাশের উপায় অনুসরণ করে বলিয়া।

যাহা হউক, পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালনই যে একটী সহজ-লভ্য এবং প্রধান disinfectant তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

পল্লী-সংস্কার।

লেখক—শ্রীচক্রধর সাহা।

জলরক্ষা।

আমরা "জল ও জলাশয়" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যাহা ইতিপূর্ব্বে "স্বাস্থ্য সমাচারে" লিখিয়াছি, বিষয়টীর গুরুত্ব বিচার করিলে তাহা অতি নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। আমাদের দেশে রোগ, পীড়া, অস্বাস্থ্য ক্রমে এত শোচনীয় বেগে বিস্তৃত হইতেছে যে, তাহার আশু নিবৃত্তির চেষ্টা ব্যতীত জাতির জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই। মনুষ্য জীবনের পক্ষে বায়ুর পরেই জলের প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের যেমন প্রয়োজন, স্নান ও অন্যান্য কার্য্যেও বহু পরিমাণ জলের একান্ত আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার যো নাই। বঙ্গদেশ "নিম্নপ্রদেশ" নামে অভিহিত ও ইহা বহু নদনদী দ্বারা অতি সুন্দররূপে বিধৌত ও উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি কেবল বর্ষা ঋতু ব্যতীত আমাদের অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতস্বতীতেও জলাভাব ক্রমশঃ বেশ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল অংশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু নদী ও বিল প্রভৃতি ছিল, এবং যাহার ফলে তদঞ্চলবাসীর জলের ক্লেশ দূর হইত, সম্প্রতি তাহার অধিক স্থলেই গ্রীষ্মকালে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়। আমাদের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতায় যতদূর সম্ভব তাহাতেও এ কথা অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, এই বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ ও গত বর্ষের চৈত্র মাসে এতদঞ্চলের অনেক গ্রামে মানুষের পানের উপযোগী জলের সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছিল। অতি অল্প সংখ্যক পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতিতে নিতান্ত নগণ্য জল সংস্থানেরও এমন শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, বলিতে গেলে বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় বহুলোকেরই বিশুদ্ধ পানীয় জলের দারুণ অভাবে কোন কোন দিন এক বিন্দু জল পানও ঘটিয়া উঠে নাই। যাহারা পিপাসায় ম্রিয়মান হইলেও দূষিত জল পান করে না, তদ্রূপ লোকের পক্ষে এটি সম্ভব হইলেও, অপর সাধারণ লোক এ অবস্থায় কি করিয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন। শ্রমজীবীই হউক আর স্বল্প পরিশ্রমী ভদ্রলোকই হউক, পিপাসার জ্বালায় এই প্রচণ্ড রৌদ্রে জলপানে বিরত থাকা অনেক স্থলেই অসম্ভব ও ক্লেশ-জনক ব্যাপার। সুতরাং শত সহস্র লোক নিতান্ত কলুষিত কর্দ্দমাক্ত ও বিষাক্ত জল পান করিয়া আপন হাতে দেহকে রোগের লীলাভূমি করিয়া তুলিতেছে। এ সমস্ত কিছুমাত্র কল্পিত কথা নহে; অথবা ইহাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই। সাক্ষাৎ ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ইহা একটি অতি সত্য ও প্রমাণিত নিদর্শন।

বৃহৎ বৃহৎ নগর ও তাহার অনুরূপ স্বাস্থ্যায়োজন বাদ দিয়া পল্লী অঞ্চলের কথা ভাবিলে ইহা একটী অতিবড় সত্য যে, পল্লীই দেশের প্রাণ, পল্লীই দেশের মূল ভিত্তি ও পল্লীই দেশের অস্থি মজ্জা;—এক কথায় পল্লী-সমষ্টিই দেশ। সুতরাং পল্লীর জল সংস্থান ও জল রক্ষাই আমাদের এবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেশের শাসনকর্ত্তা ও সম্প্রতি দেশীয় মন্ত্রীর উদ্ভাবিত স্বাস্থ্য সংরক্ষার ও ব্যাধি-প্রতিষেধের ব্যয়-বহুল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কোনও দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করিলেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। সসম্মানে সে সমস্ত জাহাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র "আদার ব্যাপারীর" যাহা লইয়া কারবার তাহারই যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া, দেশের অকপট হিতৈষী ও সূক্ষ্মদর্শী নীরব কর্ম্মীদের সাহায্যে—অতি অকিঞ্চিৎকর ও ধীরগতিতে হইলেও—যাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে, তাহাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

বিগত ২৬ শে এপ্রিলের "অমৃত বাজার পত্রিকায়" জল সংস্থান (water supply) বিষয়ে যে একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা এত অধিক সময়োপযোগী, সুন্দর ও সহজ কথায় পরিপূর্ণ যে, উক্ত প্রবন্ধ পাঠের পরেই জলরক্ষা বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের মনে এই নগণ্য প্রবন্ধের কথা উদিত হয়। সুতরাং বলিতে গেলে উক্ত প্রবন্ধের সার লইয়া ও স্থানে স্থানে উহার মূল উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বিষয় স্বাস্থ্য সমাচারের জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"যেখানে পানীয় জলের পরিমাণ অল্প অথচ সেই জলে মলিনতা অধিক, সেখানে রোগের উৎপত্তি অধিক হইবেই হইবে। আবার জলের পরিমাণ প্রচুর ও মলিনতা অল্প হইলে, রোগের অল্পতা ও নিবার্য্য রোগে মৃত্যু-সংখ্যাও অল্প হইবে। এই সুলভ ও প্রচুর বিশুদ্ধ পানীয়ের মূল্য সুদূর পল্লীবাসী ও পথের লোকেও সহজেই বুঝিতে পারে। ওলাউঠা ও টাইফয়েডের বীজাণু উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেহেই পুষ্টিলাভ করে এবং রোগীর পরিত্যক্ত মল মূত্রাদি ধৌত করণ দ্বারাই ঐ সমস্ত বীজাণু জলমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জল উহাদের বাসস্থান নহে; সুতরাং জলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে অতি সত্বরই সূর্য্য-কিরণের ক্রিয়া ও পোষণ-শক্তির অভাবরূপ প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়ে উহাদের মৃত্যু ঘটে। অতএব নির্ম্মল জলের সংস্থানের জন্য আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, যাহাতে মানুষের পরিত্যক্ত মল মূত্রাদির সঙ্গে উহার সংস্পর্শ না ঘটিতে পারে। এবং যদি ইহার পরিহার একান্ত অসম্ভব ব্যাপার হয় ও প্রচুর জলের প্রয়োজন ঘটে, তবে উক্ত প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের সম্যক কার্য্যকারিতার জন্য যথোপযুক্ত ভাল জল সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক। সুতরাং এদেশের চিরাগত প্রথানুসারে লোকালয় হইতে বহুদূরে জলাশয় খনন করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে উচ্চ পাহাড় তুলিয়া জলকে সূর্য্যালোকের সম্যক ক্রিয়াধীন রাখা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট বিধানের তেমন কোন প্রয়োজন হয় না। এবং মানব স্পর্শদোষের সম্ভাবনা হইতে পরিমুক্ত অবস্থায় কোন ক্ষুদ্র চৌবাচ্চায় উত্তোলন সরোবরের জল পাম্পযন্ত্র (pump) সাহায্যে সঞ্চয় করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এই বিশুদ্ধ জল সংগ্রহের ধারণা আমদের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে একজন ভারতীয় সিবিল সার্জ্জন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বীজাণুতত্ত্বালোচনার বহু পূর্ব্ব যুগে খুলনা সহরে জল সরবরাহের এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইহা জীবাণুতত্ত্বের তীক্ষ্ণ মাপকাটীকেও তৃপ্তিদান করিয়াছে। তথাকার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহার উপর আর কোন উন্নত প্রণালীর প্রয়োগ আবশ্যক মনে করেন নাই। বিদেশীয় ব্যবসায়ী-শোষণকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠীত সারাবঙ্গে যে সমস্ত বহুব্যয়-সাধ্য অথচ কার্য্যকরী বালুকা শোধন যন্ত্র (filters) স্থাপন করা হইতেছে, ইহার উপরে সে ব্যয়ভারও চাপান হয় নাই। গত ১৯২১ সনের বঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগের বীজাণুবিদ্ কর্ত্তৃক ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে এই বিষয়ে লোক-মতের সঙ্গে খাঁটি বৈজ্ঞানিক মতেরও সামঞ্জস্য রহিয়াছে :—

"In the first place, an important point which I wish to emphasise is the fact that in tropical climates, waters which have been subjected to the beneficient effects of storage are quite fit for drinking purposes from an epidemiological point of view without any further process of filtration. I have already drawn attention to the fact that the raw tank water of Khulna is on an average, as good as the filtered water of Jessore, and this I attribute chiefly to the excellent setting arrangements at the former place. In England, Sir Alexander Houston has for years pointed out the great improvement which polluted waters undergo as a result of storage. In America also, extended researches confirmed the results obtained in England. Many factors play a part in the self-purification of water during storage. Of these forces, one of the most important is the bacteriological action of sunlight. Owing to the greater activity of the tropical sun, storage brings about a remarkable degree of purity in Indian waters. A tank water therefore which has been stored for about a fortnight may be taken as a perfectly safe water for portable purposes from an epidemiological point of view. As a matter of fact, some tank waters compare favourably, bacterially speaking, with even the filtered waters in many of the smaller water-works, testifying to the great efficiency of natural forces in effecting the self-purification of polluted water in tropical climates. We may therefore, confidently conclude that for small communities tank waters without artificial process of purifica'ion form an excellent source of water-supply, provided measures are taken to retain the water free from contamination at the edges by men or cattle and pumps are provided."

বিশুদ্ধ জলের যোগান বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকল দলের মতামতের উপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু দেশের অবস্থা বিবেচনা করিলে, কিরূপে সুলভে বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ হইতে পারে, সেইটী সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা লোকালয় হইতে বহু দূরে মুক্ত প্রান্তরে উচ্চ পাহাড় বেষ্টিত বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া তাহার জল মনুষ্য-সংস্পর্শ বর্জ্জিত অবস্থায় রক্ষা করার প্রস্তাব উঠিলে, জন সাধারণ দূরে থাকুক, তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও প্রস্তাবকারীর মস্তিষ্ক বিকৃতির সন্দেহ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের এই সোণার বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও কোন নূতন জলাশয় কেবল পানীয় জলের জন্য রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়া, সেই জলাশয়ে কাহাকেও স্নান বা মুখ হাত প্রক্ষালন করিতে নিষেধ করেন, তবে মূর্খ নিরক্ষর নরনারী কেন, ভদ্রলোকেও মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে থাকেন। অত্যল্প দিন পূর্ব্বে এই বিষয়ে বর্ত্তমান লেখকের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সহিত আলোচনা কালে জলের সঙ্গে মানব সংস্পর্শ বর্জ্জনের একটী অতি সহজ অথচ পরোক্ষ উপায়ের উল্লেখ করাতে, তাঁহার যুক্তি-তর্কে বড়ই দুঃখিত হইতে হইয়াছিল। পানের জন্য যে পুকুরের জল রক্ষিত হইবে, সেই পুকুরে পাকা সিঁড়ি না করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবল জলের কলসী কক্ষে লইয়া নামা-উঠা চলিতে পারে তদ্রূপ রাস্তা রাখাই বেশ সুকৌশল। পাকা সিঁড়ি থাকিলে আমাদের দেশের লোকে অধিক স্থলেই কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া যখন তখন ঘাটে নামিয়া জলের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে ও তাহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে আলস্য বোধ করিবে না। অথচ পানের জন্য কিম্বা অন্য প্রয়োজনে সেই জল গৃহে লইবার বিশেষ কোন অসুবিধাও ঘটিবে না। কেবল এই অভিপ্রায়ে পুকুরের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া, কেবল দুই এক স্থানে প্রবেশ-দ্বার ও সঙ্কীর্ণ মাটীর সিঁড়ি রাখিলে, যথেচ্ছ ভাবে লোকে জলে নামিয়া জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত, বিরত বা অসমর্থ হইবে। ইহাই শ্রেয়ঃ, না স্নান ও হস্তপদ বস্ত্র তৈজসাদি প্রক্ষালন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সেই জল পানের অযোগ্য করিয়া তোলাই

শ্রেয়ঃ? একই জলাশয়ে অবগাহন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ও সেই মনুষ্য দেহ নির্গত ক্লেদ ও মল মূত্র কলুষিত জল পান করিয়া দেহকে ব্যাধি মন্দির করিয়া তোলা আমাদের দেশের চিরাগত অভ্যাস। যতদিন এই বদভ্যাসের দোষ—আমাদের জাতির স্ত্রী পুরুষ আপামর সাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, ততদিন আমাদের স্বাস্থ্য ও সুখ সুদূর পরাহত থাকিবে। যদি আমরা সজাগ ভাবে এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা, হস্ত, পদ ও অর্থ, সামর্থ্য নিয়োগ করিতে পারি, তবে যত ধীর গতিতেই হউক বা যত ক্ষুদ্রাকারে হউক, আমরা শনৈঃ শনৈঃ শ্রেয়ের পথেই অগ্রসর হইব। আর যদি কেবল বড় বড় কল্পনা জল্পনা লইয়া অলস ভাবে বাদ বিতণ্ডা করিয়া কেবল উদ্যম ও সময়ের অপব্যবহার করি তবে আমাদের আশা কোথায়?

অবশেষে করযোড়ে বিনীত ভাবে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী, ব্যবস্থাপক সভ্য মণ্ডলী ও নবীন শাসনকর্ত্তার নিকট পল্লীবাসীর আবেদন এই, "পত্রিকার" আলোচিত উক্ত বিষয়ে বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের বীজাণুতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মচারী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মতের সার মর্ম্ম অনুসারে তাঁহারা যেন দেশের ও সরকারের এই ঘোর আর্থিক সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হন। সরকারের হস্তে বহু অর্থ থাকিলেও যথেচ্ছ ভাবে ব্যয় করিয়া সেই অর্থ নিঃশেষ করা কিম্বা অর্থের অসচ্ছলতার মধ্যে দরিদ্র দেশবাসীর করভার বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করা কোন সহৃদয় গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য নহে। বিনা আড়ম্বরে অল্প ব্যয়ে প্রাকৃতিক শক্তির অবাধ প্রক্রিয়ায় যে জল শোধন কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে, স্থির ও ধীর চিত্তে দেশের গণ্য মান্য ও অকপট হিতকামী নবীন ও প্রবীণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তত্তৎ প্রক্রিয়ার অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে দেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মধ্যে মতভেদ অতি সামান্য। দেশের প্রকৃত হিতকল্পে দলগত গোঁড়ামীর প্রশ্রয়দান কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করিয়া ও বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া প্রাণ খুলিয়া দেশমাতৃকার সেবা দ্বারা দেশবাসী ভাই ভগিনীর শারীরিক মানসিক ও আর্থিক উৎকর্ষ সাধনই আমাদের বর্ত্তমান সময়ের প্রধান কর্ত্তব্য। এ সময়ে অকৃত্রিম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব অপরের মত সহিষ্ণুতার ভিত্তিতেই স্থাপন করিতে হইবে।

হিন্দু ডুবিল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিশুদের স্বাস্থ্য-হানি ও অকাল-মৃত্যুর কারণ ও নিবারণের উপায়।

শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যুর কারণ এই :—

(১) পিতামাতার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব; (২) সহবাসে অনিয়ম; (৩) সুসন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে পিতা মাতার অনভিজ্ঞতা; (৪) জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতা; (৫) সন্তান লালন পালনে অবহেলা; (৬) বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধের অভাব; (৭) বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব; (৮) সূতিকাগৃহ; (৯) ডাক্তারী ঔষধ ও পথ্য বাহুল্যরূপ ব্যবহার; (১০) বিদেশী বস্ত্রাদি এবং পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার; (১১) ম্যালেরিয়া, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

(১) পিতা মাতার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

ভারতের আর্য্য মহর্ষিগণ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, ভ্রূণ সঞ্চারের সময়ে ও জরায়ু-জীবনেই শিশুর সর্ব্ববিধ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতির বীজ ও নানা উৎকট পীড়ার বীজ অঙ্কুরিত হয়। অতএব, জনক জননী তাঁহাদের বাল্যকাল হইতেই অতি কঠোর নিয়ম, নিষ্ঠা ও সংযম, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে—শুক্র ও শোণিত (ডিম্ব) অতি বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে না পারিলে—কিছুতেই তাঁহাদের সন্তান শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র পুরাণাদিতে এই গভীর তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্রই উল্লেখ রহিয়াছে। মহাভারত, বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, মহারাজ অশ্বপতি ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সুসন্তান লাভের জন্য অষ্টাদশ বৎসর কাল অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন :—

"অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিঃমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ অপত্য উৎপাদনার্থ মিতাহারী, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন।

এইরূপ অষ্টাদশ বৎসর কাল বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, যম নিয়ম, সম্পূর্ণ যত্ন ও ভক্তির ফলেই মহারাজ অশ্বপতি বরলাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই ব্রহ্মচর্য্যের ফল স্বরূপ প্রাতঃস্মরণীয়া মহাপুণ্যবতী সাবিত্রীদেবী জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারত ভূমি পবিত্র করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে হিন্দু নর-নারীগণ সকলেই সুসন্তান লাভের জন্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাবে শুক্র ও শোণিত রক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি নানাবিধ নিয়ম পালন করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবক যুবতীগণ ঐ সকল ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করাতে সমাজের যে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় বটে। ইতর প্রাণীরাও সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে; আর জীবশ্রেষ্ঠ নরনারী কোন নিয়ম কানুনই পালন করিতে পারেন না, ইহা অতীব দুঃখের ও লজ্জার কথা। বলা বাহুল্য, এই অবহেলার ফলেই আমাদের বংশধরগণের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং ভীষণ অকাল-মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য পালন।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ, স্বদেশপ্রাণ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় তাঁহার ভক্তিযোগ নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"প্রধান প্রধান শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রক্তের চরম সার ভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার লুইস্ লিখিয়াছেন—"রক্তের সারভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়।" যে ব্যক্তি কুচিন্তা ও কুক্রিয়া দ্বারা কামের সেবা করে, তাহার শুক্র নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের পরমোৎকৃষ্টাংশ ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা মানুষের অধিকতর কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? যিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা তেজ রক্ষা করেন, তাঁহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার নিকল্‌স্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"চিকিৎসা শাস্ত্র এবং শারীর বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও সংযত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে। মানবের এই জীবনীশক্তি রক্তের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী ও উদ্যমশালী করে।

আর এই বস্তুর ব্যয়ে মানুষকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, এবং চঞ্চলমতি করিয়া ফেলে। তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শারীরযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত হীনশক্তি হইয়া যায়, মূর্চ্ছা, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।" (1)

ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় মৃত্যু, ব্রহ্মচর্য্যে জীবন। শিবসংহিতাও এই মহাতত্ত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন :—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" (2)

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

"যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য লাভ হয়।"

ডাক্তার নিকল্‌স্ অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন :—"জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়।" (3)

জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্রে শ্রী সদাশিব বলিতেছেন :—

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমঃ।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

"পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।" যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী হইবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিমান, মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর হইবে; এবং যাঁহার যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষণ্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, শরীর নিস্তেজ ও মুখশ্রী রুক্ষ ও লাবণ্যশূন্য হইবে।" (4)

কেহ কেহ বলেন যে, যৌবন অবস্থায় কাম রিপুর পরিচালনা না করিলে, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কারণ, কাম রিপুর প্রভাব যৌবনের পূর্ব্বে ও বৃদ্ধাবস্থায় থাকে না। সুতরাং কাম রিপু শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য কোন সাহায্য করে না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

সুবিখ্যাত ডাক্তার টমাস্ ব্রাইএণ্ট্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—"অণ্ডকোষের ক্রিয়া স্তনগ্রন্থি ও গর্ভাশয়ের ক্রিয়ার ন্যায় দীর্ঘকাল এমন কি আজীবন বন্ধ থাকিলেও উহার যন্ত্রাদি সুস্থ ও অবিকৃত থাকে; এবং কোন প্রকার সতেজ উত্তেজনায় স্বকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহা ব্যবহৃত না হইলেও অকর্ম্মণ্য বা নষ্ট হইয়া যায় না। (5)

---

(1) It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is reabsorbed. It goes back into the circulation, ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak, and irresolute, intellectually and physically debilitated, and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wrecked nervous system, epilepsy, insanity and death." See the Laws of Generation by T. L. Nichols, M.D. page 296.

(2) "Chastity is life, sensuality is death." See Dr. Nichols, page 297.

(3) "The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual life."

She finds use for them all in building up a keener brain and more vital and enduring nerves and muscles.

(4) "Debility of intellect and especially of the memory characterizes the mental alienation of the licentious."

(5) The student should remember, however, that the function of the testicle like those of the mammary glands and uterus, may be suspended

খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার পার্কস্ মহোদয় লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, তরুণ যৌবনে ইন্দ্রিয় সংযম করা অসম্ভব; অথচ যদি ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এমন কতকগুলি কদভ্যাস জন্মে যাহা ইন্দ্রিয় সেবন জনিত যাবতীয় কুফল অপেক্ষাও অনিষ্টকর হয়। ইহা অতিরঞ্জিত বটে। নানাপ্রকার উপায়ে কাম-রিপুর প্রভাব বর্দ্ধিত, অথবা খর্ব্ব, উত্তেজিত অথবা প্রশমিত করা যাইতে পারে। এজন্য সংযম যে কেবল সম্ভবপর এমত নহে, ইহা অত্যন্ত সহজ সাধ্য। (6)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—"এক ড্রাম শুক্রক্ষয় আড়াই ছটাক রক্ত ক্ষয়ের সমান। (7)

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন এম্-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

কেহ কেহ বলেন যে, পুং জননেন্দ্রিয় ব্যবহার না করিলে অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যায়—ইহা অতি অসত্য কথা। বরং অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয় (আত্মবিকৃতি প্রভৃতি) বশতঃ অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যায়।" (8)

---

for a long period, possibly for life, and yet its structure may be sound and capable of being roused into activity on any healthy stimulus. Unlike other glands, it does not waste or atrophy for want of use."

(*See Surgery by Thomas Bryant Pidge 648*)

(6) "The development of this passion can be accelerated or delayed, excited or lowered by various measures and continence becomes not only possible but easy" *See A Manual of Practical Hygiene by E. A. Parke, page 497.*

(7) "Loss of one dram of semen is equal, in its effect upon the system, to the loss of five ounces of blood. (*See Tissot's Observation*)

(8) "For want of exercise the male organ will decrease in size! When any such decrease in size does occur, it will be found to be caused by exactly the reverse—namely, excessive exercise by self-abuse." (*See the Science of a New life by Dr. Cowan, M.D., p. 113*)

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী।

সেই অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-নীতি ও ব্রহ্মচর্য্যহীন শিক্ষা প্রণালীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু যুবকগণ অতীব কঠোর যত্নের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি পালন করিতেন এবং এই ব্রহ্মচর্য্যের ফলেই প্রাচীন কালের হিন্দুনরনারীগণ সর্ব্ববিষয়ে উন্নত প্রতিভাশালী এবং নীরোগ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতি ও ব্রহ্মচর্য্যহীন শিক্ষার প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এক ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভাবেই হিন্দু জাতির ভীষণ শারীরিক মানসিক নৈতিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। এবং বর্ত্তমানকালে যুবক যুবতী, বালক বালিকা ও শিশুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, ও অকাল-মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাচীনকালের হিন্দু যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কি কি নিয়ম পালন করিতেন, তাহাই নিম্নে উল্লেখ করিব :—

১। শয্যাত্যাগ—আর্য্য মহর্ষিগণ ব্রহ্মচারীগণকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ ও গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিবার অভ্যাস করিলে শরীর অত্যন্ত সুস্থ থাকে ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। (9)

২। মলমূত্রাদি পরিত্যাগ—প্রত্যহ প্রাতে মলমূত্রাদি ত্যাগের অভ্যাস করিলে শরীর অত্যন্ত সুস্থ থাকে।

৩। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আঠালিয়া মাটির দ্বারা গুহ্যদেশ লেপনপূর্ব্বক ধৌত করিয়া ফেলা উচিত।

---

(9) Early risinge an not be too insisted upon. Nothing is more conducive to health and thus to long life. (*See Dr. Chavase's* Advice to a Mother, *P 376*)

৪। **দন্ত-ধাবন ও মুখ-প্রক্ষালন**—প্রত্যহ প্রাতে মুখ, দাঁত, ও জিহ্বা উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নিম, মালতি, বট, বদর, করঞ্জ, শাল, বিল্ব প্রভৃতি কোমল শাখাগ্রের দ্বারা (ব্রাসের মত করিয়া) দন্ত মার্জ্জনা করিবে। (10)

(৫) **প্রাতঃস্নান**—ঋষিরা ব্রহ্মচারীদিগকে প্রাতঃকালে স্নান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রাতঃস্নানে শরীর সুস্থ থাকে। (11)

৬। **উপাসনা**—প্রাতঃস্নানের পরই ভগবানের উপাসনা বা সন্ধ্যা অথবা গায়িত্রী মন্ত্র শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা বা গায়িত্রী মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া একাগ্র মনে ভগবানের উপাসনা করিলে চিত্তের অবসাদ দূর হয়, চরিত্র নির্ম্মল হইয়া থাকে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের, কেবল আহ্নিক কেন, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের মূল কেন্দ্র গায়ত্রী মন্ত্র; কোন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় স্বল্পাক্ষর ও সারবান মন্ত্র আজ পর্য্যন্তও জগতে দৃষ্ট হয় নাই। এমন মন্ত্রও হিন্দুরা স্মরণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন না, ইহা ভাবিতে গেলেও অধীর হইয়া উঠিতে হয়।" (12)

৭। **আহার বিধি**—ভগবান মনু ব্রহ্মচারীর আহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

"বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসানস্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণি
নাঞ্চৈব হিংসনম্॥ ২।১৭৭।

ব্রহ্মচারী মধু মাংস আহার করিবে না, গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতির রস গ্রহণ এবং স্ত্রী সংসর্গ করিবে না। যে সকল বস্তু স্বভাবতঃ মধুর, কিন্তু শেষে অন্যরূপ হয় সেই সমুদয় শুক্তদ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং প্রাণী হিংসা করিবে না।

"লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডং কবকানিচ।
অভক্ষ্যানি দ্বিজাতিনাম্ মেধ্য প্রভবানি চ॥৫।

লশুন, গৃঞ্জল (রক্ত রসুন) পলাণ্ডু, কোড়ক বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত শাকাদি ভক্ষণ করিবে না।

" * * * ন সুরা পিবেত।"

কখনও পদ্য পান করিবে না।

হিন্দু শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ছাত্রদের (ব্রহ্মচারী) পক্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মচারীদিগকে যে সকল দ্রব্য আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অক্ষরে অক্ষরে ঠিক সেই সকল দ্রব্যই আহার করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিতেছেন।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আহারে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, কাম প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া থাকে, যথা পিয়াজ, রসুন, মদ, মাংস, বড় বড় মৎস্য, মাদক দ্রব্যাদি, ধূমপান লঙ্কা, মরিচ, সর্ষপ, অধিক অম্ল দ্রব্য, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, অত্যধিক লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্য, চা কাফি ও চুরুট ইত্যাদি। (13)

(10) Every part of each tooth including the gums may in turn be well cleansed and well brushed. (*See Ditto. p 376*)

(11) The best time for taking a bath is the morning. (*See Ditto*)

(12) আর্য্য রমণীর শিক্ষা এবং স্বাধীনতা, ১০৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

(13) The large quanitty of flesh meats, together with oysters, eggs, fish, salt, pepper, spices, gravies, beer, ports, cider, wine, and other alcoholic liquors, tobacco, tea, coffee chocolate, salted meats, pies bread made from fine white flour—all these things have a direct influence on the abnormal exercise of the sexual system. Tea, coffee, tobacco, alcoholic liquors and animal food, are all stimulating or narcotic in their nature; and whatever is taken into the body of a narcotic or stimulating nature irritates the nervous system, but especially the nerves of the sexual system

পাশ্চাত্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মচারীদিগকে চা, চুরুট, সিগারেট, উত্তেজক কোন প্রকার খাদ্য বাজারের মিঠাই ইত্যাদি আহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কি গভীর দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, আর্য্য ঋষিরা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যুবক যুবতীগণকে যে যে দ্রব্য আহার করিতে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করিয়াছেন, আজ কাল সেই সেই দ্রব্যগুলিই যুবক যুবতীরা (ছাত্র-ছাত্রীরা) বাহুল্য রূপে আহার করিয়া থাকেন। যে চা আমাদের পক্ষে বিষতুল্য, আজ সে চা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, কৃষক বালকেরা পর্য্যন্ত চা, সিগারেট ইত্যাদি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। (14)

আর্য্য ঋষিগণ ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ব্রহ্মচারীগণকে নিরামিষ ও ফলফুলারি অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। 15)

৮। **ব্যায়াম**—প্রত্যহ বালক ও যুবকগণের কোন না কোন ব্যায়াম করা আবশ্যক। প্রাচীন কালের বিদ্যার্থীগণ সকলেই প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রেরা কোন প্রকার ব্যায়াম করে না, ইহার ফলে তাহাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। আমাদের জাতির অবনতির ইহাও একটী প্রধান কারণ।

৯। **বিশ্রাম ও অধ্যয়ন**—ব্যায়ামের পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, পরে অধ্যয়ন করা উচিত।

১০। **শয্যা ও নিদ্রা**—ব্রহ্মচারীর নরম গদী বা বালিশ ও বিছানার চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারীর মাদুর, কুশাসন ইত্যাদিতে শয়ন করা উচিত। (16)

১১। **ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষেধ**—ভগবান মনু যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বিষ্ণু ও সুশ্রুত প্রভৃতি আর্য্য মহর্ষিগণ ব্রহ্মচারীগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিহার করিতে বিশেষ ভাবে আদেশ করিয়াছেন, যথা—পর-নিন্দা, চৌর্য্য, হিংসা, মদ্যপান, ধূমপান, অধিক মিষ্টদ্রব্য ও লবণাক্ত দ্রব্য আহার, অতি ভোজন, অসময়ে ভোজন, অত্যধিক ঔষধ সেবন, অতি চিকিৎসা, কুচিকিৎসা, অসৎ লোকের সহিত সহবাস ইত্যাদি। (17)

...through the reflex action on the base of the brain amativeness ii inflamed or excited and in this way come lustful desires. Salt, pepper, mustard, salt food, and fine flour-bread, in their use, all tend to constipation, and, as a result, costiveness and hardened fœces, which irritates the nerves of and press against the vas deferens and vesiculated seminales and so produce morbid amative desires, which could not even remotely exist if the cause was removed. Costiveness, the result of concentrated food, is one of the many causes of self-abuse in boys and girls. (*See the Science of A New life, by John. Cowan, M.D. p. 98*).

(14) "Avoid stimulants, condiments, spiced food, pepper, mustard, fat, preserves, pickles, onions &c. &c." (*See Dr. Parker's New Marriage Guide. p. 50.*)

"Dr Dio Lewis says :—"Avoid spirits and salted liquors, tea, coffee, tobaco, oysters, rich fish fatted and salted meats, pastry, sweetmeats and stimulating condiments."

† "Tea is a strong stimulant which acts directly upon the nervous system. It contains tannin or tannic acid, and is powerful astringent, thus readily acting upon the delicate internal surface of stomach and intestines. It is a prolific cause of constipation. (*See Ditto p. 50.*)

(15) "Ripe fruits in their natural state or mainly cooked brown bread and vegetabls are the best articles." (*See the Science of a New Life, by Dr. Cowan. M.D*)

(16) Feather beds and pillows should be avoided The best bed is a mattress made from straw, corn husks, curled hair, or compressed sponge. No more bed covering should be used. (*See Ditto. p. 124*)

(17) The following are to be strictly avoided by those whose desire it is to lead a pure, chaste and continent life.

"Tobacco in all its forms. All manner of alcoholic liquor, late supper and over-eating. Sweetmeats, candies etc. White bread, pork and all fat and salt meats etc. Salt, pepper, mustard, spices, vinegar, and other condiments. Tea, coffee, and chocolate. All constriction of dress about the body. Idleness and inaction of body and mind. Feather beds and pillows, and heavy bed-coverings. Unventilated and unlighted bed-rooms Remaining in bed in the morning after awaking. Companions of doubtful or bad natures. Uncleanliness of body. Irresoluteness of will. Drugs and patent medicines, Quack doctors." (*See Ditto. p 127*)

(ক্রমশঃ)

প্রসব-বৈচিত্র্য।

লেখক—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য-বিশারদ।

কিছুদিন গত হইল, বিলাতের সুবিখ্যাত ডাক্তার জে, এস্, ডরসে মহোদয় "প্রাক্‌টিক্যাল্ মেডিসিন্" পত্রে এক বিলাতী রমণীর কথা লিখিয়াছিলেন। এই রমণী ২৪ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ বৎসরের মধ্যেই ১৮টি সন্তান প্রসব করেন। তাঁহার প্রসব তালিকা এইরূপ :—

প্রথম বর্ষে	একটি
দ্বিতীয় বর্ষে	যমজ
তৃতীয় বর্ষে	তিনটি
চতুর্থ বর্ষে	যমজ
পঞ্চম বর্ষে	তিনটি
ষষ্ঠ বর্ষে	যমজ
সপ্তম বর্ষে	তিনটি
অষ্টম বর্ষে	যমজ

মানবী একই সময়ে উর্দ্ধসংখ্যা কতগুলি সন্তান প্রসব করিতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এককালে পাঁচটির অধিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে কখন শুনা যায় নাই। ডাক্তার চর্চ্চিল বলেন, তিনি চারিটি পর্য্যন্ত জীবিত সন্তান একই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন।

এক সময়ে ডাক্তার ক্লার্ক ১০৩০৭ জন প্রসূতির সন্তান-প্রসবের হিসাব দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৮৪ জন যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; বাকীগুলির ভিতরে ৩ জন এক কালে ৩টি এবং একজন ৪টি সন্তান প্রসব করেন।

ডবলিন হাসপাতালের তালিকায় দেখা যায়, ১২৯১৭২ জন প্রসূতির মধ্যে যমজ সন্তান প্রসূতির সংখ্যা ২০৬২.; অবশিষ্টের ভিতরে ২৯ জনের একই সময়ে ৩টি এবং ১ জনের ৪টি সন্তান জন্মিয়াছিল। এসম্বন্ধে জার্ম্মানি, গ্রেটব্রিটিন ও ফ্রান্স দেশের একটি তালিকা দেখাইতেছি।

	মোট প্রসূতির সংখ্যা।	যতগুলি প্রসূতি যমজ প্রসব করিয়াছে।	যতগুলি প্রসূতি এক কালে ৩টি সন্তান প্রসব করিয়াছে।
গ্রেটব্রিটেন	২৮৫২১৯	৩৭১৮	৪৩
জার্ম্মানি	৪১৪২২২	৫০৮৫	৪৯
ফ্রান্স	৩৯৪০৯	৩৩৬	৬

সচরাচর একাশীতির মধ্যে কেবল একটি স্থলে যমজ শিশু জন্ম গ্রহণ করে। উপরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে, জার্ম্মানিতে ৮২, গ্রেটব্রিটেনে ৭৭ এবং ফ্রান্সে ১০৮ জনের মধ্যে একজন প্রসূতি যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

যমজ সন্তানেরা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হয় এবং তাহারা জননী-জঠরে পৃথক পৃথক পোরোর মধ্যে অবস্থিতি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান-দ্বয়ের মধ্যে একটি কুমার এবং অপরটি কুমারী জন্মায়। আবার দুইটি কুমারী অপেক্ষা দুইটি কুমারই সচরাচর বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে বিলাতের ৩জন ভিন্ন ভিন্ন ডাক্তারের সংগৃহীত তালিকা এইরূপ :—

যমজ প্রসূতি সংখ্যা।	উভয় কুমার	উভয় কুমারী	একটি কুমার ও অপরটি কুমারী
৫৩৬	১৭১	১৮৩	১৮২
৯৫	৩৮	২২	৩৫
২৩৩	৭৬	৫৮	৯৯
৮৬৪	২৮৫	২৬৩	৩১৪

গর্ভে যমজ সন্তান থাকিলে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে অনেক বিলম্ব হয়; কিন্তু দ্বিতীয়টি অতি শীঘ্র ও সহজে জন্মগ্রহণ করে।

সচরাচর প্রথমটি জন্মিবার ৫ মিনিট হইতে অর্দ্ধঘণ্টা পরে দ্বিতীয়টি ভূমিষ্ঠ হয়। কচিৎ কোন কোন স্থলে কয়েক দিন—এমন কি কয়েক সপ্তাহে পরেও দ্বিতীয় শিশু জন্মিতে পারে। ডাক্তার কলিন্স ২১২ জন প্রসূতির কথা লিখিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ৩৮ জনের ৫ মিনিট পরে, ২৯ জনের ১০ মিনিট, ৪৫ জনের ১৫ মিনিট, ২৩ জনের ২০ মিনিট, ৩০ জনের অর্দ্ধঘণ্টা, ৫ জনের ৪৫ মিনিট, ১৬ জনের ১ ঘণ্টা, ৮ জনের ২ ঘণ্টা, ৩ জনের ৩ ঘণ্টা, ৫ জনের ৪ ঘণ্টা, ১ জনের ৪½ ঘণ্টা, ৩ জনের ৫ ঘণ্টা, ২ জনের ৬ ঘণ্টা, ১ জনের ৭ ঘণ্টা ১ জনের ৮ ঘণ্টা, একজনের ১০ ঘণ্টা এবং ১ জনের ২০ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

ডাক্তার মেরিম্যান তিনটি আশ্চর্য্য প্রসূতির কথা বলিয়াছেন। এই তিন রমণীই যমজ শিশুর মাতা। প্রথম ও দ্বিতীয়টি প্রথম সন্তান প্রসবের যথা ক্রমে ১৪ দিন ও দেড়মাস পরে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করেন। তৃতীয়টির প্রথম দিনে যমজ এবং তৎপর দিনে আবার দুইটি শিশু জন্মিয়াছিল।

একক অপেক্ষা যমজ সন্তানের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। ইহার কারণ তাহারা প্রায়ই অকালে প্রসূত হয় এবং গর্ভবাস কালে পরস্পরের সঙ্কাপ জন্য বাড়িতে না পাইয়া কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। একই গর্ভে দুইয়ের অধিক সন্তান থাকিলে প্রসবের পর তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই জীবিত থাকে না।

কখন কখন একই গর্ভে দুইটি শিশু পরস্পর জুড়িয়া থাকে। ডাক্তার বার্ণস্ এইরূপ ঘটনার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একস্থানে এইরূপ ভাবের দুইটি অদ্ভুত শিশুকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদের পরস্পরের উদরের নিম্নাংশ সংযুক্ত (united by the interior part of the the belly) ছিল। উহাদের মধ্যে একটি কুমার ও অপরটি কুমারী। উহারা উপযুক্ত কালেই (at the full time) ভূমিষ্ঠ হয় এবং দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। *

আর এক স্থানে পরস্পরের নিতম্বদেশ-সংযুক্ত দুইটি শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারাও ভূমিষ্ঠ হইয়া নবম দিবসেই পঞ্চত্ব পায়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অব্ সার্জ্জন (Royal College of Surgeons of Ireland) নামক বিদ্যালয়েও ঐরূপ ভাবের সংযুক্ত শিশুর কঙ্কাল আছে। শুনা যায় ঐ মিলিত শিশু দুইটিও জীবন্ত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

কচিৎ কোন কোন নারীর গর্ভে রাক্ষসাকৃতি (Monsters) এক একটি সন্তান জন্মিয়া থাকে। তাহাদের গঠন দেখিলে ভয় হয়। কোন কোন শিশুর মাথা এত প্রকাণ্ড হয় যে ভ্রূণ দেহের সহিত কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না; আবার কোন কোনটি বা দ্বিমুণ্ড (dicephalous) ও চতুর্ভুজ হইয়া পড়ে।

* প্রসব-বৈচিত্র্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অপ্রতুল নহে। প্রায় দেড়বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বৃদ্ধ মাদ্রাজী এক (?) অপরূপ যমজ কন্যা, কলিকাতার ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারের সম্মুখে প্রদর্শনের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। কন্যাটির দুই মুখ, চারি হাত, চারি পা ও বক্ষস্থলও দুইটি; কেবল মাত্র কটিদেশ হইতে উরুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত তির্য্যকভাবে একত্র সংলগ্ন; দুইটি মুখ সম্পূর্ণ দুই প্রকারের; গলার স্বর বিভিন্ন ও একটি অংশ অপরটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুডৌল ও গৌরবর্ণ বিশিষ্ট; সুতরাং একটি না বলিয়া এই বিচিত্র জীবকে দুইটি বলাই সঙ্গত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কন্যা দুইটির বয়স অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। একটি অংশ (বা কন্যা) বেশ ভাল লেখা-পড়া জানে, অন্যটি তেমন শিক্ষিতা নহে। বোধ হয় মাতৃগর্ভে যমজ সন্তানরূপে পরিপুষ্ট হইতে হইতে কোন ঘটনা বিপর্য্যয়ে ইহারা পরস্পর এইরূপ ভাবে জুড়িয়া একটিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত রাইপুর গ্রামে জনৈক সূত্রধর রমণী সপ্তম মাসে উপরিউক্তরূপ একটি অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছিল; উহার চারি পা, চারি হাত, দুইটি মস্তক—পরস্পর বিভিন্ন চারি চক্ষু; বক্ষস্থল হইতে কোমর পর্য্যন্ত একত্র সংশ্লিষ্ট; দেখিলেই একটি ছেলের বক্ষস্থল বলিয়া ধারণা হয়। এই সন্তানটি মৃত অবস্থায় প্রসূত হয়। এইরূপ প্রসব-বিপর্য্যয় ও প্রসব-বৈচিত্র্যের বহু ঘটনা আমাদের দেখা শুনা আছে।

স্বাস্থ্য-সমাচার—সম্পাদক।

স্বাস্থ্য-বিধান।

শ্রীবিভূতিভূষণ জানা।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। শরীর সুস্থ না থাকিলে সকলই বিড়ম্বনার কারণ হয়। আজকাল কাহাকেও সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন না কোন রোগে প্রায় সকলেই আক্রান্ত। শরীর সুস্থ রাখিয়া কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হয়, তাহা প্রত্যেকেরই জানা দরকার। এখনকার লোকের পরমায়ুর বিষয় ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে পূর্ব্বকালের লোকের সহিত আমাদের কি পার্থক্য।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে লোকে ১৫০।১৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিত বলিয়া প্রকাশ। এব্রাহিম ১৭৫ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র আইজাক ১৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মারা যান। তাঁহার পৌত্র ম্যাম্পেব ১৪৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন, ইটালীর একটী ছোট প্রদেশে ১৩৪ জন লোকের ১০০ বৎসরের অধিক বয়স ছিল; তন্মধ্যে ৩ জনের বয়স ১১৪, ১২ জনের ১৩৫, ৪ জনের ১৩০, ২ জনের ১২৫, ৫৭ জনের ১০০ বৎসর বয়স ছিল। বর্ত্তমান কালের সাধু মাঙ্গো ১৮৫ বৎসর বয়সে ৬০০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। হাঙ্গেরীর পিয়ারী ঝোরতে নামক জনৈক কৃষক ১৮৫ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। মৃত্যুর কিছু আগেও তিনি ১ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার এই দীর্ঘায়ুর একমাত্র কারণ নিতান্ত সরল আহার বিহার। তিনি সামান্য শস্যের পিষ্টক দুধ কিম্বা ঝোলে ভিজাইয়া আহার করিতেন। টমাস পার নামে একজন ইংরেজ ১৬৩৫ খৃঃ মারা যান। তিনি ১৫২ বৎসর ৯ মাস জীবিত ছিলেন। ১৩০ বৎসর বয়সেও তিনি খুব কঠিন পরিশ্রম করিতেন। মার্কিন দেশের ক্যাপটেন্ ইজিকেল ডায়েমণ্ড নামক জনৈক পালোয়ান ১১৪ বৎসর বয়সে বলিয়াছিলেন যে চশমা ব্যতীত তিনি ১৪ ইঞ্চি দূরে বেশ পড়িতে পারেন, উচ্চ সিড়ি বাহিয়া ৪০ বৎসরের লোকের মত উঠিতে নামিতে পারিতেন। ডাক্তার ইলিয়ট্ ৪০ বৎসর কাল ব্যাপী হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহাকে একবার তদীয় অসাধারণ স্বাস্থ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন "আমার পানাহার অতিশয় পরিমিত, প্রত্যহ খোলা বাতাসে ব্যায়াম করা আমার অভ্যাস, সকল প্রকার বিলাসিতা এবং মদ, কাফি, চা কিম্বা তামাক আমি সকল সময়ে বর্জ্জন করিয়া আসিতেছি।"

এইরূপ যাহারা সরল ভাবে জীবন যাপন করিয়া স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করেন, তাঁহারাই দীর্ঘায়ু লাভ করতঃ ভূমণ্ডলে অশেষ যশ খ্যাতি রাখিয়া যান ও জীবিতকালে অশেষ প্রকার সুখভোগ করিতে সক্ষম হন।

বিবিধ রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য নিয়মিত পানাহার ও উপযুক্ত প্রকার সংযম একান্ত আবশ্যক। ঢাকার পরলোকগত মহাত্মা শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ ও সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাজ নিবাসী রামমূর্ত্তির অপরিসীম শারীরিক বলের পরিচয় পাইয়া আজকাল আর ভীমসেনের বলকে কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। চার্লস এ বেনেট নামক এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ১২ মণ লৌহ দুই হাতে উপরে তুলিতে পারিতেন। সার জন ওয়েসলী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি এক বৎসরে ৮০,০০০ মাইল ঘুরিয়া ৫০০০ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। রামমূর্ত্তির বিষয় সকলেই অবগত আছেন, তিনি ১৬০ ঘোড়ার সমান বলশালী। ইহাঁর বাল্যাবস্থার বিষয় সকলে অবগত

নহেন। বাল্যকালে উক্ত ভুবন-বিজয়ী বীর কেবল আমাশয়, অজীর্ণতায় এমন দুর্ব্বল ছিলেন যে, দৌড়িয়া কিছুদূর যাইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ইনি নিরামিষ ভোজী। উল্লিখিত কোন ব্যক্তিই এরূপ শারীরিক বল আধুনিক ফুটবল, ব্যাড্‌মিণ্টন, টেনিস, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় লাভ করেন নাই। অন্য বহুবিধ উপকারী ব্যায়ামে লাভ করিয়াছেন।

ব্যায়াম আবার সকলের পক্ষে যে হিতকর তাহা নহে। রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম অহিতকর, ইহাতে শরীরের অনিষ্ট হইতে পারে। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুতে প্রাতঃকালে নতুবা বিকালে একঘণ্টা করিয়া ব্যায়াম করিলে যথেষ্ট হইবে। ব্যায়াম অনেক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে ডনখেলা, মুগুর ভাঁজা, দ্রুতপদে ভ্রমণ, সাঁতার দেওয়া ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট ও স্ফূর্ত্তিদায়ক ব্যায়াম। আধুনিক ফুটবল প্রভৃতি খেলা আনন্দদায়ক হইতে পারে কিন্তু এতদ্দেশে ইহার কিছুমাত্র উপকার লক্ষিত হয় না। এ সকল খেলা বহু অর্থ ও সময় সাপেক্ষ। শুধু তাহাও নহে—সময়ে সময়ে এত মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় যে, কত খেলোয়াড় অকালে স্বীয় বন্ধুবান্ধবদের শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছে তাহা ভাবিলে মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হয়। যাঁহারা রীতিমত সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শুধু কি ইহাই? অধিককাল এ সকল খেলায় তাহাদের শরীর দুর্ব্বল, চক্ষু কোটরগত, গণ্ডদেশের মাংস শীর্ণ, গণ্ডাস্থি উন্নত হইয়া এক বিশ্রী চেহারা হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য সভ্যদেশ সমূহে এ সকল খেলা প্রচলিত থাকিলে কি হইবে, তাহাদের সব বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, খাওয়ারও সেরূপ বন্দোবস্ত আছে; আমাদের দেশে তাহা নাই। এ বিষয়ে ছাত্রগণ একটু ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। অনেকের ধারণা শুধু ব্যায়াম করিলেই শরীর সবল ও সুস্থ হইবে। কিন্তু তাহা নহে। শরীর অনুযায়ী পানাহার দোষে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে, ব্যায়াম করা সত্ত্বেও মাংসপেশী প্রবর্দ্ধিত না হইয়া বরং কমিতে থাকে। ব্যায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য মোটা হওয়া নহে,—শরীরের বলবৃদ্ধি করা ও তৎসহ বিবিধ রোগ-মুক্ত হওয়া। অতি ব্যায়াম বা সময়ে সময়ে ইচ্ছামত ব্যায়াম বর্জ্জনীয়। শারীরিক অবস্থানুরূপ যথোপযুক্ত ব্যায়ামে কর্ম্ম-সহিষ্ণুতা জন্মে ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া শরীর সুস্থ রাখে।

খাদ্যাভাবে আমরা বাঁচিতে পারি না। আগে পেটের সেবা, তার পর যাহা কিছু। এস্থলে পান ও ও আহার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। শুধু ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া তৎসহ আমরা ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করি। ভোজনান্তে অভ্যাসানুযায়ী পান সুপারী খাইয়া থাকি। এই পান সুপারী খাওয়ার পরিমাণ আছে। অনেকে তামাক দোক্তা, সিগারেট বিড়ি ইত্যাদি বহুবিধ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকেন। তামাক ও দোক্তা একই জিনিষ। কেহ তামাক খায়, কেহ বা দোক্তারূপে ইহা পানের সঙ্গে খায়। আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাঃ জেভিড্ পোলসন্ পরীক্ষান্তে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তামাক দোক্তা প্রভৃতিতে নিকোটিন্ নামক যে ভীষণ এক বিষ আছে, তাহার ১ গ্রেণের একের ১৫ ভাগ সেবনে একটি মনুষ্যের মৃত্যু হওয়া বেশ সম্ভব। এতদ্ব্যতিরেকে ইহার দ্বারা নাকের, মুখের, গলার, হৃৎপিণ্ডের বিবিধ ব্যাধি জন্মে। অম্লরোগ, দৃষ্টি ও স্মরণশক্তির হ্রাস, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্ক পীড়া প্রভৃতি জন্মিয়া শরীরের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নস্য অনেকে ব্যবহার করেন। কিন্তু উহাতে যে কিছুমাত্র উপকার নাই কেবল পরকে পয়সা দিয়া অমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট করা হয়, তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখেন না,—দেখিবার অবসরই বা কোথায়! ছাত্রদের মধ্যে এই কদভ্যাস ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ইহা শুধু দুঃখের বিষয় নহে; গভীর আশঙ্কার বিষয়। বাজারে, জন সমারোহে, পথিপার্শ্বে

পানের দোকানে যে পান বিক্রীত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা যক্ষ্মারোগের বীজ সংক্রামিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী সার ওয়ালটার র‍্যালে তামাক ও তামাকের বীজ স্বদেশে আনিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ইংলণ্ডে আসিয়া আমেরিকার তামাক এখন সদ্বীপা ধরিত্রীর প্রায় সর্ব্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। স্কুল্ কলেজের ছাত্রদিগকে যেখানে সেখানে কোন ভালমন্দ বিচার না করিয়া পান কিনিয়া খাইতে দেখা যায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বাড়ী হইতে খাইয়া বা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন। অভিভাবকবর্গ এদিকে একটু কৃপাদৃষ্টি করতঃ ছাত্র-সমাজের উপকার করিবেন কি? তাঁহারাই ভাবিয়া দেখিবেন ইহা কিরূপ জঘন্য বিষয়। ছাত্রমণ্ডলীও ভবিষ্যতের জন্য বিশেষরূপ সাবধান হইবেন।

শুধু কি পান তামাক। আরোও আছে, কত লিখিব। চার ব্যবহার ধনী দরিদ্র-নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কাফির ব্যবহারও কদাচ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বৎসরে এককোটী পঁচাত্তর লক্ষ সের চা বিক্রয় হইত। এক্ষণে উহার পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে; অনেক খাবারের দোকানে এখন চা থাকে। চা, কাফি, আফিং ভাং, গাঁজা, মদ কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে কয়েকজন খ্যাতনামা ডাক্তার বলেন যে, এই সকল দ্রব্য সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিলেও (বিশেষতঃ ভারত-বর্ষের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে) দেহের অনিষ্ট সাধিত হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাস বশতঃ অনেকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য এই সকল পদার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের ব্যবহারে কোন স্থায়ী উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে মদ্যপান দ্বারা দেশের কষ্ট শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।" তাহা ছাড়া খাদ্য শস্যের সারভাগ দিয়াই মদ তৈয়ারী হয়। মদ্যপান দ্বারা উত্তেজিত লোক যে কত বীভৎস অপরাধ করিয়া দণ্ডনীয় হয় তাহার সংখ্যা নাই। মাকিন যুক্তরাজ্যের একজন বিচারক যুক্তরাজ্যের মহাসভায় একদিন বলিয়াছিলেন "আমি দেড়লক্ষ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছি। ইহার মধ্যে শতকরা ৭৫ জন মদের নেশায় অপরাধ করিয়াছিল।" লণ্ডন মহা-নগরীর লর্ড মেয়র তথাকার জেল প্রত্যাগত রমণীদিগের এক উদ্ধারাশ্রমের নেত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লোকে মদ সেবন না করিলে জেল-প্রত্যাগত এই ৭৩৫টী রমণীর কয়জন জেলে যাইত?" প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছেন "মাত্র ৩৫ জন"। ১৯১৬ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে গ্রেট ব্রিটেনে মদ তৈয়ারীর জন্য যব, চাউল, ভুট্টা, চিনি প্রভৃতি লাগিয়াছে সর্ব্বপ্রকারে সতের লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টন; অর্থাৎ প্রায় চারিকোটী আটষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার মণ।

মাদক দ্রব্যাদির অপব্যবহার সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলা হইল। মাদক দ্রব্য সকল প্রকারে ত্যাগ করা উচিত। যুক্তিযুক্তভাবে আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য এই তিনের সদ্ব্যবহারে আজীবন বল ও সুখলাভ করা যায়। শরীর মন যখন উপযুক্তভাবে পরস্পরের সহযোগিতার কার্য্য করে, তখনই জীব পূর্ণতা লাভ করে। পরন্তু ইহারা বিকৃত হইলে সমুদায়ের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। মানুষ তাহাতে অশেষবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করে।

পল্লী-উন্নতি।

[রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র]
(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সিরোলজিক্যাল বিভাগের কর্ত্তা).

[বর্ত্তমানকালে যাঁহারা পল্লীর উন্নতির জন্য কাজ ...তে চাহেন, তাঁহারা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সিরো-...কাল বিভাগের কর্ত্তা, স্বদেশ-প্রাণ ডাঃ গোপাল-... মিত্র রায় বাহাদুরের সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ ...লে উপকৃত হইবেন এই আশায় এইগুলি ছাপা ...। স্বাঃ-সঃ—সঃ।]

...এক বা একাধিক গ্রামবাসী লইয়া "পল্লী-উন্নতি ...তি" গঠিত হইবে। সভ্য নির্ব্বাচনে কোনরূপ ...তিগত বা আর্থিক অবস্থাগত বাধা থাকিবে না। ...মের লোকেরা দেশে থাকুন বা বিদেশে থাকুন ... হইতে পারিবেন এবং ইচ্ছা করিলে অন্য স্থানের ...কও সভ্য হইতে পারেন। যাঁহারা গ্রামে থাকেন ...ন ঘন গ্রামে যাতায়াত করেন, তাঁহাদের মধ্য ...তে কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হইবে। অর্থ ভিন্ন ...ন কার্য্যই হইবে না; সুতরাং যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ...নি সেইরূপ অর্থ সাহায্য করিবেন; এবং যাঁহারা অর্থ ...হায্য করিতে অক্ষম তাঁহারা মুষ্টি ভিক্ষা দিবেন। এই ...তি এক বা ততোঽধিক সভ্যের বা অন্য অর্থশালী ...ক্তির নিকট হইতে বিনা সুদে ঋণ হিসাবে বা দান ...বে অর্থ সাহায্য লইবে এবং ঐ অর্থের দ্বারা কো-...অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ন্যায়ঃ—

১। পতিত জমি অন্ততঃ ১৫ বৎসরের জন্য ইজারা ...য়া উহাতে আবাদ করিবে এবং পচা পুষ্করিণীর ...পঙ্কোদ্ধার করিয়া উহাতে মৎস্যর চাষ করিয়া যে আয় ...বে তাহা হইতে জমির বা পুষ্করিণীর মালিককে ...হার বর্ত্তমান আয় দিয়া বাকি আয় সমিতির ভাণ্ডারে ...দিবে। কোন পুষ্করিণীর ধারে বাঁশ বা যে সব ...হার পাতা পড়িয়া জল নষ্ট হয় এমন কোন গাছ ...থাকিবে না।

২। জঙ্গল কাটাইয়া ঐ কাঠ বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করা হইবে এবং সেই স্থানে আবাদ করা হইবে।

৩। ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত চারি মাস প্রত্যেক লোককে সপ্তাহে দুইবার কুইনাইন সংযুক্ত বড়ি খাওয়ান হইবে। এইরূপ করিলে ম্যালেরিয়া হইবে না; সুতরাং পূর্ব্বে যাহারা অসুখে পড়িয়া থাকিত, তাহারা কার্য্য করিতে পারায় দেশের কর্ম্মশক্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে।

৪। গ্রামে অন্যান্য অসুখের জন্য একজন ডাক্তার রাখা হইবে। তিনি যে কেবল রোগের চিকিৎসা করিবেন তাহা নয়। তিনি গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষক হইবেন এবং সেই অনুযায়ী সমিতিকে উপদেশ দিবেন। তাঁহার গো-চিকিৎসা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা থাকিবে।

৫। গ্রামে একটা বা একাধিক জলাশয় কেবল পানীয় জল ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইবে।

৬। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা বক্তৃতা বা কথকতা দ্বারা সাধারণ লোকের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। সময়ে সময়ে উপযুক্ত লোক আনাইয়া ম্যাজিক ল্যান্টান প্রভৃতির সাহায্যে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইবে। সত্য ও ন্যায়-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং বিবেকের পূজা শিখাইতে হইবে। বিলাসিতা বর্জ্জন এবং অপচয় নিবারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৭। সাধারণ শিক্ষালয় বা শ্রমজীবী বিদ্যালয় খোলা হইবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও শিক্ষালয় হইবে। বালিকাবিদ্যালয়ের

শিক্ষয়িত্রী স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

৮। যাহারা রুগ্ন বা অল্প সময়ের জন্য অকর্ম্মণ্য তাহাদিগকে সুস্থ বা কর্ম্মক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইবে।

৯। যে সকল বিধবা স্ত্রীলোক ছোট ছোট ছেলের জন্য অপরের বাড়িতে কর্ম্ম করিতে পারে না তাহাদিগকে চরকায় সুতা কাটা বা ঘরে বসিয়া যে সকল কার্য্য হয় এমন অর্থকরী কার্য্য শেখান হইবে, এবং তাহারা যে সুতা প্রভৃতি তৈয়ারী করিবে তাহা অতিরিক্ত মূল্যে কিনিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে।

১০। যাহারা কর্ম্মক্ষম অথচ কর্ম্মের অভাবে বসিয়া থাকে বা ভিক্ষা করে তাহাদিগকে কর্ম্মশালা খুলিয়া বা অন্য প্রকারে কর্ম্ম দিতে হইবে। যাহারা কর্ম্ম পাইলেও কর্ম্ম করিতে নারাজ তাহাদিগকে সমিতি কোনরূপ সাহায্য করিবে না। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষম ভিখারিকে ভিক্ষা দেওয়া হইবে না।

১১। যাহারা চিররুগ্ন বা চির অকর্ম্মণ্য তাহাদিগকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সাহায্য করা হইবে।

১২। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে ফসল কিরূপে বেশী জন্মান যায় এবং জলের বন্দোবস্ত করিলে কিরূপে এক জমিতেই একাধিক ফসল হইতে পারে সে বিষয়ে চাষীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।

১৩। যুবকদিগের মধ্য হইতে এক দল স্বেচ্ছা-সেবক তৈয়ারী হইবে। তাহারা শবদাহ, অগ্নিনিবারণ, ডাকাতি নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করিবে।

১৪। প্রত্যেক সমিতির এলেকায় অন্ততঃ দুইটী বন্দুক থাকিবে।

১৫। গ্রামের সমস্ত ফসল কিনিয়া গোলাজাত করিয়া রাখা এবং অসময়ে নাম মাত্র লাভে চাষীদিগকে বিক্রয় করা হইবে।

১৬। যতটা সম্ভব পাটের চাষ ছাড়িয়া তুলার চাষ বা দেশের পক্ষে অন্য উপকারী চাষ করাইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপন্ন করিতে হইবে এবং প্রতি ঘরে চরকা ও গ্রামে অনেক তাঁত চলিবে।

১৭। যাঁহারা গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিয়া, এবং যাঁহারা সহর হইতে আসিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে চান তাঁহাদিগকে, গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

১৮। প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটী লাইব্রেরী থাকিবে। অন্ততঃ একখানি দৈনিক বাঙ্গালা কাগজ লওয়া হইবে।

১৯। গ্রামে গোধন রক্ষা ও গোচারণ ভূমির বন্দোবস্ত থাকিবে। কোন গরু গ্রাম হইতে বিক্রয় হইবে না, গ্রামে গো-হত্যা হইবে না। গোবর কেবল জমির সারের জন্যই ব্যবহার হইবে, ঘুঁটে কি অন্য প্রকারে পোড়ান হইবে না।

২০। ডাক্তারের অনুমোদন ভিন্ন কোন দুর্ব্বল বালক বালিকার বিবাহ হইবে না এবং যদি কেহ যৌতুক কারণে বালিকার বিবাহ দিতে না পারে বা না দেয় তাহাকে কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না। বিবাহে কেহ বর-পণ লইতে পারিবে না; কোন উৎসবে বা তত্ত্বে কেহ অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করিতে পারিবে না।

২১। স্ত্রীলোকদিগকে "তৈজস পত্রের" ব্যবহার না করিয়া মানুষের মত ব্যবহার করা হইবে এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে যতদূর উচিত স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং শিক্ষিত করা হইবে। কারণ যতদিন 'মা' না উঠিবেন, ততদিন দেশ উঠিবে না।

২২। এই সমিতি পরস্পরের মনোমালিন্য মিটাইয়া দিবে এবং যদি কোন লোক সমিতিকে অমান্য করে তাহা হইলে সমিতি তাহাকে সামাজিক সাজা দিতে পারিবে।

এক থানার এলকার সমস্ত গ্রাম্য সমিতি মিলিয়া বৃহত্তর সমিতি গঠিত হইবে এবং এক মহকুমার সমস্ত বৃহত্তর সমিতি মিলিয়া এক "মহকুমা সমিতি" গঠিত হইবে এবং সকল মহকুমা সমিতি মিলিয়া জেলা সমিতি হইবে। এই "জেলা সমিতি" দেশের Drainage বন্দোবস্ত করিবেন।

প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য।—প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা অবধি প্রত্যহ আমাদিগের নিকট এত অধিক পরিমাণে নানা প্রশ্নপূর্ণ চিঠি আসিয়া জমিতেছে যে, তাহার সবগুলির যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া ও প্রতি মাসে প্রকাশ করা আমাদিগের একান্ত অসম্ভব। সুতরাং এই সংখ্যা হইতে নিয়ম করিলাম যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এক যোগে দুইটির অধিক প্রশ্ন করিতে পারেন না (প্রশ্নগুলি অবশ্য অল্প কথায় সমাধান-যোগ্য হওয়া চাই) এবং গ্রাহকগণ ব্যতীত অপর কাহারও প্রশ্ন গ্রাহ্য হইবে না। আগামী এইবার হইতে প্রত্যেক প্রশ্ন-পত্রের সহিত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যেন এই বৎসরের নূতন গ্রাহক নম্বর ও নাম-ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠান।—সম্পাদক।]

প্র, ১।—(ক) গন্ধকের গ্লাসে জল পান করিলে কি উপকার হয় কি? (খ) ডিমের সাদা অংশ (যাহাকে ডিমের কুসুম বলে) উভয়ের গুণ পৃথক ভাবে জানাইবেন। (গ) Distilled water (পরিশ্রুত জল) কতদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত এবং সহজ উপায়ে কি করিয়া জল পরিশ্রুত করা যায়? (যো, চ, মজুমদার, শিমলা পাহাড়)

উত্তর।—(ক) গন্ধক এত সামান্য পরিমাণে দ্রবনীয় যে, এক গ্লাস জলে নামমাত্র গন্ধকও পাওয়া যায় না; এমন কি, গন্ধকের চূর্ণ জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া দিলেও, তাহা ২।১ মিনিটের মধ্যে গ্লাসের তলায় থিতাইয়া পড়ে। সুতরাং গন্ধকের গ্লাসে জল পানে নিজের মানসিক পরিতৃপ্তি ব্যতীত অপর কোন উপকার হয় বলিয়া বোধ হয় না।

(খ) ডিমের শ্বেতাংশে আমিষ জাতীয় পদার্থ ও জলীয় ভাগ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান; ইহা শরীরের ক্ষয় নিবারণে ও দৈহিক তন্তু (tissues) গঠনে সাহায্য করে। পীতাংশে জলীয় ভাগ কম ও ইহার পুষ্টিকারিতা অধিক; ইহাতে স্নেহ জাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে, উহা শরীরের উত্তাপ ও মেদ বৃদ্ধি করে। পীতাংশে অধিক মাত্রায় ফস্ফরস্, ক্যালসিয়াম্ ও লৌহ-লবণ থাকে বলিয়া, ইহা 'রিকেটস্' (Rickets) রোগগ্রস্ত বা রোগা ছেলেদের পক্ষে ও যাঁরা রক্তাল্পতা রোগে ভুগিতেছেন, তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সিদ্ধ ডিমই সহজে পরিপাক হয়।

(গ) সাধারণ ডাক্তারখানায় পরিশ্রুত জল বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই অবিশ্বাস্য; কারণ, সাধারণ জলে ২।৪ ফোঁটা 'সিল্‌ভার নাইট্রেট' ও 'পারক্লোরাইড্ অফ্ আয়রন্' দিলেই জল অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং ঈষৎ সাদা ও স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। একমাত্র সমুদ্রগামী জাহাজে, এলোপ্যাথিক ঔষধ ও ইন্‌জেক্‌সনে পরিশ্রুত জলের প্রয়োজন হয়; পানের জন্য জল গরম করিয়া বা গ্রাম্য প্রক্রিয়ায়—বালি, কাঠ-কয়লা ও ছোট নুড়ীর মধ্য দিয়া শোধন করিয়া লইলেই যথেষ্ট। পরীক্ষার জন্য লীবিগের যন্ত্রে (Liebig's Condenser) সামান্য পরিমাণে জল পরিশ্রুত করা চলে। জল যদি প্রকৃতই পরিশ্রুত হয় এবং রীতিমত শিশিতে আঁটা থাকে, তাহা হইলে ঐ জল অনন্তকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

প্র, ২।—(ক) প্রাতঃকাল হইতে কিছু না খাইয়া খালি পেটে একেবারে বেলা ১০৷৷০টা ১১টার সময় ভাত খাইলে স্বাস্থ্য হিসাবে কোন ক্ষতি হইতে পারে কি না? অনেকে বলেন—কিছু না খাইয়া একেবারে খালি পেটে ভাত খাওয়া উচিত নয়; যদিই ভাত খাওয়ার পূর্ব্বে সকালে কিছু খাওয়া আবশ্যক হয়, তবে কি খাওয়া উচিত? (খ) আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য কি খাওয়া উচিত? মুখশুদ্ধির অনেক জিনিষ আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী? (গ) দিবাভাগে নয়টার সময় আহার

করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন ক্ষতি হয় কি না? রাত্রিতে কয়টার সময় আহার করা উচিত,—দশটার সময় আহার করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন ক্ষতিকর হয় কি না?

উ, ২।—(ক) আমাদিগের আহার বিহার প্রভৃতি সকল কার্য্যই অভ্যাসমূলক। অনেকেই প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিছু না খাইয়া একেবারে ১০।১১টায় ভাত খান্; অথচ দেহ বেশ সুস্থ রাখেন। যাঁহারা ৯টা-১০টায় ভাত খান, তাঁহারা রীতিমত ক্ষুধা বোধ না করিলে, সকালে কিছু না খাইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু যাঁহাদের সকালে কিছু জলযোগ করা অভ্যাস আছে, তাঁহারা সামান্য পরিমাণে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের মোহনভোগ বা হালুয়া খাইতে পারেন; অথবা পিত্ত রক্ষার্থে পূর্ব্বরাত্রে ভিজান ছোলা ২।৩ কাঁচ্চা পরিমাণ—ঈষৎ লবণ ও আদার সহিত ঐ পরিমাণ কাঁচা মুগের ডাল ভিজান ও তৎসহিত কয়েকখানি বাতাসা বা ঈষৎ গুড় খাওয়া অভ্যাস করিতে পারেন। তাহাতে শরীরও ভাল থাকে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, আহারের সময় বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। আপনি আহার সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদিগের আফিসে প্রাপ্তব্য 'ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি' (মূল্য ।৴০), ডাক্তার শ্রীযুক্ত আর, সি, রায়ের "Outlines of Hygiene and Public Health" (মূল্য ৪৲) বা শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসুর "খাদ্যকথা" (মূল্য ॥০) নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

(খ) মুখশুদ্ধি সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য নহে—মুখের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য। যে কোন মুখশুদ্ধি ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ 'গরম মশলা' বলিয়া জানি, সেগুলির নাম হইতেই গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ—উহারা উষ্ণতাবর্দ্ধক ও উত্তেজক। পান খাইলে দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইয়া ফেলা উচিত। এ বিষয়ে গত মাসের 'দাঁতের কথা' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(গ) আপনি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত হইবার কথা নহে।

প্র, ৩।—(ক) প্রত্যহ গঙ্গাস্নান শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কি না? (খ) কি উপায়ে শরীর বেশ developed হইতে পারে? (ন, কৃ, দাস, ভবানীপুর)

উঃ ৩। (ক) না; মধ্য-গঙ্গায় স্নান করিতে পারিলে আরো ভাল; কারণ সেখানকার জল কর্দ্দমাক্ত বা মলমূত্রাদি দ্বারা দূষিত হইতে পারে না। পরিশ্রুত না করিয়া লইয়া শুধু গঙ্গাজল পান করিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে বটে। [এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় ৯৪ পৃষ্ঠা ও গত জ্যৈষ্ঠ মাসের আলোচনা শীর্ষ-নিম্নে 'কলিকাতায় কলেরা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

(খ) বিস্তৃত প্রবন্ধ ব্যতীত এ প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, সময় মত পুষ্টিকর আহার, বিশ্রাম, সংযম, সাধ্যমত বীর্য্য ধারণ, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, সর্ব্বদা সুচিন্তা, সুকার্য্য ও সংগ্রন্থাদি পাঠে ও অবসর মত ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত থাকিলে শরীর সুগঠিত ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হয় ও থাকে।

প্র, ৪।—(ক) ভাঙ বা সিদ্ধি এদেশের লোকে খুব খায়; ইহারা বলে—ইহাতে শরীর বেশ ঠাণ্ডা থাকে, ক্ষুধা বেশ হয়, ঘুম খুব হয় এবং কোষ্ঠ সাফ হয়। আপনি ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে কি জানেন? (খ) পাকা মেঝে ভিজা গামছা দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া এবং অন্য কোন মাদুর ইত্যাদি না পাতিয়া খালি গায়ে শয়ন করিলে, (গ্রীষ্মকালে) অনেকটা আরাম বোধ হয়। ইহাতে শরীরের কোন হানি হয় কি? (সু, রায়, পুরী)।

উ, ৪।—(ক) সিদ্ধি সেবনে নেশাজনিত ক্ষুধা ও কোষ্ঠ সাফ্ হয় বটে, কিন্তু শরীর ঠাণ্ডা থাকে না। প্রবল নেশার অবস্থায় মাথা ঘোরে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, প্রায়ই কামোদ্রেক হয় ও খুন করিবার প্রবৃত্তি চাপে। নেশা কাটিয়া গেলে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক অবসাদ আসে; কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। তৎপরিবর্ত্তে কথা কহিবার উৎসাহ বাড়ে। বেশী দিন খাইলে বুদ্ধিভ্রংশ হয় ও উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

(খ) যাহাদের বাত বা মূত্রগ্রন্থির (kidney) পীড়া আছে বা যাহারা সর্দ্দি, ডিস্‌পেপসিয়া বা আমাশয়গ্রস্ত তাহাদিগের ক্ষতি আছে, অপরের নহে। তবে এরূপ শয়ন করিবার পূর্ব্বে, বিছা, কানচেলা, পিপীলিকা, সাপ প্রভৃতির কথা স্মরণ করা উচিত।

প্র, ৫।—১০।১১ মাস কাল অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিতেছি; * * এখন যকৃতের দোষ হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় ডাক্তাররা অনুমান করেন। আজ কয়েক দিন উদরাময় দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় কি পথ্য বা ঔষধ সেবন করা সঙ্গত বিবেচনা করেন? (ম, র, খাঁ চৌধুরী, সাতক্ষীরা।)

উ, ৫।—পথ্য—দিনের বেলা 'পিশ্ পাশ' বা হবিষ্যান্ন; সঙ্গে লেবু ব্যবহার করিতে পারেন। বেশী তরকারী ও বড় মাছ পরিত্যাগ করিবেন। রাত্রে শুধু খৈ বা শুধু খৈ-মণ্ড। দুধ ত্যাগ করিয়া অল্প অল্প কলার-পাতা দধি ভোজন করিবেন; আরম্ভ করিবেন আধ ছটাক হইতে,—পরে ক্রমশঃ এক পোয়া পর্য্যন্ত উঠিবেন। বেশী রাত্রে বা বেশী বেলায় আহার ও দিবা-নিদ্রা বর্জ্জন করিবেন। ঔষধ—Hewlett's Mist. Bismuth et Pepsinae Co. (without opium) ক্রয় করিয়া প্রত্যহ দু'বেলা আহারের পর সেবন করিলে, অথবা ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিমিটেডের (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা) তৈয়ারী Ext. Balae Liq. ১ শিশি ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতে পারেন। সুবিধা হইলে স্থানীয় ডাক্তার দিয়া উপর্য্যুপরি বা এক দিন অন্তর ৫ দিন এক একটি করিয়া 'এমিটিন্ হাইড্রোক্লোর' ইন্‌জেকসন্ দেওয়াইয়া লইবেন।

প্র, ৬।—বর্ত্তমান কলিকাতা বা অন্যত্র মাদক দ্রব্য নিবারণী কোন সভা আছে কি না এবং থাকিলে তাহার ঠিকানা কি? ভারতে মাদক দ্রব্য বার্ষিক কত আমদানি হইয়াছে বা হয় জানাইবেন। ("পূর্ণানন্দ," দাতারপুর, পঞ্জাব)

উ, ৬।—কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি বড় বড় সহরে ২।১টি করিয়া মাদক দ্রব্য নিবারণী সভা আছে; তন্মধ্যে ৪৮ নং রিপণ ষ্ট্রীটস্থ Calcutta Temperance Federation ও বোম্বাইয়ের Bombay Temperance Council ("Gazdar Mansion" Princess Street, Dhobi-Talao, Bombay)—এই দুইটীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতে মদ আমদানির গত চারি বৎসরের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

ইং ১৩১৭—১৮	২৪৯৯৬০০০৲	(স্পিরিট ও ঔষধের
১৩১৮—১৯	৩৩০২১০০০৲	জন্য য়্যাব্‌সলিউট্
১৯১৯—২০	৩৩৭৪১০০০৲	য়্যাল্‌কহলও এই
১৯২০—২১	৪৯০০২০০০৲	হিসাবের মধ্যে)

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আসাম ও পশ্চিমাঞ্চলে গত বৎসরের শেষভাগ হইতে মদের আমদানি প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সবিশেষ অধুনাতন সংবাদ "বঙ্গীয় সামাজিক হিতসাধন মণ্ডলীকে" (Bengal Social Service League, Amherst Street, Calcutta) লিখিলে জানিতে পারিবেন।

প্র, ৭।—(ক) হাঁপানি বা শ্বাসকাশি কি কি কারণে জন্মে। এই দুরারোগ্য পীড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রার্থনীয়। (খ) রাত্রিতে বিনা স্বপ্নে অজ্ঞাতভাবে শুক্রস্রাবের কারণ কি কি? (গ) ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ সম্বন্ধে কতিপয় সহজসাধ্য নিয়ম অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিবেন। (পু, বি, ভদ্র, ময়মনসিংহ)

উ, ৭।—(ক) স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ব্যতীত উত্তর দেওয়া যায় না। (খ ও গ) ডাক্তার কামাখ্যা বাবুর "হিন্দু ডুবিল" নামক প্রবন্ধটি আদ্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়া দেখুন। এ সম্বন্ধে ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

পল্লী-স্বাস্থ্য।

বাঙ্গলার মফস্বলে চিকিৎসা বিদ্যালয়ের কত অভাব, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষার্থীগণের কিরূপ আগ্রহ, তাহার একটু পরিচয় লউন।

যশোহরে একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দুই বিভাগেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে, এই অল্পকালের

মধ্যেই অনেকগুলি ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে। আগামী ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত ছাত্র গ্রহণ করা হইবে। আমরা আশা করি এই জনহিতকর বিদ্যালয়টীর উন্নতি এবং রক্ষাকল্পে যশোহরবাসী যথোচিত সাহায্য এবং সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।—যশোহর।

এবার সৌভাগ্য ক্রমে মফস্বলের একখানি মাত্র সংবাদপত্রে একটী মাত্র স্থানের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল দেখিলাম—

স্থানীয় স্বাস্থ্য আপাততঃ মন্দ নহে।—পল্লীবার্ত্তা, বনগ্রাম।

এই বনগ্রামের পল্লীবার্ত্তাতেই আর একটি সুখবর পাইতেছি—

বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড হইতে জনৈক প্রচারক সম্প্রতি বনগ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইনি বায়স্কোপ চিত্রের সাহায্যে ঐ সকল বিষয় জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। ইহাতে কৃষক শ্রেণীর লোকে উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।—পল্লীবার্ত্তা।

পল্লীবার্ত্তা হইতে আরও একটা সংবাদ উদ্ধৃত করিলাম—

বর্ষা রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এবার এ অঞ্চলে জ্বরের প্রাদুর্ভাব নাই। পাটের চাষের হ্রাস বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।—পল্লীবার্ত্তা।

এখন পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখুন, পাটের চাষে লাভ বেশী, না, সুস্থ থাকায় লাভ বেশী। এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর পাটের চাষ কমিবে না কি?

কলেরার জের আরও কতদিন চলিবে বলা যায় না—

কলেরার প্রাদুর্ভাব

তেজপুর ও তৎসন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে কলেরা মহামারীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম সমূহে এই মহামারী ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। গ্রামবাসিগণ ঔষধ পথ্যের অভাবে মারা যাইতেছে। ময়মনসিংহের ফুলবাড়ী বস্তী হইতে বহুসংখ্যক মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।—হিন্দুস্থান।

আলোচনা।

চট্টগ্রামে মেডিক্যাল স্কুল।

মৈমনসিংহে মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হইতে না হইতে, চট্টগ্রামে মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা প্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। আনন্দের সংবাদ বটে। আমরা বহুদিন হইতে প্রতি জেলায় জেলায় এইরূপ এক একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন, কুইনাইনের অধিকতর প্রচার ও মূল্য হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে স-পারিষদ গভর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি, এবং তাহা লইয়া স্বাস্থ্য-সমাচারের পৃষ্ঠায় অনেক চোখের জল ফেলিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম বুঝি অরণ্যে রোদন হয়। এখন দেখিতেছি গরীবের কথা বাসি হইলেই মিষ্টি লাগে! কিন্তু টাট্‌কা থাকিতে উহা যদি মিষ্ট লাগিত, এতদিন কতকগুলি সুযোগ্য ডাক্তার দেশের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর দশন-নখর হইতে কত সহস্র নরনারী যে রক্ষা পাইত, তাহা চৌষট্টি হাজারী উজির মহাশয়রা একটু মাথা ঘামাইলে বোধ হয় বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিতেন।

গত ২১শে জুলাই তারিখে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ বার্লে সাহেবের সভাপতিত্বে "মেডিক্যাল স্কুল ফাউণ্ডিং কমিটির" একটি সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভার সম্পাদক বিপিনচন্দ্র গুহ মহাশয় চট্টগ্রাম সহরে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও তাহার আনুষঙ্গিক উপকারিতা সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিয়া, ঐ উদ্দেশ্যে অর্থ ভিক্ষা করেন। তখনই সরাসরি ১০,০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। খাঁ সাহেব আবদুর রহমান্ দোবাষ্ দুই সহস্র, ব্যবসায়ী জমিদার নগেন্দ্রলাল চৌধুরী মহাশয় এক সহস্র ও আরও কয়েক জন বদান্য ব্যক্তি কয়েক শত করিয়া চাঁদা দিতে রাজি হইয়াছেন। স্কুলটির নির্ম্মাণ কল্পে প্রায় লক্ষ টাকা প্রাথমিক ব্যয় পড়িবে। তন্মধ্যে জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ২৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবেন, বাকী টাকা নাকি সরকার বাহাদুর পূরণ করিবেন। এখন এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হোক, ভগবৎ সমীপে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তবে সুরেন্দ্র বাবুর নিয়োজিত কমিটি ২১টি জিলায় স্কুল স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। কবে তাঁহারা প্রতি জেলায় এক একটি করিয়া আদর্শ মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া, পান বিড়ি খাইবার মুদ্রা প্রদানে একান্ত অসমর্থ মফস্বলের ছাত্রদের কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ

...র দ্বার হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফেরা ও ...ব্যাধি বর্গীদের লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণের চৌথ ...কথঞ্চিৎ বন্ধ করিয়া দিয়া দেশের ও দশের ...দাই হইবেন, আমরা সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় ...লাম। আপাততঃ আমরা ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট হই; ...আমাদের প্রাজ্ঞরা বলিয়া থাকেন, "নেই মামার ...কাণা মামা ভাল!"

...পানী বুরুষ প্রসঙ্গে অবান্তর কথা।—

কিছুকাল পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, জাপানী বুরুষ ...হারের ফলে অনেকে এ্যানথ্রাক্স রোগে ভুগিতেছে। ...এদেশে জাপানী বুরুষের আমদানী এক রকম ...করিয়া দেওয়া হয়। এখন শুনিতেছি, ...পান গবরমেণ্ট এই নিষেধ-বিধি রহিত করাইবার ...করিতেছেন; অর্থাৎ যাহাতে জাপানী বুরুষ প্রস্তুত ...রিয়া আবার এদেশে জাপানী বুরুষ পূর্ব্বের মত ...াইতে পারেন সেই অধিকার চাহিতেছেন। এবং ...ও সঙ্গে সঙ্গে শুনিতেছি যে, গবরমেণ্টের এখনও ...অনুমতি দিবার একটুও ইচ্ছা নাই। আচ্ছা, ...জাপানী বুরুষগুলা রোগ-বীজদুষ্ট, এবং যে কারণে ...পানী বুরুষের এদেশে আমদানী রহিত হইয়াছে, ...পান গবরমেণ্ট খোঁজ লইয়া দেখিয়াছেন কি যে, ...পানী বুরুষ প্রস্তুতকারীর তাঁহাদের প্রস্তুত বুরুষের ...দোষটি দূর করিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন? ...কিরূপ গ্যারেন্টি দিতে প্রস্তুত আছেন? যদি কেহ ...পানী বুরুষ ব্যবহার করিয়া এই রোগে আক্রান্ত ...কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা অন্য কোনরূপে ...তিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে জাপানী ব্যবসায়ীরা, তথা ...পান গবরমেণ্ট কিরূপ ক্ষতি পূরণ দিতে প্রস্তুত ...ছেন? জিনিসটির যখন এত বড় একটা মারাত্মক ...রহিয়াছে, তখন, আগে সেই দোষ দূর না করিয়া ...উপরোধ অনুরোধ আবদারই চলিতে পারে না। ...প্রসঙ্গে আমরা আর একটী বিষয়ের প্রতি সাধারণের ...গবরমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গত ...য়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল রণ সম্ভার সংগৃহীত ...য়াছিল, যুদ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সেই সকল ...অনেক পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইতেছে। গবরমেণ্ট ...বাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সেই সকল জিনিস সাধারণকে ...ক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ...শুনিতেছি যে, সৈন্যগণের দ্বারা যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত, কিন্তু অধুনা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত অনেক জিনিসও বাজারে বিক্রীত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, লোকে পথের ধারে বসিয়া থাকি রঙের নানাবিধ সূতি দ্রব্যের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ লইয়া বিক্রয় করিতেছে। সে জিনিসগুলির অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সেইগুলি নূতন নহে; ব্যবহারের পর এরূপ জিনিসের যেরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে, ইহাদের অবস্থাও সেই রকম। কিছুদিন হইল, দেখিলাম, এক একটা টিনের কৌটার ভিতর এক যোড়া করিয়া রঙিন চশমা; প্রত্যেক কৌটা চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, এবং বহু লোক তাহা কিনিতেছেও। কাহারও কাহারও মুখে শুনিলাম, ঐ চশমাগুলি সৈন্যদের ব্যবহৃত second hand জিনিষ। এ সকল কথা কি সত্য? যদি সত্য হয় তাহা হইলে এরূপ ভাবে এই সব জিনিষ সাধারণের মধ্যে কেনা বেচা হইতে দেওয়া কি উচিত? ইহাতে কি সাধারণের মধ্যে নানা প্রকার রোগ বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা নাই? আর যদি জনরব সত্য না হয়, তাহা হইলে বোধ হয় এই জনরবের প্রতিবাদ করা সরকারের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জন-সাধারণ নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে এই সব জিনিষ কিনিয়া ব্যবহার করিতে পারে এবং পূর্ব্বোক্তরূপ জনরবও রটিতে পারে না। শীত পড়িবার সময় বরাবর প্রায় দেখা যায় বাজারে নানা আকারের ও নানা ফ্যাসানের গরম কাপড়ের জামা বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেগুলি দেখিলেই তাহা যে ব্যবহৃত,—second hand, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জিজ্ঞাসা করি, এসব জিনিস কলিকাতার বাজারে আমদানী হয় কোথা হইতে? প্রায় দেখা যায়, দরিদ্র লোকেরা সস্তা দরে এই সব জামা কিনিয়া পরিয়া কিম্ভূত কিমাকার সাজিতেছে। এক দেশের এই রকম ব্যবহৃত জিনিস অন্য দেশে এই ভাবে চালান দিয়া সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে, যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ প্রথমোক্ত দেশেই সীমাবদ্ধ, তাহারা এই প্রকার গাত্র-বস্ত্রের সাহায্যে দ্বিতীয়োক্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না কি? বিষয়টি বড় গুরুতর। আমরা ইহার সদুত্তর চাই। জাপানী বুরুষে যখন এ্যানথ্রাক্স রোগ বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা থাকায় তাহার আমদানী বন্ধ হইয়াছে, সেইরূপ ঐ সকল ব্যবহৃত জিনিসের এদেশে আমদানী ও ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্বাস্থ্য-সমাচারের আত্ম-নিবেদন।

আমাদিগের আত্ম-নিবেদনের প্রারম্ভে, যাঁহারা ১৩২৯ সালের স্বাস্থ্য সমাচারের চাঁদা যথাসময়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তাঁহাদিগকে হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদিগের নিকট সবিনয় নিবেদন,—এই পত্রিকাখানির দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া ও ইহাতে প্রকাশিত উপদেশগুলির সার্ব্বজনীন্ প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিবেচনা করিয়া, ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে যেন কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন ও প্রত্যেকে ২।১টি করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া পত্রিকাখানির প্রতি তাঁহাদিগের অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দেন।

যাঁহাদিগকে গত ফাল্গুন মাস হইতে এ বৎসরের চাঁদার জন্য পুনঃপুনঃ তাগিদ করা হইতেছে, তাঁহাদিগকে করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাঁহাদিগের মনোভাব আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদিগের আর্থিক ও বাচনিক উৎসাহের উপর আমাদিগের এই বিরাট উদ্যম ও স্বাস্থ্য-সমাচারের ক্ষুদ্র জীবন কতখানি নির্ভর করিয়া আছে, তাহা তাঁহারা নিজেরা জানিয়াও এবং বহুবার আমাদিগের নিকট হইতে শুনিয়াও, চাঁদা পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না কেন—তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; অথচ কাগজ বন্ধ করিবার জন্যও তাঁহারা কোন আদেশ দিতেছেন না! এইরূপ একটি সৎকার্য্যে—যাহাতে নিজের ও নিজ পরিবারের উপকার, দেশের ও দশের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে বার্ষিক মাত্র দুইটি টাকা অর্থাৎ মাসে দশটি পয়সা বা প্রতিদিন একটি পাই পয়সাও কি খরচ করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ? আমরা কি তাহাই বুঝিব?

নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া স্বাস্থ্য-সমাচার গত বৈশাখ হইতে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; এই কয় বৎসর জীবন অতিবাহিত করার ফলে স্বাস্থ্য-সমাচার অনেক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে ও অনেক নূতন বাণী দেশবাসীকে শুনাইতে প্রয়াসী হইয়াছে, এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের মতে, ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিও সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান উন্নতির সৌধটি খাড়া করিয়া তুলিতে, আমাদিগের ব্যক্তিগত বাধা, বিপত্তি, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের কথা ছাড়িয়া দিই,—কত যে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিলে পাঠকগণ নিতান্ত আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। গত বৎসর মূল্য বৃদ্ধি করাতে প্রায় সহস্রাধিক গ্রাহক আমাদিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন; ফলে—আপাততঃ স্বাস্থ্য-সমাচার প্রতি মাসে ৩০০০ হাজার করিয়া ছাপা হইতেছে, তন্মধ্যে দানশীল (paying) গ্রাহকদিগের ২,৮০০ শত, নমুনা ও উপহারের জন্য ১০০ শত খরচ হয়, এবং বাকী ১০০ শত কপি ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য মজুত থাকে। ২,৮০০ শত গ্রাহকগণের নিকট হইতে ৫,৬০০৲ টাকা আদায় হয়; কিন্তু তাহা নিয়মিত হয় না, প্রায় ১,৮০০ শত গ্রাহকগণের নিকট বর্ত্তমান বর্ষের চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, এমন কি গত সনের চাঁদা দুই চারিজন সহৃদয় গ্রাহক এখনও পর্য্যন্ত দিবার অবসর পান নাই। স্বাস্থ্য-সমাচার প্রতি মাসে ছাপিবার জন্য (কর্ম্মচারী, সহকারী সম্পাদকসঙ্ঘের মাহিনা, Est blishment, depreciation প্রভৃতি ধরিয়া) অন্যূন ৬৫০৲ টাকা হয়, অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ৮০০০৲ টাকা খরচ পড়ে। ৫,৬০০৲ টাকার উপর—বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বাবদ আরো ৪০০৲ টাকা আয় ধরিলেও, আমাদিগকে প্রতি বৎসর অন্নাধিক ২,০০০৲ টাকা করিয়া লোকসান দিতে হয়; ইহা সামান্য নহে! কিন্তু "স্বাস্থ্য-সমাচারের" প্রকাশ ও প্রচার আমাদিগের ব্যবসা নহে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ে স্বদেশের উন্নতি, স্বদেশীর উপকার সাধন—ইহাই আমাদিগের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। সুতরাং লোকসানের এই অসহনীয় গুরুভার আমাদিগের নিকট নিতান্ত লঘু জ্ঞান হয়—যদি এই জাতীয় কার্য্যে জাতির সহানুভূতি পাই, অন্ততঃ গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদিগের সময়মত সাহায্য ও উৎসাহ পাই! তাঁহাদিগের সাহায্য ও উৎসাহ আমাদিগের ন্যায্য দাবী বলিয়াই মনে হয়; স্বাস্থ্য-সমাচারের বার্ষিক ২৲ টাকা মূল্য রাজকর নহে—'সনির্ব্বন্ধ' ভিক্ষা, এইটুকু সকলেরই মনে রাখিবার বিষয়।

আমাদিগের যাহা বলিবার ছিল বলিলাম। এখন, যাঁহাদের নিকট চাঁদা এখনও বাকী পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহারা হয় এই চারি সংখ্যার মূল্য বাবদ অবিলম্বে ৸০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইয়া পর মাস হইতে পত্রিকা বন্ধ করিতে আমাদিগকে আদেশ করুন, নচেৎ ভাদ্র সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে আদেশ বা আগামী মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে ২৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়া—আমাদিগের দীর্ঘ একাদশ বর্ষের সেবা ও সাধন সফল ও সঞ্জীবিত করুন—ইহাই আমাদিগের শেষ সবিনয় অনুরোধ! ইতি—

২০শে শ্রাবণ ১৩২৯, কলিকাতা। সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ,—স্বাস্থ্য-সমাচার।

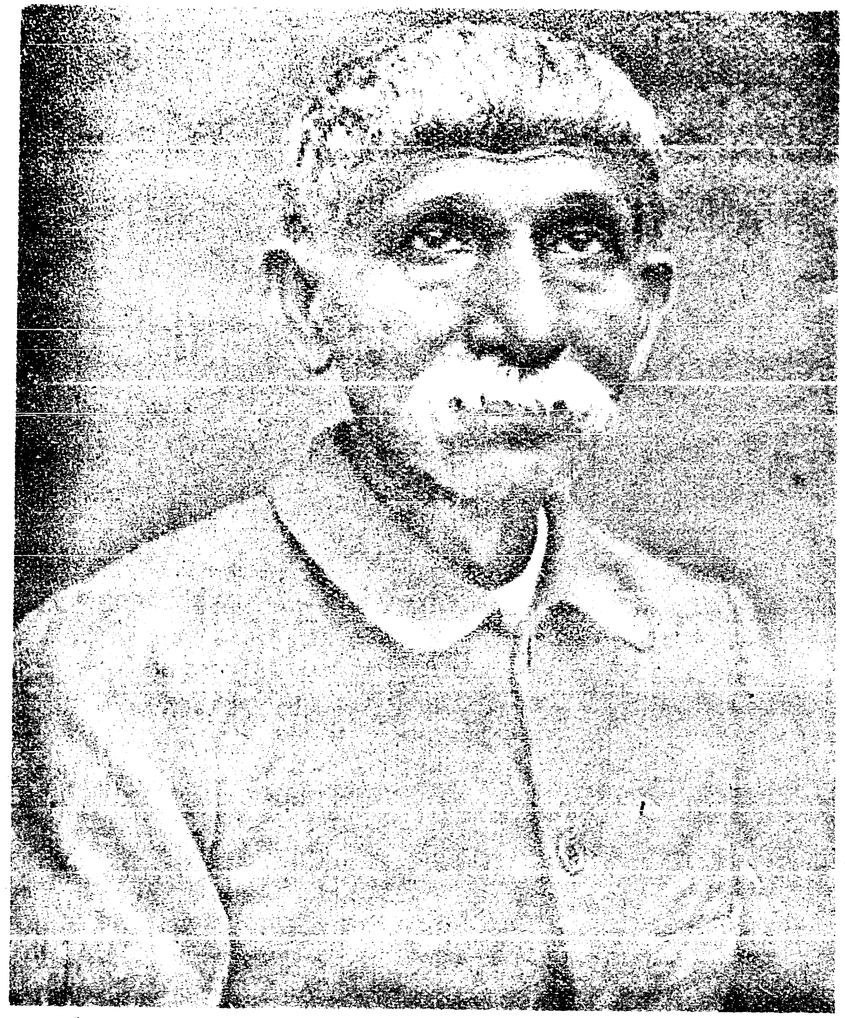

গোলোকগত ৺ অতিলাল ঘোষ।

গোলোকগত ৺মতিলাল ঘোষ।

জন্ম অক্টোবর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২২।

ভারতের অন্যতম রাজনীতিক চূড়ামণি স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের রাজনীতি-কুশলতার কথা আমরা কিছু বলিব না—সে কথা আরও অনেকে এই কয়দিন ধরিয়া কহিয়াছেন, এবং কহিতেছেন। বাঙ্গালায় রাজনীতিক মতি বাবুকে সকলেই ৫০ বৎসর ধরিয়া জানিতেছেন, বুঝিতেছেন। কিন্তু দেশের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য তিনি কিরূপ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন তাহা সকলে জানেন না। বাঙ্গালায় অনেক সংবাদপত্র জন্মিয়াছে, লয় পাইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। সংবাদপত্র সম্পাদনও অনেকে করিয়াছেন কিন্তু, সকলেরই একমাত্র অথবা সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য পলিটিক্স বা রাজনীতি। মতিবাবুর ন্যায় রাজনীতির সহিত দারিদ্র্য সমস্যা ও স্বাস্থ্যনীতি আলোচনা আর কেহ করেন নাই।

তাঁহার সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকা বাঙ্গালায় স্বাস্থ্যহীনতার কথার যে ভাবে আন্দোলন আলোচনা হইয়া থাকে, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার মূল্য বড় সামান্য নহে। **বাঙ্গালা এবং ভারতের স্বাস্থ্যহীনতা দারিদ্র্যের ফল** এই সত্যটি তিনি যেমন জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এখন আর কেহ পারেন নাই—কেহ পারিবেন কি না তাহাও বলা যায় না। দারিদ্র্যতা জন্য উপযুক্ত আহারের অভাবেই দেশে রোগবৃদ্ধি হইতেছে, জন্ম হইতে মৃত্যুর হার বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা তিনি সর্ব্বক্ষণ সকলকেই বুঝাইয়া গিয়াছেন। দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইলেই যে স্বাস্থ্য-সমস্যার বারো আনা ভাগ সমাধান হইয়া যাইতে পারে—একথা ইউরোপীয় এবং সরকারী স্বাস্থ্য নীতি-বিদগণকেও অধুনা স্বীকার করিতে হইতেছে। ফলে বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ প্রকৃত পক্ষে (পোলিটিকোনমিক্সের politico-nomics) ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই মতিবাবুর তথা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রধান আলোচ্য বিষয় বরাবরই ছিল, এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও থাকিবে।

মতিবাবুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় দরিদ্রের হইয়া স্বাস্থ্য কথা কহিবার উপদেষ্টা চলিয়া গেলেন। তাঁহার ন্যায় আর কেহ সে কথা তেমনি করিয়া কহিতে পারিবেন কি না তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন।

শ্রীভগবান গোলোক গত আত্মার প্রীতি সম্পাদন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৯ সাল { ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালার দুর্গোৎসব।

মনুসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্লুক ভট্টের সন্তান রাজা কংসনারায়ণ, মহামতি আকবর শাহের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালায় প্রথম দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। আচার্য্যাগ্রগণ্য রমেশ শাস্ত্রীর বিধান মতে রাজসিকভাবে দুর্গোৎসব করিতে কংসনারায়ণের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তদবধি প্রতি বৎসর বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে আনন্দময়ীর এই মহাযজ্ঞ মহাআড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। রাজা কংস যখন দুর্গাপূজা করেন, তখন টাকায় আড়াই মণ চাউল মিলিত, পাঁচসের ঘি মিলিত, পাঁচগণ্ডা পয়সায় এক ঘটি জলহীন দুগ্ধ পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা খাদ্য ও পরিধেয় তখন বিশগুণ সস্তা ছিল। আর তখন ছিল, বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে একপ্রাণতা, অনাবিল আনন্দ, নিরোগা সবল সুস্থ দেহ আর আড়ম্বরহীন নির্ভীক স্বচ্ছন্দ জীবন।

আর এখন? এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আজ ত বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব নয়—**দুর্গতির উৎসব**। আজ বাঙ্‌লার প্রাঙ্গনে সে সুন্দর সুস্থকায় শিশুর কলহাস্য নাই, নারীর সে কল্যাণ-বিভূতি নাই, বৃদ্ধের সে অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস নাই, পল্লীর সে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও শোভা নাই, পল্লীবাসীর সে সরল প্রাণের প্রীতি, সহানুভূতি ও একতা নাই। আজ সবই যেন ছাড়া-ছাড়া। আমরা যেন জীবনের আদর্শ হারাইয়া ফেলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছি, সনাতন শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়া গিয়া গন্তীরবেদী গজের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি, কৃষি-বাণিজ্য-সম্পদকে সম্মার্জ্জনীর মুখে ফেলিয়া দিয়া, সত্য-সত্যই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছি। তাই আমাদের ঘরে অন্ন নাই, মুখে হাস্য নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। আমরা আজ যথার্থই হা-ঘরে, হা-ভাতে হইয়াছি।

আমাদের এ দীনতার কারণ কি ?—আমাদের অজ্ঞানতা ও স্বাস্থ্যহীনতা! বিগত চারিশত বৎসর ধরিয়া আমরা কেবল চাল-কলা দিয়া, ঢাকের বাজনা বাজাইয়া, ডাকের গহনা সাজাইয়া, বৃথা জড় প্রতিমার পূজা করিয়া আসিতেছি। আমরা দশভূজে দশপ্রহরণ ধারিণী, অভয়প্রদায়িনী প্রফুল্ল-প্রসন্ন-আননা ত্রিনয়না জগদম্বার এতকাল ধরিয়া উপচার যোগাইয়া আসিলাম, তবু আমাদের দুই বাহু দুর্ব্বল, ভয় ঘুচিল না, মুখে বিষাদের কালিমা গাঢ়তর, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না। সিংহ বাহিণীর পার্শ্বে জ্ঞানাধিষ্টাত্রী সরস্বতীর শ্রীপাদ-পদ্মে এই যে এতকাল ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম, কতখানি অজ্ঞানতা ঘুচাইতে পারিয়াছি ? আমাদের বিদ্যা কই, জ্ঞান কই, শিক্ষা কই, পরিণাম-দর্শিতা কই, বিবেক-বিচার-বুদ্ধি কই ? আমরা কেবলই 'লজির' (logy) সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি, দুই চারিটা বাঁধাগৎ ও বিদেশী বুলি শিখিয়া বিদ্যা-সাগরের পারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ও-পারে গিয়াছি না এ পারেই আছি তাহা কে বলিবে ? সিদ্ধিদাতা গণেশের ভজনা করিয়া আমরা কি পাইলাম ?—আমাদের কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা নাই, সকল কার্য্যই অসিদ্ধ, সকল কামনাই অপূর্ণ, সকল উদ্দেশ্য-সাধনেই বিঘ্ন। রণ-দুর্ম্মদ, স্বাস্থ্য ও শক্তিরূপী সুব্রহ্মণ্য কার্ত্তিকেয়, ষোড়শোপচার গ্রহণ করিয়া, বিনিময়ে আমাদের দিলেন কি ?—অস্বাস্থ্য, অবসাদ, নির্জ্জীবতা নিরানন্দ, সংক্রামক ও চিরস্থায়ী ব্যাধি। কমলা চঞ্চলা হইয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন। সিংহের গর্জ্জন থামিয়া গিয়াছে—কেশর ঝরিয়া পড়িতেছে। তাই আজ আমাদের বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে পুঁথিগত ধন পরহস্ত-গত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালার মা-টি সধবা হইয়াও একাদশী করিতেছেন। বল বাঙ্গালী, আজ তোমার এ দুর্গোৎসব না দুর্গতির উৎসব ?

আমাদের এ দুর্গতির জন্য দায়ী কে ?—রাজা ও প্রজা উভয়েই। নদী খাল বিল মজিয়া যাইতেছে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, ওলাউঠা, হাম বসন্ত, ধনুষ্টঙ্কার আমাশয়, প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধির বিষে বঙ্গপল্লী উজাড় হইয়া যাইতেছে, অচ্ছোদ পানীয় জলের অভাবে দেশের লোক তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মরিতেছে, হাতুড়ে বৈদ্য ও অশিক্ষিত দাইরা শমনের কর্ত্তব্যের বোঝা লঘু করিয়া দিতেছে, অনাহার, অচিকিৎসা ও অবহেলায় বাঙ্গালার প্রাণের সকল স্পন্দন ক্রমশঃ থামিয়া আসিতেছে, তবু সংস্কার ও উন্নতির প্রস্তাব উঠিলেই, রাজা তাঁহার রাজকোষে অর্থাভাবের দোহাই দিতেছেন ; অথচ সামরিক ব্যয় ও সৈন্য সংরক্ষণ-করে তিনি প্রজার খাজানার অর্দ্ধেক অপচয় করিতেছেন, এক একটি রাজপুরুষের শুভাগমনে কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন, গ্রীষ্মাবাস ও লাট-সভার সভ্যদের যাতায়াতের ব্যয়ের জন্যই বৎসরে দুইলক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করিতেছেন! কিন্তু এই সকল দিকে ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া, তিনি যদি প্রজার অভাব-অভিযোগ-দুঃখ-শোকের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে রাজা ও প্রজা—উভয়েরই অনেক উপকার হইত। রাজারই স্বার্থের দিক দিয়া বলি,—অধিক সংখ্যক প্রজা হইলে তাঁহার খাজানার পরিমাণও আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি পায়, প্রজার প্রতি রাজার সহানুভূতি থাকিলে প্রজা সন্তুষ্টির সহিত তাহার খাজনা দেয়, খাজনা বৃদ্ধি করিলেও বিনা দ্বিধায় অকাতরে তাহা প্রদান করে, প্রজার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে তাহারই সহায়তায় এ দেশ বা রাজার দেশকে বিদেশীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়, প্রজা শিক্ষিত হইলে—আর্থিক বিষয়ে উন্নত হইলে, রাজার দায়ীত্বের বোঝা অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়—রাজার ব্যক্তিগত আর্থিক সমস্যার অনায়াসেই পূরণ হয়। রাজার রাজকোষে অর্থ নাই—মানিয়া লইলাম। কিন্তু এই-যে এক একটি প্রদেশে অসংখ্য জমিদার—যাঁহারা রাজার তর্জ্জনী-সঞ্চালিত কাষ্ঠ-ক্রীড়নক মাত্র, যাঁহারা বৎসর বৎসর খাঁ সাহেব, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, কে, টি, প্রভৃতি উপাধি বিভূষিত হইয়া নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে দিন যাপন করিতেছেন, যাঁহাদের

অধিকাংশেরই দেশ-সেবা ও জন-হিতকর অনুষ্ঠানের খাতায় খরচের ঘরে শূন্য দেখা যায়, তাঁহাদের সাহায্যেও কি রাজা দেশের এই দুরবস্থা অপনোদনে সচেষ্ট হইতে পারেন না ? আজ রাজা যদি নিয়ম করিয়া দেন যে, যে-জমিদার তাঁহার জমিদারীর বার্ষিক মুনাফার এক চতুর্থাংশ প্রজার অভাব নিরাকরণে ব্যয় করিবেন, তিনি লাট-কৌন্সিলের সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন ; কিম্বা যিনি নিজ জমিদারীর মধ্যে ১০০টি বা ততোধিক বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণী, ২০০ শত বা ততোধিক ইঁদারা কাটাইয়া দিবেন, প্রতি মৌজায় একটি করিয়া হাঁসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও এক একটি করিয়া প্রাথমিক ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিবেন, বা খাল বিল আমূল সংস্কার করিয়া জঙ্গল কাটিয়া দিবেন বা যাঁহার জমিদারীতে নিবার্য্য রোগের প্রকোপে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক লোক মরিবে, তিনি বা তাঁহারাই কেবলমাত্র রায় সাহেব বা রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি লাভের অধিকারী হইবেন,—তাহা হইলে দেখিবে যে, কাল দেশের সমস্ত জমিদারের মধ্যে স্বার্থ-প্রণোদিত জন-হিতকর অনুষ্ঠানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চার প্রভাব বায়ুমুখে অগ্নির মত কেমন আপনা-আপনি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে! এরূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে একদিক দিয়া রাজাও বাঁচেন, অপর দিক্ দিয়া প্রজাও বাঁচেন ; কিন্তু রাজা কি এরূপ কৌশলের শরণ লইবেন ?

তারপর, আমাদের নিজেদের দোষ! এই-যে আমাদের দেশের আভিজাত্য সম্প্রদায়—ছোট-বড় জমিদার, তাঁহারা কি আমাদের সহিত এক শাসিত-শ্রেণী-ভুক্ত নহেন ? 'আমরা' বলিতে কি তাঁহাদিগকেও বুঝায় না ? তাঁহারা জনসাধারণের প্রীতি অর্জ্জন করিতে—আশীর্ব্বাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে এ পর্য্যন্ত কি কায করিয়াছেন ? তাঁহারা যদি এ বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে উদ্যোগী হইতেন, তাহা হইলে কি এতদিন দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইত না ? তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই—প্রজার সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করিবার মত মানসিক অবস্থা নাই ; যাঁহারা উচ্চ শিক্ষিত—তাঁহারা অধিকাংশই ম্যানেজার ও সদর নায়েবের উপর প্রজার শাসন-পালনের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অকুণ্ঠিত আলস্যে লাট-পরিষদের বেঞ্চি গরম করিতেছেন ও অবসর মত মোটর চড়িয়া হাওয়া খাইয়া, পল্লী-উন্নতির চিন্তা ও চেষ্টাকে 'গো টু-হেল্' করিয়া দিয়া দিব্য আরামে দিন কাটাইতেছেন! ফলে—প্রজা ও জমিদার-কর্ম্মচারীর মধ্যে অহী-নকুলের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে ; মার-পিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা, খাস দখল ও উচ্ছেদের নিত্য সমারোহ লাগিয়া আছে। জমিদার জীবনে কখনও প্রজাকে চিনেন না, প্রজাও আর তেমন করিয়া মালেকের জন্য প্রাণ দিতে জানে না। তার পর, ধর্ম্মের-ক্ষেত্রে—ব্যবসায়-ক্ষেত্রে—সামাজিক ক্ষেত্রে—রাজনীতির ক্ষেত্রে—শিক্ষার ক্ষেত্রে—আমরা ভেদ-জ্ঞানকে কত প্রকারেই যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছি—তাহার ইয়ত্তা নাই। একতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল টুটাইয়া, আজ আমরা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেদের চারিপার্শ্বে উচ্চ প্রাচীরের ঘের তুলিয়াছি ; আমাদের জাতীয় উন্নতি—মুক্তির পথ কোথায় ? রাজনীতির ক্ষেত্রে—আমরা গরমপন্থী, মধ্যপন্থী, নরমপন্থী, ধীরপন্থী, চপলপন্থী—কত পন্থা ও পন্থীরই না সৃষ্টি করিয়াছি। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে—বিষ্ণুপন্থী, শিবপন্থী, গণপতপন্থী, শক্তিপন্থী, সূফীপন্থী শিয়াপন্থী কত পন্থা ও পন্থীরই না উদ্ভব হইয়াছে। সামাজিক ক্ষেত্রে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র, নমঃশূদ্র, নবশাক, মাহিষ্য, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কৌলিন্য, চাষা, ভদ্র—কত না স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টিই করিয়াছি। সাংসারিক ক্ষেত্রেও ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়াছি ; বাপের সহিত পুত্রের মিল নাই, বধূর সহিত শ্বশ্রূর বনিবনাও নাই, এমন-কি স্বামীর ঘর করিয়া স্ত্রীর শান্তি নাই! নগরে, পাশের বাড়ীর লোক পাশের বাড়ীর লোকের নাম জানে না, একের কান্নায়

অপরে চ'খের জল ফেলে না, একের সুখে অপরে হাসে না। পল্লীতে,—এক পল্লী অপর পল্লীর উন্নতি দেখিতে পারে না, এক পাড়া অপর পাড়ার—তথা এক গৃহ অপর গৃহের—ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঈর্ষায় ফাটিয়া মরে, ১ ছটাক জমির জন্য ভাই ভাইয়ের মাথায় লাঠি মারে, রাত্রি-কালে জ্ঞাতি বা আত্মীয় মরিলে সংকারের জন্য, কেহ অসুখের অছিলায়, ভার্য্যার শীতলাঙ্কের মায়া কাটাইয়া আসিতে চাহে না! দোষ রাজার ঘাড়ে দিয়া খালাস হইলে চলিবে না, আমাদেরই দোষ পনর আনা। সাধ করিয়া কি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়া-ছিলেন ?—

পরের পরে কেনরে রোষ,
নিজেরাই যদি শত্রু হোস্,
এ যে তোদের নিজেরই দোষ,—
আবার তোরা মানুষ হ'।

খাঁটি সত্য কথা! আমরা যে স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। এর উপায় কি ?

বাঙ্গালী, আজ শক্তিপূজা করিতে চলিয়াছ—তোমার শক্তি কই ? শক্তি না থাকিলে শক্তির আরাধনা করিবে কি করিয়া ? সেকালে সকলে শক্তি কা'কে বলে জানিত, তাই বোধনের দিনে পরমাত্মা শক্তি মাটির প্রতিমায় অসিয়া অধিষ্ঠিতা হইতেন, লক্ষ ভক্তের ভক্তি-অশ্রু-সিঞ্চিত মেদিনী-গগন-নিনাদিত "মা মা" ধ্বনিতে মহামায়া মাটির ওষ্ঠে হাসি ফুটাইয়া শক্তি-পুত্রদের অভয় দিতেন—আশ্বাস দিতেন—আশীর্ব্বাদ করিতেন। আজ সে শক্তি—সে ভক্তি কোথায় ? না আছে দৈহিক শক্তি, না আছে মনের শক্তি, না আছে আধ্যাত্মিক শক্তি। যাহারা এতকাল ধরিয়া শক্তির একটা বিরাট অপব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, নিজ বংশধরকে অশিক্ষিত, নারীকে নির্জ্জিত, দুর্ব্বলকে পদ-দলিত করিয়া আসিয়াছে, সকল বিষয়ে শক্তিহীনতাই আজ তাহাদের পাপের জ্বলন্ত প্রতিফল। ওগো, শক্তিহীনের গৃহ-প্রাঙ্গণে মাটির পুতুলে শক্তিময়ীর আগমনীর সমারোহ জাগে না, শক্তিহীনের ভক্তিহীন প্রণামের বিনিময়ে শক্তি-ভক্তির আধার-ভূতা কৈবল্যদায়িনী মা আমাদের শক্তি-ভিক্ষা দেন না। মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীরামচন্দ্র চক্ষু উৎপাটন করিতে গিয়াছিলেন, বাঙ্গালী, পারিবে কি ?

বাঙ্গালী, দুঃখের উপলখণ্ডে শয়ন করিয়া দুর্গতির মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া নেশার খেয়ালে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছ। ভাবিতেছ স্বত্ব-রজ-তমোগুণাদর্শ প্রকটিত করিয়া, ত্রিলোক-পূজিতা, শিব-শিরধৃতা, ব্রহ্মজ্ঞান বিনোদিনী, শান্তি-মুক্তি প্রদায়িনী মা দুর্গা, লক্ষ্মী-গণপতি প্রভৃতি সমভিব্যহারে সুরথ রাজার যুগের মত সত্যসত্যই বুঝি তোমার ঠাকুর-দালানে আসিয়া আবির্ভূতা হইতেছেন ?—মূর্খ, অলীক স্বপ্ন! মা'র আর সে মাতৃত্বের মূর্ত্তি নাই, তার কায়াও নাই—ছায়াও নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরিকল্পিত সে মূর্ত্তি—রমেশ শাস্ত্রীর বিহিত সে প্রতিমা-যে তখনকার বাঙ্গালী-জীবনের আদর্শোজ্জ্বল মৃন্ময় প্রতিচ্ছবি! তখন বাঙ্গালীর রূপ ছিল, জয় ছিল, যশ ছিল, আশা ছিল। তাই চিন্ময়ী জননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে রূপের ওরূপ অফুরন্ত বিকাশ ছিল, গলায় জয়মাল্য দুলিত, যশের গানে নিখিল ভুবন মুখরিত হইত!

কিন্তু এখন ? রূপ নাই, জয় গিয়াছে, যশ ডুবিয়াছে : আশা আছে কি না আছে- তাহা পরে বলিব। তাই মা যে নব কলেবর পরিগ্রহ করিয়া-ছেন ; চর্ম্ম-চক্ষু না খুলিয়া অন্তরের চক্ষে দেখ।—ওই দেখ, দেশ মাতৃকারূপিণী মা আমাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও বুভুক্ষিতা, অনাহার ক্লিষ্টা, পরিধানে ছিন্ন মলিন শত-গ্রন্থিযুক্ত বাস, অঙ্গে সে সূর্য্যকরোজ্জ্বল লাবণ্য নাই মুখে সে সুস্মিত সৌন্দর্য্য নাই, হস্তে সে বরাভয় নাই। মা আজ ডাইনী হইয়াছেন, দশ হাতে তাই সন্তানের জন্য 'মূর্খতা', 'স্বার্থপরতা', 'নারীনিগ্রহ', 'জাড্য', 'জলপ্লাবন' 'কাপুরুষতা' 'পর-মুখাপেক্ষিতা' 'অস্থির চিত্ততা' প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। পদতলে 'সমাজ ও দেশাচার'রূপী স্থবির অথচ বলশালী কেশরী সাম্লের কঙ্কালসার দেহখানি ধারণ করিয়া হুঙ্কার ...তেছেন ; 'ধর্ম্ম'-মহীষ সমাজের চরণ-প্রান্তে ...অসহায়ভাবে আপনার রক্তাক্ত মুণ্ড ডালি ...য়াছে। 'স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুরূপী' অসুর--'ব্যাধি'-বল্লমের ...ঘাতে জর্জ্জরিত, 'সর্প'রূপী চিকিৎসকের অষ্ট বন্ধনে ...বদ্ধ, 'পেটেণ্ট' ঔষধের বিষে কণ্ঠাগত প্রাণ! এক-...দিকে বাগ্-বাদিনী বাণী, বিদেশী জ্ঞানের সরসীর উপর ...পদ্মে সমাসীনা হইয়া মেমের পোষাকে বিভূষিতা ...শীর্ষে যুনিভার্সিটির ডিগ্রীজ্ঞাপক হুড্ Hood) ...করিয়া, ধর্ম্মজ্ঞান হীন শিক্ষা প্রচারে ব্রতিনী; ...বীণা—যে বীণার সুরে বৈদিক যুগের শুদ্ধ-ব্রত ...সাম-স্তোত্র গাহিয়া তপোবনের পশু পক্ষীকেও ...করিতেন, বাল্মিকীমুনি নিষাদের চক্ষেও পাবনী ...বহাইতেন, কেন্দুবিল্বের ভক্ত জয়দেব ললিত ...লতার প্রতি শিরায় শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেন, ...সেই বীণা ছিন্নতন্ত্রী হইয়া পূর্ব্বের স্মৃতি বুকে ...নিরালে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। বিজয়, প্রতাপ, ...গণেশ, সীতারামের বংশধররূপী কার্ত্তিকেয় আজ ...কারূপী ময়ূরের উপর উপবেশন করিয়া বিলাসের ...স্রোতে গা ভাসান দিয়াছেন, আয়ুধের পরিবর্ত্তে তাঁহার ...হাতে সিগারেট, Race courseএর ,guide আর ...থিয়েটারের টিকিট শোভা পাইতেছে। অন্যদিকে ...লক্ষ্মীর মুখে গভীর সাহানুভূতির বিধুর হাস্য-রেখা ; ...সে দুইদিকে দুইহাতের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ, করিয়া ...বলিতেছেন "অবসাদ-হিমে মৃতপ্রায় বাঙ্গালী, ...তোমার ছায়া মাত্র তোমার ঐ ঝাঁপির মধ্যে, ...তোমার কায়া গিয়াছে ঐ সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ...ঐ পাগ্ড়ী-বাঁধা তাজ-মাথায় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ...দীপ্তিওয়ালার ঘরে।" দুর্গতিনাশিনীর বংশ-...দুলাল গণেশ ভায়ার আর দুর্গতির সীমা নাই ; কার্ত্তিকের ...সেদিন 'অসিজীবি' নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু গণপতির এখনও 'মসীজীবি' নাম গেল না। কলম চালাইতে ...বড় ভালবাসিতেন কিনা, তাই আজ তিনি কেরাণীরূপে ...কানে কলম গুঁজিয়া সম্মুখে 'লেজার' বই খুলিয়া বসিয়া ...আছেন। কলম পিষিতে পিষিতে দাদার বুদ্ধি হাঁদা হইয়াছে, নাদা পেট শুখাইয়া আম্সী হইয়াছে, মাথায় টাক পড়িয়াছে। কলা বউ রোগ, শোক, দুঃখ ও দারিদ্র্যের জালায় কাৎ হইয়া পড়িয়াছেন, কলাগাছ শুকাইয়া কঞ্চি হইয়া গিয়াছে, একহাত ঘোমটা তবু দেহের মান্ কতকটা বজায় রাখিয়াছে। গজানন কেরাণী-জীবন যাপন করিলে কি হয়, পুত্রজননের অবসর তাঁহার যথেষ্টই আছে; তাই কদলী-বধূর কোলে এবং অঞ্চল-পার্শ্বে ৭।৮টি 'পিলে-পট্‌কা' পুত্র-কন্যা ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে !

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আজ এই প্রতিমার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার দেউলে প্রতিদিন যে এই সজীব প্রতিমারই পূজারতি চলিতেছে। ধর্ম্ম-দাম্ভিক ভণ্ড বঙ্গবাসী, রাগ করিও না, এ মাতৃমূর্ত্তির ব্যঙ্গ নয়, এ তোমারই জাতীয় জীবন-চিত্র !

'বাঙালী, ঘরমুখো বাঙালী, অন্যের মুখ-চাওয়া অন্নের কাঙালী', একটু আগে বলিতেছিলাম না—আমাদের উদ্ধারের আশা ও উপায়ের কথা? ভাবিয়া দেখ,—'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে' স্বর্গ-দ্বারের ঘাটে দাঁড়াইয়া জগতের সকল জাতি একে-একে আসিয়া মিলনের মহামন্ত্র শিখিয়া গিয়াছে—এরই পুরোহিত একদিন তাহাদের সভ্যতার সঙ্কল্প পাঠ করাইয়াছেন! যে জাতির বেদ বেদান্ত-দর্শন-উপনিষৎ মান্ধাতার কাল হইতে জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে যাহার শিক্ষা-গুরু এখনও পৃথিবীতে জন্মে নাই, রাষ্ট্রগতভাবে, সমাজগত-ভাবে, জাতিগতভাবে যে জাতি পঙ্গু ও পরমুখাপেক্ষী হইলেও এখনও বিগতপ্রাণ হয় নাই, যাহার পক্ষে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ বিশ্বাস, রাসবিহারী, তারক পালিত চিত্তরঞ্জন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মত কুবলয়ের জন্ম হয়, সে জাতির উদ্ধারের আশা এখনও নিভে নাই। যে দেশে চন্দ্র সূর্য্য এখনও আলো দিতে ভুলে নাই, যাহার নদী-গিরি-বন এখনও সরস-শোভন আছে, যাহার জমির উর্ব্বরতা—নারীর প্রাণ—নরের মনীষা এখনও অতীতের স্মৃতিতে

পর্য্যবসিত হয় নাই, সে দেশের উদ্ধারের উপায় এখনও আছে।

কিন্তু এই আশা ফলবতী—এই উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, চাই মানুষের মত মানুষ—চাই শক্তি—চাই স্বাস্থ্য—চাই জ্ঞান—চাই অনুভূতি। প্রত্যেক মানুষটিকে গায়ত্রী জপের মত সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ করিতে হইবে যে, (১) বাঙলায় প্রতি সহস্রে জন্মে ৩১ জন আর মরে ৩২ জন, (২) নানা নিবার্য্য ব্যাধির প্রকোপে আনাহার, অচিকিৎসা ও অযত্নে গড়ে প্রতি বৎসর ১৪৭২৫০ অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭ জন করিয়া লোক মারা পড়ে। (৩) এপর্য্যন্ত গঙ্গাসাগরে তত শিশু ভাসান হয় নাই যত শিশু বৎসর বৎসর আঁতুড় ঘরে এ দেশে মরে; জন্মিবার এক বৎসর মধ্যেই হাজার-করা প্রায় ৩০০ শিশু শমন-রাজের প্রজারূপে গণ্য হয়। (৪) স্বামীর অত্যাচারে, শ্বশ্রূকুলের অযত্নে ও নিজের অজ্ঞতায় হাজার করা প্রায় ৪৪ জন স্ত্রীলোক প্রসবকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়; যক্ষ্মা, সূতিকা, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে যত নারী মরে, ততনারী বুঝি পাঁচশত বৎসরের সতীদাহ প্রথায় মরে নাই। (৫) এ দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রতি বৎসর প্রায় দশলক্ষ লোক মরে এবং তাহার প্রায় দ্বিগুণ জীবন্মৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য জ্বর, হাম, বসন্ত, আমাশয় প্রভৃতিতে যত লোক মরে, বড় বড় যুদ্ধেও তত লোক মরে কিনা সন্দেহ। (৫) ধনবলে আমরা জগতে সকল জাতি অপেক্ষা হীন, আমাদের প্রত্যেকের গড়ে বার্ষিক আয় প্রায় ২৩৷৷০ মাত্র। দেশের ব্যবসার সূত্র পনের আনা ভাগ বিদেশী ও ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর করধৃত; দালালরূপে, পরিচালকরূপে, খরিদ্দাররূপে, বিক্রেতারূপে, আমরা নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু-বাণ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি।

এই কয়টি সত্যবাণী শুধু সায়ং প্রাতে স্মরণ করিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে এগুলির প্রতিকারের উপায় করিতে হইবে। বাঙ্গালী, এতকাল ধরিয়া কেবল কথা কহিয়াই আসিয়াছ; ওরে, আবহমানকাল ধরিয়া—

"হইতে উচ্চ শুধু কি তুচ্ছ
বচন-গুচ্ছ রচিবি?"

এখন স্বপ্নের আকাশে বিচরণ ছাড়িয়া বাস্তবের ভূমিতে অবতরণ করিতে হইবে; এখন কেবল কাজ চাই!

"কর্ম্মের পর নির্ভর কর
এ জগতে যদি বাঁচিবি!"

কথায় যে আদৌ কাজ হয় না এমন নহে, বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ সকলই কথারূপে আমাদের নিকট আসিয়াছে, ব্রহ্মশক্তিধর গায়ত্রী-মন্ত্রও দেখিতে গেলে কথারই সমষ্টি মাত্র; কিন্তু কথা হইবে সত্য সনাতন—তাহার পশ্চাতে চাই গভীর চিন্তা, সম্মুখে চাই কঠোর কার্য্য!

ঘরমুখো বাঙ্গালী, ঘরের পানে চাও; সহরবাসী, পল্লীর পানে তাকাও; পল্লীবাসী, নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত কর; পরের মুখ না চাহিয়া, নিজদের দীনতা ঘুচাইবার ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লও। ব্যক্তিগত ভাবে—সমষ্টিগত ভাবে যে যাহার নিজের চরকায় তৈল সিঞ্চন কর। পরমুখো বাঙ্গালী, ত্রিশটাকা মাহীনার কেরাণীগিরির লোভে ত্রিনিদাদে বাগ্‌দাদে, হংকংয়ে, সাংটাইয়ে ছুটিয়া চলিয়াছ, ঘরে থাকিয়া ব্যবসার একপেশে দাঁড়ী পাল্লায় পাষাণ ভাঙ দেখি। মাড়োয়ারী ভাটিয়া যেমন দীনবেশে তোমার দেশে আসিয়া দশ বৎসরের মধ্যে পাঁচতলা অট্টালিকা তুলিতেছে—তোমারই ধনে, তেমনি তাহাদের ধন আহরণ করিতে চলিয়া যাও মাড়বার, বোম্বাই, সুরাট, করাচী, দীল্লি, লাহোর, বঙ্গের বাহিরে প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে—তেমনি লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া! কবির কথায়—

'যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরে শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন-তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

তুমি চিরদিন সকলের বড় ছিলে, এবার কর্ম্মে সকলের বরণীয় হও;—তবে জয় তোমার!

জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়া তোমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। ধর্ম্মনীতি বিবর্জ্জিত মুখস্থ-করা বর্ত্তমানিক শিক্ষার বকযন্ত্রে, দেশের ও দশের আশা-ভরসা স্থল—আমাদের বালক ও যুবকদিগকে নিষ্পেষিত করিলে চলিবে না। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—এই মহামন্ত্র তাহাদের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা-স্নায়ু-ধমনীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলুক। দেশভাবে শিক্ষিত হও, যাহাতে কমলাকে তোমার ঘরে অচঞ্চলা করিতে পারে, স্বদেশ বিধাতার অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিতে পার—

"রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়,
ভিক্ষা-ভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারই উত্তরীয়,—"

যাহাতে জ্ঞানে ও কর্ম্মে সকল সভ্যজাতির সম্মুখে বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পার;—তব যশ তোমার!

শক্তির অপব্যবহার যেই করুক না কেন, তাহার প্রতিক্রিয়া আছেই আছে; বাঙ্গালী, তুমি তোমার অবশিষ্ট শক্তিটুকুর অপচয় করিও না। মনে রাখিও—শুধু দেহের শক্তিই শক্তি নহে, মনের শক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি, চাই—আত্মশক্তি! আরো চাই—স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা। দেশে অকাল মৃত্যুর প্রতাপ খর্ব্ব কর। স্বাস্থ্যহীন কখনও শক্তির অধিকারী হয় না। জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে আগে চাই অটুট স্বাস্থ্য; "ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দ্দার—" কল্পনায় আনিতেও হাসি পায় না কি? তারপর, চিকিৎসকের উপর একান্ত নির্ভরতা পরিত্যাগ কর; তাহারা আমাদের জাতির দেহে—সমাজ বক্ষে জলৌকা বিশেষ। তাহারা রোগীকে হাতে রাখিয়া, রোগীর আত্মীয়-স্বজনের মনে অযথা ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়া, নিজেদের অর্থ উপায়ের পথ সুগম করে; স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা সামান্য জ্বরকে বিকার বলে, পেটের অসুখকে কলেরায় পরিণত করে, বুকের ব্যথাকে যক্ষ্মা বলিয়া পরিচয় দেয়! আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, দেহতত্ত্ব ও নিদানশাস্ত্র শিখিবার অধিকারী একমাত্র ডাক্তররাই নহে, সকলেরই তাহাতে মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত। আমাদের অজ্ঞতার উপরেই ডাক্তরেরা একাধিপত্য করে। ভুলিয়াও কখনও বিদেশী ঔষদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিও না; যে সকল গাছ গাছড়া বিদেশী বণিক এখান হইতে দু'পয়সা দিয়া নিজের দেশে কিনিয়া লইয়া যায়, তাহাই রূপান্তরিত করিয়া শিশির মধ্যে পুরিয়া সুদৃশ্য লেবেলে শোভিত করিয়া, এখানে আনিয়া দুই টাকায় বিক্রয় করে। দেশীয় রোগ—যদি সারে ত—দেশীয় ঔষধেই সারিবে, নচেৎ বিদেশীয় পেটেন্টে তাহার কোন আশাই নাই। অন্ধ, নিজের ঘরের দিকে দেখ—আয়ুর্ব্বেদ তোমার অমরত্বের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে; ঐ বেদে বুড়োর কুঁড়েখানিতে যাও—স্পর্শমনি কুড়াইয়া পাইবে। বাঙ্গালী, তোমার অভাবের জাল সংহত কর, আধুনিক বাবুয়ানা ও বিলাসিতার সামগ্রী—মদ, তামাক, সিগারেট, এসেন্স, লেভেণ্ডার, বিলাতী ফুড্, টিনে-আঁটা বিদেশী খাদ্য, হ্যাট্-কোট্-প্যাণ্ট-কম্ফর্টার-ষ্টকিং প্রভৃতি বর্জ্জন কর। তোমার সমাজিক জীবনে শক্তি আন, স্বাস্থ্য আন, স্বচ্ছন্দতা আন;—তবে রূপ তোমার!

মহাশক্তিরূপিণী ব্রহ্মময়ী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ে, জানি- তুমি আজ বাঙ্গালীর ঠাকুর-দালানে মাটির প্রতিমার মধ্যে অধিষ্টিতা নও, তাহার মাটি আজ খাঁটি নহে—তাহার প্রাণ আজ সজীব নহে; তবু জানি—তুমি জলে স্থলে মরুদ্‌ব্যোমে ত্রিভুবনের প্রত্যেক অণু-পরমাণুটিতে আপন সত্তা মিশাইয়া রাখিয়াছ। আজ এই শুভদিনে জগদ্‌ব্যাপী তোমার ওই অসীম নিরাকার মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া এই ভিক্ষা চাই, শক্তিময়ী,—তোমার বিশ্ববিজয়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া বাঙ্গালীর মৃতকল্প প্রাণকে সঞ্জীবিত কর;—অপর্ণে, নারীকে মাতৃ-বিগ্রহ জ্ঞানে পূজা করিতে তাহার

হৃদয় গোমুখী দিয়া দ্রবময়ী ভক্তি-জাহ্নবীধারা উৎসারিত কর; অন্নপূর্ণে, একদিন সর্ব্বঐশ্বর্য্যত্যাগী শিবকে প্রসন্ন আননে অন্ন-ভিক্ষা দিয়াছিলে, আজ ক্ষুধাকাতর বাঙ্গালীর সম্মুখে তুমি তোমার অনন্ত খাদ্য-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও; অয়ি অভয়দাত্রী কদ্রে, পর-পদ-সেবায়, পরানুকরণে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, চিন্তায়, সাহিত্যে, শিল্পে—সর্ব্বত্র এই যে ঘোর আত্মবিস্মৃতি ও পৌরুষ-হীনতার লক্ষণ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া একবার "মাভৈঃ" রবে হুঙ্কার ছাড়িয়া তোমার প্রবুদ্ধ সন্তানের সর্ব্ব বন্ধন নাশ করিয়া, "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" বলিয়া মোহ নিদ্রা টুটাইয়া, তোমার অভয়মন্ত্র—অশোকমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে নবজীবন দান কর; করুণারূপিণী জগদ্ধাত্রী, অমৃতের সন্তানকে তুমি অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন—খুঁজিয়া পায় নাই, এবার অবোধকে কোলে তুলিয়া সেই অমৃত-স্তন্যধারা পান করাইয়া দাও দেখি। আবার বাঙ্গলায় রূপ, জয়, যশ ফিরিয়া আসুক, আবার স্বাস্থ্য সুখ সম্পদ বাঙ্গালী-জীবনের কানায় কানায় ভরিয়া উঠুক, আবার সেকালের মত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যত ভাই-বোন গলা ধরা-ধরি করিয়া তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে তেমনি হাসিমুখে আসিয়া ভক্তি-আপ্লুত প্রাণে প্রণতি করুক্।

তাই আজি মা বাঙ্গালীর লক্ষ-আনন্দ-দিনের-স্মৃতি-বিজড়িত এই পুণ্য মুহূর্ত্তে তোমার চিন্ময়ী মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বর মাগিতেছি—

"বিধেহি দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রীয়ং,
জয়ং দেহি, যশো দেহি, ভাগ্যং ভগবতী দেহি মে!"

হাসির টুক্‌রা।

ব্যবস্থাপত্রের বহর।

ডাক্তার।—দেখুন্, এই যে প্রেস্‌কিপসনখানা করিলাম, ইহাতে আপনার পুত্রের সব রকম ব্যারামেরই এক একটি ঔষধ রহিল। মাথা ব্যথার জন্য 'ব্রমাইড,' জোলাপের জন্য 'ম্যাগসাল্‌ফ', জ্বরের জন্য 'স্পিরিট ইথার নাইট্রিক,' হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্যের জন্য 'ডিজিটেলিস্,'—কিছুই দিতে কসুর করি নাই।

রোগীর পিতা।—বাঃ বাঃ বলিহারি যাই, আপনার এলেমের! কিন্তু বলি কি ডাক্তার বাবু, দেহের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ডাক-পিয়ন আছে ত? এতগুলি ঔষধ এত জায়গায় বিলি করিবার ঠিক বন্দোবস্ত আছে ত? তা যদি না থাকে ত, আমি বলি—আপনাদের Materia medica খানা শিলে বেটে রোগীকে খাইলে দিলে হয় না?

অদল-বদল।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ডাব্‌লিনে একজন বিখ্যাত অন্যমনস্ক ব্যারিষ্টার ছিলেন। একদিন তিনি একটি খুনী মোকর্দ্দমায় ফরীয়াদীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন; কিন্তু অত্যধিক সর্দ্দিকাশির জন্য তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ বাধা পড়িতেছিল। প্রথম শুনানির পর তিনি কতকগুলি 'কাফ্‌লজেঞ্জস্' (Cough Lozenges) কিনিয়া হাতে রাখিয়া দিলেন, এবং অপর পক্ষের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতার অবকাশে, কাশি উপশমের জন্য এক-একটি করিয়া লজেঞ্জস্ মুখে ফেলিয়া চুষিতে লাগিলেন। ব্যারিষ্টারের অপর হাতে একটি বুলেট ছিল—যেটির সাহায্যে আসামী তাঁহার পক্ষীয় কোন লোককে খুন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দ্বিতীয় শুনানির মাঝামাঝি সময়ে বিচারপতি প্রসঙ্গক্রমে বুলেটটি দেখিতে চাহিলেন। অমনমনা আইনজীবি অবশিষ্ট কয়েকটি লজেঞ্জস্ সমেত, দক্ষিণ হস্তখানি বিচারকের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া আদালতের সমবেত দর্শকবৃন্দ মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল। বিচারক গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "মশাই, আমি আপনার নিকট কাশির ঔষধ চাহি নাই, আসামীর পিস্তলের বুলেটটি দেখিতে চাহি।" ব্যারিষ্টারপ্রবরের তখন চমক ভাঙিল; তিনি বামহস্তের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে চক্ষুর্দ্বয় কপালে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! হুজুর সাহেব, আমি ভুলক্রমে বুলেটটি মুখে ফেলিয়া চুষিতে চুষিতে গিলিয়া ফেলিয়াছি!"

"গুপ্ত-প্রকাশ" বা চরিত্র-গঠনের পন্থা।

কিশোর ও যুবকদিগের পাঠ্য।

লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

(১)

যদি কোনও লোকের বাড়ী যাও, ত দেখিবে যে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সেখানে যা কিছু হয়, সবই একটি উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ ভোজনের জন্য। কেহ পয়সা আনিতেছে, কেহ বাজার করিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ হাঁড়ি মাজিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে—সবই ঐ একটি মতলবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, প্রত্যহই, এই একটি কাযের জন্যই অবিরাম পরিশ্রম, অসংখ্য চেষ্টা, অনবরত আয়োজন। ভোর থেকে আর অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত সকল দেশে, সকল বাড়ীতেই, এই একই চেষ্টা। আজ যদি ভগবান এমন ব্যবস্থা করেন যে, না খাইলেও বাঁচা যাইবে, তবে দেখিবে যে, লোকে চাকরি, ব্যবসায় সব ছাড়িয়া দিবে—পৃথিবীর সাড়ে পনরআনা কাযই আর থাকিবে না।

ক্ষুদ্র বাড়ী ছাড়িয়া, একবার যদি সারা পৃথিবীর দিকে তাকান যায়, অর্থাৎ সুধু মানুষের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি সমস্ত প্রাণী-জগতের কথা ধরা যায়, ত ঠিক এমনি ভাবে কোন্ জিনিষটি চলিতেছে—বা সমস্ত জীব-জগৎকে চালাইতেছে বলিতে পার? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে—"সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা"। প্রথমতঃ, কীট পতঙ্গদিগের দিকে দেখ—দেখিবে যে, ডিম পাড়িয়াই মশকী দেহ-ত্যাগ করে। মশকরা গাছপালার রস পান করে; কিন্তু মশকীরা রক্ত পান করে—কেন না, মশকীদিগকে ডিম পাড়িতে হয় বলিয়া, অর্থাৎ তাহাদিগের নিজ দেহের ও ভাবী সন্তানদের বেশী পুষ্টির দরকার বলিয়া তাহারা গাছের রসের চেয়ে পুষ্টিকর জিনিষ (রক্ত) খাইয়া থাকে। গাছপালার দিকে দেখ, একটা গাছের অগুন্তি বিচি ও ফল (বীজ) হয়; কেন না, অনেক বিচি নষ্ট হইয়া, মাত্র, বাকী বীজগুলি কাযে লাগে, অর্থাৎ গাছে পরিণত হয়। পাছে গাছের বংশ রক্ষা না হয়, এই জন্য এক একটা গাছে অফুরন্ত বিচি হয়। গাছ ছাড়িয়া মাছের কথা ভাবিয়া দেখ। স্থির-জলে (পুকুর প্রভৃতিতে) অনেক মাছ ডিম পাড়ে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ মাছ কখন্ ও কোথায় ডিম পাড়ে? বর্ষায় (যখন নদী নালায় প্রচুর জল ও প্রবল স্রোত হয়), স্রোতের উজানে যাইতে যাইতে, অথবা, নদীর কোন নিভৃত যায়গায় মাছেরা ডিম ছাড়ে। কেন এমন করে? মাছের ডিম, মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীরা খাইয়া ফেলে—এই জন্য মাছেরা নিভৃত যায়গায় অথবা স্রোতের মুখে ডিম ছাড়ে, যাহাতে তখনি ডিমগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ভাসিয়া যায়—তাহা হইলে কোন জলচর প্রাণী একত্রে বেশী ডিম খাইয়া ফেলিতে পারে না।

তাহা হইলেই দেখ, এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে—সৃষ্টি বা বংশ-রক্ষা করা। যে জীবই জন্মিয়াছে, সে তাহার বংশ-রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। জীবের জন্ম দিবার জন্যই, জীবের সৃষ্টি। খাওয়া-পরা, ঘর-বাড়ী, বিষয়-বৈভব—যা কিছু, সবই "ছেলে পুলেদের জন্যে"।

আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে।—যখন কোনও প্রাণীর বাচ্ছা বা ছানা হয়, তখন সেই বাচ্ছা-গুলিকে তাহাদের মা দেখে। আর মা'কে ও বাচ্ছা-গুলিকে খাওয়াইবার জন্য, এবং বিপদ-আপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদের বাপই ব্যস্ত থাকে। একথা থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মা সন্তান-দিগকে লালন-পালন করিবে, আর বাপ সন্তান ও তাহাদের মাকে রক্ষা করিবে। এত কথা গুছাইয়া

যাহা বলিলাম, তাহা সকল প্রাণীই মনে মনে বুঝে এবং আপনা হইতেই সেই মত কায করে। যে জীবের মধ্যেই দেখ, মাদীরা মদ্দাকে খুঁজিয়া বাহির করে এবং জীবনে তাহার সঙ্গ ছাড়ে না। যে মাদী বুঝে যে, "এই মদ্দা আমার ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে"—সেই মাদী সেই মদ্দাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই মদ্দা বাছা-বাছি করিবার সময়ে, কত যুদ্ধ-মারামারি হয়, আর তাহার ফলে কত মদ্দা মরিয়া যায়, কিন্তু—শেষে যে মদ্দা জিতে, সেই সে মাদীকে গ্রহণ করে। এখনো, অসভ্য বুনোজাতের মধ্যে, রীতিমত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া তবে স্ত্রী বা মাদী লাভ করিতে হয়। বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েদের কপালে যে সিন্দুরের চিহ্ন থাকে, শুনিতে পাই যে, পুরাকালে স্ত্রীলাভের জন্য যুদ্ধ হইত—মহাভারতে সে কথার যথেষ্ট আভাষ আছে। সেই যুদ্ধে যে পুরুষ জয়ী হইত, সেই হত পুরুষদগের রক্তের টীকা দিয়া স্ত্রীকে বরণ করিত। কপালে বিজয়-সূচক রক্তের টীকা এখন সিঁথির সিন্দূরে দাঁড়াইয়াছে। স্বামীই সিন্দুরের টীকা দেয়, স্বামীর মৃত্যু হইলে প্রদত্ত টীকা মুছিয়া লওয়া হয়।

আমরা এতক্ষণে কি কি বুঝিলাম—তাহা দেখা যাউক। আমরা বুঝিলাম যে—

১। জীব জন্ম দিবার ও সৃষ্টিরক্ষা করিবার জন্যই জীবের সৃষ্টি। ২। প্রাণীদিগের মধ্যে, পুরুষেরা বলে, বিক্রমে ও সাহসে স্ত্রীদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবার উপযুক্ত।

(২)

লাল কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে, সব জিনিষ লাল দেখায়; নীল কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে, সাদা জিনিষও নীল দেখায়। যে জিনিষটাকে দেখা যায়, সেটার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না—যে দেখে তাহার চোখেরও কিছু দোষ হয় না—অথচ মাঝে লাল কাচ থাকায়, সব লাল দেখায়।

মানুষের মনও ঠিক কাচের মত। কাচের লাল বা নীল রং আপনা হইতে হয় না—মানুষে যত্ন করিয়া তাহাকে লাল বা নীল রঙে পরিবর্ত্তন করে। আর, যে কেহই সেই রঙ্গীন্ কাচের ভিতর দিয়া দেখে, সে লালই দেখে। আমরা যখন জন্মাই, তখন "মন" বলিয়া কোন জিনিবের কায থাকে না।—শিশুরা মতলব করিয়া হাতও বাড়ায় না, পাও বাড়ায় না—সুখে দুঃখে, সকল অবস্থাতেই খালি কাঁদে বা হাসে। ক্রমে ক্রমে, তাহার বাড়ীর সকলের কথা শুনিয়া, আদরযত্ন অনাদর পাইয়া, পাঁচ রকমের অভিজ্ঞতার ফলে, বড়-লোকের ছেলেদের এক রকম চাল-চলন ধরণ-ধারণ হইয়া দাঁড়ায় আর "ইতর" দিগের ছেলেদের অন্যরকম হয়; সাহেবদের ছেলেদের একরকম চাল-চলন হয়, গোঁড়া হিন্দুর ঘরের ছেলেদের অন্য রকমের হয়। এই চলন চালন, ধরণ-ধারণ, এই কায-কর্ম্ম, চলা-ফেরা, এই প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তি, এই অভ্যাস-আচার, রীতি-নীতি এই সবই "মনের" খেলা। "মন" মানে কি? যাহা মনন বা ইচ্ছা করে, সেই মন। কাহারো মন পশু দেখিলেই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করে; কাহারো মন ফল দেখিলেই চুরি করিতে চায়, ইত্যাদি। এই মনই হইল আমাদের চোখের রঙ্গীন কাচ;—একটা বাছুর দেখিলে, সাহেবদিগের ছেলে তাহাকে খাইবার ইচ্ছা করিবে,—কারণ, তাহার সমাজে, তাহার বাড়ীতে, নিত্যই খাইবার সময়ে বৎসতরী মাংস ভক্ষণ ব্যাপার দেখিয়া দেখিয়া, তাহার মন শিখিয়াছে—হৃষ্টপুষ্ট বাছুর দেখিলেই তাহাতে উত্তম আহারের কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু একটি নিষ্ঠাবান হিন্দুর ছেলে সেই বৎসতরীকে দেখিলেই, প্রণাম করিবে। এই হইল শৈশবের শিক্ষা ও সংস্কারের ফল—এই শিক্ষা ও সংস্কারের সমষ্টিরূপ রঙ্গীন কাচ দিয়া যাহা দেখিবে, তাহাই মনের রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীভগবান যখন মানুষকে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাহাকে হাত, পা, মুখ, চোখ প্রভৃতি দিয়া দেন। সকলেরই হাত, পা, মুখ, চোখ থাকিলেও, কাহারো চেহারা দেখিতে বিশ্রী, কাহারো চেহারা সুশ্রী। বিশ্রী চেহারা দেখিয়া তুমি ঘৃণা করিলেও, যাহার চেহারা বিশ্রী, তাহার ত আর অন্য উপায় নাই। এই সুশ্রী,

...বিচারও মনের কায। শ্রমজীবীর পেশী-বহুল ...দাদি হইতে বিলাসী, অলস ধনী-পুত্রের হাত-পা ...ম, সুগোল ও সুদৃশ্য হইলেও, কাহারো ...হারো চক্ষে নিকৃষ্ট বোধ হইতে পারে। তাই ত ...বারই বলিতেছি যে, মন যে জিনিষকে যে ভাবে ...রীন করায়, মানুষ সেই রঙেই তাহা দেখে। জন্মগত ...স্কার, আজীবন শিক্ষা; দীক্ষা ও অভ্যাসই মানুষকে "ভাল" "মন্দ" ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝিতে দেয়। এবং ...দুর বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পরে দেহকে ভস্ম করিলেও, ...দেহাশ্রিত "মন" মরে না, সংস্কার, অভ্যাস ও শিক্ষার ...ভূত সেই মন পর-জন্মে, পুনরায় আমাদিগকে লইয়া ...লা খেলায়। "অভ্যাস" এমনিই নাছোড়-বান্দা জিনিষ! এই জন্যই, হিন্দু প্রতিপদে, প্রত্যহই, কিছু কিছু ...অভ্যাসের উপদেশ দেন।

আমাদের হাত পা দেখিয়া, সাধারণতঃ আমরা কোনও কথা বলি না; কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যন্ত হাড়-পাঁজর বাহির করা রোগা, সে লোকটি যদি দুপাতা ইংরাজি পড়িয়া থাকে, তবে অতি দারুণ গ্রীষ্মেও সে ...য়ে জামা দিয়া তাহার দেহের কঙ্কালের ছায়া ...কিয়া, তবে লোক লোচনের সম্মুখে বাহির হইবে। ... দরিদ্র বলিয়া খাইতে না পাইয়া রোগা,—কথাটি তাহার পক্ষে সত্য না হইলেও, সে লোকের সামনে খালি গায়ে যাইতে লজ্জা বোধ করিবে—ইংরাজী সামাজিকতার শিক্ষা এই। তাহার দেহের দৈন্যই তাহার 'লজ্জার" স্থান। স্ত্রীলোকেরা যাহার-তাহার সম্মুখে মাথার কাপড় খোলেন না—বহু বর্ষের বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এই প্রথা;—কাযেই, বঙ্গরমণীর পক্ষে, মাথা ও মুখ "লজ্জার" স্থান। সাহেবদিগের দেশে মাথা ও মুখ রমণীদের লজ্জার স্থান নহে। কিন্তু স্থির বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান প্রদত্ত এই পবিত্র দেহে লজ্জার কোনও জিনিষ নাই (No part of the animal system is immoral)—আমরাই বুদ্ধি, বিবেচনা বা ব্যবহারের দোষে দেহের ...ন কোনও অংশকে লজ্জার বিষয় করিয়া লইয়াছি।

খোদার উপর এইরূপ খোদকারী করিয়া কি ফল হইয়াছে? পাপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের স্বভাব এই—যেখানেই যত লুকোচুরি, সেখানেই অনুসন্ধিৎসা তত বেশী। মেমেরা ঘোমটা দেন না—কাযেই রাস্তা দিয়া পরম রূপবতী মেম চলিয়া গেলেও, কেহ তাকাইয়াও দেখে না;—কিন্তু ঘোমটা দিয়া একটি কুৎসিত হিন্দু বৃদ্ধা যাইলেও, পাঁচজনের চঞ্চল চোখ আগে সেই দিকে পড়ে। আমাদেরও ঘটিয়াছে তাই। বহুকাল ধরিয়া, চুপি চুপি, জনন-সম্বন্ধীয় কথা বলায়, এখন লোকের মধ্যে ঐ সকল কথার ইঙ্গিত করাও বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ফলে অনাচার, দুরাচার, কদাচার, পাপাচার;—তাহার ফলে ব্যারাম, অকর্ম্মণ্যতা, অল্পায়ুঃ। সমাজ এ সবই দেখিতেছেন, কিন্তু শব হইয়া তমোনিদ্রাবৃত আছেন। কাযেই শবরূপী সমাজের বক্ষে পাপাচারের অবাধ, উদ্দাম, তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে—টলমল দেশ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! অথচ, এ কথা সকলেই বোঝেন, এবং সকলেই স্বীকার করেন যে, জীবের জন্ম জীব-জন্ম দিবার জন্য। কোনও উপায়েই কেহ এত বড় কথাটা উড়াইয়া দিতে পারেন না। সভ্য-সমাজে, মানুষের জীবনের চরম পরীক্ষা,—সমাজকে সুসন্তান দান করা। কাযেই, এ সকল কথা যত্ন করিয়া না শিখিলে কোথা হইতে এ সব জ্ঞান আসিবে?

আজ তাই অসংকোচে সকল কথা শিখাইবার উদ্দেশ্যে, এই প্রবন্ধের সূচনা। যাহার মন তেমন কলুষিত ভাবাপন্ন, সে ব্যক্তি এ প্রবন্ধ পাঠের অনুপযুক্ত। শ্রীভগবানের নির্ম্মিত এই দুর্লভ নরদেহ নামক শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির যে ব্যক্তি দর্শন করিতে চাহে সে নিজ মনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া তবে যেন অগ্রসর হয়।

(৩)

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"। যে জিনিষটাই শিখিতে হয়, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাহা শিক্ষা করা উচিত। শ্রদ্ধা করিয়া না শিখিলে, শিক্ষা কখনো

সম্পূর্ণও হয় না, সফলও হয় না। শিক্ষারাজ্যে ইতরামির স্থান নাই।

(৪)

গোড়া হইতে স্পষ্ট করিয়াই বলি, জননেন্দ্রিয় আমাদের আলোচ্য বিষয় বিধায়ে, জনন-তন্ত্র (generative system) সম্পর্কীয় কয়েকটি কথা এখানে বলিব।

প্রথমতঃ এই কথা স্মরণ কর—জীবের জন্ম দিবারই জন্য জীব জন্মিয়াছে—অর্থাৎ বংশ-রক্ষা করাই সৃষ্টির মূল কারণ। যে ব্যক্তি সমাজকে সর্ব্ববিধায়ে উপযুক্ত সন্তান দান করিয়া যাইতে পারে, তাহারই জন্ম সার্থক; তাহা যে না পারে, তাহার জন্ম বিড়ম্বনা এই বড় কথাটি খুব ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং খুব যত্ন করিয়া মনে রাখিতে হইবে। এ পৃথিবীতে তুমি খাইতে আইস নাই, তুমি মোটর হাঁকাইয়া বেড়াইতে আইস নাই; তুমি আসিয়াছ—স্বয়ং দেশের ও দশের সেবার ভিতর দিয়া, শ্রীভগবানে লীন হইতে; এবং নিজের অভাবে, উপযুক্ত একটি-দুইটি সন্তানকে সংসারে রাখিয়া, তোমার বংশের ধারা রক্ষা করিতে; হিন্দুর মতে, সৎকর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার ক্ষয় করিয়া যাইতে আসিয়াছ। এবং যে সন্তান তোমাকে পিতৃত্বে বরণ করিয়াছে, সেও তোমার মত অনেকটা একই পথের পথিক বলিয়া অর্থাৎ তুমি তাহার কর্ম্মক্ষয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া সেই তোমার ধারা রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র। যদি যথার্থ ভাবে নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন কর, তবে বংশ-পরম্পরাগত সাত্ত্বিক ভাবও লাভ করিবে—মুক্তির পথ সুগম হইবে। এই কথাটি বেশ যত্ন করিয়া বুঝিতে ও স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। হিন্দুর ছেলে হইয়া একথা যে না বুঝে, তাহার আশা কোথায়? বর্ত্তমান কালে, বিজাতীয় শিক্ষার ফলস্বরূপ "বিবাহ করিব না" এইরূপ সংকল্প করিয়া, অনেক হিন্দু যুবকও অবিবাহিত থাকিয়া যাইতেছেন। যাঁহারা বিলাতী ভোগের ও লালসার রঙ্গীন কাচের ভিতর দিয়া নিজেকে ও এই জগৎকে দেখেন, তাঁহারা দুইটি সত্য ঘটনার দিকে ফিরিয়াও তাকান না। প্রথম ব্যাপারটি এই:—যাঁহারা মনে করেন যে, যথেষ্ট রোজগার না করিতে পারিলে, বিবাহ করা উচিত নহে, তাঁহারা ঘোর স্বার্থপর ও ভোগ-লোলুপ জীব। তাঁহারা পৃথিবীর উপকার করিতে আইসেন নাই, তাঁহারা স্ব স্ব দেহকে ভোগায়তন করিয়া আসিয়াছেন—অর্থাৎ এই কর্ম্ম-ভূমি ও সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র পৃথিবীর ধারা হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন থাকিয়া "আপনার" সাংসারিক সুখই খুঁজিতে আসিয়াছেন। এই জন্যই দীনাতিদীন হইলেও, হিন্দু ধনী "আঁটকুড়ের" (অপুত্রকের) হাতে ভিক্ষা পর্য্যন্ত লইতেও ঘৃণা বোধ করেন। দ্বিতীয় ব্যাপারটি এই:—এই পৃথিবীতে ধনীদিগের সন্তান প্রায় জন্মে না, কিন্তু যেখানে যত দারিদ্র্য, সেখানেই তত সন্তান সম্ভাবনা বেশী—ইহাই প্রাকৃতিক নির্দ্দেশ—তোমার আমার ক্ষুদ্র বিচারের ফল নয়। দরিদ্রের ঘরে বহু সন্তান জন্মিলেও, কতকগুলির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী;—বোধ হয়, এই জন্যই দরিদ্রের সংসারে সন্তান বাহুল্য। কিন্তু, আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ধনীই হও আর দরিদ্রই হও, অর্থের তুলাদণ্ডে কর্ত্তব্য অবধারণ করিও না—যেকালে জন্মিয়াছ, সেকালে জন্ম-সার্থক কর, ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম কর্ত্তব্য বিমুখ হইও না।

দ্বিতীয়তঃ, স্মরণ কর—কোনও প্রাণী, যে কোনও বয়সে বা কালে জীবের জন্ম দিতে পারে না। প্রত্যেক প্রাণীরই জীবনে কতকটা নির্দ্দিষ্ট কাল থাকে; সুধু সেই কালটুকু মধ্যে সে জীবের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। মানুষের বেলায়, সেটুকু, গড়ে, ১৫ বৎসর বয়স হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল। হিন্দুদিগের মতে, মানুষের জীবিতকালের মাত্রা অন্ততঃ একশত বৎসর। তাহার মধ্যে, মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল সে জীবের উৎপাদন কার্য্যে ব্যয় করিতে পারে। এই কথাগুলি বেশ তলাইয়া বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমাদিগকে বুঝিতে

হইবে যে, জীবোৎপাদনের জন্য এই ত্রিশ বৎসরকাল আমাদিগের মেয়াদ থাকিলেও, ইহার প্রথমার্দ্ধকাল বাদ দিয়া চলাই আমাদিগের পক্ষে সুবিবেচনার কায হইবে কেন না, ২৫।৩০ বৎসর বয়স না হইলে আমাদিগের দেহের পক্কতা হয় না। অপরিণত দেহে অপরিণত ফলই হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক মানুষেরই নিয়ম করা উচিত যে, ২৫।৩০ বৎসর বয়স না হইলে, সন্তানোৎপাদনে নিযুক্ত হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ, যেমন হাঁতে টাকা আসিবামাত্র অযথা খরচ করিলে শীঘ্রই দেউলিয়া হইয়া পড়িতে হয়, তেমনি, মানুষের জন্য, ত্রিশবৎসর কাল সন্তানোৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, সর্ব্বথা, সর্ব্ব রকমে, আমাদিগের সংযত হইয়া চলা উচিত; কারণ, অযথা বীর্য্যস্খলনের অনেক কুফল, তাহা পরে বর্ণনা করিব। তৃতীয়তঃ, যৌন কালের (period of active sexual life) অর্থাৎ (১৫ হইতে ৪৫ বৎসর) প্রথমাংশে যে সকল সন্তান জন্মে, তদপেক্ষা শেষার্দ্ধের সন্তানেরা বেশী স্বাস্থ্য ও মেধা লইয়া জন্মে। এই জন্যই বোধ হয় "অষ্টম-গর্ভের" সন্তানের প্রতি সমাজের এত টান। এই কথাটি সকলেরই স্মরণ রাখা চাই।

তৃতীয় কথা স্মরণ কর—সুসন্তান জন্ম দেওয়া, যদি মনুষ্য জীবনের চরম পরীক্ষা হয়, তাহা হইলে সে চরম কার্য্যের জন্য কতটা আয়োজন, কতটা ঐকান্তিক চেষ্টা, কতটা প্রাণপাত সাধনা করা উচিত! এই দেখ না কেন, বাড়ীতে বিবাহাদি সামান্য উৎসব কার্য্যের জন্য কতদিন ধরিয়া কত পরিশ্রম করিয়া আমরা কত আয়োজন করি;—আর নিজ নিজ জীবনের চরম পরীক্ষারূপ সুসন্তানোৎপাদন কার্য্যের জন্য কতটুকু আয়াস স্বীকার করিয়া থাকি! তুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ "পাশের" জন্য কত জ্ঞান সঞ্চয় করি, কিন্তু সারাজীবনের কঠিন পরীক্ষার জন্য একতিলও জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা হয় না! এ কথা ভাবিলেও লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া আইসে,—আমরাই (মানুষই) না ভগবানের সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ? মানব জন্মই না পৃথিবীতে এত দুর্লভ? মানুষের দেহই না শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমন্দির? কথায় শুনিতে বেশ,—কিন্তু—কাযের বেলায় মানুষ পশুরও অধম হইয়া দাঁড়ায়!

(৫)

পুরুষের বীর্য্যই জনন-কার্য্যের প্রধান উপাদান। এই বীর্য্যকে রেতঃ, ধাতু, "ধাত", শুক্র, ম্যাটার, সিমেন্ প্রভৃতি বলা হয়। এই বীর্য্যের জন্মস্থান—অণ্ডকোষে বিচিতে)। মুখে যেমন লালা সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া জমা থাকে না; চক্ষে যেমন "জল" তৈয়ারী হইয়া কোনও লুকান চৌবাচ্ছায় জমা থাকে না; নাকে যেমন সর্দ্দি সদাসর্ব্বদাই জমা থাকে না;—কিন্তু, প্রত্যেকবার খাইবার সময়ে যেমন প্রায় আধসের লালা মুখের ভিতরে নিঃসৃত হয়, চোখে বালি পড়িলে যেমন অনবরত জল গড়াইতে থাকে এবং নাকে লঙ্কার ঝাঁজ লাগিলে যেমন প্রচুর সর্দ্দি পড়ে, তেমনি, আবশ্যক হইলেই, কামোত্তেজনার সময় অণ্ডকোষের মধ্যে বীর্য্য তখনি-তখনি তৈয়ার হইয়া যায়।

কুচিন্তা, কু-দৃশ্য দর্শন, কু-কথা শ্রবণ, ইতর প্রাণীদিগের বেলা কুস্থানের আঘ্রাণ গ্রহণ, হস্তাদি দ্বারা জননেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করা—প্রভৃতি নানা উপায়েই কামোদ্রেক ঘটাইয়া, বীর্য্য স্খলন করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ, যে যে পথ দিয়া কামের উদ্রেক করান যায় বা সম্ভব হয়, তাহা এই:—

(১) চিন্তা বা মনন দ্বারা। যে মন ইচ্ছা করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কেই বশ বা নিগ্রহ করিতে পারে; আবার সেই মনই আমাদিগকে লইয়া বানর নাচায়—কুকর্ম্মে রত করে। মনকে বশে আনার মত শক্ত কায আর নাই। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরে আধিপত্য করে। মন কখনো মরে না—পুনর্জ্জন্ম হইলেও পূর্ব্ব-জন্মের মন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য, মন অত্যন্ত দুর্জ্জয় বলিয়া, মনকে সর্ব্বদাই সুচিন্তা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করাই বুদ্ধিমানের কায। এই কথা স্মরণ করিয়া, (অর্থাৎ সৎ-অসৎ বিচার করিয়া) যে-সে ধারণাকে মনে স্থান দিবে।

(২) চক্ষু দ্বারা—কুৎসিৎ কায বা চিত্র দর্শন দ্বারা।

(৩) কর্ণ দ্বারা—কুৎসিৎ কথা শ্রবণ দ্বারা।

(৪) নাসিকা—ইহা ইতর প্রাণীদের বেলায় প্রযোজ্য। অনেকে জানেন না যে, মৃগনাভিটি কি? যে মৃগের নাভিতে এই ময়লা জন্মে, সেইটি সেই জাতীয় পুংমৃগ। যৌন-সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইলেই, উহার নাভিতে এই উগ্রগন্ধী দ্রব্যের সঞ্চার হয় এবং এই গন্ধের দ্বারাই মৃগীরা ঐ মৃগের নিকটে আকৃষ্ট হয়। মানুষের বেলা, নানা সুগন্ধি সেবনে কামোদ্রেক হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মচারী ও বিধবাদিগের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(৫) ত্বক। গাল, ঠোঁট, নিতম্বদেশ, উরু, স্তন—প্রভৃতির ত্বক কাহারো কাহারো পক্ষে কামোদ্রেকশীল। অর্থাৎ, এই এই স্থানকে উত্তেজিত করিলে, কামোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়। অঙ্গ-প্রসাধন ও কণ্ডুয়নেও কামেচ্ছা প্রবল হয়। ব্রহ্মচারী ও বিধবারা এই কারণে উক্ত কার্য্যে রত হন না। নিতম্বদেশ উত্তেজিত হইলে কামোদ্রেক ঘটিতে পারে, এই কারণে শিশুদিগের নিতম্বদেশে চপেটাঘাত বা বেত্রাঘাত করা অন্যায়। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

(৬) পরিপাক যন্ত্র।—অতি-ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য-ভোজন, মাছ, মাংস, প্রভৃতি উগ্র দ্রব্য ভোজনে কামেচ্ছা প্রবল হয়। যাহাতে 'পেট গরম" হয়, এমন জিনিষ খাইলে কামোদ্রেক ঘটে; মাছ, মাংস, ডিম, কাঁকড়া, গরম মসলা, পেঁয়াজ, রসুন, বেশী পান সুপারি, খাইলেও কামোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা! এই কারণে বিধবাকে নিরামিষাশী ও পান সুপারি ত্যাগিনী হইতে হয়। এই কারণে—অর্থাৎ যাহাতে কামোদ্রেক মোটেই না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে—তাঁহাদিগকে মাসে দুইটা উপবাস করাইয়া, শরীরকে স্নিগ্ধ ও লঘু করিয়া তুলিতে হয় এবং এক বেলার বেশী দুইবেলা আহার বিধবাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। এবং এই জন্যই ব্রহ্মচারীগণের ভিক্ষান্ন দ্বারা একবেলা উদর-পূর্ত্তির ব্যবস্থা আছে। ভোজনের পরে চিৎ হইয়া শুইলে, হজমের ব্যাঘাত হয়—এজন্য চিৎ হইয়া নিদ্রিত হইলে, কামোদ্রেক ঘটিবার সম্ভাবনা। দিবা-নিদ্রারও ঐ কুফল। এই জন্য "মা দিবা সাপ্সী"।

(৭) মলদ্বার। ছোট ছোট ক্রিমি (thread worm) থাকিলে, মলদ্বার শুড় শুড় করে। মলদ্বারে এই ভাবে উত্তেজনা থাকিলে, কামেচ্ছা বলবতী হইবার কথা। নিরন্তর কোষ্ঠ কাঠিন্যও কামোদ্রেক করায়।

(৮) জননেন্দ্রিয়ের অপরিচ্ছন্নতা। ইন্দ্রিয়মাত্রেই অযত্নে, অতি শীঘ্র ও সহজে অপরিষ্কার হইয়া পড়ে। অপরিষ্কার থাকিলে, আপনিই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিয়া থাকে। একারণে, পরিষ্কার জলে উহাদিগকে ধুইয়া রাখা উচিত। পরিষ্কার রাখিবার উদ্দেশ্যে, সাবান ব্যবহার করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই; বরঞ্চ, নিত্য সাবান লাগাইলে, চর্ম্ম উগ্র হইয়া যায়। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, দাদ প্রভৃতি যাহাতে না হইতে পারে, সে জন্য, আশে পাশে বেশী চুল জন্মাইতে দিতে নাই এবং যায়গাটিকে নিত্য পরিষ্কার রাখিতে হয়।

[লক্ষ্য করিও,—কেমন একটি যন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত শরীরের প্রায় সকল অংশেরই যোগাযোগ রহিয়াছে।]

(৬)

যে যে কারণে কামোদ্রেক হয়, সেই সেই অবস্থায় বীর্য্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। সুপক্ক আমে ভিন্ন আম গাছের অপর কোথাও সে সুমিষ্ট রস পাওয়া না গেলেও, সেই রসের উপাদান আমগাছেই ওতপ্রোত ভাবে থাকে। আমও যখন-তখন ফলে না, ফলিলেও সকল সময়ে সুমিষ্ট হয় না। সেই রকমে, আমাদের অণ্ডকোষে বীর্য্য প্রস্তুত হইলেও, আমাদের রক্তে সেই বীর্য্যের উপাদান থাকে। রক্ত হইতে বীর্য্যের উপাদান আহরণ করিয়া, যখন ইচ্ছা, তাহাকে আমরা অণ্ডকোষের মধ্যে তৈয়ারি করিয়া লই। এই সার কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। রক্তের মধ্যে বীর্য্যের উপাদান ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতবার বীর্য্যপাত করা যায়, ততবারই

রক্ত হইতে ঐ জিনিষটিকে তুলিয়া লওয়া হয়; রক্ত হইতে ঐ জিনিষটি শূন্য হইয়া পড়ে। দেখা গিয়াছে যে, রক্তের ঐ উপাদান যে-যে পরিমাণে নষ্ট হয়, রক্ত সেই পরিমাণে ও শক্তিতে তত হীন হইয়া পড়ে,—অথচ রক্তই আমাদিগের জীবন!

যাহাদের বেশীবার বা বেশী * পরিমাণে বীর্য্যপাত হইয়াছে, তাহারা দুর্ব্বল বোধ করে, তাহাদের চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে, মাথা ঘোরে, বেশীক্ষণ চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না, স্মরণ শক্তি কমিয়া যায়, যাহারা কোনও কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সকল কথা—মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়; চিন্তশক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া আসে ক্রমশঃ ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়; অনেক সময়ে, কাণের ভিতরে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ বোধ হয়, তাহাদের চক্ষের দৃষ্টিও কমিয়া আসে; শরীর অলস হয়, মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়। কাহারো কাহারো মাথা ধরিতে থাকে, বৈকালে ঘুষ ঘুষে জ্বর হয়, কেহ কেহ বা সাময়িক পাগলও হইয়া যায়। এই অতিমাত্র বীর্য্য-ক্ষয় হইতে ক্ষয়কাশি ও (phthisis) আসিয়া দাঁড়ায়। আরো কত কি হয় —তাহার তালিকা † দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্য করিও—শরীরের সামান্য অংশ অণ্ডকোষ হইতে বীর্যপাত ঘটিলে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কোন যন্ত্র নিষ্কৃতি পায় না—অল্প-বিস্তর সকলেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে।

মোট কথা এই যে, আমাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ নির্ভর করে—শরীরের রক্তের উৎকর্ষতার উপরে। সেই রক্তের সারাৎসার অংশ—বীর্য্য। কাযেই, বেশী বা অযথা বীর্য্যপাতে, রক্ত দুর্ব্বল হয়। রক্ত দুর্ব্বল হইলে, মানুষটার সব দিকেই অনিষ্ট হয়। এই কথাটি মুনি-ঋষিরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা তাহার শতাংশের একাংশও বুঝেন না। কাযেই, মুনি-ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের উপরে এত জোর দিতেন। "ব্রহ্মচর্য্য" বলিলে, আর যাহা-কিছু বুঝাক বা না বুঝাক, বীর্য্যপাত না করাটাকেই সবচেয়ে বেশী করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। আর্য্য ঋষিরা "ঊর্দ্ধরেতঃ" থাকিতেন—অর্থাৎ জীবনে কখনো এক ফোঁটাও বীর্য্যপাত করিতেন না। তাই, না খাইয়াও তাঁহাদিগের দেহের এত লাবণ্য থাকিত, তাঁহাদের ধ্যান ও ধারণা করিবার এত শক্তি জন্মাইত, তাঁহারা এত সামান্য আহার করিয়াও এত দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। আজ আমরা যে অত্যন্ত বেশী অল্পায়ুঃ, এত রোগ ও জরাপ্রবণ, এত কম বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী, তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের অসংযম। এটাকে একটা কথার কথা হিসাবে বলিলাম, তাহা নহে। ইহা খাঁটি সত্য।

এ পৃথিবীতে আর একটি মজার জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। তুমি যতই একলা থাকিতে চেষ্টা কর—যতই এক-বস্তু লইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর—দেখিবে, "বহুর" সহিত "এক" কত রকমে মাখান, কত কত বিষয়ে জড়ান। এই "এক" জিনিষ বীর্য্য ধরিয়াই দেখাইয়াছি যে, বীর্য্যপাতে মাথা খারাপ হয়, চক্ষু খারাপ হয়, মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়, আয়ুঃ কমিয়া যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি কমিয়া যায়। আবার অসংযমের দিক দিয়া দেখ—যে এতটুকু সামান্য জিনিষের বেলায় অসংযত হইতে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ সকল জিনিষের বেলায়ও

---

* "বেশী" ও "অল্প" এই দুইটি বড়ই মারাত্মক। কারণ, কোন্ জিনিষটা কাহার পক্ষে "বেশী", কাহার পক্ষে "কম", তাহা কেহই মাপিয়া জুকিয়া করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে, ক্ষেত্রও পাত্র বিশেষে এই "বেশী"-"কমের" মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হয়। "অমুকের ত এতটা করিলে অসুখ হয় না, আমার এত সামান্যতে কেন অসুখ করে" এ অভিযোগ করা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

† সংবাদ পত্রে ও পঞ্জিকায় "স্বপ্নদোষ" "শুক্রতারল্য" প্রভৃতির আখ্যায় যে সকল মারাত্মক বর্ণনা থাকে তাহা পাঠে অনেকেরই সর্ব্বনাশ হয়। পাঠক জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগকে নির্থক বেশী বেশী ভয় দেখাইয়া দু-দশ শিশি ঔষধ বিক্রয় করাই ঐ বাজে দেওয়ার কারণ। কখনো কোনও বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিও না—এবং পয়সা দিলে "প্রশংসা-পত্র" কিনিতে পাওয়া যায় বলিয়া প্রশংসা-পত্রে মুগ্ধ হইও না।

(২) চক্ষু দ্বারা—কুৎসিৎ কায বা চিত্র দর্শন দ্বারা।

(৩) কর্ণ দ্বারা—কুৎসিৎ কথা শ্রবণ দ্বারা।

(৪) নাসিকা—ইহা ইতর প্রাণীদের বেলায় প্রযোজ্য। অনেকে জানেন না যে, মৃগনাভিটি কি? যে মৃগের নাভিতে এই ময়লা জন্মে, সেইটি সেই জাতীয় পুংমৃগ। যৌন-সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইলেই, উহার নাভিতে এই উগ্রগন্ধী দ্রব্যের সঞ্চার হয় এবং এই গন্ধের দ্বারাই মৃগীরা ঐ মৃগের নিকটে আকৃষ্ট হয়। মানুষের বেলা, নানা সুগন্ধি সেবনে কামোদ্রেক হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মচারী ও বিধবা-দিগের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(৫) ত্বক। গাল, ঠোঁট, নিতম্বদেশ, উরু, স্তন—প্রভৃতির ত্বক কাহারো কাহারো পক্ষে কামোদ্রেকশীল। অর্থাৎ, এই এই স্থানকে উত্তেজিত করিলে, কামোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়। অঙ্গ-প্রসাধন ও কণ্ডুয়নেও কামেচ্ছা প্রবল হয়। ব্রহ্মচারী ও বিধবারা এই কারণে উক্ত কার্য্যে রত হন না। নিতম্বদেশ উত্তেজিত হইলে কামোদ্রেক ঘটিতে পারে, এই কারণে শিশুদিগের নিতম্বদেশে চপেটাঘাত বা বেত্রাঘাত করা অন্যায়। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

(৬) পরিপাক যন্ত্র।—অতি-ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য-ভোজন, মাছ, মাংস, প্রভৃতি উগ্র দ্রব্য ভোজনে কামেচ্ছা প্রবল হয়। যাহাতে 'পেট গরম" হয়, এমন জিনিষ খাইলে কামোদ্রেক ঘটে; মাছ, মাংস, ডিম, কাঁকড়া, গরম মসলা, পেঁয়াজ, রসুন, বেশী পান সুপারি, খাইলেও কামোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা! এই কারণে বিধবাকে নিরামিষাশী ও পান সুপারি ত্যাগিনী হইতে হয়। এই কারণে—অর্থাৎ যাহাতে কামোদ্রেক মোটেই না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে—তাঁহাদিগকে মাসে দুইটা উপবাস করাইয়া. শরীরকে স্নিগ্ধ ও লঘু করিয়া তুলিতে হয় এবং এক বেলার বেশী দুইবেলা আহার বিধবাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। এবং এই জন্যই ব্রহ্মচারীগণণের ভিক্ষান্ন দ্বারা একবেলা উদর-পূর্ত্তির ব্যবস্থা আছে। ভোজনের পরে চিৎ হইয়া শুইলে, হজমের ব্যাঘাত হয়—এজন্য চিৎ হইয়া নিদ্রিত হইলে, কামোদ্রেক ঘটিবার সম্ভাবনা। দিবা-নিদ্রারও ঐ কুফল। এই জন্য "মা দিবা সাপ্সী"।

(৭) মলদ্বার। ছোট ছোট ক্রিমি (thread worm) থাকিলে, মলদ্বার শুড় শুড় করে। মলদ্বারে এই ভাবে উত্তেজনা থাকিলে, কামেচ্ছা বলবতী হইবার কথা। নিরন্তর কোষ্ঠ কাঠিন্যও কামোদ্রেক করায়।

(৮) জননেন্দ্রিয়ের অপরিচ্ছন্নতা। ইন্দ্রিয়মাত্রেই অযত্নে, অতি শীঘ্র ও সহজে অপরিষ্কার হইয়া পড়ে। অপরিষ্কার থাকিলে, আপনিই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ঘটিয়া থাকে। একারণে, পরিষ্কার জলে উহাদিগকে ধুইয়া রাখা উচিত। পরিষ্কার রাখিবার উদ্দেশ্যে, সাবান ব্যবহার করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই; বরঞ্চ, নিত্য সাবান লাগাইলে, চর্ম্ম উগ্র হইয়া যায়। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, দাদ প্রভৃতি যাহাতে না হইতে পারে, সে জন্য, আশে পাশে বেশী চুল জন্মাইতে দিতে নাই এবং যায়গাটিকে নিত্য পরিষ্কার রাখিতে হয়।

[লক্ষ্য করিও,—কেমন একটি যন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত শরীরের প্রায় সকল অংশেরই যোগাযোগ রহিয়াছে।]

(৬]

যে যে, কারণে কামোদ্রেক হয়, সেই সেই অবস্থায় বীর্য্য তৈয়ারী হইয়া থাকে। সুপক্ক আমে ভিন্ন আম গাছের অপর কোথাও সে সুমিষ্ট রস পাওয়া না গেলেও, সেই রসের উপাদান আমগাছেই ওতপ্রোত ভাবে থাকে। আমও যথন-তথন ফলে না, ফলিলেও সকল সময়ে সুমিষ্ট হয় না। সেই রকমে, আমাদের অণ্ডকোষে বীর্য্য প্রস্তুত হইলেও, আমাদের রক্তে সেই বীর্য্যের উপাদান থাকে। রক্ত হইতে বীর্য্যের উপাদান আহরণ করিয়া, যথন ইচ্ছা, তাহাকে আমরা অণ্ডকোষের মধ্যে তৈয়ারি করিয়া লই। এই সার কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। রক্তের মধ্যে বীর্য্যের উপাদান ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতবার বীর্য্যপাত করা যায়, ততবারই

...হইতে ঐ জিনিষটিকে তুলিয়া লওয়া হয়; রক্ত ...ই ঐ জিনিষটি শূন্য হইয়া পড়ে। দেখা গিয়াছে ...রক্তের ঐ উপাদান যে-যে পরিমাণে নষ্ট হয়, রক্ত ...রিমাণে ও শক্তিতে তত হীন হইয়া পড়ে,—অথচ ...ই আমাদিগের জীবন!

যাহাদের বেশীবার বা বেশী * পরিমাণে বীর্য্যপাত হইয়াছে, তাহারা দুর্ব্বল বোধ করে, তাহাদের চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে, মাথা ঘোরে, বেশীক্ষণ চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না, স্মরণ শক্তি কমিয়া যায়, তাহারা কোনও কাযে মনোনিবেশ করিতে পারে না। ...ল কথা—মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়; চিন্তশক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া আসে ক্রমশঃ ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়; অনেক সময়ে, কাণের ভিতরে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ বোধ হয়, তাহাদের চক্ষের দৃষ্টিও কমিয়া আসে; শরীর অলস হয়, মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়। কাহারো কাহারো মাথা ধরিতে থাকে, বৈকালে ঘুষ ঘুষে জ্বর হয়, কেহ কেহ বা সাময়িক পাগলও হইয়া যায়। এই অতিমাত্র বীর্য্য-ক্ষয় হইতে ক্ষয়কাশি ও (phthisis) আসিয়া দাঁড়ায়। আরো কত কি হয় —তাহার তালিকা † দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্য করিও—শরীরের সামান্য অংশ অণ্ডকোষ হইতে বীর্য্যপাত ঘটিলে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কোন যন্ত্র নিষ্কৃতি পায় না—অল্প-বিস্তর সকলেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে।

মোট কথা এই যে, আমাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ নির্ভর করে—শরীরের রক্তের উৎকর্ষতার উপরে। সেই রক্তের সারাৎসার অংশ—বীর্য্য। কাযেই, বেশী বা অযথা বীর্য্যপাতে, রক্ত দুর্ব্বল হয়। রক্ত দুর্ব্বল হইলে, মানুষটার সব দিকেই অনিষ্ট হয়। এই কথাটি মুনি-ঋষিরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা তাহার শতাংশের একাংশও বুঝেন না। কাযেই, মুনি-ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের উপরে এত জোর দিতেন। "ব্রহ্মচর্য্য" বলিলে, আর যাহা-কিছু বুঝাক বা না বুঝাক, বীর্য্যপাত না করাটাকেই সবচেয়ে বেশী করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। আর্য্য ঋষিরা "ঊর্দ্ধরেতঃ" থাকিতেন—অর্থাৎ জীবনে কখনো এক ফোঁটাও বীর্য্যপাত করিতেন না। তাই, না খাইয়াও তাঁহাদিগের দেহের এত লাবণ্য থাকিত, তাঁহাদের ধ্যান ও ধারণা করিবার এত শক্তি জন্মাইত, তাঁহারা এত সামান্য আহার করিয়াও এত দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। আজ আমরা যে অত্যন্ত বেশী অল্পায়ুঃ, এত রোগ ও জরাপ্রবণ, এত কম বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী, তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের অসংযম। এটাকে একটা কথার কথা হিসাবে বলিলাম, তাহা নহে। ইহা খাঁটি সত্য।

এ পৃথিবীতে আর একটি মজার জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। তুমি যতই একলা থাকিতে চেষ্টা কর—যতই এক-বস্তু লইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর—দেখিবে, "বহুর" সহিত "এক" কত রকমে মাথান, কত কত বিষয়ে জড়ান। এই "এক" জিনিষ বীর্য্য ধরিয়াই দেখাইয়াছি যে, বীর্য্যপাতে মাথা খারাপ হয়, চক্ষু খারাপ হয়, মাংসপেশী দুর্ব্বল হয়, আয়ুঃ কমিয়া যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি কমিয়া যায়। আবার অসংযমের দিক দিয়া দেখ—যে এতটুকু সামান্য জিনিষের বেলায় অসংযত হইতে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ সকল জিনিষের বেলায়ও

* "বেশী" ও "অল্প" এই দুইটি বড়ই মারাত্মক। কারণ, ...ন জিনিষটা কাহার পক্ষে "বেশী", কাহার পক্ষে "কম", তাহা ...ই মাপিয়া জুকিয়া কষিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ...র নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে, ক্ষেত্রও পাত্র বিশেষে এই "বেশী"-"কমের" মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হয়। "অমুকের ত এতটা ...িলে অসুখ হয় না, আমার এত সামান্যতে কেন অসুখ করে" এ ...যোগ করা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

† সংবাদ পত্রে ও পত্রিকায় "স্বপ্নদোষ" "শুক্রতারল্য" ...ত্তির আখ্যায় যে সকল মারাত্মক বর্ণনা থাকে তাহা পাঠে ...নেকেরই সর্ব্বনাশ হয়। পাঠক জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগকে ...র্থক বেশী বেশী ভয় দেখাইয়া দু-দশ শিশি ঔষধ বিক্রয় করাই ...ধাপ্পা দেওয়ার কারণ। কখনো কোনও বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিও ...—এবং পয়সা দিলে "প্রশংসা-পত্র" কিনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ...সা-পত্রে মুগ্ধ হইও না।

অসংযম আসিয়া জোটে। এই কারণেই, মুনি-ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের সাধনকার্য্যে বীর্য্য-পাতের দিকে প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিলেও, সকল বিষয়েই সংযমের অভ্যাস করিতে বলিতেন। তাঁহারা এটা বেশ বুঝিতেন যে, এ পৃথিবীতে প্রত্যেক অণুর সঙ্গে অপর প্রত্যেক অণুর অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অসংযমী, অহঙ্কৃত, ও "স্ব-স্ব প্রধান" মন্ত্রবাদী পাশ্চাত্যগণের শিক্ষা ও দীক্ষার ফলে, আমরা প্রতি কার্য্যেই এই সূক্ষ্ম সূত্র ভুলিয়া যাই।

আর একটা কথা।—বেশ করিয়া তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,—প্রথমতঃ, যখন জীবের জন্ম হয় অপর জীবের জন্ম দিবার জন্য, এবং সেই জন্মদান হয় প্রধানতঃ বীর্য্যেরই প্রভাবে, তখন "বীর্য্য নষ্ট করা" মানে দাঁড়ায়—জীবন ও জন্ম অসার্থক করা—পশুভাবাপন্ন হইয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করা—অপমানিত করা। দ্বিতীয়তঃ, এ পৃথিবীতে তিনটি দারুণ ব্যারাম আছে—মেহ (গণোরিয়া), গর্ম্মি (সিফিলিস) ও ক্ষয়কাশ থাইসিস্—যাহা জীবনে কখনো সারে কি না সন্দেহ—যাহা পর-পর পাঁচ পুরুষকে ভোগায়, এবং যাহার জন্য মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে। এমন যে তিনটি ব্যারাম, তাহার মধ্যে দুইটিই জননেন্দ্রিয়ের অসংযমের শাস্তি স্বরূপ এবং ক্ষয়কাশও প্রকারান্তরে তাই। অন্ততঃ, এই দুইটি দিক দিয়াও বেশ বুঝা যায়—ভগবানের নির্দ্দেশ কোন পথে। জীব, তুমি কি এতই অন্ধ যে এই ভগবৎ-সঙ্কেত দেখিতে পাও না?

(৭)

পৃথিবীতে যত জীব আছে, প্রত্যেকেরই জীব-জন্ম দিবার নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা কাল আছে—সুধু মানুষের বেলায় তাহা নাই। ভগবান্ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়াছেন বলিয়া, ঐরূপ (সাময়িক প্রবৃত্তির উন্মেষ) কোনও কাল-নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। কিন্তু মানুষ নিজের বুদ্ধির অপব্যবহার করিয়া, অত্যন্ত অসংযমের পরিচয় দিতেছে।

প্রথমতঃ।—আজ আমরা প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমাদের জীবনের মধ্যে মস্ত কর্ত্তব্য হইতেছে মাত্র একটা—সেটি দু-একটি সুসন্তান জন্ম দেওয়া। কামাচারী হইয়া "শূকরের পাল" সৃজন করা নয়। "সুসন্তান" বলিলে "রূপ, জয় ও যশ"-সম্পন্ন সন্তান বুঝায়। সেরূপ সন্তান জন্ম দিবার জন্য যে আরাধনা, যে ব্রহ্মচর্য্য, যে মানসিক উন্নতাবস্থার প্রয়োজন, তাহার এতটুকুও কি আমরা করি? কাযেই, যে সন্তান জন্মায় সে দীর্ঘায়ুঃ, রূপ, জয় (জীবনের সাফল্য) ও যশঃ (ভগবদ্বিভূতি)—কিছুরই কিছু লইয়া আসে না—সে আমাদের অসংযমের মূর্ত্ত বিকাশ হইয়া জন্মায়। সে নিত্য ব্যারামে ভোগে, অল্পায়ু হয়—সমস্তই আমাদের অসংযমের ফলে; সে সন্তান আমাদিগের পাপের শাস্তি দিতে আসে, আমাদের বংশের বা সমাজের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আসে না। তাহার নিত্য ব্যারাম, নিত্য অকাল-মৃত্যু দেখিয়াও আমরা অসংযম হইতে ছাড়ি না!!!

দ্বিতীয়তঃ। সন্তান জন্মিলে, অন্যায় মমত্ব বশতঃ, আমরাই (পিতামাতাই) বাল্যকাল হইতে তাহাকে অসংযমের ক্ষেত্রের মাঝখানে রাখিয়া, পদে পদে অসংযমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা দিয়া, তাহার মধ্যে অসংযমের বিপুল স্রোত বহাইয়া দিই। সন্তান জন্মিলে, সে সন্তান যে ষোল আনা আমারই সম্পত্তি এই মনে করি—সে যে দেশের ও দশের সেবা করিতে জন্মিয়াছে, এ কথা ভুলিয়া যাই। কাযেই, ষোল-আনা আপাত-মনোরম কিন্তু বিষদিগ্ধ ভোগের লালসায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারের শান্তিচ্ছায়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অথবা নামমাত্র তাহার মধ্যে থাকিয়া, আহারে, বেশভূষায়, আদরে, যত্নে, ব্যবহারে—ছেলেকে বেশ বুঝিতে দিই যে, "তুমি যে এই ভোগায়তন দেহ লইয়া আসিয়াছ, আমি তোমাকে তাহারই উপযোগী করিয়া তুলিতেছি।" এই রকমে শৈশব হইতেই তাহার দশেন্দ্রিয়ের সহস্রদ্বার আমরাই স্বহস্তে খুলিয়া দিয়া তবে ছাড়ি।

তৃতীয়তঃ। আমরা "শিক্ষার" নামে সন্তানদিগকে যে জিনিষ দিই, তাহাকে কি ভাষায় বর্ণনা করিব, তাহা খুঁজিয়া পাই না। মানুষের জন্মজাত যে মেধা, যে বুদ্ধি, যে চিন্তাশক্তি ও যে শারীরিক শক্তি থাকে, অজস্র

[অ]বস্থার অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়া নিজের মেজাজ ও [তা]হার শরীর মাটি করিয়া, তাহার এককালীন লোপ [কর]াইয়া, কতকগুলা পড়ান বুলি শিখাই মাত্র। আমরা [পু]ত্রদিগকে "শিখিতে" দিই, নারীগণকে তাহা দিই না। [আ]মরা বিশ্বের সকল তথ্যের কিছু না কিছু শিখি, শিখাই [না] শুধু,—দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব। আমরা [সা]হেবীয়ানার অনুকরণ বা মর্কটামি করিতে শিখাই, [সা]হেবী ভাষা শিখাই,—পরের কুকুরকে মাথায় তুলিতে শিখাই, ঘরের ঠাকুরকে অবজ্ঞা করিতে শিখাই—এই ত শিক্ষা—এই ত তথাকথিত "বিদ্যা" যাহা শিখাইতে [আ]মরা সর্ব্বস্বান্ত হই এবং বালকদিগের জীবনের অর্দ্ধেক [অ]তিবাহিত করিয়া দিই। তাহাদিগকে সর্ব্বরকমে, এমন কি অশনে বসনে, চিন্তায়, ভাবে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে, [বি]জাতীয় ভাবাপন্ন ও স্বকীয় ভাবে বীতশ্রদ্ধ করিয়া [দি]বার জন্য অন্ধ আবেগে ধাবিত হই। আমরা নিজেরা [দে]শের কোনও জিনিষকে চিনিলাম না, এমন কি [ভা]বী বংশধর ছেলেদিগকে চিনিলাম না। দেশাত্মবোধ, [আ]ত্ম-সম্মান বোধ, এসকলও কোন দিন শিক্ষা দিলাম [না]—দাসত্বের পরাকাষ্ঠা ও সেই সঙ্গে দাস-জাতি-সুলভ [ক]র্ষাই শিখিলাম।

চতুর্থতঃ—সন্তানের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, [আ]মাদিগের ব্যবহার হীনতার চূড়ান্ত সীমাও অতিক্রম [ক]রে। এক দিকে যেমন পাত্র-পাত্রীর বংশ পরিচয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্য, তাহাদিগের শীলতার কোনও [মূ]ল্য আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া মনেও স্থান [দি]ই না, অন্য দিকে তেমনি পাত্রীর পৈতৃক অর্থের [দি]কে লোভ করি এবং পাত্রীর ভোগের ইন্ধন স্বরূপ মেয়েটির রূপ, রং প্রভৃতির মূল্য অতীব অসম্ভব মাত্রায় চড়াইয়া দিই। সন্তানের সম্মুখে কি সুন্দর, কি মহান্ আদর্শই ধরি—এ কথা ভাবিতে গেলেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়! কিন্তু আজ বাঙ্গালীর ঘরে—যে হিন্দু বাঙ্গালী বংশরক্ষা করাটা একটা অবশ্য-কর্ত্তব্য, [পু]ণ্যকার্য্য মনে করে—সেই বাঙ্গালীর ঘরে এ কি নীচ লালসা, পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মর্ম্মভেদী অভিনয়!

পঞ্চমতঃ—একই পিতামাতার পুত্রেরা একরকমের ব্যবহার ও শিক্ষা ও যত্ন পায়, কন্যা বা অপর রকমের ব্যবহার, শিক্ষা ও যত্ন পায়। পুত্র জন্মিলে সংসারে আনন্দ-উৎসব হয়, কন্যা জন্মিলে, সংসার নিরানন্দ হয়। পুত্র দুধ-ঘি খায়, কন্যার আহারের কথা না বলাই ভাল! অথচ সন্তানোৎপাদন কালে পুত্রের (ভাবী জনকের) ও স্বাস্থ্য যত ভাল হওয়া উচিত, কন্যারও (ভাবী জননীর) স্বাস্থ্য ততই ভাল হওয়া উচিত। শুধু দৈহিক স্বাস্থ্যের কথা বলিতেছি না—মানসিক ও সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যের উন্নতি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানুষ হইয়া হিন্দুর সন্তান হইয়া, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আমরা আজ এ কি করিতে বসিয়াছি?

আর দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃথা বৃদ্ধি করিব না। অসংযম, অবিবেচনা, ক্ষণস্থায়ী, আপাত-মনোহর; কিন্তু পরে যত অনর্থের মূল। তুচ্ছ ভোগের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, ইহ-সর্ব্বস্ব হইয়া, আত্ম মর্য্যাদার লোপ সাধন, শিক্ষার নামে অশিক্ষা দান—আমাদের পাপের আর সীমা নাই। পাপের কূপের মধ্যে থাকিয়া আজ আমরা পৃথিবীর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু তাহা করিলে চলিবে না ত!

এখন আমাদিগকে মোড় ফিরিতে হইবে। যে পথে যাইতেছি, সে পথ উৎকৃষ্ট পথ ত নহেই, পরম নিকৃষ্ট পথ। এখন হইতে কথায় ও কাযে আমাদিগকে—

১। সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ, এ দেহ যে ভগবানের শ্রীমন্দির।

২। দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব—শিশুকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত শিখিতে ও শিখাইতে হইবে।

৩। ছেলে মানুষ করার জন্য, প্রত্যেক পিতা মাতাকেই অবহিত হইতে হইবে। যেমন আপিসের কায, বা নিজ নিজ ব্যবসায়ে মন প্রাণ দিয়া সকল তথ্য শিক্ষা করি, এবং প্রতি পদে বুঝিয়া সুজিয়া কাযে নামি, তেমনি করিয়া ছেলে মানুষ করিতে হইবে।

৪। আত্মসম্মানবোধ ও দেশাত্মবোধ জন্মায়, এমন পথে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রকৃতি দত্ত নিজ হাত-পা প্রভৃতি সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহাতে সজাগ ও সক্ষম হইয়া উঠে এবং মনের ও চিত্তের বৃত্তিগুলি যাহাতে স্ফূর্ত্তি পায়, এইরূপে প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ করিয়া, শিক্ষা দিতে হইবে।

৫। শয্যাসঙ্গিনী বধূ না আনিয়া, ভাবী বংশের জননী হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বধূ আনিতে হইবে।

(৮)

এক্ষণে, যুবকগণের কর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবের জন্ম, মানবকে জন্ম দিবার জন্য। মানবের কত বয়সে, কম পক্ষে মানবকে জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়? সাধারণতঃ, মেয়েদিগের বেলায়, এ দেশে, বারো বর্ষে ও বালকদিগের বেলায়, চৌদ্দ-পনর বৎসরের পরে—গড়ে ১৯।২০ বৎসর বয়সে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'মেয়েদের ১২, আর ছেলেদের ১৪।১৫ বৎসর বয়সের পরে ছেলে জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়" বলিলে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পৃথিবীতে ঐ নিয়ম সকলেরই বেলায় সমানে খাটে। তাহার চেয়েও বেশী যত্ন করিয়া মনে রাখা দরকার এই যে, যদিও কোনও বালিকার ১২ বৎসর বয়সে, ও বালকের ১৪।১৫ বৎসর বয়সে, ঐ ক্ষমতা জন্মায়, তবে সেই নির্দ্দেশ মত তাহারা যদি কায করিতে যায়, তবে উভয়েরই অল্প বয়স হইতে শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং উভয়েই স্বল্পায়ু হইবে। যে সকল ঘোড়া বা বলদ গাড়ী টানে, তাহাদিগকে কখনো ঘোটকী বা গরুর সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া হয় না—এমন কি বেশী বয়সে, একদিনেরও জন্য নয়—কারণ, ঐ একদিনের সংসর্গের ফলে, ঐ জানোয়ারেরা হীনবল হইয়া পড়ে। যদি মানুষের চেয়ে বিশগুণ বলিষ্ঠ গরু ঘোড়ার বেলায় এ কথা সত্য হয়, তবে দুর্ব্বল মানুষের বেলায় ঐ কাঁচা বয়সে (১২—১৫) বীর্য্যপাত করিলে, শুধু দেহ কেন, আয়ুও ক্ষয় হইয়া যাইবেই। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স না হইলে, আমাদিগের দেহের সমস্ত হাড় শক্ত হয় না। নিজে শক্ত না হইয়া, জীবের জন্ম দিতে গেলে, নিজেরও সর্ব্বনাশ, ভাবী সন্তানেরও সর্ব্বনাশ—চির রুগ্ন অল্পায়ু ছেলেকে লইয়া আজীবন কষ্ট পাইতে হয়। এখানে তাহা হইলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে;—প্রথম, বালিকারা ১২ ও বালকেরা ১৪।১৫ বৎসরের পরে সন্তানোৎপাদন করিতে পারে। দ্বিতীয়, —উক্ত কথাটি লিখিত—পঠিত ভাষায় ঠিক হইলেও বালিকাদিগের ১৮।১৯ বৎসর ও বালকদিগের ২৪।২৫ বৎসর বয়স না হইলে, কখনো পুত্রোৎপাদনে উদ্যত হইতে নাই।

আমরা কেমন করিয়া জানিলাম যে, বালিকাদের ১২ বৎসর বয়সের পরে ও বালকদিগের ১৪।১৫ বৎসর বয়সের পরে ঐ ক্ষমতা জন্মায়? আমরা প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে ঐটি টের পাই।

বালিকাদিগের "ঋতু" আরম্ভ হয় ১২।১৪ বৎসর বয়সে। যে আধারে সন্তানের জন্ম হয়, তাহাকে "পো—নাড়ী," জরায়ু, গর্ভাশয়, ইউটারাস্ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। আমাদিগের মুখের ভিতরে যেমন লাল রঙের চামড়া আছে, পো-নাড়ীর ভিতরেও ঠিক্ সেই রকমের কোমল লাল রঙের চামড়া আছে। প্রত্যেক ২৮ দিন অন্তর (অর্থাৎ চান্দ্র মাসের শেষে) ঐ পো-নাড়ীর চামড়ার খোলসটি বদল হয়। যতকাল, রমণীর পক্ষে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা সম্ভবপর হয় (অর্থাৎ গড়ে ১২।১৪ বৎসর বয়স হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত), ততদিন প্রত্যেক চান্দ্র মাসান্তে (অর্থাৎ, গড়ে ২৮ দিনের মাথায়) ঐ পো নাড়ীর রীতিমত খোলসটি বদল হয়। প্রত্যেকবার খোলস বদলের সঙ্গে, চারিদিন ধরিয়া ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই যে ২৮ দিন অন্তর ৪ দিন ধরিয়া পো-নাড়ী হইতে রক্তস্রাব হয়, ইহাকে "ঋতু" আর্ত্তব, শোণিত, মাসিক, মাসকাবারি, মাথামমলা, মাহিনা, লৌ, মেদ্সেজ, মেনষ্ট্রয়েসন, কোর্স, পিরিয়াড প্রভৃতি নামে বলা হয়। ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব। মেয়েরা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হইলে, তাহাদিগের ঋতু

থাকে, তাহাদের স্তন বড় হয়, তাহাদিগের ভাব খুব বাড়ে, এবং সেই সঙ্গে দেহটাও হঠাৎ সুশ্রী ও পুষ্ট হইতে থাকে। যে বয়সে (১২-১৫) লক্ষণগুলি আরম্ভ হয়, তাহাকে Age of puberty বলে।

বালকদিগের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা আগমন কালে, কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। তাহারা হঠাৎ লম্বে বাড়ে, তাহাদের গলার স্বর মোটা হয়, গোঁফ্-দাঁড়ির রেখা দেখা দেয়, তাহাদের স্বভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হয়—কেহ গম্ভীর হয়, কেহ অতিশয় চঞ্চল হয়, কেহ কোপন স্বভাব হয়, ইত্যাদি। বালকদিগের এই কালকেও (১৪-১৬) যৌবনের আরম্ভকাল বা Age of puberty বলে।

বালক ও বালিকাদিগের কত বয়সে কি কি লক্ষণ হইলে, তাহারা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম-হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে এই সার্টিফিকেট পায়, তাহা বলিলাম; এবং আরো বলিয়াছি যে, প্রকৃতি সার্টিফিকেট দিলেও, তোমরা পূরা কাযের লায়েক তখনি-তখনি হইতে পার না। আমাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তারি করিবার সার্টিফিকেট দিবার অন্ততঃ পনর বৎসর পরে তবে আমাদিগের প্রকৃত ডাক্তারি করিবার একটু একটু ক্ষমতা জন্মে। সেই জন্য বলি—সাবধান, খুব সাবধান, আগুণ লইয়া খেলা করিও না—

সংযম অভ্যাস কর।

(৯)

যে কোনও বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে, তাহার দুইটি দিকই সমান যত্ন করিয়া শিখিতে হয়। প্রথম দিক—সেই শিক্ষিতব্য বিষয়ের স্বাভাবিক পরিণতি; দ্বিতীয় দিক—তাহার বিপরীত আচরণের ফল, অর্থাৎ অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল। আমরা এই দুইটিই শিখাইব। এইখানে প্রথমে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলিব।

আমাদের দেহের মধ্যে, ছয়টি কায করিবার জন্য, ছয়টি প্রধান যন্ত্র-"তন্ত্র" (তন্ত্র—system) আছে। একটি তন্ত্র সুধু শ্বাস প্রশ্বাস কায লইয়াই আছে। একটি তন্ত্রের কায, রক্ত চলাচল কার্য্য সাধন করা। তৃতীয় তন্ত্রটি পরিপাক-ক্রিয়া লইয়া আছে। চতুর্থ তন্ত্র জ্ঞান ও দৈহিক চলন চালনা লইয়া থাকে; পঞ্চম তন্ত্রটি শারীরিক ক্লেদ নিষ্কাশনে ব্যস্ত; এবং ষষ্ঠ তন্ত্রটি জনন-কার্য্যের জন্য। এইখানে একটু বলিবার কথা আছে। শ্বাস-কার্য্য, রক্ত চলাচল কার্য্য, পরিপাক ক্রিয়া—এ গুলি শুনিতে ও বিচার করিতে গেলে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে লইয়া বিচার করিতে হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা "কথামালার" "উদর ও অন্যান্য অবয়ব" গল্পটি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, এই দেহের কোনও একটি অংশ দেহের অপর অংশ হইতে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবে কায করে না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ—সবই দেখিতে ও বিচার করিতে আলাদা হইলেও, একের অভাবে বা একের পীড়ায়, অপরের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব। যদি কোনও কারণে, আমাদের শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তবে পরিপাক যন্ত্র, রক্ত-চলাচল যন্ত্র, যতই সুস্থ থাকুক না কেন, কেহই কিছু করিতে পারে না—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি কোনও কারণে পরিপাক শক্তি একেবারে বন্ধ হয়, তবে দু'দিনে হউক, দশদিনে হউক, অপর সকল যন্ত্রই নিস্তেজ হইয়া মৃত্যু ঘটায়। বেশী কথায় কায কি, যদি কোনও দিন অতি ভোজন করা যায়, তবে বেশী ভোজনের দরুণ শরীরে বেশী জোর না হইয়া, বরং সেদিন শরীর এমন নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, রাতদিন ঘুম পায়, শরীরে আলস্য আসে, কাযে অনিচ্ছা ঘটে। পাঁচদিন যদি মলত্যাগ না ঘটে, তবে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি কোথায় চলিয়া যায়, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে, শরীরে অত্যন্ত আলস্য আসে।

মানুষের বেলায় সকল কায করা যায় না বলিয়া, জন্তু জানোয়ার হইতে আরো দু'চারটা দৃষ্টান্ত দিব।

৪। আত্মসম্মানবোধ ও দেশাত্মবোধ জন্মায়, এমন পথে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রকৃতি দত্ত নিজ হাত-পা প্রভৃতি সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহাতে সজাগ ও সক্ষম হইয়া উঠে এবং মনের ও চিত্তের বৃত্তিগুলি যাহাতে স্ফূর্ত্তি পায়, এইরূপে প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষ করিয়া, শিক্ষা দিতে হইবে।

৫। শয্যাসঙ্গিনী বধূ না আনিয়া, ভাবী বংশের জননী হইবার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বধূ আনিতে হইবে।

(৮)

এক্ষণে, যুবকগণের কর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবের জন্ম, মানবকে জন্ম দিবার জন্য। মানবের কত বয়সে, কম পক্ষে মানবকে জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়? সাধারণতঃ, মেয়েদিগের বেলায়, এ দেশে, বারো বর্ষে ও বালকদিগের বেলায়, চৌদ্দ-পনর বৎসরের পরে—গড়ে ১৯।২০ বৎসর বয়সে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'মেয়েদের ১২, আর ছেলেদের ১৪।১৫ বৎসর বয়সের পরে ছেলে জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়" বলিলে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পৃথিবীতে ঐ নিয়ম সকলেরই বেলায় সমানে খাটে। তাহার চেয়েও বেশী যত্ন করিয়া মনে রাখা দরকার এই যে, যদিও কোনও বালিকার ১২ বৎসর বয়সে, ও বালকের ১৪।১৫ বৎসর বয়সে, ঐ ক্ষমতা জন্মায়, তবে সেই নির্দ্দেশ মত তাহারা যদি কায করিতে যায়, তবে উভয়েরই অল্প বয়স হইতে শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং উভয়েই স্বল্পায়ু হইবে। যে সকল ঘোড়া বা বলদ গাড়ী টানে, তাহাদিগকে কখনো ঘোটকী বা গরুর সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া হয় না—এমন কি বেশী বয়সে, একদিনেরও জন্য নয়—কারণ, ঐ একদিনের সংসর্গের ফলে, ঐ জানোয়ারেরা হীনবল হইয়া পড়ে। যদি মানুষের চেয়ে বিশগুণ বলিষ্ঠ গরু ঘোড়ার বেলায় এ কথা সত্য হয়, তবে দুর্ব্বল মানুষের বেলায় ঐ কাঁচা বয়সে (১২—১৫) বীর্য্যপাত করিলে, শুধু দেহ কেন, আয়ুও ক্ষয় হইয়া যাইবেই। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়স না হইলে, আমাদিগের দেহের সমস্ত হাড় শক্ত হয় না। নিজে শক্ত না হইয়া, জীবের জন্ম দিতে গেলে, নিজেরও সর্ব্বনাশ, ভাবী সন্তানেরও সর্ব্বনাশ—চির রুগ্ন অল্পায়ু ছেলেকে লইয়া আজীবন কষ্ট পাইতে হয়। এখানে তাহা হইলে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে;—প্রথম, বালিকারা ১২ ও বালকেরা ১৪।১৫ বৎসরের পরে সন্তানোৎপাদন করিতে পারে। দ্বিতীয়, —উক্ত কথাটি লিখিত—পঠিত ভাষায় ঠিক হইলেও, বালিকাদিগের ১৮।১৯ বৎসর ও বালকদিগের ২৪।২৫ বৎসর বয়স না হইলে, কখনো পুত্রোৎপাদনে উদ্যত হইতে নাই।

আমরা কেমন করিয়া জানিলাম যে, বালিকাদের ১২ বৎসর বয়সের পরে ও বালকদিগের ১৪।১৫ বৎসর বয়সের পরে ঐ ক্ষমতা জন্মায়? আমরা প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে ঐটি টের পাই।

বালিকাদিগের "ঋতু" আরম্ভ হয় ১২।১৪ বৎসর বয়সে। যে আধারে সন্তানের জন্ম হয়, তাহাকে "পো—নাড়ী," জরায়ু, গর্ভাশয়, ইউটারাস্ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। আমাদিগের মুখের ভিতরে যেমন লাল রঙের চামড়া আছে, পো-নাড়ীর ভিতরেও ঠিক্ সেই রকমের কোমল লাল রঙের চামড়া আছে। প্রত্যেক ২৮ দিন অন্তর (অর্থাৎ চান্দ্র মাসের শেষে) ঐ পো-নাড়ীর চামড়ার খোলসটি বদল হয়। যতকাল, রমণীর পক্ষে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা সম্ভবপর হয় (অর্থাৎ গড়ে ১২।১৪ বৎসর বয়স হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত), ততদিন প্রত্যেক চান্দ্র মাসান্তে (অর্থাৎ, গড়ে ২৮ দিনের মাথায়) ঐ পো নাড়ীর রীতিমত খোলসটি বদল হয়। প্রত্যেকবার খোলস বদলের সঙ্গে, চারিদিন ধরিয়া ঐ স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই যে ২৮ দিন অন্তর ৪ দিন ধরিয়া পো-নাড়ী হইতে রক্তস্রাব হয়, ইহাকে "ঋতু" আর্ত্তব, শোণিত, মাসিক, মাসকাবারি, মাথাময়লা, মাহিনা, লো, মেদ্‌সেজ, মেনষ্ট্রুয়েসন, কোর্স, পিরিয়ড, প্রভৃতি নামে বলা হয়। ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব। মেয়েরা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হইলে, তাহাদিগের ঋতু

[আর]ম্ভ হইতে থাকে, তাহাদের স্তন বড় হয়, তাহাদিগের [লজ্জা]র ভাব খুব বাড়ে, এবং সেই সঙ্গে দেহটাও হঠাৎ [বেশ] সুশ্রী ও পুষ্ট হইতে থাকে। যে বয়সে (১২-১৫) [এই] লক্ষণগুলি আরম্ভ হয়, তাহাকে Age of puberty [ব]লে।

বালকদিগের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা আগমন [কা]লে, কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। তাহারা হঠাৎ লম্বে [বা]ড়ে, তাহাদের গলার স্বর মোটা হয়, গোঁফ্-দাঁড়ির [রে]খা দেখা দেয়, তাহাদের স্বভাবের আকস্মিক [প]রিবর্ত্তন হয়—কেহ গম্ভীর হয়, কেহ অতিশয় চঞ্চল হয়, [কে]হ কোপন স্বভাব হয়, ইত্যাদি। বালকদিগের এই [বয়]সকেও (১৪-১৬) যৌবনের আরম্ভকাল বা Age of puberty বলে।

বালক ও বালিকাদিগের কত বয়সে কি কি [ল]ক্ষণ হইলে, তাহারা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে [ব]লিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে এই সার্টিফিকেট পায়, [ত]াহা বলিলাম; এবং আরো বলিয়াছি যে, প্রকৃতি [সা]র্টিফিকেট দিলেও, তোমরা পূরা কাযের লায়েক [য]খনি-তখনি হইতে পার না। আমাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় [ডা]ক্তারি করিবার সার্টিফিকেট দিবার অন্ততঃ পনর বৎসর পরে তবে আমাদিগের প্রকৃত ডাক্তারি করিবার একটু একটু ক্ষমতা জন্মে। সেই জন্য বলি—সাবধান, খুব সাবধান, আগুন লইয়া খেলা করিও না—

সংযম অভ্যাস কর।

(৯)

যে কোনও বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে, তাহার দুইটি দিকই সমান যত্ন করিয়া শিখিতে হয়। প্রথম দিক—সেই শিক্ষিতব্য বিষয়ের স্বাভাবিক পরিণতি; দ্বিতীয় দিক—তাহার বিপরীত আচরণের ফল, অর্থাৎ অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফল। আমরা এই দুইটিই শিখাইব। এইখানে প্রথমে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলিব।

আমাদের দেহের মধ্যে, ছয়টি কায করিবার জন্য, ছয়টি প্রধান যন্ত্র-"তন্ত্র" (তন্ত্র—system) আছে। একটি তন্ত্র সুধু শ্বাস প্রশ্বাস কায লইয়াই আছে। একটি তন্ত্রের কায, রক্ত চলাচল কার্য্য সাধন করা। তৃতীয় তন্ত্রটি পরিপাক-ক্রিয়া লইয়া আছে। চতুর্থ তন্ত্র জ্ঞান ও দৈহিক চলন চালনা লইয়া থাকে; পঞ্চম তন্ত্রটি শারীরিক ক্লেদ নিষ্কাশনে ব্যস্ত; এবং ষষ্ঠ তন্ত্রটি জনন-কার্য্যের জন্য। এইখানে একটু বলিবার কথা আছে। শ্বাস-কার্য্য, রক্ত চলাচল কার্য্য, পরিপাক ক্রিয়া—এ গুলি শুনিতে ও বিচার করিতে গেলে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে লইয়া বিচার করিতে হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা "কথামালার" "উদর ও অন্যান্য অবয়ব" গল্পটি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, এই দেহের কোনও একটি অংশ দেহের অপর অংশ হইতে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবে কায করে না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ—সবই দেখিতে ও বিচার করিতে আলাদা হইলেও, একের অভাবে বা একের পীড়ায়, অপরের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব। যদি কোনও কারণে, আমাদের শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, তবে পরিপাক যন্ত্র, রক্ত-চলাচল যন্ত্র, যতই সুস্থ থাকুক না কেন, কেহই কিছু করিতে পারে না—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি কোনও কারণে পরিপাক শক্তি একেবারে বন্ধ হয়, তবে দু'দিনে হউক, দশদিনে হউক, অপর সকল যন্ত্রই নিস্তেজ হইয়া মৃত্যু ঘটায়। বেশী কথায় কায কি, যদি কোনও দিন অতি ভোজন করা যায়, তবে বেশী ভোজনের দরুণ শরীরে বেশী জোর না হইয়া, বরং সেদিন শরীর এমন নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, রাতদিন ঘুম পায়, শরীরে আলস্য আসে, কাযে অনিচ্ছা ঘটে। পাঁচদিন যদি মলত্যাগ না ঘটে, তবে ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি কোথায় চলিয়া যায়, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, মাথা ঘোরে, বুক ধড়ফড় করে, শরীরে অত্যন্ত আলস্য আসে।

মানুষের বেলায় সকল কায করা যায় না বলিয়া, জন্তু জানোয়ার হইতে আরো দু'চারটা দৃষ্টান্ত দিব।

পুং-জাতীয় জন্তুদিগকে যদি শৈশব হইতে আলাদা রাখা যায়, তবে তাহাদের সামর্থ্য খুব বাড়ে, তাহারা খুব তেজাল হয় ও দুষ্ট হইতে পারে। যে সকল পুং জাতীয় ঘোড়াকে গাড়ী টানান কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহাদের অণ্ডকোষ যদি আস্ত থাকে, এবং সে সকল ঘোটক যদি কখনো কোন ঘোটকীকে স্পর্শ না করিতে পায়, তবে তাহারা যেমন তেজাল তেমনি সহিষ্ণু হয়। অতিমাত্রা তেজের ফলে, তাহারা কখনো দুষ্টও হইয়া থাকে। যদি সেই সকল ঘোটকের অণ্ডকোষ কাটিয়া দেওয়া হয় ("আক্তা করা" হয়) এবং তাহারা কখনো কোনও ঘোটকীকে স্পর্শ না করিয়া থাকে, তবে তাহাদের তেজ, শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা কিছুই কমে না, কিন্তু তাহাদের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গাড়ীটানা ঘোড়া বা ষাঁড়কে স্ত্রী-সংসর্গ করিতে দিলে, তাহারা আর তেমন তেজাল, শ্রমশীল বা সহিষ্ণু থাকে না।

এখন তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে,—

(১) শরীর মধ্যে ছয়টি প্রধান তন্ত্র (systems) থাকিলেও, তাহারা পরস্পর পরস্পর সাপেক্ষ; কেহই স্ব স্ব প্রধান নয়।

(২) স্ত্রী সংসর্গ করিলে জন্তুদিগের কার্য্যকারিতা কমিয়া আসে। এই শেষের কথাটি সকল দেশের পালোয়ানেরাই জানেন। পালোয়ান, কুস্তিগীর, প্রভৃতি ব্যক্তিরা অধিকাংশই অবিবাহিত থাকিয়া যান।

(১০)

"ভগবানই যখন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন যে, অল্প বয়স হইলেও, সেই কাঁচা বয়সেই (বালকদিগের বেলায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সে) আমাদিগের সন্তানোৎপাদন করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তখন, হইলেই বা ডাক্তার, খোদার উপর খোদকারী করিবার তোমার কি অধিকার আছে? তুমি কি ভগবানের চেয়ে বড়?" কেহ হয় ত এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইহার উত্তরে আমি বলি—খোদার উপরে খোদকারী করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না; তবে, ভগবান্ মানুষকে বুদ্ধি-বিবেক বলিয়া যে জ্ঞানটি দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি-বিবেকেরই পরিচালনা করিয়া বলি, কিছুকাল সবুর কর। কারণ শুন।—

প্রথমতঃ—মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা—সর্ব্বাংশে সু-সন্তানের জন্ম দেওয়া। চরম পরীক্ষা, খেলা করিতে করিতে দেওয়া চলে না। বহুদিন তপস্যা, বহু আরাধনা, কঠোর সংযম দ্বারা দেহ ও মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া লইয়া, তবে সন্তানোৎপাদন কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়। বাস্তবিক সুসন্তানের জন্ম দিবার আজীবন ব্রত গ্রহণ করিয়া, বেশ পরিণত বয়সে, যখন নিজ দেহ ও নিজ মন সর্ব্বাংশে সুস্থ ও পবিত্র বোধ হইবে, তখন সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে পরম উপাদেয় ব্যবস্থা আছে। আজকাল অহমিকার বশে আমরা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজ নিজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ—এই একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই মানবদেহে যে কোনও যন্ত্র-তন্ত্র অপর সকল যন্ত্র-তন্ত্রের উপরে বিশিষ্ট ভাবে কায করে। জননেন্দ্রিয়ের বিষয়ে এই কথাটি খুবই খাটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অণ্ডকোষে বীর্য্যের সৃষ্টি হয়। এই অণ্ডকোষ যদি কাটিয়া ফেলা হয়—অর্থাৎ বীর্য্য সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লোপ করা হয়, তবে যে পশুর তাহা করা হয়, সে মৃদু স্বভাব হয়, তাহার চেহারা স্ত্রীজাতীয়ের ন্যায় হয়—আবার যে রমণীদের আদৌ ছেলেপুলে হয় না, তাহাদের গোফের রেখা দেখা দেয়, তাহাদের মেজাজ রুক্ষ হয়।

যাহারা ঊর্দ্ধরেতা তাঁহাদের আয়ু, মেধা, স্মৃতিশক্তি, দেহের লাবণ্য, শারীরিক সামর্থ্য—সমস্তই বাড়িয়া যায়। আর যাহারা অতিশয় বীর্য্যপাত করে তাহারা অল্পায়ু, রুগ্ন অকাল বৃদ্ধ, হয় এবং তাহাদের দৈহিক ও মানসিক অপক্কতাই ঘটিয়া থাকে। এমন যে জিনিষ (বীর্য্য)—যাহা রাখিলে দেহ ও মন উন্নতির পথে যায়, এবং যাহা নষ্ট করিলে, দেহ মন কিছুই ঠিকমত গড়িয়া উঠিতে পায় না,—সে জিনিষ নষ্ট না করাই

বুদ্ধিমানের কায। সারাজীবন পেটে ভাল করিয়া না খাইয়া, কত লাঞ্ছনা কত তিরস্কার খাইয়া পয়সা জমাও—কাহার জন্য? প্রাণের অপেক্ষা যাহাকে ভালবাস, সেই ছেলেরই জন্য ত? আজীবন কষ্ট স্বীকার কর যাহাতে ছেলে সুখে থাকিবে। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, পয়সা ও বীর্য্য, কোন্‌টি তোমার ছেলের পক্ষে ভাল? যত ঊর্দ্ধরেতা থাকিবে (অর্থাৎ যত বীর্য্য তুলিয়া রাখিবে) ছেলেকে ততই সুন্দর পবিত্র দেহ, মন ও অপরিমেয় স্বাস্থ্য দিতে পারিবে। কৈ সেদিকে নজর কৈ? তোমার পয়সা ভগ্ন স্বাস্থ্য ছেলেকে স্বাস্থ্য দিবে না; পয়সা তাহাকে আয়ু কিনিয়া দিতে পারিবে না; পয়সা তাহাকে মেধা দিবে না, কিন্তু আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া যে ছেলের জন্মদান করিবে—সে ছেলের আয়ু, মেধা, স্বাস্থ্য, রূপ, জয় ও যশ—অপ্রমেয় হইবে। ছেলের জন্য ইহা অপেক্ষা মূল্যবান আর কি দিবে?

তৃতীয়তঃ, তুমি যদি কামাতুর বা অসংযমী হও, তুমি যদি একটা ভোগের অধিকার পাইয়াছ বলিয়া ষোল আনা তাহা উশুল করিয়া লইতে চাও, তবে তোমার যে সন্তান হইবে, সেও অসংযমী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। পিতামাতার মনে যে যে প্রধান ঝোঁকগুলি থাকে, প্রায় সে সকলগুলিই সন্তানে বর্ত্তে। বোধ হয়, মায়ের মনের ঝোঁকটাই বেশী করিয়া সন্তানেরা পায় বলিয়াই, "নরানাং মাতুল-ক্রমঃ" এই কথাটার উৎপত্তি। কাযেই পিতামাতার সন্তানের মনের গতির উপরে আধিপত্য ও দায়িত্ব গুরু। এ দায়িত্ব বুঝিয়া কায করা চাই—নতুবা ভবিষ্যৎ জীবনে নিজকেই ভুগিতে হয়। এমন অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, পিতা ঋষিতুল্য, পিতা পরম ধার্ম্মিক, পিতা সদাচারী—কিন্তু মাতার স্বভাব কিছু রুক্ষ বিধায়ে, সমস্ত সন্তানগুলিই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থতঃ, সন্তান ও সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া, স্বার্থপর ভাবে শুধু নিজের দিক দিয়া দেখিলেও, অসংযমীদের যুক্তির অসার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। যত ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, তত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হইতে পারে, তত রোগের আক্রমণ হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায় এবং তত দীর্ঘায়ু হইতে পারা যায়। সামান্য দু'দণ্ডের ভোগের লোভে, আয়ুকে খাটো করা, শরীরকে ব্যাধি-মন্দির করা, মনের ও দেহের পুষ্টিকে নষ্ট করা বোকামির পরাকাষ্ঠা নয় কি?

ভোগের পিচ্ছিল-পথ মরণের দিকে!
ব্যাধি-ক্লেশ ভোগ সাথে তুলে দিই মুখে!
কামের অনলে সঁপি' বিবেক-ইন্ধন,
স্বেচ্ছা পশু হই, ত্যজি' মানবত্ব ধন!!!

পঞ্চমতঃ, যাহারা নস্য লয় না, তাহাদিগের নাকের গন্ধ লইবার ক্ষমতার লোপও হয় না, এবং তাহাদিগের নাকে অনবরত সর্দ্দিও গড়ায় না। যাহারা নস্য এক-আধদিনের জন্য লয়, তাহাদিগের তাৎকালিক উত্তেজনা ছাড়া, আর কিছুই বহুকালস্থায়ী অপকার হয় না—কিন্তু সে ক্ষণিক উত্তেজনার ফলে, সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁকানি দিয়া তবে একটা হাঁচি হয়। যাহারা বারম্বার নস্য লয়, তাহাদের ঘ্রাণশক্তি ও সেই সঙ্গে হয় ত শ্রবণশক্তিরও লোপ হয় এবং তাহারা নস্য ছাড়িয়া দিলেও, তাহাদিগের ঐ শক্তি দুটি আর ফিরে না, এবং নাক দিয়া অনবরত সর্দ্দি গড়ান কমে না। যদি নাকের উপরে সামান্য এই অত্যাচারের এত কুফল ফলে,—যে নাক অনবরত ঠাণ্ডা-গরম, ধূলা-ধোঁয়ার মাঝখানে আছে—তখন এই দেহের মধ্যে সেরা যন্ত্রের (জননেন্দ্রিয়ের) উপরে অকারণ অত্যাচারের কত বেশী ও কত দূর স্থায়ী কুফল হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। চোখ থাকিতে যদি আমরা না দেখি, বিবেককে যদি দুর্ব্বুদ্ধি চাপা দিই—তবে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। এই পৃথিবীতে সকলেই ক্ষমা করিতে পারে—কিন্তু প্রকৃতির ক্ষমা নাই, ভ্রান্তি নাই, আলস্য নাই—সুদ সমেত পাওনা তিনি আদায় করিবেনই করিবেন; তা—আজই হউক আর কালই হউক। রুগ্ন, দুর্ব্বল, শিশু, রমণী—কাহারো প্রতি প্রকৃতির দয়া নাই।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে কায করিলেই, তিনি নির্ম্মম হস্তে তাড়না করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাই লোকে কথায় বলে "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। একথা ভুলিলে চলিবে না।

তোমরা বুঝিয়াছ, কত বয়সে তোমাদের সন্তান জন্ম দিবার ক্ষমতা জন্মায়; এবং তোমরা এটাও বুঝিলে যে, ক্ষমতা পাইলেই তাহার চালনা করা গর্হিত কায। এ পৃথিবীতে সকল কায়েরই কাল আছে, সকল জীব জন্তুই সেই কালধর্ম্ম মানিয়া চলে; কিন্তু মানুষকে বুদ্ধি বিবেক দিয়াছেন বলিয়া, ভগবান মানুষকে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতাও দিয়াছেন। আমাদের কায, অতি যত্নে সকল দিক বিবেচনা করিয়া তবে এক পা অগ্রসর হওয়া।

তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের কর্ত্তব্য, লক্ষ্য স্থির রাখা—যে ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছিলেন। বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"অর্জ্জুন, তুমি কি দেখিতেছ?" বারবারই অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—"আমি মৎস্য-চক্ষের প্রতিবিম্ব ছাড়া এত বড় সভায় আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" যদি মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া, শ্রীভগবানের এই জগতের সেবা দ্বারা তাঁহাকে পাইতে চাও, তবে লক্ষ্য স্থির রাখিও—"সমাজকে উপযুক্ত সন্তান দান করাই মানুষের কর্ত্তব্য" সর্ব্বদাই এই কথা মত চলিও।

যদি মনে মনে এই মহৎ উদ্দেশ্যকে স্থির রাখিতে পার, যদি মনে মনে পূর্ণ যৌবন পর্য্যন্ত (৩৫ বৎসর বয়স) ঊর্দ্ধরেতা থাকিবার সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে পার, তবে যে যে কারণে সেই সংকল্পের ক্ষতি হইতে পারে, সেই সেই কারণগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা কর। সেগুলি করিবার উপায় এই এই :—

১। মনে রাখিবে—তুমি—শ্রীভগবানের অংশ. তুমি সদা সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের সম্মুখে থাকিয়া, তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহারই কায করিয়া যাইতেছ। তাহা হইলে কোনও হীন চিন্তা বা নীচ কায তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। "প্রতিদিন আমি, হে হৃদয় স্বামি, দাঁড়াবো তোমার সম্মুখে; করি যোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে!"

২। তুমি যে পিতামাতাকে এত ভালবাস ও ভক্তি কর, তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ বলিয়া ধারণা রাখিও। চিত্তের কিছু দুর্ব্বলতা ঘটিলেই, তাঁহাদিগের পবিত্র মুখ স্মরণ করিও, অতি কাতরভাবে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ মনে মনে ভিক্ষা করিও। আর সদা সর্ব্বদাই মনে সশঙ্কিত চিত্তে থাকিও—কেমন করিয়া দেবোপম পিতামাতার পবিত্র বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইবে। তোমার পক্ষে এটি অতি মহা গুরুভার—অতি বড় কর্ত্তব্যের দাবী।

৩। যাহাদেরই দেহ দুর্ব্বল, তাহাদেরই মন দুর্ব্বল হইবার কথা। কাযেই, দেহকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করিবে—এক দিনের জন্য নয়,—যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, প্রত্যহ। এই দুর্লভ মানব দেহ দ্বারাই শ্রীভগবানের সেবা করিতে হয়, দেবোপম পিতৃ পিতামহের বংশের ধারা রক্ষা করিতে হয়, দেশের ও দশের সেবা করিতে হয়। এত বড় গুরু ভার বহন করিতে হইলে, দেহকে তদুপযোগী করা এবং তদুপযোগী রাখা চাই। নিত্য, রীতিমত ভাবে (অর্থাৎ খেয়ালের বশে নহে, কঠোর কর্ত্তব্য বোধে) ব্যায়াম করিলে এবং আজীবন ধরিয়া কঠোর ভাবে এই সাধনা করিলে, শরীর দৃঢ় ও মন উন্নত থাকে, দেহে ব্যারাম হয় না, কর্ত্তব্যের ত্রুটি বা কামাই হয় না। এমন মজার কল এই দেহ, এমন মজার জিনিষ এই মন—যে ইহারা কেহই এক সেকেণ্ডের জন্যও স্থির থাকে না—ক্রমাগত নিম্নগামী হয় এবং সেই নীচ-গতির সময়ে, যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকে টানিয়া নীচুদিকে লইয়া যায়। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, অঙ্গচালনা ও মানসিক উন্নতি এই দুই কাযকে এক দিনের জন্য কামাই দিবে না—যে দিনটি কামাই দিয়াছ—সেই দিনটিই ইহারা তোমাকে পতনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। এই জন্য, ব্রত লইয়া, অঙ্গ চালনার কায ও মানসিক অনুশীলন

করিতে হইবে—এক মৃত্যুশয্যায় এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে পারে, তাহার আগে নয়। এই দুনিয়া অনবরত নীচের দিকে তোমাকে নীচে টানিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে—তাই তুমি অনবরত সব দিনই আপনাকে উপরের দিকে টানিয়া তুলিয়া রাখিতে সচেষ্ট হও—অন্য উপায় নাই।

৪। আহারের মত মিত্র এবং আহারের মত শত্রু আর নাই। মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, গরম-মসলা, বেশী-বেশী তেল-ঘি—এই সকলে শরীর গরম হয়, মন চঞ্চল হয়, সঙ্কল্প ও সংযমের বাঁধ শিথিল হয়। এসকল জিনিষ খাইও না। অতি ভোজন, গুরুপাক খাদ্য ভোজন, অধিক রাত্রে ভোজনও ত্যাজ্য। রসনা ও শিশ্নের সংযম ভীষণ রকমে কঠিন। খুব সাদা-সিধা ও খুব সহজে হজম হয় এমন খাবার ছাড়া, কোনও খাবার স্পর্শ করিও না। একদিন পোলাও-কালিয়া খাইলে শরীরকে হায়রাণ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না! রসনাকে যত লোভ দেখাইবে সে ততই বেশী লুব্ধ হইয়া পড়িবে। আজীবন কত সোণা-দানা খাইয়াছ, —কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও কি খাবার লোভ ছাড়িতে পারিয়াছ? তাই বলিতেছিলাম যে, অল্প বয়স হইতেই, রসনাকে জব্দ করিতে শিখ। কোনও দিনই তাহার বশে যাইও না। পেট সর্ব্বস্ব ইংরাজ-গুরুর ডাক্তারী গ্রন্থ পড়িয়া আমরা আজ "পুষ্টির" মহা সমস্যায় দেশকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছি। মাংস, ডিম না খাইলে, দুধ সর না খাইলে, ঘায় বুঝি দেহ!—বাঙ্গালী গো-খাদক নয় বলিয়াই বুঝি যাবতীয় গো-খাদক জাতি তাহার উপরে আজ আধিপত্য করিতেছে—এমন সুযুক্তিরাশি শুনিতে শুনিতে বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু যে বলিষ্ঠ কৃষক, যে বলিষ্ঠ ভারবাহী (মুটে) ব্যক্তি সুধু বরণ টিপিয়া ভাত খাইতেছে, তাহার পুষ্টি আসে কোথা হইতে? আমাদিগের যে পূর্ব্বপুরুষেরা দীর্ঘায়ু, নীরোগ, সবল ও উন্নতকায় হইতেন, সে কত মাংস দুগ্ধ পান করিয়া হইতেন? ভোগ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য প্রভুদের "হুক্কা-হুয়া" রব ভুলিয়া যাও—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া, সংযমের পথে অগ্রসর হও। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর চার্লস্ এলিয়ট সাহেব হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রদের বাবুয়ানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"Students should lead ascetic lives" (ছাত্রদিগের যতির ন্যায় সংযমের জীবন যাপন করা উচিত)। এ কথাটিই ঠিক। রসনা ও শিশ্নকে প্রাণপণে চাপিয়া ধর।—সর্ব্বদাই এই দুইটির বিষয়ে ভাবিবে, যেন কেউটে সাপের মস্তকে পা দিয়া রাখিয়াছ—সে বিষধর প্রাণপণে তোমার পা'কে জড়াইয়া ধরিয়া অবসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে—আর তুমি পা তুলিলেই তোমাকে ছোবল মারিবে—সাবধান,—খুব সাবধান!!!

(৫) আহারের সঙ্গে পোষাকের বিষয়েও সংযম চাই। বেশী কতকগুলা কাপড়-চোপড় পরিলে, শরীর গরম হয়। এদেশে সাহেবদিগের কাছে তুচ্ছ আদর পাইবার আশায়, অথবা, রেল, ষ্টীমার বা আপিষে তুচ্ছ সুবিধা পাইবার লোভে, লোক সাহেবির মর্কটামি করে, তাহা অতি ভুল। শীত পড়িতে না পড়িতেই দশটা ওভারকোট জড়ান অতি ভুল। আমি অতি দারুণ শীতেও দেখিয়াছি যে, একটা সুতির পিরাণ ও যেমন-তেমন ব্যাপার গায়ে দিয়া, খুব আরামে থাকা যায়। আর আজকাল বড়মানুষী দেখাইবার জন্য, অনর্থক কতকগুলি সোয়েটার, মাফলার, ওভারকোট প্রভৃতিতে জড়াইয়া একদিকে দেশকে যেমন দীন করিতেছি তেমনি অন্যদিকে দেহকেও শীতাতপ অসহিষ্ণু (অর্থাৎ অসংযত) করিয়া তুলিতেছি। বাল্য বয়স হইতে শরীরকে শীতাতপের ক্লেশ সহিষ্ণু করা সকলেরই উচিত। কৈ, সাহেবেরা ত কখনো অতি গ্রীষ্মে ধুতি, চাদর পরেন না? আর আমরা, ঘরের পয়সা সুধু-সুধু তাহাদের ঘরে তুলিয়া দিতেছি কেন?

(৬) শয়ন ও শয্যা।—দিবানিদ্রা, সময়ে-অসময়ে নিদ্রা, রাত্রিকালে অধিকক্ষণ ধরিয়া (৬ঘণ্টার বেশী)

নিদ্রা, অকারণ রাত্রি জাগরণ, সূর্য্যোদয়ের পরেও নিদ্রা যাওয়া, অনিয়মিত কালে নিদ্রা যাওয়া—এসবগুলিই দোষের। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে (৯।১০টায় শয়ন করিয়া, অতি প্রত্যুষেই) শয্যাত্যাগ করিতে হয়। খুব নরম শয্যায় শয়ন করিতে নাই। শয্যা কঠিন হইলেই মঙ্গল।

(৭) শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল না থাকিলে, প্রত্যহ শীতে-গ্রীষ্মে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবে। মাসে অন্ততঃ দুইটি উপবাস করিবে—রুটি, লুচি, ক্ষীর, সর খাইয়া নহে—একবেলা নির্জ্জলা, অপর বেলায় সামান্য ফল মূল খাইয়া। উপবাসের মত, কাম জয় করিবার ও শরীরের দোষ দূর করিবার অপর উপায় খুব কমই আছে।

(৮) অহর্নিশ স্মরণ রাখিবে—

(ক) এ দেহ ভগবানের শ্রীমন্দির।

(খ) ভগবানের প্রীতির জন্যই (নিজ সুখের বা তৃপ্তির জন্য নহে) সকল কায করিতেছি এরূপ মনে রাখিতে হইবে।

"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম।"

(১১)

"এত অল্প বয়স হইতে কি রাতদিন "ভগবান্, ভগবান" করিতে ভাল লাগে? যখন বুড়া হইব, তখন দেখা যাইবে। এখন এ দুনিয়ার কায করি, পয়সা আনি, পরে,—ভগবানের কথা দেখা যাইবে"—অনেকে হয় ত এই কথা বলিয়া বসিবে। আমি তাহা জানি।

প্রথমে, বয়সের কথা ধরা যাউক। আজ তোমার বয়স অল্প বলিয়া, তুমি বুড়ো কালের জন্য হরিনাম করিবার কথা বলিতেছ। যদি তুমি কাল মরিয়া যাও, তবে বুড়োকাল কবে পাইবে? সেই জন্যই বলা হয়—"অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো, বিলম্বং কিং করিষ্যতি?" যে'টা করা উচিত, বা যেটা করিতেই হইবে, তাহা এখনিই কর—কি জানি যদি কাল সময় না পাও? এখন যদি মনে আসে, ত সীতাহরণ (মন্দকাযটা) খুব চট্ করিয়া হইয়া যায়, কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি গড়ার সৎ কার্য্যের প্রথম ধাপটাও গাঁথা কিছুতেই হয় না। দীর্ঘসূত্রীদিগের সকল কাযেই এমনটি হয়।

দ্বিতীয় কথা—"ভোগ করিবার পরে ত্যাগ আসে", এইরূপ কথা অনেক ভোগবিলাসীর মুখে শুনা যায়। কিন্তু সেটা সত্য কাহার পক্ষে? যে ত্যাগ করিবে বলিয়া দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরলক্ষ্য হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পক্ষে সামান্য ভোগের পরে ত্যাগ আসিবার সম্ভাবনা। ভোগের পিচ্ছিল পথে যাইলে, তোমার-আমার পক্ষে, নিস্তার নাই। বরং গোড়া হইতেই ভোগের আস্বাদ না করা ভাল। সারা জীবন ধরিয়া কত কি খাইয়াছ, কৈ খাইবার বাসনা কি এতটুকুও কমিয়াছে? তোমার-আমার পক্ষে, ভোগের পর ত্যাগের কল্পনা মিথ্যা দুরাশা। তাহা ছাড়া, ধর তুমি ভোগ করিবেই;—কি ভোগ করিবে? সমস্ত পৃথিবীটাকে তোমার মুঠার মধ্যে আনিয়া দিলেও তুমি তৃপ্তি পাইবে কি? তাই বলিতেছি, স্বাদ পাইবার আগেই, বীরের মত ভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব দেখাও—মানুষের মত খাড়া হইয়া সমাজের সম্মুখে দাঁড়াও।

তৃতীয়তঃ—"তুমি বলিয়াছ, পয়সা রোজগার না করিলে, খাব কি?" বেশ কথা। পয়সা রোজগার কর—কেহ বাধা দিতেছে না। কিন্তু পয়সা রোজগার করিবার নেশায় মাতিও না। আপনার ভোগ বিলাসের জন্য পয়সা কুড়াইও না—পরার্থে, শ্রীভগবানেরই নাম করিয়া, তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য পয়সা রোজগার কর। কিন্তু স্বার্থের বা পরার্থের জন্য, যে জন্যই হউক, পয়সা রোজগার করিতে করিতে, কি তাঁহার নাম, তাঁহার ধ্যান, তাঁহাকে মনন করা যায় না? "যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?"

চতুর্থতঃ—আমাদের জাতির দোষ দাঁড়াইয়াছে—আমরা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট। কি করিতেছি, কেন করিতেছি, তাহা আমরা সকল সময়ে ভাবিয়া দেখি না। ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই ভাবেই আমরা

...ই কায করিয়া পরে ভাবি; ভাবিয়া চিন্তিয়া সকল ...করি না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ, এত ...। আমাদিগকে লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে—অন্তরে ...রে স্বরাট হইবার চেষ্টা করিতে হইবে—তবে ...দিগের মঙ্গল হইবে। আমরা এই দেহ, ও এই ... লইয়া এত উন্মত্ত যে, এক দণ্ডও ভাবিয়া দেখি ...—যাঁহাকে ভগবান বলি তিনি কে ও কোথায়? ...হিন্দু শিক্ষা দেন যে, ভগবান আমা হইতে স্বতন্ত্র ...—God সকল জিনিষের কারণ। কিন্তু হিন্দু বলেন, ...হা নয়;—হিন্দু বলেন ভগবান তোমার কারণ নন, ...আমার উপাদান—তুমিই ভগবানের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ...বান আপনার আধারে আপনি আধেয়রূপে ...ছেন। বাস্তবিকই ত তাই। রোজ রাত্রে যখন আমরা ...ই—তখন এক রকম মৃত্যুরই মত অবস্থা প্রাপ্ত হই। ..., বা কোন্ মহাশক্তি, "আমার" (দেহের) ...চৈতন্য অবস্থায়, চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, ...আমাকে" (আমার এই দেহকে) রক্ষা করেন এবং ...তে আমার (দেহের) চেতনার মধ্যে লীন হইয়া যান? ...নি বাহিরের কোনও "কারণ" শক্তি নন, তিনি ...ই মানবাত্মারই "উপাদান" শক্তি। এ কথা ভুলিয়া ...ই কেন? এই দেহের মধ্যে যে মহাচৈতন্য আছেন, ...হাকে না জানিয়া, বহির্জগতের সকল জিনিষ লইয়া ...ত উন্মত্ত থাকি কেন? এটা কি বোকামি নয়? এ ...থিবীতে, আমার এই দেহ অপেক্ষা আর কাহাকে ...মি বেশী ভালবাসি? কাহাকেও নয়। পুত্র, কন্যা, ...—পৃথিবীর কেহই আমা অপেক্ষা আমার নিকটে ...র নয়। অথচ আমার এই দেহের মধ্যে যে চৈতন্য-...ক্তি সর্ব্বদা রহিয়াছেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আমার আপন, ...হাকে ফেলিয়া, আর কোন্ কায, কোন্ চিন্তা ...মার কাছে বড়? এই মোটা কথাটা ধরিতে ...রিলেই, সকল গোল মিটিয়া যায়।

(১২)

"তোমার সব কথা বুঝিলাম, তোমার সকল ...মত কায করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু যে পাপ শরীরে ঢুকাইয়াছি—সেই স্বপ্নদোষের জ্বালায় যে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তাহার প্রতিকারের কোনও উপায় বলিতে পার?"

বেশ কথা;—তবে স্বপ্নদোষ কি, কেন হয় ও কিসে যায়—এইবার সেই কথার আলোচনা করিব।

যে লোক কখনো মাছ খায় নাই, তাহার মাছ খাইবার ইচ্ছা ত হয়ই না—পরন্তু তাহাকে মাছ খাওয়াইতে গেলে, প্রথম-প্রথম, হয় ত সে বমি করিয়া ফেলে; কিন্তু কিছুদিন চেষ্টা করিয়া মাছ খাইলে, তখন আবার তাহার এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মাছ না খাইলে, সেদিন তাহার খাওয়া ঠিক্ হয় না। অভ্যাসের এমনিই গুণ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের রক্তে বীর্য্যের "উপাদান" আছে, কিন্তু বীর্য্য অবস্থায় তৈয়ারি থাকে না। যে জিনিষ কোথাও তৈয়ারী থাকে, বলিবামাত্রেই তাহাকে পাওয়া যায়; কিন্তু, যাহা তৈয়ারী থাকে না, তাহা ত বলিবা মাত্রই পাইবার যো নাই। এই জন্য, যাহারা আজীবন বালব্রহ্মচারী বা ঊর্দ্ধরেতাঃ (অর্থাৎ জীবনে কখনো যাহাদিগের বীর্য্যপাত হয় নাই) তাহারা সে জিনিষের আস্বাদও জানে না, সে জিনিষের জন্য তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষাও নাই। কাযেই, এ জীবনে, কখনো তাহাদিগের স্বপ্নদোষ হয় নাই এবং হইবেও না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করিয়া, জোর করিয়া, দুর্ব্বুদ্ধির বশে বা কুপরামর্শের ফলে, অস্বাভাবিক উপায়ে পাঁচবার বীর্য্যপাত করিয়াছে, তাহারই "স্বপ্নদোষ" হয় এবং তাহা বারবার হইতেও থাকে। অভ্যাসের এমনিই গুণ—যে জিনিষটি পাঁচবার করিবে—পুনঃ পুনঃ সেই কায করিবার চেষ্টা ভিতর হইতে ঠেলিয়া আসিবে—বিশেষ করিয়া ঘুমের অবস্থায়। দেহের ঘুমের অবস্থায়, আমাদের মনও ঘুমায়।—এই মন, জাগ্রত অবস্থায়, আমাদের অনেক প্রবৃত্তিকে চাপিয়া রাখিতে পারে—ঘুমের অবস্থায়, যে কোনও কারণে, কাম প্রবৃত্তি জাগিলেই, বীর্য্যপতন ঘটিয়া থাকে। এই নিদ্রিতাবস্থায়, তোমার

নিদ্রা, অকারণ রাত্রি জাগরণ, সূর্য্যোদয়ের পরেও নিদ্রা যাওয়া, অনিয়মিত কালে নিদ্রা যাওয়া—এসবগুলিই দোষের। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে (৯।১০টায় শয়ন করিয়া, অতি প্রত্যূষেই) শয্যাত্যাগ করিতে হয়। খুব নরম শয্যায় শয়ন করিতে নাই। শয্যা কঠিন হইলেই মঙ্গল।

(৭) শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল না থাকিলে, প্রত্যহ শীতে-গ্রীষ্মে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবে। মাসে অন্ততঃ দুইটি উপবাস করিবে—রুটি, লুচি, ক্ষীর, সর খাইয়া নহে—একবেলা নির্জ্জলা, অপর বেলায় সামান্য ফল মূল খাইয়া। উপবাসের মত, কাম জয় করিবার ও শরীরের দোষ দূর করিবার অপর উপায় খুব কমই আছে।

(৮) অহর্নিশ স্মরণ রাখিবে—

(ক) এ দেহ ভগবানের শ্রীমন্দির।

(খ) ভগবানের প্রীতির জন্যই (নিজ সুখের বা তৃপ্তির জন্য নহে) সকল কায করিতেছি এরূপ মনে রাখিতে হইবে।

"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম।"

(১১)

"এত অল্প বয়স হইতে কি রাতদিন "ভগবান্, ভগবান" করিতে ভাল লাগে? যখন বুড়া হইব, তখন দেখা যাইবে। এখন এ দুনিয়ার কায করি, পয়সা আনি, পরে,—ভগবানের কথা দেখা যাইবে"—অনেকে হয় ত এই কথা বলিয়া বসিবে। আমি তাহা জানি।

প্রথমে, বয়সের কথা ধরা যাউক। আজ তোমার বয়স অল্প বলিয়া, তুমি বুড়ো কালের জন্য হরিনাম করিবার কথা বলিতেছ। যদি তুমি কাল মরিয়া যাও, তবে বুড়োকাল কবে পাইবে? সেই জন্যই বলা হয়—"অদ্যৈব কুরুযচ্ছ্রেয়ো, বিলম্বং কিং করিষ্যতি?" যে'টা করা উচিত, বা যেটা করিতেই হইবে, তাহা এখনিই কর—কি জানি যদি কাল সময় না পাও? এখন যদি মনে আসে, ত সীতাহরণ (মন্দকাযটা) খুব চট্ করিয়া হইয়া যায়, কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি গড়ার সৎ কার্য্যের প্রথম ধাপটাও গাঁথা কিছুতেই হয় না। দীর্ঘসূত্রীদিগের সকল কাযেই এমনটি হয়।

দ্বিতীয় কথা—"ভোগ করিবার পরে ত্যাগ আসে", এইরূপ কথা অনেক ভোগবিলাসীর মুখে শুনা যায়। কিন্তু সেটা সত্য কাহার পক্ষে? যে ত্যাগ করিবে বলিয়া দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরলক্ষ্য হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পক্ষে সামান্য ভোগের পরে ত্যাগ আসিবার সম্ভাবনা। ভোগের পিচ্ছিল পথে যাইলে, তোমার-আমার পক্ষে, নিস্তার নাই। বরং গোড়া হইতেই ভোগের আস্বাদ না করা ভাল। সারা জীবন ধরিয়া কত কি খাইয়াছ, কৈ খাইবার বাসনা কি এতটুকুও কমিয়াছে? তোমার-আমার পক্ষে, ভোগের পর ত্যাগের কল্পনা মিথ্যা দুরাশা। তাহা ছাড়া, ধর তুমি ভোগ করিবেই;—কি ভোগ করিবে? সমস্ত পৃথিবীটাকে তোমার মুঠার মধ্যে আনিয়া দিলেও তুমি তৃপ্তি পাইবে কি? তাই বলিতেছি, স্বাদ পাইবার আগেই, বীরের মত ভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব দেখাও—মানুষের মত খাড়া হইয়া সমাজের সম্মুখে দাঁড়াও।

তৃতীয়তঃ—"তুমি বলিয়াছ, পয়সা রোজগার না করিলে, খাব কি?" বেশ কথা। পয়সা রোজগার কর—কেহ বাধা দিতেছে না। কিন্তু পয়সা রোজগার করিবার নেশায় মাতিও না। আপনার ভোগ বিলাসের জন্য পয়সা কুড়াইও না—পরার্থে, শ্রীভগবানেরই নাম করিয়া, তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য পয়সা রোজগার কর। কিন্তু স্বার্থের বা পরার্থের জন্য, যে জন্যই হউক, পয়সা রোজগার করিতে করিতে, কি তাঁহার নাম, তাঁহার ধ্যান, তাঁহাকে মনন করা যায় না? "যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?"

চতুর্থতঃ—আমাদের জাতির দোষ দাঁড়াইয়াছে—আমরা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট। কি করিতেছি, কেন করিতেছি, তাহা আমরা সকল সময়ে ভাবিয়া দেখি না। ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুই ভাবেই আমরা

করিই কায করিয়া পরে ভাবি; ভাবিয়া চিন্তিয়া সকল করি না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ, এত। আমাদিগকে লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে—অন্তরে স্বরাট হইবার চেষ্টা করিতে হইবে—তবে মাদিগের মঙ্গল হইবে। আমরা এই দেহ, ও এই লইয়া এত উন্মত্ত যে, এক দণ্ডও ভাবিয়া দেখি -যাঁহাকে ভগবান বলি তিনি কে ও কোথায়? হিন্দু শিক্ষা দেন যে, ভগবান আমা হইতে স্বতন্ত্র না—God সকল জিনিষের কারণ। কিন্তু হিন্দু বলেন, য়া নয়;—হিন্দু বলেন ভগবান তোমার কারণ নন, মার উপাদান—তুমিই ভগবানের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বান আপনার আধারে আপনি আধেয়রূপে ছেন। বাস্তবিকই ত তাই। রোজ রাত্রে যখন আমরা ই—তখন এক রকম মৃত্যুরই মত অবস্থা প্রাপ্ত হই। , বা কোন্ মহাশক্তি, "আমার" (দেহের) চৈতন্য অবস্থায়, চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, মাকে" (আমার এই দেহকে) রক্ষা করেন এবং তে আমার (দেহের) চেতনার মধ্যে লীন হইয়া যান? নি বাহিরের কোনও "কারণ" শক্তি নন, তিনি মানবাত্মারই "উপাদান" শক্তি। এ কথা ভুলিয়া কেন? এই দেহের মধ্যে যে মহাচৈতন্য আছেন, কে না জানিয়া, বহির্জগতের সকল জিনিষ লইয়া উন্মত্ত থাকি কেন? এটা কি বোকামি নয়? এ বীতে, আমার এই দেহ অপেক্ষা আর কাহাকে বেশী ভালবাসি? কাহাকেও নয়। পুত্র, কন্যা, -পৃথিবীর কেহই আমা অপেক্ষা আমার নিকটে নয়। অথচ আমার এই দেহের মধ্যে যে চৈতন্য- সর্ব্বদা রহিয়াছেন, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আমার আপন, কে ফেলিয়া, আর কোন্ কায, কোন্ চিন্তা কার কাছে বড়? এই মোটা কথাটা ধরিতে লেই, সকল গোল মিটিয়া যায়।

(১২)

"তোমার সব কথা বুঝিলাম, তোমার সকল মত কায করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু যে পাপ শরীরে ঢুকাইয়াছি—সেই স্বপ্নদোষের জ্বালায় যে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তাহার প্রতিকারের কোনও উপায় বলিতে পার?"

বেশ কথা;—তবে স্বপ্নদোষ কি, কেন হয় ও কিসে যায়—এইবার সেই কথার আলোচনা করিব।

যে লোক কখনো মাছ খায় নাই, তাহার মাছ খাইবার ইচ্ছা ত হয়ই না—পরন্তু তাহাকে মাছ খাওয়াইতে গেলে, প্রথম-প্রথম, হয় ত সে বমি করিয়া ফেলে; কিন্তু কিছুদিন চেষ্টা করিয়া মাছ খাইলে, তখন আবার তাহার এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মাছ না খাইলে, সেদিন তাহার খাওয়া ঠিক্ হয় না। অভ্যাসের এমনিই গুণ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের রক্তে বীর্য্যের "উপাদান" আছে, কিন্তু বীর্য্য অবস্থায় তৈয়ারি থাকে না। যে জিনিষ কোথাও তৈয়ারী থাকে, বলিবামাত্রেই তাহাকে পাওয়া যায়; কিন্তু, যাহা তৈয়ারী থাকে না, তাহা ত বলিবা মাত্রই পাইবার যো নাই। এই জন্য, যাহারা আজীবন বালব্রহ্মচারী বা ঊর্দ্ধরেতাঃ (অর্থাৎ জীবনে কখনো যাহাদিগের বীর্য্যপাত হয় নাই) তাহারা সে জিনিষের আস্বাদও জানে না, সে জিনিষের জন্য তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষাও নাই। কাযেই, এ জীবনে, কখনো তাহাদিগের স্বপ্নদোষ হয় নাই এবং হইবেও না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করিয়া, জোর করিয়া, দুর্ব্বুদ্ধির বশে বা কুপরামর্শের ফলে, অস্বাভাবিক উপায়ে পাঁচবার বীর্য্যপাত করিয়াছে, তাহারই "স্বপ্নদোষ" হয় এবং তাহা বারবার হইতেও থাকে। অভ্যাসের এমনিই গুণ—যে জিনিষটি পাঁচবার করিবে—পুনঃ পুনঃ সেই কায করিবার চেষ্টা ভিতর হইতে ঠেলিয়া আসিবে—বিশেষ করিয়া ঘুমের অবস্থায়। দেহের ঘুমের অবস্থায়, আমাদের মনও ঘুমায়।—এই মন, জাগ্রত অবস্থায়, আমাদের অনেক প্রবৃত্তিকে চাপিয়া রাখিতে পারে—ঘুমের অবস্থায়, যে কোনও কারণে, কাম প্রবৃত্তি জাগিলেই, বীর্য্যপতন ঘটিয়া থাকে। এই নিদ্রিতাবস্থায়, তোমার

অনিচ্ছায়, বীর্য্য বা শুক্রস্খলন হওয়াকে স্বপ্নদোষ বা নক্‌টার্ণল্ এমিসন বা পলিউশান কহে। স্মরণ রাখিও—স্পার্ম্মাটোরিয়া স্বতন্ত্র ব্যারাম—স্বপ্নদোষ ও স্পার্ম্মাটোরিয়া একই ব্যারাম নহে—যদিও বহুকালের স্বপ্নদোষ বদ্ধমূল হইলে, তবে স্পার্ম্মাটোরিয়া ব্যারাম দাঁড়ায়।

এইখানে গোড়ার কথা দু-একটা বলা প্রয়োজন। স্বপ্ন কি? স্বপ্ন কেন হয়? স্বপ্নের অর্থ কি? এ সকল কথার সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক ও অসম্ভব। তবে মোটের উপরে দুইটি কথা আমাদিগকে বেশ যত্ন করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম কথাটি এই যে, আমাদের পক্ষে অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত এমন সকল ঘটনা ঘটিলে, তাহা স্বপ্নের সময়ে উদয় হইতে পারে। এরূপ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেমন—মনে কর যে, তোমার চক্ষের সাম্‌নে, কচ্ করিয়া একটা লোকের মাথা কেহ কাটিল, আর সেই রক্তাক্ত কাঁচা মাথাটা তোমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। এ দৃশ্য যেমন আকস্মিক তেমনই অপ্রত্যাশিত। কাযেই, যখন তখন ঘুমের সময়ে, তুমি এই ঘটনাটি, অথবা, ইহারই রকমফের কোনও ঘটনা দেখিয়া, স্বপ্নে শিহরিয়া উঠিতে পার। দ্বিতীয় কথাটি হইতেছে এই,—যে জিনিষটির জন্য তোমার মনে নিদারুণ আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, যেটি পাও নাই অথচ পাইবার জন্য অহর্নিশ মনে মনে দারুণ ইচ্ছায় তোমার মনকে দগ্ধ বা বিচলিত করে—সেই কথাও নিদ্রার সময়ে তোমাকে তাহা প্রাপ্তির তৃপ্তি দিতে আসে। লক্ষ্য করিও—এটিও অভ্যাসের ফল। মনে মনে অহর্নিশ তাহাকে পাইবার কল্পনা করিয়াছ - রোজ রোজ চাওয়ার অভ্যাস করিয়াছ—কাযেই, ঘুমের অবস্থায়, অভ্যাস সাকার হইয়া, স্বপ্নে মনকে সন্তোষ দিবার জন্য, দেখা দেয়। এখন বুঝিতে পারিলে, কেন স্বপ্ন-দোষ হয়? তুমি হয়ত বলিবে—"হাঁ, অনেক দিন আগে বটে মনে রাত-দিন কুচিন্তা পোষণ করিতাম;—কিন্তু আজ ৫।৭ বৎসর অতি কঠোর সংযমে আছি - কু-চিন্তা থেকে শত হাত দূরে থাকি—তবু কেন স্বপ্ন-দোষ হয়?" তাহার উত্তরে বলিব, যে, যে দুটি কারণ আছে সে, দুইটিই অভ্যাসের ফল। অভ্যাস এমনই জিনিষ বটে। তুমি ৫।৭ বৎসর কু চিন্তা ছাড়িয়াছ বটে, কিন্তু জীবনে যে জিনিষটাকে একবার অভ্যাস করা যায়, সেটা সহজে যায় না—যতক্ষণ তাহার উল্টা পথের অভ্যাস না করা যায়। উল্টা পথের অভ্যাস কি, তাহা পরে বলিতেছি। আবার, অসময় হইতে তোমার জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, অতি মাত্রায়, সামান্য উত্তেজনাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া পড়ে—সেও যে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যাসের মত আমাদের পরম শত্রুও আর নাই। আবার, ভাল-অভ্যাসের মত এমন পরম মিত্রও আমাদের আর নাই। তার পরের কথা হইতেছে—মন। "মন" মানে—যে মনন বা কোনও কিছু ইচ্ছা করে। এই মন—মাথায়, কি বুকে, কি কোথায় আছে, আমরা তাহা জানি না। এই মনের কথা আমরা একবার ভাবিও না—অথচ এই মনের মত প্রবল জিনিষ খুব কমই আছে। এই যে তোমার-আমার দেহ, ইহারা চালিত হয় কাহার দ্বারা? ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা;—চোখ দেখে, তবে পা বাড়াই; মুখ-স্বাদ লয়, তবে খাবারটি গিলি। কাযেই ইন্দ্রিয়েরাই এই দেহকে চালায়। অতএব, ইন্দ্রিয়েরা এই দেহের চেয়ে বড়। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে কে চালায়? মন। আমি যদি মনে করি, তবে দেখিব—নতুবা চোখ বুজিয়া থাকিব। আমি যদি মনে করি, তবে পা বাড়াইব—নতুবা পড়িয়া থাকিব। কাযেই, মনই ইন্দ্রিয়গণকে চালায়—মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা। কিন্তু, যদি তুমি রাত-দিন সুধু রসগোল্লা খাও, চিনি খাও, গুড় খাও,—তিত ঝাল, টক একেবারে না খাও—তবে তোমার জিব নামে যে ইন্দ্রিয়টি আছে, সে সুধু মিষ্টত্বের স্বাদ লইয়া লইয়া, মনকে এমন বিগড়াইয়া দিবে—যে, তোমার মিষ্ট ছাড়া অপর কোনও রস আস্বাদন

করিবার মন হইতেই দিবে না। অর্থাৎ, যদিও মন ইন্দ্রিয়ের রাজা, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরা চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা মনের ক্ষমতা কমাইতে বা লোপ করিয়া দিতে পারে। এই জন্যই মদ খাইলে অসুখ হইবে এবং অন্য কত রকমে অপকার হইবে জানিয়াও, লোকে মদ খায়। তবেই বুঝিলে, মন কত প্রবল জিনিষ। আর একটা মনের বলের দৃষ্টান্ত দিই; তোমার দারুণ ক্ষুধা পাইয়াছে,—ইট খাইবে কি কাঠ খাইবে খুঁজিয়া পাইতেছ না—এমন অবস্থায়, একদিক দিয়া একজন নানারকম রসনা তৃপ্তিকর খাবার আসিয়া যে দণ্ডে তোমার সম্মুখে ধরিয়া দিল, অমনি সেই মুহূর্ত্তেই আর এক জন যদি তোমার পরীক্ষায় ফেল হওয়ার সংবাদ বা অপর কোনও শোকের সংবাদ দেয়—তখন তোমার সে ক্ষুধা কোথায় উপিয়া যায়—তখন সে খাবার দেখিয়া তোমার বমি ঠেলিয়া আসে! এটি মনের খেলা - মন যেই খারাপ খবর পাইল, অমনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে দমিয়া দিল। তাই বলিতেছিলাম - মানবের মন একটি প্রচণ্ড শক্তির আধার।

অথচ, এই মনের সন্ধানও আমরা লই না। আর পাশ্চাত্য শিক্ষার কোথাও মনস্তত্ত্বের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই—আছে সুধু এম্-এ, বি-এ ক্লাসে। হিন্দুর ঘরে জন্মাইলাম—যে হিন্দু আজীবন মনকে লইয়াই ইচ্ছামত খেলিতেন, যে হিন্দু মনের যোল-আনা সন্ধান লইতেন,—সেই হিন্দুর ঘরে ছেলেবেলায় জন্মাইলাম, কিন্তু ছেলেবেলা হইতে কেহই ইহার মহত্তার কথা দূরে থাকুক, ইহার অস্তিত্বের বিষয়ও বলিয়া দেন নাই। আর, যে সব বিলাতি-বিদ্যা চর্চ্চা করিয়াছি, তাহাতে দেহের কথা, বাহুবলের কথা, দুপাতির কথাই আছে—মনের এতটুকু সন্ধানও নাই! ইচ্ছা করিয়া এ রকম অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে, আর চলিবে না। প্রত্যেক বালক ও যুবককে বুঝিতে হইবে যে, মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা;—কতক্ষণ? যতক্ষণ মন নিজে শক্ত থাকে—যতক্ষণ সে ইন্দ্রিয়গণকে তাহাকে (মনকে) বানর-নাচাইতে দেয় না! মন শক্ত থাকে কেমন করিয়া? ইন্দ্রিয়গণকে মনের বশে রাখিয়া (অর্থাৎ অতি শৈশব হইতেই সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বপ্রকারে, সংযম অভ্যাস করিয়া) এবং যেমন ব্যায়াম দ্বারা দেহের সৌষ্ঠব ও বল বাড়ান যায়, তেমনি, রাত দিন মনের দৃঢ়তা লাভের জন্য সঙ্কল্প স্থির করিয়া—মনন দ্বারাই মনকে শক্ত করা যায়,—যেমন, আবৃত্তি দ্বারা, ক্রমাগত স্মরণ করিবার অভ্যাস করিয়াই স্মরণ-শক্তিকে বাড়ান যায়, যেমন মাংসপেশীকে খাটাইয়াই তাহাদিগকে দৃঢ় করা যায়। অনেকের ধারণা আছে যে, ঘৃত ভোজন, অশ্বগন্ধা সেবন বা ব্রাহ্মী ভোজন করিলে বা নানা রকমের ফস্‌ফরাস্ ঘটিত বিলাতী ঔষধ সেবন করিলে, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে। এ সব বাজে কথা, এ সব নির্জ্জলা মিথ্যা কথা। অনবরত স্মরণশক্তি পরিচালনা করিলেই, স্মরণশক্তি বাড়ে। সেই রকমে, এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোনও ঔষধ খাওয়াইলে মনের ক্ষমতা বাড়ে না। স্নায়ু (nerves) বা মস্তিষ্ককে (brain) বলবান করে এমন তথা-কথিত ঔষধ সেবনেও মনের বল হয় না। মনের বল হয়,—রোজ, জোর করিয়া, মনে মনে "মনকে শক্ত করিবই" এই অভ্যাস করিলেই মনের বল বাড়ে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মনে কর, কাহারো ভূতের ভয় আছে। রোজ, একটু একটু মনে জোর করিয়া, অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া, শেষকালে ভূতের ভয়কে একেবারেই তাড়ান যায়। যাহার কোপন স্বভাব সে চেষ্টা করিলে, রাগকে একেবারে দমন করিতে পারে। মনে করিয়া বসিয়া, তুমি এখনই এমন কি কাঁচা ফোড়া কাটাইয়া আসিতে পার। তাহা হইলেই বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, মনের বল, মনন করার উপরেই নির্ভর করে। দুর্ব্বল মন লইয়া এ কঠিন দুনিয়ায় কোনও লাভ নাই—সবল মনের অনেক সুবিধা। "আমি ফোড়া কাটান দেখিতে পারি না" অনেকে এইটা বলিয়া বাহাদুরি করেন। ইহাতে বাহাদুরি কিছুই নাই। এ পৃথিবীতে আসিয়া পর্য্যন্ত, শতদিকে, সহস্র রকমের

অবস্থায় পড়িয়া, লক্ষ ঘা খাইয়াও যে মনকে গড়িতে শিখে নাই, তাহার জীবনই বৃথায় গিয়াছে। তাই বার বার বলিতেছি—যদি মনের দৃঢ়তা করিতে না শিখিয়া থাক, তবে এখন হইতেই শত কর্ম্মের মধ্যে এই কাযকে শীর্ষ স্থান দিও। আমাদের মনের আঁট নাই বলিয়া, আমরা এ পৃথিবীর কোনও কায করিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্যরা মনের বলের যথেষ্ট কসরৎ করেন বলিয়া, তাঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হন। এই মনের সঙ্গে স্বপ্ন-দোষ কমানর বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, এ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম।

পঞ্জিকাতে, সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য কবিরাজী বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, স্বপ্নদোষ ব্যারামটি মারাত্মক ব্যারাম—যাহার এ ব্যারাম হয়, তাহার আর এ জীবনে রক্ষা নাই—মরাই তাহার পক্ষে ভাল। আর সেই সঙ্গে দেখা যায় যে, যিনি বিজ্ঞাপন দিতেছেন, তাঁহার ঔষধ খাইলেই, স্বপ্ন-দোষ নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। ঐ বিজ্ঞাপনদাতা কবিরাজ অবধূত ও চিকিৎসকগণ লোকের মনে ভয় লাগাইবার জন্য, ধাপ্পা দিয়া কয়েকটি জিনিষের কথা খুব বড় গলায় বলিয়া থাকেন; সে বাঁধাবুলিগুলি এই ঃ—অনিচ্ছায় বীর্য্যপাত, শুক্র-তারল্য, মাথা ঘোরা, চখের সম্মুখে কি যেন ভাসিতেছে এমন দেখা, প্রস্রাবের সঙ্গে সামান্য কোঁৎ দিলে শুক্র বাহির হওয়া—ইত্যাদি। তুমি যত ভয় পাইবে, তত হাঁক্-পাক্ করিয়া, এদিক-ওদিকে ছুটাছুটি করিবে—তাহাদের দশ কৌটা ঔষধ খাইবেই খাইবে। তাহারাও ত তাই চায়। তাহারা চায়—তোমার ব্যারাম কঠিন না হইলেও তোমাকে ভয় দেখান চাই; তাহারা চায় যে, ব্যারাম সারুক না সারুক, তাহারা ত তোমাকে বিষম ভয় দেখাইয়া দু'দশটা ধাপ্পা দিয়া তোমার কাছ থেকে দশ বিশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইতে। এ কথা তোমরা কেহই বোঝ না—কাযেই ভয়ে জড় সড় হইয়া থাক। এ ব্যারাম পাঁচ জনকে বলিবারও নহে, কাযেই পরামর্শ করিতে পার না—কাযেই, চট্‌পট্ ও লুকাইয়া সারিবার জন্য, ব্যস্ত হইয়া ঐ সকল লোকের পকেট ভারি কর মাত্র—তোমার ব্যারাম যেমন তেমনই থাকে। কেহ সুপরামর্শ দিয়া সত্য কথা বলিলেও তখন সে কথা শুনিবার মন তোমাদের থাকে না! কারণ, ঐ সকল ঔষধের বিজ্ঞাপনদাতারা কত শত "প্রশংসা-পত্র" ছাপে। তোমরা জান না যে কত বিজ্ঞাপনদাতারা স্বয়ংই "প্রশংসা-পত্র" নিজেরা করিয়া, যার-তার নাম দিয়া, ছাপিতে পারে; অথবা, পয়সা দিলে অনেক লোভী লোক আছে, তাহারা যা-তা 'প্রশংসা-পত্র তখনই লিখিয়া দিতে পারে। অনেকে ছাপার অক্ষরে নাম দেখিবার লোভেও মিথ্যা প্রশংসা-পত্র দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, পঞ্জিকাতে বা সংবাদ-পত্রে স্বপ্নদোষের যত ঔষধের বিজ্ঞাপন থাকে, তাহার সকলগুলিই বা অধিকাংশই মিথ্যা—যদিও সেটা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অসার, মিথ্যা-বিজ্ঞাপন আজকাল কম বাহির হয় না। কোন্ বিজ্ঞাপন সত্য আর কোনটি মিথ্যা, তাহা বিচার করা শক্ত। অথচ, এই সকল বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পড়িয়া, এই সকল ধাপ্পাবাজীর পাল্লায় পড়িয়া, এই সকল 'সর্ব্বনেশে" ভয়ে বিহ্বল হইয়া, কত যুবক যে চঞ্চল ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়, তাহা বলা যায় না। তাহাদের সেই অবস্থার ফলে, সুচিকিৎসকগণকে বিড়ম্বিত হইতে হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞ, বহুদর্শী, সুচিকিৎসক যতই বুঝান না কেন, উক্ত জাতীয় বিজ্ঞাপন পাঠ করার ফলে, যুবকদিগের মনে এমন বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, তাহারা কিছুতেই এই ব্যারামের কুফল স্বরূপ, নিম্নলিখিত নির্জ্জলা মিথ্যা কথাগুলি ভুলিতে পারে না ঃ—

(১) "প্রস্রাবের সঙ্গে অহরহ "ধাতু" (বীর্য্য) নির্গত হইতেছে—এবং শরীর ফোঁপরা হইয়া পড়িতেছে। যাহাদের স্পার্ম্মাটোরিয়া হয়, তাঁহাদের

ক্ষে এ কথা কথঞ্চিৎ সত্য হইলেও, স্বপ্নদোষগ্রস্তদের বোয় ইহা অতীব মিথ্যা কথা।"

(২) প্রস্রাবের সঙ্গে মাথার ঘি (মস্তিষ্কের সার পার্থ) বাহির হইয়া মাথা খালি করিয়া দেয়।

(৩) পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া যায়, বাঁকিয়া যায়, শিল ও উত্থান শক্তি হীন হইয়া পড়ে।

(৪) বীর্য্য এমন পাতলা হয় যে, নিয়তই তাহা গড়াইয়া গড়াইয়া বাহির হইতে থাকে।

বলা বাহুল্য, উপরের একটিও সত্য নয়—সকল গুলিই অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা কথা এবং দশ হাজার রোগীর মধ্যে একজনেরও উহার শতাংশের একাংশও য় কি না সন্দেহ। ভয় দেখাইয়া রোগী সংগ্রহ করা ীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। ভয়ে রোগীর অনিষ্ট হয়—রোগীর সারিবার পথে কাঁটা পড়ে। রোগীকে সকল কথা খোলসা করিয়া বুঝাইয়া দিলে, রোগীর সারিবার সুবিধা হয়—ভয় দেখাইলে তাহাকে সারান শক্ত হয়। আমি নিজে চিকিৎসক এবং বহুসংখ্যক স্বপ্নদোষগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি বলিয়াই, এই সকল ব্যবসায়ের কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছি। তাই যুবক ছাত্রগণকে হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিতেছি—"দোহাই তোমাদের—তোমরা বিজ্ঞাপন পড়িও না—পড় ত তাহার একবর্ণও বিশ্বাস করিও না। নিজ নিজ মনের উপরে ভয়ের গাঢ় কালিমা লেপন করিও না।"

(১৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বপ্নদোষের কারণ যৌবন-স্বভাব-সুলভ কদভ্যাস ও প্রত্যহই সন্ধ্যাকাল আসিলেই শয়ন করা পর্য্যন্ত, একান্ত ও ভয় বিহ্বলচিত্তে "আজ কি স্বপ্নদোষ হইবে" ইত্যাকার অমূলক ভয় মনে মনে পোষণ করা। ইহা ছাড়া স্বপ্নদোষ হইবার আরো কতকগুলি কারণ আছে—সেগুলি শারীরিক যন্ত্রের বিকৃতির ফল। এইবারে একে একে সে গুলির কথা বলিতেছি ঃ—

(১) পেট গরম হওয়া।—গুরু-ভোজন, অতি ভোজন, অধিক বেলায় বা বেশী রাত্রে ভোজন করিলে, পেটে হাওয়া হয়, পেট ভার থাকে, পেট কামড়ায়, পেট খোঁচায়, লিভার বা যকৃত টন্ টন্ করে, পেট "দম্‌সম্" হয়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে, ঘুম আসে না ইত্যাদি নানা কষ্ট হয়। এই জন্য যাহাদের স্বপ্নদোষ হয়, তাহাদের পক্ষে পেট ঠাণ্ডা রাখা অতীব প্রয়োজন। রাত্রে কখনো পেট ভরিয়া খাইতে নাই এবং নিজ নিজ রাত্রে আহারের অভ্যস্ত সময়ের চেয়ে বেশী রাত্রেও খাইতে নাই। কাহারো পেটে দুধ ভাল করিয়া সহে না; কাহারো পক্ষে দই, মাংস, ডিম, গরম মসলা বা অপর খাবার তেমন সয় না। এই সকল খাবার তাহাদের পক্ষে রাত্রে না খাওয়াই উচিত।

(২) চিত বা উপুড় হইয়া শোয়া।—চিৎ হইয়া শুইলে, পেট গরম হয় এবং স্বপ্নময় ঘুম হয়—ভাল ঘুম হয় না। উপুড় হইয়া শুইলে, অযথা চাপে, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। পাশ-বালিশ বেশী আঁকড়াইয়া শুইলে, অথবা খুব নরম ও পুরু বিছানায় শুইলেও জননেন্দ্রিয়ে উত্তেজনা হয়—ঘুম ভাল হয় না।

(৩) অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া শুইলে, অনেক বাতবিতণ্ডা করিয়া শুইলে, তখনি অথবা বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া মাথা গরম করিয়া শুইলে, ভাল ঘুম হয় না। ভাল ঘুম না হইলেই স্বপ্নদোষ হইবে।

(৪) বেলা করিয়া ঘুমাইলে স্বপ্নদোষ হয়।—সাধারণতঃ যোয়ান বয়সে, ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা ঘুমাইলেই স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়। রাত্রি ৯।১০টায় শুইবার পরে, ভোর ৪।৫ টায় যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখনিই বিছানা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িতে হয়। কারণ, আলস্য করিয়া পাশ ফিরিয়া পুনরায় ঘুমাইলে, সে ঘুম কখনো ভাল হয় না—স্বপ্নপূর্ণ হইয়া থাকে এবং সে ঘুমের ফলে শরীরের অলসতা বাড়িয়া যায়। প্রথম-চোট যে ঘুম হয়, সেই ঘুমই শরীরকে তাজা করে—তার পরের ঘুম শরীরে "জড়তা" আনে।

আর ভোরের বেলায় এই জড়তাময় ঘুমের সময়েই স্বপ্নদোষ হওয়া খুবই সম্ভব।

(৫) **ঘুমের অবস্থায় পেটে বেশী প্রস্রাব জমিলে, স্বপ্নদোষ হয়।**—যাহারা বৈকালে চা, সরবৎ প্রভৃতি পান করে; যাহারা রাত্রে ভোজনের সময়ে বা পরে অনেকটা দুধ বা জল বা ডাবের জল বা সোডা ওয়াটার পান করে; বা যাহারা রাত্রে দুধ বার্লি খায়—এই সকল লোকের অল্প সময়ের মধ্যেই—হয় ত মাঝ রাত্রির পরেই—প্রস্রাবের বেগ হয়। মূত্র থলিতে প্রস্রাব জমিলেই প্রস্রাবের বেগ হয়, আর সেই বেগ হইতেই ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও স্বপ্নদোষ ঘটে।

শীত কালে ও বর্ষাকালে রাত্রে বেশী জলীয় জিনিষ না খাইলেও, বেশী বেশী প্রস্রাব হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য যুবকদিগের তিনটি নিয়ম প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত। প্রথম—রাত্রের দিকে বেশী জল বা জলীয় জিনিষ না খাওয়া; দ্বিতীয়—যখনই শয়ন করিবে—তাহার পাঁচ মিনিট আগেও যদি প্রস্রাব করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তখনি, আবার প্রস্রাব করিয়া তবে শুইবে; এবং রাত্রে যখনই প্রস্রাবের পীড়া বোধ হইবে, কখনো আলস্য করিয়া শুইয়া না থাকিয়া, তখনিই প্রস্রাব করিয়া আসিবে; ভোরের দিকে, রাত্রি ৪টার পরে, যখনই ঘুম ভাঙ্গিবে, তখনই প্রস্রাব করিবে এবং তাহার পরে আর কখনো শুইবে না।

(৬) **ক্রিমি থাকিলে**—যথোপযুক্ত চিকিৎসা করাইবে। সরু সরু সুতার মত কুচো ক্রিমি থাকিলে, উপর্য্যুপরি ৫।৬ দফায় অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন করিয়া ৬০ গ্রেণ লবণ এক ছটাক গরম জলে গুলিয়া, সেই জল মলদ্বারে পিচকারী করিয়া দিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। রীতিমত কোষ্ঠ সাফ না হওয়াও স্বপ্নদোষের একটি মস্ত কারণ।

(৭) **চুলকানি প্রভৃতি থাকিলে**—তাহা সারাইতে হইবে। লিঙ্গমূলে অত্যন্ত বেশী চুল থাকিলে, হাইড্রোসিল বা একশিরা থাকিলে, বা কুঁচকিতে বা বিচিতে চুলকানি বা দাদ হইলে, মুণ্ডো থাকিলে (অর্থাৎ লিঙ্গের মাথায় যে চামড়াটি থাকে, সেটিকে গুটাইয়া খুলিতে না পারা গেলে), অথবা লিঙ্গ-মুণ্ডে সাদা সাদা উগ্র-গন্ধি ময়লা জমিলে, প্রস্রাব করিয়া 'জল লওয়ার' অভ্যাস না থাকিলে—এই সকলের উত্তেজনায়, যখন-তখন, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে, লিঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটিয়া স্বপ্নদোষ ঘটায়। এইজন্য, প্রত্যহ স্নানের সময়ে, ঐ সকল যায়গা পরিষ্কার করা উচিত। নিত্য সাবান ব্যবহারে, চামড়া খস্‌খসে ও উগ্র হইয়া পড়ে; খুব বেশী ময়লা হইলে, সাবান ব্যবহার করা যাইতে পারে। নতুবা নিত্যই সাবান ব্যবহার করিও না। পরিষ্কার জলে সপ্তাহে এক বা দুই দিন লিঙ্গমুণ্ড পরিষ্কার করিলেই, যথেষ্ট। মুণ্ডো থাকিলে, তাহাকে কাটান বা অতি সন্তর্পণে অল্প অল্প বলপ্রয়োগে ছাড়ান উচিত।

(৮) কচি ছেলেদিগকে কখনো পাছায় মারিতে নাই। পশ্চাদ্দেশের ঐরূপ উত্তেজনার ফলে, অকালে কামোদ্রেক হইতে পারে। শিশু বা যুবকগণকে গাছে চড়িতে দেওয়া, বা কাহারো পিঠে চড়িতে দেওয়া, বা জীবন্ত বা কাঠের ঘোড়ায় চড়িতে দেওয়া অধিক সাইকেল করিতে দেওয়াও—ঐ ঐ কারণে নিষিদ্ধ। ঐ সকল করিলে, অকালে ও অযথা কামোদ্রেক হয় এবং স্বপ্নদোষ আনে।

(১৪)

অপর যে যে গৌণ কারণে কামোদ্রেক হয়, তাহা এইবারে বলিব। (১) যাহারা যুবক হইয়াও অলস ভাবে জীবন যাপন করে, তাহারা সহজেই কামের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাতদিন শুইয়া-বসিয়া থাকা, "আড্ডাধারী" হওয়া, সকাল সন্ধ্যা ঘরের কোণে বসিয়া গল্প গুজব করা—যুবকদিগের পক্ষে নিন্দনীয় এবং অনিষ্টকরও বটে। (২) যাহারা যুবা বয়সে অযথা পরিমাণে গুরুপাক খাদ্য দ্রব্য খায়, অথচ তদুপযুক্ত পরিশ্রম করে না, তাহাদিগেরও অল্প বয়সে কামোদ্রেক ঘটিবার সম্ভাবনা। মাংস, ডিম, গরম-মসলা, মোহন,

মুন, অধিক অন্ন, অধিক ঘৃত দেওয়া খাদ্য—এ সকল নিত্য খাইলে, অথবা মধ্যে মধ্যে খাইয়াও যথোপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম না করিলে—কামোদ্রেক ঘটে! ছাত্রদিগের পক্ষে ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু এই কথা সাত্ত্বিকভাবে যাহারা জীবন যাপন করে ও সাত্ত্বিক আহার খায়, তাহাদেরই পক্ষে প্রযোজ্য। মাংসাশী, ভোজনবিলাসী এবং অলস ছাত্রদিগের পক্ষে ঘৃত অমৃত তুল্য নহে। নিত্য মজুরের মত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া এ সকল খাদ্য খাওয়া যায়। এইজন্যই সে কালে মৃগয়া করিয়া তবে মাংস ভোজনের অধিকার ছিল। সাহেবরা যেমন অবস্থাপন্নই হউক, যেমন-তেমন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক, তাহারা অসুরের মত পরিশ্রম নিত্যই করে। যে যুবকেরা অলস ভাবে, "বাবু" সাজিয়া, শুইয়া-বসিয়া, "ভদ্র" লোকের মত গল্প-গুজব করে, বা আড্ডা দিয়া বেড়ায়—তাহারা যেন দুধ, ঘি, মাংস, ডিম, কালিয়া-পোলাও, পেঁয়াজ-রসুন না খায়। (৩) রাতদিন নভেল পড়া, পদ্য লেখা, প্রেমের কাহিনী বা কবিতা পড়া, নিত্য থিয়েটার-বায়স্কোপ যাত্রা দেখা, সখ করিয়া বা দুএকদিন পরীক্ষা করিবার ছলে আফিম, মদ, বা "মদনানন্দমোদক" খাওয়া বা খাইতে সুরু করা—এ সকলই কামোদ্রেক ঘটায়। (৪) কচি ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সে "বউ-বউ" খেলে, সেটাকেও আমি দোষনীয় বলি। (৫) কি সহরে কি পল্লীগ্রামে, হিন্দু বাঙ্গালীর বাড়ীতে এমন সকল ক্রিয়াকাণ্ড, কথা-বার্ত্তা, আচার-অনুষ্ঠান হয়, যাহার ফলে, অল্প বয়স হইতেই, বালক বালিকারা কামরাজ্যের সন্ধান পায়। যদি এ সম্বন্ধে পাঠকগণের আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়, তবে পরে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১৫)

আমরা বুঝিলাম যে, (১) স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে কদভ্যাসের ফলে, (২) কতকগুলি শারীরিক অবস্থার দোষে তাহা বজায় থাকে এবং (৩) মনের দৌর্ব্বল্যের জন্য তাহা সারিতে পারে না। এক্ষণে, স্বপ্নদোষ "সারান" যায় কেমন করিয়া, তাহার কথা বলিব। প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখি যে, স্বপ্নদোষ একবার আরম্ভ হইলে, জীবনে কখনো তাহা সারে না। কিন্তু, নামে না সারিলেও, কাযে এক রকম সারে বটে। অর্থাৎ, চেষ্টা করিলে, স্বপ্নদোষ এত কমিয়া যায় যে, তাহাকে এক রকম সারাই বলা যাইতে পারে। মাসে একক্ষেপ স্বপ্নদোষ হইলে, তাহাকেও দোষের বলিয়া ধরিব না।—তাহার চেয়েও কমান যায়। বিবাহ করিলে, যতদিন স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে ততদিনের মত ঐ ব্যারাম আর দেখা দেয় না।

যে যে চেষ্টা করিলে ঐ ব্যারাম খুব কমিয়া যায়—একরকম প্রায় সারিয়াই যায়—সে গুলি এই:—

(১) আহারে সংযত হওয়া চাই। যাহাতে পেট গরম হয়, এমন কিছুই খাইতে নাই। রাত্রে খুব হাল্‌কা খাদ্য খাওয়া চাই। রাত্রের দিকে জলীয় জিনিষ খাইবে না। রাত্রি ৭॥০টার মধ্যে খাইয়া, ৯॥০ টার মধ্যে শুইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশ না লইয়া, শক্ত বিছানায় শুইবে।

(২) শুইবার আগে প্রস্রাব করিয়া, মাথাটি ভিজা গামছায় মুছিয়া, ভগবানের নাম করিয়া এবং মনে মনে খুব জোর সঙ্কল্প করিয়া শুইবে যে, আজ আর স্বপ্নদোষ হইবে না। ভোরের দিকে, ঘুম ভাঙিলেই, তখনি উঠিয়া পড়িবে।

(৩) যদি চিৎ হইয়া শোয়া অভ্যাস থাকে, তবে শুইবার সময়ে, কোমরে একটা ঘুন্সিতে একটা কাটিম এমন ভাবে বাঁধিবে যে, চিৎ হইলে কাটিমটা শির-দাঁড়ায় আঘাত করায় আপনিই ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া যাইবে।

(৪) প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠ সাফ হয়, তাহার জন্য শাকসব্জী, ফলমূল এবং, আবশ্যক হইলে, রীতিমত জোলাপও ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে স্নানের অভ্যাস করা চাই। কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া, অথবা শিঠের শির

দাঁড়ার উপরে শীতল জলধারা দিয়া স্নান করিতে পারিলে ভাল হয়। কুঁচকি প্রভৃতির আশ পাশ পরিষ্কার রাখিবে।

(৬) বরং একদিন না খাইবে, তবু যেন একটি দিনও ব্যায়াম ও ভগবানের আরাধনা বাদ না যায়। "ব্যায়াম" বলিলে, এমন কোনও অঙ্গ-চালনা বুঝিবে, যাহাতে শরীর খুব হাল্‌কা ও ঝরঝরে বোধ হয়—যাহার পরে ক্লান্তি না আসে। বোধ হয়, ডাম্বেল ভাঁজাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক। ভগবানকে আঁকড়াইয়া ধরিবে—দিন দিন তাঁহারই একান্ত শরণাপন্ন হইবে—ভয় থাকিবে না!—"অভী"—তাঁহারই অংশ তুমি, অমৃতের অধিকারী তুমি,—তুমি তাঁহার দয়া, তাঁহার আশ্রয় এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ খুঁজিবে। কুচিন্তা দূরে পলাইবে, কুদৃশ্য তোমাকে প্রলোভিত করিতে পারিবে না, মনের কোণে যেখানে কুবাসনা লুকাইয়া আছে, সেও অন্তর্হিত হইবে। মায়ের কোলে আশ্রয় পাইলে শিশুর যেমন অবস্থা হয়, তোমারও তেমনি হইবে। যদি নিজ পিতামাতার ছবি থাকে, তবে তাহা সর্ব্বদা এমন যায়গায় রাখিবে যেখানে মনে কুচিন্তা উদিত হইবা মাত্রেই সেই নরদেবতার যুগল চিত্র তোমার দৃষ্টিপথে পড়িবে। তাঁহাদের পবিত্র দেহ দেখিয়া, তাঁহাদের মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পাপ কায হইতে বিরত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনো বলি—সাধনা চাই, সংযম চাই। আবার বলি—মনের কসরৎ চাই। বারবার স্মরণ কর—অভ্যাসই সকল কাযের মূল। এইজন্য শিশুকাল হইতে নিয়মিত সময়ে ভগবানের আরাধনা, সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতির প্রত্যহ অভ্যাস করা উচিত। কিন্তু, শিশুকালে সে সকল হয় নাই বলিয়া, নিরাশ হইও না—দুঃখিত হও, অনুতপ্ত হও, কিন্তু নিরাশ হইবার কোনও হেতু নাই। সাধন-সমরে কোমর বাঁধিয়া নাম—মনে মনে বল "আমি স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমানের অংশ, চেষ্টা করিলে কি না করিতে পারি?"—পূর্ব্বের অভ্যাস ধুইয়া মুছিয়া নষ্ট করিবার জন্য, দিন রাত—আহারে, বিহারে, চিন্তায় সংযম অভ্যাস কর; শরীরকে দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু কর; ভগবচ্চিন্তা দ্বারা মনকে উন্নত ও সংযত কর—কোথায় তোমার বাল্যকালের কু-অভ্যাস উপিয়া যাইবে—স্বপ্নদোষ বিরল হইতে বিরলতর হইতে থাকিবে—তুমি প্রকৃত "পুরুষ" সাজিয়া সংসারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হইবে। মানুষের মুখ তাকাইও না—মানুষের ক্ষমতা কতটুকু? অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে সম্মুখে বসাইয়া, তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিয়, যে কাযে লাগিবে, তাহাতেই সিদ্ধি নিঃসন্দেহ। কখনো ভুলিয়াও মনে করিও না, তুমি দীন, তুমি ক্ষীণ, তোমার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়—তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সর্ব্বদাই আপনাকে সম্বোধন করিয়া, মনে মনে বলিবে—

"হে অমৃত-পুত্র, ওহে ব্রহ্মসুত, ভু'ল না তুমি বা কে? তুমি অনন্ত সুখের, অনন্ত আনন্দের অধিকারী; তোমার শক্তি অসীম—তুমি আত্মার আশীর্ব্বাদ খোঁজ—নিজের দিকে ফিরিয়া তাকাও। তুমি ত ক্ষুদ্র নও, তুমি ত ক্ষীণ নও—তুমি বিরাটের একটি অংশ—তুমি প্রচ্ছন্ন Ruhmkorff's coil, তুমি Leyden jar.

(১৬)

শেষ কথা।

যদি ইংরেজি মত ধর, তাহা হইলে, evolution অর্থাৎ বিবর্ত্তন বাদ মানিতে হইবে—অর্থাৎ ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র জীবাণু হইতে ক্রমশঃ উন্নত ও বিকশিত হইয়া, আমরা মানুষ হইয়াছি এই ধারণা করিতে হইবে—অর্থাৎ কত জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া, কত মেহনত করিয়া, তবে মানুষ হইতে পারিয়াছি, ইহার মধ্যে চালাকি নাই, দয়া-মায়া নাই, সৌভাগ্য-সুবিধা নাই—তিল তিল করিয়া, খাটিয়া-খুটিয়া, কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া, কত "পোঁড়" খাইয়া তবে এমনটি হইতে পারিয়াছি—মানব জন্ম বাস্তবিকই দুর্লভ জন্ম।

যদি হিন্দুর দিক হইতে (?)থ, ত বুঝিতে পারিবে, যে সুকর্ম্মের দ্বারাই মানবজন্ম পাইয়াছ। অর্থাৎ গুণ দেখাইয়াছ বলিয়াই, মানুষ হইতে পারিয়াছ—অকর্ম্ম ...লে, আবার পশুত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে। কাযেই, হিন্দুর ... হইতে ধরিলেও, মানবজন্ম সহজে, হেলায় ...য় পাও নাই—জন্ম জন্ম কত সুকর্ম্ম করিয়াছ, তবে ...ষ হইতে পারিয়াছ।

তাই বার বার বলি—স্মরণ রাখিও—মানব-জন্ম ...বিকই দুর্লভ জন্ম। এই জন্মে পশুত্বের দিকে ...তে অবনতি না ঘটে, তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে ...র্ত্তব্য।

কিন্তু এই পৃথিবীর নিয়ম এই—এখানে কিছুই ...কিতে পারে না। তুমি জীবনে যে অবস্থায় উপনীত ...য়াছ, শত সহস্র ঘটনা, লক্ষ লক্ষ লোক তোমাকে ...েই স্থান হইতে নীচ-পথে টানিয়া নামাইবার চেষ্টা ...রিতেছে ও করিবে। কাযেই, হয়, তাহাদিগকে ...োমার নিজের মত অবস্থায় টানিয়া তুলিতে হইবে—...থবা, যদি পার ত, তুমি স্বয়ং উত্তরোত্তর উন্নতির ...থে অগ্রসর হইয়া, তাহাদিগের নাগাল ছাড়াইয়া ...ড়িয়া যাও।—মোট কথা, এজগতে এক যায়গায়, ...ক অবস্থায়, দাঁড়াইয়া দম ফেলিয়া আরাম খুঁজিবার ...য়গা নাই।—হয় আগে চল, না হয় ত তোমারই ...াপনার জন, তোমারই সমাজ, তোমাকে টানিয়া ...িঁচড়াইয়া নামাইয়া ফেলিতে থাকিবে। এ বড় ...থাটি বড় করিয়া মনে রাখিবে।

যদি বেশ করিয়া বুঝিয়া থাক যে, মানবজন্ম ...তি দুর্লভ এবং অনেক কষ্টে তাহা লাভ হইয়াছে; এবং যদি আরো বুঝিয়া থাক যে, এজগতে ক্রমশঃ ...ন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গতি নাই; তবে ...খন জিজ্ঞাসা করিবে—কি করিলে, সেই পথে ...াওয়া যায়? তাহার উত্তর—সর্ব্ববিধ সংযমের দ্বারা, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে মন-প্রাণ অর্পণ দ্বারা, এবং সর্ব্ববিধ ...-অভ্যাসের দ্বারা। অভ্যাস যেমন শত্রু হইতে ...ারে, সে আবার তেমনি মিত্রও হইতে পারে। এই জন্যই, হিন্দুর কথায় বলিতে গেলে,—শিশুকাল ...হইতে, শাস্ত্রমতে সংযম, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ...রা, আত্মদর্শন ঘটাও। তাই বলি, শিশুকাল হইতেই নিত্য পূজা, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা, নিত্য সাধু ...ঙ্গ, নিত্য ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ...টাইবে। শিশুকাল হইতে ঐ সকল শাস্ত্রীয় কায ...দি না কর, তবে বেশী বয়সে, সে গুলি করিতে গেলে পূর্ব্বের সঞ্চিত কদভ্যাসের মূলোচ্ছেদ করিতেই অনেক চেষ্টা ও অমূল্য সময় বৃথায় যাইবে—তাহার পরে অনেক সময় কাটাইয়া, সু-অভ্যাস বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করিবে। আমাদের আয়ুষ্কাল মাপা-জোকা। তাহার যদি ২০ বৎসর কদভ্যাসে কাটে, আর বিশ বৎসর কদভ্যাসের মূলোচ্ছেদ করিতে কাটে, আর হাতে কত বৎসর সাধনার জন্য থাকে—তাহা হিসাব করিয়া দেখিবে।

তাহার পরে, তোমাকে বেশ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুধু নিজের চরিত্র গঠন করিয়াই তোমার নিষ্কৃতি নাই। তুমি যে বংশে, যে সমাজে, সে দেশে জন্মিয়াছ, সেই বংশের, সেই সমাজের, সেই দেশের ধারা, তাহাদের গৌরব, তাহাদের সাধনা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ত হইবেই—পার যদি, তাহা বাড়াইবার চেষ্টাও করিবে। সে ধারা আবার তোমার সন্তান-সন্ততির দ্বারা প্রবাহিত হইবে। কাযেই, সুসন্তান জন্ম দেওয়া তোমার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হওয়া চাই। কত তপস্যা, কত সাধনা, কত চেষ্টা করিয়া মনকে উন্নত করিলে, তবে সেই উন্নত মন সন্তান-সন্ততিতে যায়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। এ জীবনে কেবল সংগ্রাম করিতে হইবে—কেবল খাটিতে হইবে—সাধনা করিতে হইবে। তুমি যে মানুষ, ইহা তোমাকে সত্য সত্যই অনুভব করিতে হইবে, এবং সকলকে অনুভব করাইতে হইবে, তোমার মনুষ্যত্বের বীজ তোমার বংশের মধ্যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যাহাতে সত্য সত্য আপনার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাইতে পার, সে জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন কর—তোমার উন্নতিতে তোমার বংশের উন্নতি, তোমার সমাজের উন্নতি, তোমার জাতির উন্নতি, তোমার দেশের উন্নতি। দেশ-মাতৃকার সেবার পক্ষে, নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব-বিকাশই পরম সহায়। হিন্দু এ কথাটি বেশ করিয়া বুঝিতেন—আমরা হিন্দু হইয়াও, সে আসল কথাটা ভুলিয়া গিয়াছি। কথায় কথায় "জাতি-যাওয়ার" ভয়টা হিন্দু কি গভীর উদ্দেশ্যে দেখাইতেন, তাহা একবার তলাইয়া ভাব—আর শ্রীভগবানের নিকটে কাতরতা সহকারে দয়া ভিক্ষা কর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। শ্রীরস্তু।

———

হিন্দু দুর্ব্বল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-রত্ন।

শিশুদের স্বাস্থ্য-হানি ও অকাল-মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়।

ব্রহ্মচর্য্যহীনতার ভীষণ পরিণাম।

আজকাল আমাদের দেশের বালক-বালিকা ও যুবক যুবতীগণের চরিত্রে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে নানা প্রকার ভীষণ পাপ-তাপ হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়া দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিতেছে। ফলতঃ, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই আমাদের জাতীয় অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে যে দুইটী অতি ভীষণ মহাপাপ হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, যাহার ফলে হিন্দু সমাজ অতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। যথা :—

আত্ম-বিকৃতি।

(Self-Abuse, Masturbation.)

"ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়দ্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥"
(মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৮০ শ্লোক।)

আজ কাল ঘোর কলি মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবতীর্ণ; সুতরাং মানবজাতি সভ্যতার দোহাই দিয়া, স্বাভাবিক পথ ও পরম হিতকর প্রকৃতির মঙ্গলময় উপায় ত্যাগ করিয়া, বিবিধ কৃত্রিম অনুষ্ঠানে রত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কারণে আত্মবিকৃতি মহাপাপ জগতে দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ইহা যেন একটী কৌলিক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক ধর্ম্মনীতিহীন শিক্ষাই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই কদভ্যাসের আরও নানা কারণ আছে; যথা :—

(১) কুসংসর্গ, (২) বালক-বালিকাদের মধ্যে আদি রসপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদির বহুল প্রচার, (৩ সহরে সর্ব্বত্রই কুলটাগণের পশার বিস্তার, (৪ জনাকীর্ণ নগরে বাস জন্য অল্প বয়সেই রিপুর উত্তেজনা ৫ আহারের পরিবর্ত্তন, উত্তেজক দ্রব্যাদি। আহার, (৬) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি। বিখ্যাত ডাক্তার পার্কস্ ও কাউয়েন মহোদয়গণ এই কদভ্যাসের লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা লিখিয়াছেন :—

"মনুষ্যসমাজে এমন কোন পাপ নাই, ইহার (আত্মবিকৃতির) সহিত যাহার তুলনা করা যাইতে পারে। হাজার হাজার বালক-বালিকা ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে; এবং বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারে অক্ষম এবং অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়েই যে প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।" (1) এই ঘৃণিত কদভ্যাসের ফলে বালকদের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। যথা :—

"যে সকল বালক এই কদভ্যাসে রত থাকে, তাহাদের স্বভাব চরিত্রের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হয়। যে সকল বালক পূর্ব্বে (কদভ্যাসের পূর্ব্বে) সচ্চরিত্র, অত্যন্ত বাধ্য, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, উৎসাহপূর্ণ ও কর্ম্মঠ থাকে, এই কদভ্যাসের পর হইতেই হঠাৎ তাহারা (বালকেরা) উগ্রস্বভাব, খিটখিটে, অবাধ্য হয় ও তাহাদের শরীর জড় হইয়া পড়ে। এ ভিন্ন, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কালবর্ণ দাগ পড়ে। এই কালবর্ণ দাগ শরীরের অবসন্নতা ও যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মুখমণ্ডল বিবর্ণ, ছোট ও কদাকার হইয়া পড়ে। পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পাদদ্বয়ে দুর্ব্বলতা অনুভব, এবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। সমস্ত শরীরের এবং হাত পার ধমনী স্ফীত, স্বভাব উগ্র, হৃৎকম্প, মাথায় দপ্‌দপে শব্দ, মুখে ব্রণ প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। বয়স্থ বালকগণের মূর্চ্ছা রোগ জন্মে, এবং সর্ব্বদা হাত পা ঘর্ম্মাক্ত থাকে।" (2)

আত্মবিকৃতির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে উক্ত ডাক্তার মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ দেশের প্রত্যেক জনক জননী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন :—

"একজন বালক অন্য বালককে এই কদভ্যাস শিক্ষা দেয়। কোন স্কুলের একটী বালক এই কদভ্যাসে রত হইলে, সে সমস্ত স্কুলের ছাত্রগণকে নষ্ট করিতে পারে। ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ যে, আমাদের বর্ত্তমান যুবকযুবতীগণ প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে এই কদভ্যাসে রত আছে এবং অধিকাংশ স্থলেই এই পাপের প্রাখর্য্য দৃষ্ট হয়। (3) এ ভিন্ন, কোন কোন স্কুলে অস্বাভাবিক অভিগমন বাহুল্যরূপে দেখা যায়।" (4)

হে হিন্দু জনক জননীগণ! আপনারা একবার আলস্য ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করুন। আর সময় নাই, উচ্চকণ্ঠে বালকবালিকাদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে সাবধান করুন, রক্ষা করুন! ভারত নানা কারণে যৎপরোনাস্তি অবনত হইয়াছে,—এখন তাহার কেবল জলমগ্ন হওয়াই বাকী রহিয়াছে। এই ভাবে আর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে হিন্দু সন্তানরা একেবারে অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়িবে। যদি অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন বা শুক্রক্ষয় জন্য বল গেল, বুদ্ধি গেল, স্বাস্থ্য গেল, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হ্রাস পাইল, তাহা হইলে কেবল পুস্তকগত বিদ্যায় আমাদের কি উপকার সাধিত হইবে? এখনও সময় আছে—এখনও সকলে সাবধান হউন—অগ্রসর হউন—বালক-বালিকাদিগকে রক্ষা

---

(1) "This is by far the wrost of all sins and vices to which humanity is liable. It spoils thousands of boys and girls; no words can describe the ill health, the matrimonial infelicity, and general misery it engenders." (See Dr. Parker's New Marriage Guide. p. 30. See also The Science of a New Life. by Dr. Cowan M. D. p. 353).

(2) Signs of self-abuse—"One sign in a boy is a change in his disposition and character. If a boy who has been very obedient, very cheerful, full of energy, and good tempered, suddenly changes to be fret-ful, irritable, stupid, and disobedient; * * generally there are black circles round the eyes—symptoms of exhaustion, suffering from consumption—face looks small, pale, and haggard. Pains in the back, weakness in the legs, and headaches, may be looked upon as indications of self abuse. great fulness in the veins of the body, hands, and feet; also irritability of temper, palpitation of the heart beating in the head, pimples on the face. In older boys epileptic fits, coldness and moisture of the hands &c, &c." (See Ditto p, 19 to 30)

(3) "One boy teaching another, and if even one boy in school, is corrupted by this vice, he may contaminate all the rest. It is alarming to think that most of the boys attending our public schools are more or less familiar with this degrading practice." (See Ditto)

"In schools and out of schools—females as well as males—married as well as single—are to be found—those bearing the imprint of the great wrong done their souls by this low, debasing unmanly, cowardly practice of self-abuse." (See the Science of a New Life by Dr. Cowan M D. P, 353.)

(4) In many cases, a hot-bed of vice, and in some schools sexual perversion had prevailed universally." (See Dr. Parker's New Marriage Guide, p. p. 19 to 30).

করুন! হিন্দু ডুবিল! পিতা-মাতা তাঁহাদের বাল্য-কালে যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সন্তানও বাল্য ও যৌবনকালে এই মহাপাপে লিপ্ত হইবে। (5)

জনক-জননীর প্রতি নিবেদন।

প্রথম বয়সে বালক-বালিকাদিগকে কুসঙ্গ হইতে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিবেন। মন্দ বালকের সহিত কখনও স্বীয় সন্তানগণকে মিশিতে কি আলাপ করিতে দিবেন না। স্কুলের কোন বালক-বালিকা এই কদভ্যাসে রত আছে জানিতে পারিলে, তখনই তাহাকে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবেন! এ সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষক মহাশয়ের তীব্র দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-উত্তেজক কোন পুস্তক বা নাটক কখনও বালক-বালিকাদিগকে পাঠ করিতে দিবেন না। বালক-বালিকাদিগকে সহরে না রাখাই উচিত। আর যাঁহারা বালক-বালিকাদিগকে সহরে রাখিবেন, তাঁহারা কোন আত্মীয়ের নিকট বা ভাল বোর্ডিংএ ছেলেমেয়েকে রাখিতে বিশেষ যত্ন করিবেন; স্বাধীন ভাবে বালক-বালিকাকে কখনও সহরে রাখিবেন না। কতকগুলি ইন্দ্রিয়-উত্তেজক আহারীয় দ্রব্য আছে; যথা—পেঁজ, রশুন, গরম মসল্লা, লঙ্কা মরিচ।—এই সকল উত্তেজক দ্রব্য, বাজারের মেঠাই, অধিক মসল্লা সংযুক্ত খাদ্য কখনও বালক-বালিকাদিগকে আহার করিতে দিবেন না।

কুলটা সংসর্গ ও উপদংশ পীড়া।

বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় সহর বন্দরে কুলটাগণের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন—'কলিকাতা সহরে বেশ্যার সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কলিকাতা প্যারীসকেও অতিক্রম করিতে চলিল। পুণ্যভূমির, সতী সাধ্বীর দেশের রমণীগণের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন অতীব দুঃখের, লজ্জার ও ঘৃণার বিষয় সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতিহীন শিক্ষা-প্রণালী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। প্রাচীন কালে (বর্ত্তমান সভ্যতার অনুসরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) এদেশে ব্যভিচার ছিল না। পাশ্চাত্যদেশের বহু পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকগণ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও ধনবান যুবক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ (বিশেষতঃ যাহারা সহরে বাস করে) কুলটা সংসর্গ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে এই ভীষণ পাপ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ফলতঃ কুলটা সংসর্গের ফলে এ দেশের যুবকগণের অপরিমিত শুক্রক্ষয় হইতেছে এবং তাহাদের শুক্রও দূষিত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে তাহারা নানা জঘন্য ও উৎকট পীড়ার (উপদংশ প্রভৃতি) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমাজের উচ্ছেদ ও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য উক্ত চরিত্রহীন ও কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত যুবকগণের ঐ সকল অতীব ভীষণ ও জঘন্য পীড়ায় (উপদংশ) ক্রমে ক্রমে আমাদের কুল-লক্ষ্মীগণও আক্রান্তা হইতেছেন। এই উপদংশ পীড়ার ভীষণ আক্রমণে আজ এ দেশের অগণ্য জননী ও শিশুদের গুরুতর স্বাস্থ্য-হানি হইতেছে ও তাহারা নানা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে! বর্ত্তমান সময়ে শিশুদের এই ভীষণ অকাল মৃত্যুর সর্ব্ব-প্রধান কারণ—উপদংশ পীড়া। উপদংশ পীড়ার ন্যায় অতি ভীষণ পীড়া জগতে আর নাই। এই পীড়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশধরগণকে আক্রমণ করে এবং ত্বক, মাংসপেশী, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র, ডিম্ব ইত্যাদি সমস্তই বিকৃত করিয়া থাকে।

(5) "A father having been at any time of his life a masturbater and leading other than a perfectly chaste and continent life during the child growth in the mother's womb will as surely as night succeds day have a child that will likewise masturbate" (See the Science of a New Life, by Dr. Cowan, M. D. p 357).

এই উপদংশ পীড়াকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র "ফিরঙ্গ রোগ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে এই পীড়া এ দেশে আনিয়াছিলেন। ফলতঃ, এই ভীষণ পীড়ায় আমাদের জাতির যে কি সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

(৩) ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে অধিকাংশ যুবক যুবতী-গণের নানা উৎকট পীড়া ও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। আমরা ক্রমে সেগুলি বর্ণনা করিব।

(২) সহবাসে অনিয়ম।

আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ভগবান আমাদিগকে জননেন্দ্রিয়, ও উপযুক্ত সময়ে উক্ত জননেন্দ্রিয় বৈধভাবে পরিচালনা করিয়া সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন ভিন্ন সহবাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ( ) ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য সহবাস করা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। ইন্দ্রিয়-সেবন-জনিত সুখের পরিমাণ অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এইরূপ ক্ষণস্থায়ী ও সামান্য সুখের জন্য দেহ ক্ষতিকর অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন করা যে নিতান্ত অন্যায় ও ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সহবাসের ইচ্ছা, এবং তাহাতে যে সুখানুভব আছে, সেগুলি কেবল সন্তান উৎপাদনের সহায় মাত্র। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যায় যে, ভগবান্ কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদন জন্যই কামেন্দ্রিয় ও কাম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সুখ ভোগের জন্য ইহা প্রদত্ত হয় নাই।

গরু, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় সেবন প্রণালী দেখিয়া আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি যে, নারীগণের যেরূপ মাসিক ঋতু হয়, ইতর জন্তুগণের স্ত্রীজাতিরও সেইরূপ ঋতু বা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে। ঐ সময়ে ইতর প্রাণীর স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির সংসর্গের জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। এইরূপ ঋতুকাল কি বিশেষ কাল ভিন্ন ইতর প্রাণীর স্ত্রীজাতিরা অন্য সময়ে সহবাস করে না। এমন কি ঐ বিশেষ কাল ভিন্ন অন্য কালে পুরুষজাতি সহবাসের ইচ্ছায় স্ত্রী জাতির নিকটবর্ত্তী হইলে, স্ত্রী জাতি তাহাদিগকে বাধা দেয়। ফলতঃ দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট রাজ্যের সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই সহবাস সম্বন্ধে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন! কিন্তু মনুষ্য সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর প্রাণী হইয়াও এই অকিঞ্চিৎকর, দেহক্ষতিকর, ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া নিজকে পশু অপেক্ষা অধম করিয়া তুলিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করে না, ইহাই আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয়। যে সকল কীট, পতঙ্গ নিমেষ মধ্যে জলবিম্বের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনন্তকালে লীন হইয়া যায়, অতি দীর্ঘ শত বৎসর পরমায়ু এবং অত্যুন্নত মস্তিষ্ক লইয়াও মানুষ যদি সেই সকল সামান্য জীব অপেক্ষাও বুদ্ধিতে হীনতম হইয়া ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর সুখান্বেষণে নিয়ত রত থাকে, তবে তাহার মনুষ্য জন্ম ইতরতম পশু জন্ম অপেক্ষাও অধম। যে ইন্দ্রিয় সকল স্বর্গীয় সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন (সুসন্তান উৎপাদন) জন্য ব্যবহার করিতে পাইয়াছি, তাহার অসদ্ব্যবহার করা যে কতদূর ঘৃণার্হ, তাহা মানব মাত্রই বুঝিতে পারেন। এই বিষয় একবার চিন্তা করিলে, মনে হয়, আমরা ঈশ্বর-দ্রোহী মহাপাপী হইয়া নিজ দোষেই তাঁহার এই স্বর্গোপম পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিতেছি। যখন দেখি, অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি বেশ্যালয় হইতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও গৃহে আসিয়া দীন হীন মলিন বেশে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে;—যখন দেখি, শত শত ব্যক্তি এইরূপ অর্থহীন অথবা দুশ্চিকিৎস্য ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হইয়া চারিদিকে পুত্র কলত্রের

(6) "Sexual congress in intended for the procreation of Children," (See Dr. Chavasse's Advice to a Wife, P. 15.

দিকে চাহিয়া হায় কি হইল! হায় কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, হায় হায় কেন সজ্ঞানে সযত্নে এমন গরল মূল্য পান করিয়াছি, এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছে,—যখন দেখি, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা মহারাজা নিঃ-সন্তান হইয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য লালায়িত হইতেছেন, যখন দেখি, অতিরিক্ত সহবাসজনিত নানাবিধ গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসংখ্য লোক ব্যাধ-বিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় চিকিৎসকের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে,—যখন দেখি, তাহারা হায় কি হইল, হায় কি করিলাম, কেন এমন হইলাম, বলিয়া নিয়ত আর্ত্তনাদ করিতেছে,—যখন দেখি, প্রমেহ উপদংশ প্রভৃতি ব্যাধি সকল অস্থি, মজ্জা পর্য্যন্ত চর্ব্বণ পূর্ব্বক অসংখ্য ব্যক্তিকে ভগ্নকঙ্কাল করিয়া ফেলিতেছে, শত শত ব্যক্তি অন্ধ, বধির ও অঙ্গহীন হইয়া অথবা নানা প্রকার উপদংশ ব্যাধির নিদারুণ যন্ত্রণায় গগন-ভেদী অর্ত্তনাদ করিতেছে,—যখন দেখি, অসংখ্য লোক তাহাদের বিকৃত, রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ পুত্র কলত্রের ক্ষীণপ্রভ জীবন-দীপ নির্ব্বাণ ভয়ে শত সহস্র প্রকার যত্নে নিয়ত বিব্রত,—তখন মনে হয়, হিন্দু শাস্ত্র! তুমি পরকালে পাপীর জন্য যমালয়ে যে সকল যম যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহার আদর্শ ইহজন্মেই অবলোকন করিতেছি।

ফলতঃ অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন জনিত মহাপাপ আজ কাল বিকট মূর্ত্তিতে বিশ্বগ্রাস করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই মহাপাপের বাহুল্যে অধুনা মানব মণ্ডলী জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, অকালে জরাগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ—সহবাসে অনিয়ম অমিতাচার ও অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবা।

ফলতঃ যদি কেহ বংশধরগণকে যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, নীরোগ, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে চান, তবে তাঁহার বীজ বপন করার পূর্ব্বে পবিত্র মনে, পবিত্র ভাবে যথাকালে বীজ বপন করা উচিত। পুত্রকে পবিত্র উন্নত দেখিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে আপনাকে উন্নত করুন, পশ্চাৎ পুত্র উৎপাদন করিবেন। আর্য্য মহর্ষিদের একমাত্র উপদেশ এই—শাস্ত্রের বিধান এই—অগ্রে ব্রহ্মচারী ভাবে অবস্থান কর, পরে সন্তান উৎপাদন করিও। বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি দ্বারা রেতঃসংযম করিয়া প্রথমে নিজকে মনুষ্যত্বের উপযুক্ত করিতে হইবে, পরে অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিবে। রেতঃসংযম ব্রহ্মচারি-ব্রতের একটী প্রধান অঙ্গ। এই রেতঃরক্ষা আর্য্যগণ জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পুনরায় সেই আর্য্যদিগের পন্থা অবলম্বন ভিন্ন হিন্দুর রক্ষার আর কোনই উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে মানবগণ কিসে গাছ ভাল হইবে, কিসে ঘোড়া ভাল হইবে, কিসে গরু ভাল হইবে ইত্যাদি বাহ্য উন্নতির চিন্তা করিয়া তাহার উপায় অবধারণ করেন; প্রাচীনকালের মহাত্মারা কিসে মানুষ ভাল হইবে, প্রধানতঃ ইহাই চিন্তা করিতেন। তাঁহারা যে কেবল চিন্তা করিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা সহবাস সম্বন্ধে শতসহস্রপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতেন।

সহবাস সম্বন্ধে আর্য্য মহর্ষিগণ যে সকল নিয়ম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও সেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা তাহা এস্থলে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। পাঠক মহোদয়গণ, বিশেষ মনোযোগের সহিত এ সকল তত্ত্ব পাঠ করিয়া দেখিবেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

চরক-সংহিতার শারীরস্থানের জাতি সূত্রীয় অধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন:—

"স্ত্রীপুরুষয়োরব্যাপন্ন শুক্রশোণিতযোনি গর্ভাশয়য়োঃ শ্রেয়সীং প্রজামিচ্ছতোস্তন্নিবৃত্তিকরং কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ।"

অর্থাৎ যে পুরুষ ও স্ত্রীর শুক্র, শোণিত (ডিম্ব), গর্ভাশয় কোন প্রকার দোষে দূষিত নহে, উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিতে হইলে তাঁহাদের যে সমুদায় কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, সংপ্রতি সেই সকল কর্ম্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিব।

'ততঃ পুষ্পাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমাসীৎ ব্রহ্মচারিণ্যধঃ-...নী পাণিভ্যামন্নমজর্জ্জর পাত্রে ভুঞ্জানা না কাঞ্চিদেব ...াপদ্যেত।'

অর্থাৎ অনন্তর স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে তিন ...পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিণী (পতির সহবাস রহিত) হইয়া ...পধানে (বাহু উপাধানে) ভূমিতে শয়ন ও অজীর্ণ-...ত্রে (ধাতব পাত্র ভিন্ন) ভোজন করিবে। এবং ...কালের মধ্যে গাত্র মার্জ্জনাদি শরীরের কোন ...রের শুদ্ধাচারের কর্ম্ম করিবে না। (7)

আর্য্য ঋষিরা সকলেই এক বাক্যে ঋতুর সময় ...তুর তিন দিন সহবাস করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ ...রিয়াছেন। (8)

মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন:—

"ততশ্চতুর্থেহহন্যেনামুৎসাদ্য সশিরস্কাং স্নাপয়িত্বা ...নি বাসাংস্যাচ্ছাদয়েৎ পুরুষঞ্চ।"

অর্থাৎ তাহার পর চতুর্থ দিবসে গাত্র মার্জ্জন এবং ...রোহন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইবে। এইরূপ পুরুষকেও স্নান করাইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইবে।

'ততঃ শুক্লবাসসৌ চ স্রগ্বিণৌ সুমনসাবন্যোন্যমভি-কামৌ সংবসেতামিতি ব্রূয়াৎ।"

অর্থাৎ তাহার পর উভয়ে পুষ্পমাল্য ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইলে "তোমরা যাইয়া সহবাস কর" স্ত্রী-পুরুষকে এই কথা বলিবে।

"স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ তৌ চাযুগ্মেষু দুহিতৃকামৌ।"

অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন ইচ্ছা করিলে স্নানের পর হইতে যুগ্ম দিবসে (ঋতুর ষোল রাত্রির মধ্যে ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, রাত্রে) এবং কন্যা উৎপাদনের ইচ্ছা থাকিলে অযুগ্ম দিবসে (৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, রাত্রিতে) সহবাস করিবে।

"ন চ ন্যুব্জং—।"

অর্থাৎ স্ত্রী যদি ন্যুব্জভাবে (উপুড় হইয়া) থাকে অথবা পার্শ্বগত (কাৎ হইয়া) থাকে তবে ঐ অবস্থায় সহবাস করিবে না। স্ত্রী উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) বীজ গ্রহণ করিবে।

"অত্র্যাত্যশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিতা ভীতা বিমনাঃ শোকার্ত্তা ক্রুদ্ধা চান্যঞ্চ পুমাংসমিচ্ছন্তী মৈথুনে চাতিকামা বা নারী গর্ভং ন ধত্তে বিগুণাং বা প্রজাং জনয়তি।"

অর্থাৎ স্ত্রী অত্যন্ত ভোজন করিলে বা ক্ষুধাতুর হইলে, বা পিপাসাতুর হইলে বা ভীত অথবা চঞ্চলচিত্ত বা শোকার্ত্ত বা ক্রুদ্ধ বা অন্য কোন পুরুষকে ইচ্ছা করিলে অথবা অত্যন্ত কামাতুর হইলে গর্ভ ধারণ করে না; যদিও গর্ভধারণ করে, তাহা হইলে বিকৃত সন্তান প্রসব করে।" (9)

---

(7) এ সম্বন্ধে প্লিনি (Pliny) নামক জনৈক পাশ্চাত্য ...জ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন:—'ঋতুমতি নারী অতিশয় ...বিত্র। সে যে স্থানে বাস করে তথাকার উদ্ভিদে বিশেষ ...রূপ পীড়া জন্মে, মদ্য অম্লত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকার অনেক ...রূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে।" Pliny tells us that ...n the approach of a woman in this state (the ...enstrual) meat will become sour, seeds which ...e touched by her become sterile, grafts ...ther away, garden plants are withered up, ...nd fruit will fall from the tree beneath ...hich she sits. (See Natural History, Book VII. ...Pages 13.)

(8) "Coitus during menstruation is injurious ...o health". (See Laws of Sexual Philosophy by ...r. J. L. Chandra I. M. S. Pages 324—5.

Coitus during menstruation engender monsters." ...See Trans. Edinburgh Obstet. Soc. Vol. XXI, ...Pages 324—5.)

(9) "Dr. Trall says:—The stomach must not be loaded, the liver must not be obstructed, the lungs must not be congested, the skin mnst not be clogged and the brain must not be oppressed. In short, there must be the normal play of all the functions."

"অতিবালামতিবৃদ্ধাং দীর্ঘরোগিনীমন্যেন বা বিকারে-ণোপসৃষ্টাং বর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ অত্যন্ত বালিকা, অতিশয় বৃদ্ধা, চিররোগিনী বা অন্য কোন রোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না। (01)

পুরুষেহপ্যেত এব দোষাঃ, অতঃ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতৌ স্ত্রী-পুরুষৌ সংসৃজ্যেয়াতাম্।"

অর্থাৎ পুরুষেরও ঐ সমস্ত থাকিলে স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকা উচিত। অতএব সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য পরস্পর সহবাস করিবে। (11)

"সঞ্জাতহর্ষৌ মৈথুনে—।"

অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই হিতকর বস্তু ভোজন করিয়া, মৈথুনে উভয়ের অভিলাষ হইলে, উভয়ে সুগন্ধি ও উৎকৃষ্ট আস্তরণবিশিষ্ট সুখজনক শয্যায় শয়ন করিয়া তাহাতে পুরুষ দক্ষিণ পদদ্বারা এবং স্ত্রী বাম পদদ্বারা আরোহণ করিবে। তাহার পরে সেই শয্যায় "অহিরসি আয়ুরসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সহবাস করিবে। (12)

---

(10) Dr. J. A. Balfour says :—

"How could progeny begotten when parents are weak, exhausted, or sickly be as vigorous as created when they overflow with life, health and power ?"

"Fathers and mothers should be careful what child en they bring into the world. Fathers should eradicate all their vices and subdue their passions. They should bring into prominence all the excellencies and virtues they possess, so that the constant practice of these may have a favourable impression on the offspring."

"Mothers probably exert a more powerful influence upon children than fathers. During the whole of the gestatory period she exercises an influence upon the unborn child which the father cannot possibly exercise. This period, therefore, should be, if possible one of continuous calm, and happiness. She should be free from all disturbing influences, and her health should be carefully attended to."

(11) Dr. Nichols says :—"To be well begotten, one's parents must not only be of a good stock, and developed a good organization, but they must be actually living healthy lives and observing the conditions of health Any unhealthy condition of the father affects the seminal fluid. For this to be pure and strong and vital, the blood and the nervous power must be in the same condition, and so of the germs prepared by the mother. No unhappy man, no man whose nervous power is exhausted by labour or care, no man who poisons his blood, and disorders his nerves with stimulants and drugs, can possibly beget a healthy child. Every Zoosperm prepared in the testes for the fecundation of the ovum is affected by every cause that affects the parent There is no condition of body or mind, with which the germ of life may not be affected by either of the parents. The seeds of all follies, vices, and crimes are sown in the organism, moral character intellectual powers and tendencies, physical organization, health or disease, happiness or misery, are impressed upon the infinitesimal germ and the inconceivably minute zoosperm. The microscopic animalculæ, sapen like an elongated tadpole, is in reality, a blackguard, a liar, a thief, a scoundrel ; or it is scrofulous, or syphilitic, or gouty ; or it is idioter, or insane all these, if formed by a parent of whom these are actual qualities. And so it is of the germ prepared in the ovary of the mother. So the sins of parents are visited on their children to the third and fourth generation, and where the causes continue, to the thirtieth and fortieth."

(12) "Father and mother, therefore, at the time of begetting, must be in all pure and natural and healthy condition. If the parents love each other, the child will love its parents. But if a whoman, submits to be impregnated by a man whom she loathes and hates, that loathing and hatred will be impressed upon the child."

"The whole state of the mother, during the period of pregnancy, influences the being of the child. There is no condition of the mother mental or physical, which may not have its influence upon the child."

"...সা চেদেবমাশাসীত—।"

অর্থাৎ স্ত্রী যদি এইরূপ আশা করেন যে, আমার ...কর, গৌরবর্ণ, সিংহসদৃশ বিক্রমশালী শুদ্ধাচারী ...সত্ত্বময় পুত্র হউক, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে ...স্নানের পর হইতে পরিষ্কৃত যবের মণ্ড, মধু. ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমান বর্ণ-বিশিষ্ট ...র দুধে আলোড়ন করিয়া রৌপ্য বা কাংস্য-...ত্রে পান করিতে দিবে এবং প্রত্যহ প্রাতে ...পাত্রে পান করিতে দিবে ও শালি বা ...ন্ন, দধি, মধু অথবা ঘৃতের সহিত পান করিতে ...বে। (13)

"তথা সায়মবদাত-শরণ শয়নাসনযান-বসন-
ভূষণ বেশা চ স্যাৎ।"

অর্থাৎ তাহার পর সায়ংকালে পরিষ্কৃত গৃহে ...ষ্কৃত শয্যায় শয়ন, পরিষ্কৃত আসনে উপবেশন, পরিষ্কৃত পানীয় পান, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান, এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বেশবিন্যাস করিবে।

"সায়ংপ্রাতশ্চ শশ্বৎ শ্বেতং—।"

অর্থাৎ ঐ স্ত্রী সায়ং ও প্রাতঃকালে শ্বেতবর্ণ, বৃহৎকায়, ও শ্বেত চন্দনাঙ্কিত বৃষ এবং আজানের অশ্ব দর্শন করিবে। আর মনের অনুকূল সান্ত্বনা বচন দ্বারা মনের সন্তোষ জন্মাইবে। আর যে সমুদায় পুরুষ ও স্ত্রীর সৌম্য প্রকৃতি, সৌম্য বল, সৌম্য উপচার, সৌম্য চেষ্টা তাহাদিগকে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক পদার্থ দর্শন করিবে। সহচরীরা ঐ স্ত্রীকে প্রিয় ও হিতকর বস্তু দ্বারা সর্ব্বদা সেবা করিবে।

"ইত্যনেন বিধিনা সপ্তরাত্রং—।"

অর্থাৎ এইরূপে সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইলে স্ত্রী অষ্টম দিবসে পতির সহিত অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া অখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুন্দর পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কার ধারণ করিবে।

এই সকল প্রক্রিয়ার পর মহর্ষিরা স্ত্রী পুরুষকে নানা প্রকারের হোম, যজ্ঞ অর্থাৎ নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক মহর্ষি স্ত্রী পুরুষের সহবাসের পূর্ব্ব সময়ে ভগবানের আরাধনা ও ভগবচ্চিন্তা করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। সহবাসের পূর্ব্ব সময়ে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা খুব ভাল থাকিলে এবং সে সময় ভগবানের চিন্তা করিলে, তাহাতে সন্তান সর্ব্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও ধার্ম্মিক হইবে, ইহাই তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। বর্ত্তমান কালে বহুসংখ্যক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও মহর্ষিদের আদেশ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া থাকেন।

---

(13) Dr. Trall says :—"Parents who are in ...mparatively good condition when they cohabit ...reproduction, will frequently have children more ...autiful than themselves ; while, on the other ...nd, parents who are in their worst condition when ...ey beget children are represented in the next ...neration by specimens of the *genus homo* more ...ooking than they are themselves. Especially ...portant is it for those who would have beautiful ...ildren to be in their best bodily and mental ...ndition when the fruitful organism is experienced. ...perfectly symmetrical body implies an equal and ...lanced, so to speak, contribution from every ...gan and structure ; and to secure this result, the ...rson must be free from all local congestions or ...itations."

(See Sexual Physiology and Hygiene, by R. J. ...all M. D.)

কোন্‌টা আগে?

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

সমাজ-দেহের জোঁক

ওরে, স্বরাট্‌শূন্য স্বরাজকামী, দুঃখ যে তোর চারিধার।
ঘুচ্‌বে কি সব, পাস্‌ যদি তুই রাষ্ট্রনীতির অধিকার?
শাসক সাথে দ্বন্দ তোদের, নিজেদের নেই সহযোগ;
জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহে ঢুক্‌ছে তোদের নানা রোগ।
শান্তি-নিলয় পল্লী ছেড়ে কল্লি বাসা সহর মাঝে,
পিশ্‌তে কলম, চাট্‌তে ধুলা, ধোঁয়া খেতে সকাল সাঁঝে।
তোর অভাবে গ্রামগুলি সব এক হ'য়ে যায় শ্মশান সাথে
ছেলের পালে ব্যাধির তরে দিচ্ছে তুলে যমের হাতে।

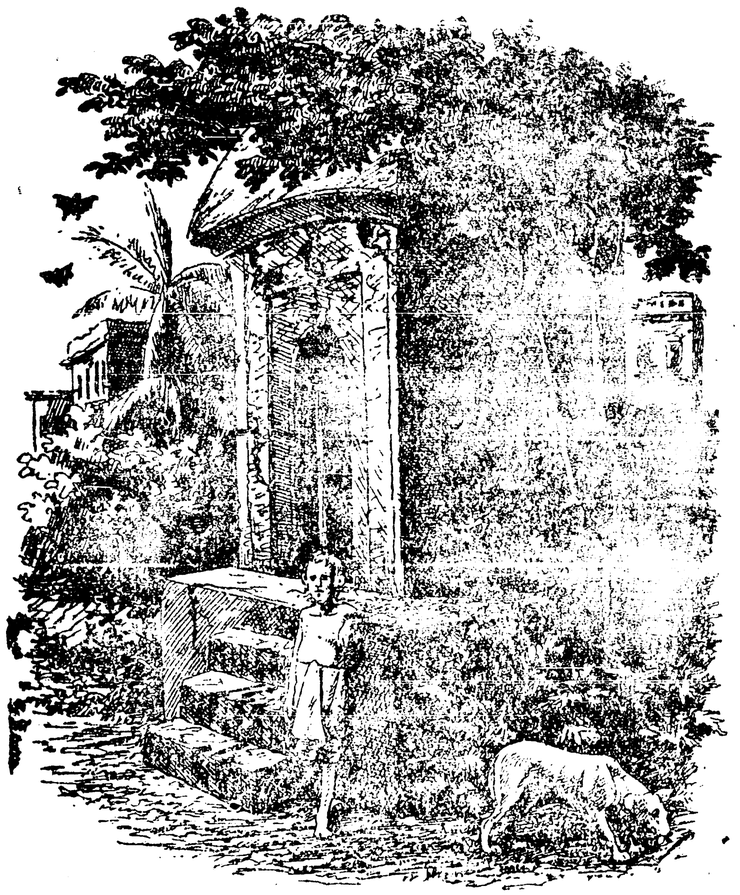

আধুনিক পল্লীচিত্র

শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুর-নদী, কুকুর—তারও শুষ্ক জিভ্‌,
চাম্‌চিকা-বাস মন্দিরে সব, বেলপাতা আর পায়না শিব।
কারোর দ্বারে অতিথ্‌ এলে দেখিয়ে দিচ্ছে অন্য বাড়ী;
অন্নসত্রে আজকে যে সে কাঁদছে ব'সে শূন্য হাঁড়ী।
নর-নারী পড়্‌ছে লুটে মরণ-রথের চাকার তলে;
দিবস রাত্র শ্মশান-বুকে চিতাই শুধু ধূ ধূ জ্বলে।
ঘরের পাশে ঝোপ-ঝাড়েতে সাপ্‌-শিয়ালে নিচ্ছে বাসা;
পল্লীরাণীর কুঞ্জখানি মঞ্জু শোভায় দেখায় খাসা।
ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, প্লেগ, বসন্ত মহামারী—
শমনরাজের টেক্স আদায় কচ্ছে সেথায় বাড়ী-বাড়ী।
পুঞ্জে পুঞ্জে মশা-মাছি গুঞ্জরিয়া বেড়ান্‌ সেথা;
(দেশোদ্ধারের চাঁদা আদায় কচ্ছে হেথায় দেশের নেতা!)
হাতুড়ে আর অশিক্ষিত বদ্যি যত বিদ্যানিধি,
দিচ্ছে বড়ী নাড়া টিপে, 'পার্কাসানে' * দেখ্‌চে হৃদি।

["অজ্ঞানতা"-কূপের উপরে স্তোকবাক্যরূপ তক্তায় হাতুড়ে কবিরাজ দাঁড়াইয়া আছেন]

[বিদেশী-বেশধারী ডাক্তার মহাশয় দেশের সমস্ত অর্থই বিদেশী বঁধুর মুখবিবরে পুরিতেছেন]

[দেশী ধাত্রী এক হাতে শিশুর গলা টিপিতেছেন এবং অপর হাতে যমদূতকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছেন—ইহাই এ দেশে ঘরে ঘরে ঘটে]

রোগীর রুধির শুষ্‌ছে রোগে, তারাও শোষে অন্যধারে;
রোগ যদিও দয়া করে, ডাক্তারে তার দফা সারে।
উকীল, বদ্যি—এঁদের মত তিল্‌কে কে তাল কত্তে পারে?
ম্যারেন এঁরা ধনে-প্রাণে চাপেন্‌ যখন যাদের ঘাড়ে!

* 'ষ্টেথস্কোপের' পরিবর্ত্তে বুকের উপর আঙ্গুলের ঘা দিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া হৃদ্‌ পরীক্ষার নাম 'পার্কাসান্‌' (Percussion)

ধাত্রীর অজ্ঞতা শিশু-মৃত্যুর সদ্য কারণ

বংশরক্ষা কত্তে লোকে কচ্ছে দুটো তিনটে বিয়ে ;
বংশ কিসে রক্ষা হবে দেয় যদি তায় ঘুণ ধরিয়ে ?
হাজার-করা তিনশ' শিশু বাংলা দেশের আঁতুড় ঘরে,
বছর বছর মরে যদি বংশ কিসে রক্ষা করে ?
মুচী-ডোমের অশিক্ষিতা ধাই বুড়ীরে ডেকে এনে,
করিয়ে প্রসব তারে দিয়ে কোনমতে হিঁচড়ে টেনে,

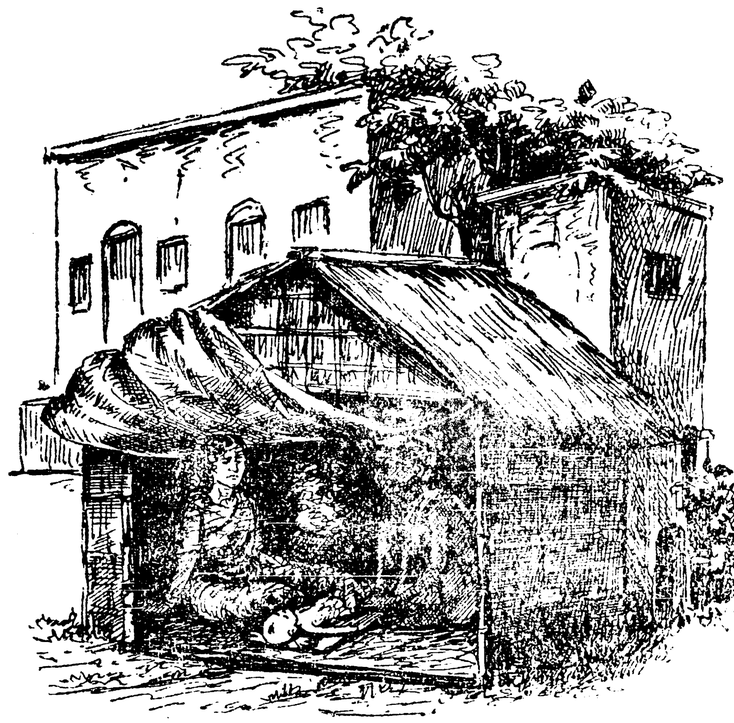

[আপনারা "অন্ধকূপের" কথা শুনিয়াছেন—হিন্দু-ঘরের "যমকূপ"রূপ আতুড় ঘরের চেহারা দেখুন।]

বাঁশের চাঁচে নাড়ী কেটে, সর্‌ষে প'ড়ে, শিকড় বেঁধে,
ভয় দেখিয়ে প্রসূতিরে পেঁচোয় পাওয়ার * গল্প ছেঁদে,
আলো-বায়ু-রুদ্ধ-করা ভগ্ন কুঁড়েয় বদ্ধ রেখে,
কাঠ্ কয়লার আগুন দিয়ে শিশুগুলি সেঁকে সেঁকে,
প্রসূত আর প্রসূতিরে বাঁচাতে কেউ যদি পারে,
ধন্য বলো' কপাল তাদের, দিওনাকো বাহবা তারে।

* অপরিষ্কার বাঁশের চাঁচাড়ি, ময়লা-সঞ্চিত দীর্ঘ নখ প্রভৃতির দরুণ নবজাত শিশুর শরীরে একপ্রকার রোগ-বীজাণু প্রবেশ করিয়া ধনুষ্টঙ্কার বা tetanus উৎপাদন করে, তাহাকেই অজ্ঞতাবশতঃ অন্তঃপুরিকাগণ 'পেঁচোয় পাওয়া' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ধাত্রী-বিদ্যা মোদের দেশে রয়েছে ঐ ডোমের ঘরে,
অশিক্ষা আর কুসংস্কার আছে যেথায় মূর্ত্তি ধ'রে ;
অজ্ঞানতায় বিশের মধ্যে পাঁচটা শিশু যারা মারে,
আজন্মকাল নখ কাটে না, ভুলেও যদি কাপড় ছাড়ে !
যে ধাত্রীতে পুরাযুগে দিগ্বিজয়ী 'সিজার' বীরে*—
জননীরে বাঁচিয়ে তাহার, বা'র্ করেছে উদর চিরে,
যেথায় পান্না শান্তা ছিল শিশুর প্রসব পালন তরে,
যাদের কীর্ত্তি-সুধার ধারা ইতিহাসের পাতায় ঝরে,
শাস্ত্রমতে সপ্ত মাতার মধ্যে বিরাজ কর্ব্বে যে—
দেখ্‌রে চেয়ে চক্ষু মেলে তার আসনে বস্‌ছে কে ?

মাতার অজ্ঞতা শিশু-মৃত্যুর অপর কারণ

বিধির বরে আঁতুড় ঘরে বাঁচলে শিশু পেঁচোর হাতে,
আটকৌড়ে ও ষষ্ঠীপূজার ধূম লেগে যায় আঙ্গিনাতে ;
দু'মাস পরেই শুকিয়ে আসে মায়ের স্তনে স্তন্যধারা,
গাভীর দুগ্ধ, শঠির পালো খাওয়াতে হয়, নেইক চারা ;

[বাঙ্গালার বীর-প্রসবিনী]

প্রহর মধ্যে পাঁচটি দফায় শিশুর আহার হবেই হবে,
সাধ্য কি যে তার বিরুদ্ধে একটিও কেউ কথা কবে ?

* যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার প্রায় নব্বই বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন রোমরাজ্যে জুলিয়াস্ সিজার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি প্রথমে একজন নানা দেশ-বিজয়ী সেনাপতি ও পরে সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। সেকালের ধাত্রীরা প্রসব ও প্রজনন-শাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন যে, সিজারের জন্মকালে যোনিপথে সন্তান বাহির করা উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক বিবেচনা করিয়া, ধাত্রী তাঁহাকে

মুখের মধ্যে ঝিনুক ঠেসে ঢক্‌ঢকিয়ে দুধ খাইয়ে,
হাসি মুখে মরেন মাতা সোনার বাছার বালাই নিয়ে ;
হজম করা দূরের কথা, দুধের সাগর পেটেয় ধ'রে—
রাখ্‌তে যদি না পেরে সে হড়্‌হড়িয়ে বমন করে,
'আলাই-বালাই-ঘাট্'—বলে মা আবার দুগ্ধ খাওয়ান্ তারে ;
এই ক'রেত পেট্-রোগা হয়, লিভার বাড়ে মাসেক চারে।
'অন্নপ্রাশন' শেষ হ'লে তার দু'বেলা ভাত চল্‌তে থাকে,
বিলাতী ফুড্, চুষি, মিঠাই—কতই চলে ভাতের ফাঁকে।
এই ভাবে হয় শিশু পালন বাংলা দেশের প্রতি ঘরে,
এই ক'রেত কাঁচা বংশ ঘুণ ধ'রে হায় নুইয়ে পড়ে।
বাঙ্গালী মা'র পাঁচ বছরের কোল্-জোড়া ধন আঁচল-নিধি,
দু'পা রাস্তা হাঁট্‌তে গেলেই—দুর্‌দুরিয়ে কাঁপে হৃদি ;
হাত পা পাছে ভাঙ্‌বে ব'লে থাক্‌বে খোঁকা ঘরের কোণে ;
(এম্‌নি ক'রেই রসাতলে যাচ্ছে ছেলে মায়ের গুণে !)

শিক্ষার পেষণে বালকের সর্ব্বপ্রকারের অনিষ্ট

হাতে খড়ি হ'লে বাছার ঢোকেন সুখে বিদ্যালয়ে,
'বিদ্যাভুতুম" হবেন তিনি সেক্ষপীরের পরিচয়ে।
নেল্‌সনাদির জীবন-চরিত, গ্রীসের পুরাণ, রোমের কথা,
হেন্‌রী রাজার কোন্ স্ত্রী ছিল সবার চেয়ে পতিব্রতা,
জ্যামিতি আর ত্রিকোন্‌মিতি, বীজগণিতের আশিস্ রাশি,
বইতে মাথায় শুকিয়ে আসে বাছার মুখের মধুর হাসি।
রামায়ণ আর মহাভারত, বেদ-বেদাঙ্গ রইল প'ড়ে—
'বটতলা' আর 'বসুমতি', 'বঙ্গবাসী'র গুদাম ঘরে ;
'শ্রীরামচন্দ্র কাহার জায়া, সীতা ছিলেন্ কাহার ভাই' !—
অনেক ধাড়ী খোকার মধ্যে এরূপ প্রশ্নের অভাব নাই !

প্রসূতির উদর চিরিয়া বাহির করেন; বলা বাহুল্য ইহাতে উভয়েরই প্রাণরক্ষা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য ধাত্রীবিদ্যায় প্রসূতির অস্ত্রোপচারের বিষয় যে অধ্যায়টিতে লিপিবদ্ধ করা আছে, শিজারের যুগকে অমর করিবার জন্য সেটিকে 'সিজেরিয়ান্ সেক্সন্' নামে প্রচলিত করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-নীতি, স্বদেশ-প্রীতি, দেশের ইতিবৃত্তগুলি—
বিদ্যালয়ের কাজীরা সব যত্নে রাখেন শিকেয় তুলি'।
"স্বাস্থ্য খোঁজে আস্ত গাধায়, ভজে কেষ্ট-রাধা-রাম ;
বাস্তবের এ 'মডার্ণ' যুগে পুরাণ-কথার নেইক দাম।
ও-সব রেখে ম্যাথু-মিলেরক্যাণ্ট্-মেকলের ভক্ত হ'লে ;
কিছু না হোক্ সবার মাঝে উপাধি-হার গলায় দোলে"—
এই ব'লে যে উচ্চ-শিক্ষা কর্‌তে ছোটে কত ছেলে !
প্রাণ কাঁদে হায় বেচারীদের শেষ অবস্থা ভাব্‌তে গেলে।
ছাত্র চেয়ে পাঠ্য বইয়ের ওজন অনেক বেশীই হবে ;
সরস্বতীর ব্যবসাদারী এমন্‌টি আর কোথায় ভবে ?
ধর্ম্মনীতি বিবর্জ্জিত যে শিক্ষালয় তৈরী করে—
কেরাণী-পাল, উকীল, দালাল, শাসক দলের সুখের তরে,
গরীব পিতার মুদ্রা চোষে, ছেলের শোষে রক্ত যে,—
(সেই) কর্ম্মনাশা শিক্ষাদাতার ঘুঘুর বাসা পুড়িয়ে দে।
অর্দ্ধ জীবন দুঃখে-কষ্টে অনিদ্রা আর অশ্রু-জলে,
হয় কাটাতে যার সেবাতে পাষাণ-কঠিন চরণ-তলে,
যাহার কৃপায় দুধের বাছায় অজীর্ণ ক্ষয় ধ'চ্ছে ঠেসে ;
যাহার তুলি ফেরায় 'কলি' অনেক যুবার কালো কেশে,
যাহার তরে দেশের-দশের ভবিষ্যতের আশা-স্থল—
হচ্ছে কৃশ, কাণা, কুঁজো, বধির—ব্যাধির বিন্ধ্যাচল,*
পূজাতে যার প্রতি মন্ত্রে হচ্ছে দিতে রূপাঞ্জলি,
খড়্গ যাহার বছর-বছর হাজার শিশু দিচ্ছে বলি,
চিনিয়ে জগত, স্বরূপ দেখ্‌তে কৌশলে যে রাখ্‌ছে বাকী,
মনুষ্যত্ব হরণ ক'রে গড়্‌ছে খাঁচার তোতাপাখী ;

---

* সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োজিত "ছাত্র মঙ্গল সংসদ" (Student Welfare Scheme) এখানকার অধিকাংশ কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শতকরা প্রায় ৩২ জন ছাত্র রীতিমত কৃশ, ৪০ জন কোল-কুঁজো, ৮ জনের দাঁত খারাপ, প্রায় ৫০ জনের চ'খের দোষ আছে; এবং তাঁহাদের মতে, প্রতি তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুইজনের দেহের কোন-না-কোন ব্যাধি বিদ্যমান্ ও তাহার রীতিমত চিকিৎসা হওয়া দরকার।

যাহার দয়ায় দ্বারে দ্বারে কলম-পেষা রুটির তরে,
শুষ্ক মুখে বি, এ, এম, এ, বিফল হ'য়ে ঘুরে মরে,

[—"গরীব নাচার, বাবা ; হয় একটা প্রাইভেট টিউসনি, নয়ও একটা ত্রিশ টাকা মাহীনার চাকরী, নিদেন্ একটা পয়সা বাবা! হাজার চার-পাঁচ টাকার সেলামী নিয়ে এই বাড়ীর কর্ত্তামহাশয়রা আমার কাঁধে চারটি ডিগ্রীর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন বাবা!]

যাহার ফন্দী—স্বাধীন চিত্ত বন্দীশালে বদ্ধ করা,
ভাবিস্ কিরে এখনও তার পূর্ণ হয়নি পাপের ভরা ?
ভাঙ্‌রে তারে কঠিন হাতে, নূতন ক'রে আবার গড়্ ;
স্বস্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য দীক্ষা, 'নৈব ভিক্ষা' প্রচার কর্ !

নারীর শোচনীয় দুরবস্থা

দেখ্‌রে চেয়ে অন্যদিকে পল্লীবালার মলিন মুখ ;
পল্লী সাথে তারও আজি ফুরিয়ে গেছে সকল সুখ।
লোকাচার আর সমাজ-শাসন, কুসংস্কার, দেশাচার,
সর্ব্বোপরি রোগের জ্বালা ছিঁড়্‌ছে তাদের প্রাণের তার।

একে একে নিভ্‌ছে তাদের ঘরের আলো, জীবন-তারা ;
চক্ষে ঝরে সলিল-ধারা—হ'চ্ছে স্বামী-পুত্র-হারা।
অর্দ্ধাসনে এক-কাপড়ে কাল কাটাচ্ছে সীমন্তিনী ;
তাদের প্রাণের হাসির উৎস শুকিয়ে গেছে অনেক দিনই।
বারোয় যাদের হচ্ছে বিয়ে, তেরোয় তাদের কোল্‌টী যোড়া ;
বছর-বছর যে না বিয়োয়, সে নাকি হয় কপাল-পোড়া !
সমাজ-বুড়োর চোখ্ ফুটাতে মর্‌ল কত স্নেহলতা,
তবুত কই ঘুচল না ওই বিরাট-পাপের পণ-প্রথা।
দশ বছরেই পড়্‌লে মেয়ে বাপের শিরে বজ্র হানে ;
নিঠুর পিতা এখনও দেয় দুধের মেয়ে গৌরী-দানে।
দুদিন পরেই স্বামী কেমন ভালো ক'রে চেনার আগে,
থান পরা আর শাঁখা ভাঙার, একাদশীর পরব লাগে।
বিদ্যাসাগর ছিলেন মূর্খ, তোরাই বড় বুদ্ধিমান ;
পাচ্ছ এখন বাল-বিধবার চক্ষুজলের প্রতিদান !
যেথায় সতীর পূণ্য তেজে কাঁপ্‌ত হৃদয় যমরাজারই,
প্রতি বারো নারীর মধ্যে একটি সেথায় বারনারী।
প্রতি ছ'টি স্ত্রীয়ের মাঝে একটি যেথায় বাল-বিধবা,
স্বামীর পূজায় দিচ্ছে যারা টাট্‌কা প্রাণের রক্ত-জবা,
মচ্ছে যেথায় হাজার-করা দু'কুড়ি মা আঁতুড় ঘরে,
ইচ্ছা ক'রে বইছে যারা রোগের বোঝা পরের তরে,
প্রতি বছর হাজার হাজার অচিকিৎসায় যমের ঘরে—
নিচ্ছে যাদের জরায়ু রোগ, সুতিকা আর যক্ষ্মা, জ্বরে,
যেথায় বালা জর্জ্জরিতা পিশাচ পতির অত্যাচারে,
(যার অভাবে কেউ এ ভবে সৃষ্টি-রক্ষা কর্‌তে নারে—)
যাদের নরে বদ্ধ করে হেঁসেলে আর শয়ন-ঘরে,
অন্ধ যেথায় পুরুষ-চক্ষু নারীর স্বাস্থ্য-সুখের পরে,
সেথায় তাদের দুঃখ দেখে পাষাণ-বক্ষ ফাটে হায় !
শক্তিময়ীর অংশ নারী, দৈন্য কি তার দেখা যায় ?
অথর্ব্ব এই সমাজটারে ভেঙে চুরে নূতন কর্ ;
নারীরে দে' শিক্ষা-ভক্তি, হবি যদি শক্তিধর !

জাতি বাঁচিলে তবে স্বরাজ

দেখ্‌রে বারেক মনে ভেবে—স্বাস্থ্য সকল সুখের সার ;
বালক-বৃদ্ধ-বণিতারও বাঁচার আছে অধিকার।
আমরা হোলুম গরীব ছোট, জগত মাঝে সবার চেয়ে ;
মর্‌ছে ভুগে ভুগ্‌ছে ম'রে দেশের কত ছেলে-মেয়ে।

বড় বড় যুদ্ধে যত লোক মরে তার চেয়েও বেশী.
মার্‌ছে মানুষ করাল খড়্গে ম্যালেরিয়া এলোকেশী।
মর্‌ছে যত দ্বিগুণ তত থাক্‌ছে হ'য়ে জীবন্মৃত ;
মরেনি স্ত্রী সতীদাহে—প্রসব-কালে মর্‌ছে যত।
ওলাউঠা, হাম, বসন্ত, প্লেগ, আমাশা, টিটেনাসে,
যায় যদি প্রাণ হাজার লোকের, পাঁচশ লোকে মর্‌ছে ত্রাসে।

[শমন-রাজের রপ্তানি-সেরেস্তা (Export Department)]

নিবার্য্য এই ব্যাধির বিষে বঙ্গ-পল্লী উজাড় হ'ল ;
ওগো ধনী সহরবাসী, বারেক তোমার মুখটি তোলো !
চাইনা স্বরাজ, স্বদেশী সাজ, দেশের যদি জীবন গেল ;
চাই সুশিক্ষা, স্বাস্থ্য ভিক্ষা, সেই দিকেতেই দৃষ্টি ফেল।
চাই উদার মাঠ, গগন ললাট, পানীয় জল বাতাস আলো।
নয়ত, খাঁটি দাওয়াই-এলাজ্, চাই গ্রামে এক বদ্যি ভালো।
চাই চাষার গান, রমণীর মান, শান্তি-নিদান শিশুর হাসি ;
চাই দু'মুঠো দু'বেলা চাল, চাইনা সোনা রূপার রাশি।
চাই নিরোগা সবল দেহ, চাই উঁচু মন, সরল প্রাণ ;
তারপরে চাই চরকা নাটাই, তাঁতের মোটা বস্ত্র দান।
'আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।'—তাইতে আগে বাঁচ্‌তে চাই ;
জীবন-যুদ্ধে শক্তিহীনের হয়না ত জয় কোথাও ভাই।
নিজের গর্ত্ত বুজিয়ে নে'রে, পরের ফুটো খুঁজ্‌বি শেষে ;
রোগের খাজনা থামা দেখি—আস্‌বে স্বরাজ আপনি দেশে !

বাঙ্গালা কি প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর ?*

লেখক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল্।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে, প্রথমেই ম্যালেরিয়ার কথা মনে আসে এবং বাঙ্গালী যে পুরুষানুক্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য, তাহা অনেকের নিকট জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নিরপেক্ষ ভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে স্থানবিশেষে জ্বর ও মৃত্যু দেখা যাইত বটে, কিন্তু নানাবিধ পীড়ার এরূপ প্রকোপ ও তন্নিবন্ধন ভীষণ মৃত্যু কখনও দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ বিগত ১৩২৫ ও ১৩২৬ সালে যেরূপ সমগ্র বাঙ্গালাব্যাপী জ্বর ও তজ্জনিত মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব। গবর্ণমেণ্টের সেন্সাস্ রিপোর্ট আলোচনার ফলে, মৃত্যুসংখ্যা যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। ভগবানের উদ্দেশ্য কি এই, যে, বঙ্গদেশ একেবারে জনশূন্য হয় ? সহৃদয় ও বিচক্ষণ পাঠকবর্গ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন. ইহা কতদূর সত্য।

সবিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে যে গ্রামে প্রবল জ্বর ও মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে সেই-সেই গ্রামে মুচীপাড়ায় জ্বর প্রায় দেখা যায় না এবং অকাল মৃত্যু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই একটী গ্রামে মুচী সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্বর ও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তাহাও অতি সামান্য। যদি লোকক্ষয়ই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মুচীসম্প্রদায়ের মধ্যে লোকক্ষয় হইতেছে না কেন ? চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই ধারণা করিতে পারিবেন যে, লোকে নিজের দোষেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহা না হইলে মুচী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি ব্যাধিগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে না কেন ?

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে আমি যশোহর, খুলনা, নদীয়া, হুগলী, মুর্শীদাবাদ, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অনেক জেলার পল্লীগ্রামের সংবাদ লইয়াছি এবং যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার মীমাংসা সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। পাঠকবর্গ এই মীমাংসার সত্যাসত্য-বিচার ইচ্ছা করিলে, নিজনিজ গ্রামের এবং জেলাস্থ অন্যান্য গ্রামের মুচীপাড়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে নিম্নলিখিত গ্রামগুলির মুচীপাড়ায় জ্বর বা মৃত্যু নাই বলিলেই হয়! কিন্তু অন্যজাতির মধ্যে জ্বর ও মৃত্যু সমধিক পরিমাণে ঘটিয়াছিল।—যথা, জেলা হুগলির অন্তর্গত আকনা ও সিংউড়, জেলা যশোহর ষ্টেশনে নওয়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী শ্রীধরপুর, দীঘিরপার, পুঁড়াখালি প্রভৃতি গ্রাম ও ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত বল্লাগ্রাম; খুল্‌না জেলার অন্তর্গত থানা কলারোয়ার নিজ কলারোয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও ঐ জেলার থানা-তালার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ এবং কপিলমুনির নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি, জেলা নদীয়ার থানা হাঁসখালীর অন্তর্গত রামনগর পাচীউড়া ও থানা জীবন-নগরের অন্তর্গত বাঁকাগ্রাম; জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী মল্লিকপুর, ও জেলা মুর্শীদা-বাদের থানা নওদার অন্তর্গত গ্রামগুলি।

কোন কোন গ্রামের মুচীপাড়ায় পীড়া দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সকল পাড়া কতকটা ভদ্রলোকের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী, বৃক্ষাদিতে, আচ্ছাদিত এবং ভিজা ও সেঁতসেতে।

* প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইলে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।—"স্বাস্থ্য-সমাচার" সম্পাদক।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে, একই গ্রামের একাংশে পীড়া ও মৃত্যু, এবং অপরাংশে পীড়া ও মৃত্যুর একান্ত অভাব। যদি স্থানের দোষই পীড়া ও মৃত্যুর একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ের একই রূপ দশা ঘটিত। এরূপ স্বাস্থ্যের তারতম্য সকলেরই বিবেচনার বিষয়। প্রকৃতিদেবী কেন এক শ্রেণীর উপর সদয় এবং অপর শ্রেণীর উপর নির্দ্দয়—দেখা যাইতেছে? সাধারণ জ্ঞানে এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যাইতে পারে; যেমন ব্যক্তি বিশেষের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইলে তাঁহার মনোমত কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ প্রকৃতি দেবীর অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে তাঁহার অনুমোদিত পথ অবলম্বন করাই বিধেয়। সুতরাং প্রথম শ্রেণী প্রকৃতি দেবীর অনুমোদিত নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিয়া থাকেন, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়।

স্বাস্থ্যের তারতম্যের কারণানুসন্ধান।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, মুচী ও বুনো সম্প্রদায় মধ্যে জ্বর ও মৃত্যুর সংখ্যা এত অল্প কেন এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়—হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন—জ্বর ও মৃত্যু কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিপীড়িত হইতেছেন কেন? আমরা এই প্রবন্ধে মুচীদিগকে প্রথম সম্প্রদায় বলিব; হাড়ী, ডোম, ডুলে, বাগদী, বুনো প্রভৃতি কয়েকটী ইতর জাতির আচার ব্যবহার ইহাদিগের ন্যায় এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্য ইহাদিগের স্বাস্থ্যের তুল্য। সেকারণ ইহাদিগকেও প্রথম সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিব। এতদ্ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার লোককে দ্বিতীয় সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমেই উভয় সম্প্রদায়ের জীবন যাপন প্রণালী পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথম সম্প্রদায়ের জীবন যাপন প্রণালী।

আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক গ্রামে লোকালয় হইতে দূরে, গ্রামের প্রান্তভাগে প্রথম সম্প্রদায় বাস করে। তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহা সাধারণতঃ মাঠের মধ্যে খোলা স্থান। তথায় গাছপালা অতি সামান্য থাকে ও তাহাদিগের বাসস্থানের চারিদিকে কৃষিক্ষেত্র বা খোলা ময়দান। সুতরাং—সেখানে অবাধে বায়ু সঞ্চালন করিয়া থাকে। বাসস্থানের সন্নিকটে বৃহৎ বৃক্ষ, খানা খন্দক না থাকায় বৃক্ষাদির পাতা পচিয়া বায়ু দূষিত হইতে পারে না। আরোও, তাহারা বাসস্থান হইতে দূরে কৃষিক্ষেত্রে মলত্যাগ করে। ঐ মল শীঘ্রই মৃত্তিকায় পরিণত হয় বলিয়া চতুঃপার্শ্বের বায়ু দূষিত হইতে পারে না। সূর্য্যরশ্মি তাহাদিগের বাসস্থানের চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে পতিত হইয়া থাকে। যদিও কোন কোন পরিবার বৃক্ষতলে বাস করে, তথাপি তাহাদের গৃহের চারিদিকে সূর্য্য রশ্মি পতিত হওয়ায় ভূমি শুষ্ক থাকে এবং বর্ষার জল সঞ্চিত হইতে পারে না। উচ্চভূমি বলিয়া জল হইলেই তাহা সরিয়া যায়।

পরন্তু ইহারা পরিশ্রমী ও বিলাসিতাপরিশূন্য, এবং দেশের ও ঋতুর উপযোগী বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। যদিও ইহারা শীতকালে উপযুক্ত শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না, তথাপি ইহারা অগ্নিকুণ্ড করিয়া অগ্নিতাপ গ্রহণ করে। ইহার ফলে ইহারা ঋতুর বিপর্য্যয় সহ্য করিতে পরে, ইহাদিগের ত্বক্ দৃঢ় হয়, এবং ইহারা অধিকতর শৈত্য সহ্য করিতে সক্ষম হয়। ইহাদিগের পীড়া হইলে ইহারা উপবাস করে এবং শেফালিকা পাতার রস এবং অন্যান্য সামান্য গাছ-গাছড়া, টোট্‌কা-টাট্‌কা ব্যবহার করে। সাধারণতঃ বিদেশী কোন প্রকার ঔষধ সেবন করে না। কদাচিৎ কেহ কখনও সামান্য মাত্রায় কুইনাইন সেবন করে। বলা বাহুল্য, ইহাদিগের মধ্যে অনেকে সকল দিন দুবেলা আহার করিতে পায় না; এবং ইহারা আউস বা আমন চাউল যাহা পায় তাহাই খায়। অনুসন্ধানে ক্বচিৎ ২।১টী মুচী পাড়ার স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মুচীপাড়া জলা যায়গায়, অথবা নিবিড় বৃক্ষচ্ছাদিত স্থানে, কূয়া খানার নিকটে অথবা লোকালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত।

ঐ সকল স্থানে মুচীরা পচা পাট ধৌত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের জীবন যাপন প্রণালী

এক্ষণে দ্বিতীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা যাউক। এই শ্রেণীকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিব; যথা—(ক) কৃষক সম্প্রদায়, (খ) কৃষকেতর সম্প্রদায়।

(ক) শ্রেণী।

অগ্রে (ক) শ্রেণীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যাউক। এই শ্রেণীর সহিত প্রথম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুচী সম্প্রদায়ের অনেকটা ঐক্য আছে। সাধারণতঃ ইহারা খোলাস্থানে বাস করে। ইহাদের বাসস্থানে অবাধে বায়ু সঞ্চালন করে এবং সূর্য্য কিরণ পতিত হয় ও বর্ষার জল বাসস্থানে সঞ্চিত না থাকিয়া সরিয়া যাওয়ায়, ইহাদের বাসস্থান শুষ্ক থাকে। তবে ইহাদিগের অবস্থা খারাপ কেন? এক্ষণে দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে কি না দেখা যাউক। কৃষকেরা যে বায়ু সেবন করে তাহা বিশুদ্ধ নহে; কারণ প্রত্যেক কৃষকের বাসস্থানে অথবা নিকটে সার তৈয়ারী করার জন্য একটী করিয়া কূয়া থাকে। তাহাতে গোবর ও সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা রাখা হয়। কূয়ার সঞ্চিত জলে ইহা পচিয়া থাকে; এবং ইহা হইতে দুর্গন্ধময় বাষ্প সর্ব্বদা উত্থিত হয়; এবং তাহাই পরিবারবর্গ প্রতি নিয়ত সেবন করে। যাহার বাটীতে কূয়া নাই সেও বাটীর একস্থানে গোবর আবর্জ্জনা সঞ্চিত করিয়া রাখে। সুতরাং তাহা জলে পচিয়া যায় ও তাহা হইতে বিষাক্ত পদার্থ উত্থিত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়; উহারা তাহাই সেবন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কৃষকেরা সর্ব্বদা দুর্গন্ধময় জল ও বায়ু উপভোগ করে; এমন কি কোন কোন কৃষক বাটীর অতি সন্নিকটে পাট পচাইয়া থাকে।

২য় পার্থক্য এই যে কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ প্রথম সম্প্রদায় অর্থাৎ মুচী বুনাদিগের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল। কৃষকেরা পীড়া হইলে অপরিমিত কুইনাইন সেবন করে এবং সকল প্রকারের ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করে। আরোও, কৃষকদিগের কতকাংশ ভদ্রলোকের ন্যায় বিলাসপ্রিয় হইতেছে। এই শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ অত্যধিক পীড়া ও মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—

বনগ্রামের অন্তর্গত আকাইপুর গ্রামের নিকট অনেকগুলি মুসলমান পরিবার মহকুমা মেহেরপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া একটী মাঠের মধ্যে বাস করিতেছে। ইহারা গ্রামের নাম মেহেরপুরই রাখিয়াছে। ইহাদিগের চতুষ্পার্শস্থ গ্রামে ১৩২৫ সালে ভয়ানক পীড়া ও মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে জ্বর কি পীড়া হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত আকাইপুরের সন্নিকটে নওদা বলিয়া একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের মধ্য হইতে কতক লোক উঠিয়া লোকালয় হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে ঐ গ্রামের মাঠের মধ্যে বসতি করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে জ্বর কি মৃত্যু হয় নাই। বলা বাহুল্য এই সকল নূতন গ্রাম খোলা মাঠের মধ্যে থাকায়, তথায় অবাধে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় এবং তথায় অবাধে বায়ু সঞ্চালন করে; এবং সে বায়ুও বিশুদ্ধ।

(খ) শ্রেণী।

এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের (খ) শ্রেণীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সমুদায় ভদ্র হিন্দু-মুসলমানগণকে এই (খ) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইহাদিগের সহিত প্রথম সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুচী বুনাদিগের তুলনা করিলে সর্ব্ববিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

আমরা এক-একটী বিষয় লইয়া তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমতঃ ইঁহাদিগের বাসস্থান সাধারণতঃ খোলা জায়গায় থাকে না। যেখানে ইঁহারা বাস করেন, সেখানে বহু পরিবার ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া বাস করেন। বাসভবনের চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষাদি, গুল্মলতা

প্রভৃতি থাকে। বসতি বাটীতে ও চারিদিকে বড়-ছোট অনেক খানা ডোবা থাকে—তাহাতে বর্ষাকালে জল জমা এবং নিকটবর্ত্তী বৃক্ষাদির পাতা তাহাতে পতিত হওয়ায়, কালক্রমে পচিয়া দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপাদন করে। আরও, পূর্ব্বের ন্যায় পতিত জমি না থাকায়, তাহারা বাধ্য হইয়া বাটীর অতি সন্নিকটে মলত্যাগ করে। ইহাতেও বায়ু দূষিত হয়। চারিদিকে বৃক্ষাদি থাকায় বায়ু অবাধে সঞ্চালন করিতে পারে না। সুতরাং এই দুর্গন্ধময় বায়ু তথায় আবদ্ধ থাকে এবং এই দূষিত বাষ্প প্রতি নিয়ত সেবন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ বাস ভবনের চারিদিকে নানা প্রকার বৃক্ষাদি থাকায় সূর্য্যরশ্মি তথায় অবাধে প্রবেশ করিতে পারে না। একারণ বাসস্থান শুষ্ক হইতে পারে না—তাহা সর্ব্বদাই ভিজা থাকে। তৃতীয়তঃ বাসভবনে ও তাহার সন্নিকটে বর্ষার জল যাহা পতিত হয়, তাহা সরিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং বাসস্থান ও নিকটবর্ত্তী স্থান শুষ্ক হইতে পারে না। সর্ব্বদা জল জমিয়া বৃক্ষাদির পত্রাদি তন্মধ্যে পতিত হইয়া দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং ইহাই ভদ্রলোকগণ প্রতিনিয়ত সেবন করেন। চতুর্থতঃ, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বিলাসী এবং ভদ্র আখ্যাধারী। এই ব্যক্তিগণ প্রায়ই শ্রমবিমুখ এবং ইঁহাদিগের অনেকেই চা, সিগারেট প্রভৃতি ব্যবহার করেন; এবং কেহ কেহ নানাবিধ মাদক দ্রব্য সেবন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। বিলাস-স্রোত ভদ্র-সমাজে এরূপ ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে, এই শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকও জীবন ধারণের পক্ষে নিত্য আবশ্যক দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বিলাসের সেবা করিয়া থাকেন। পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে প্রবল গ্রীষ্মের যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ভদ্রলোকগণ শরীর আপাদ মস্তক গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। ইহাতে যে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয় তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টি রাখেন না। আহার সম্বন্ধেও দেখা যায়, দেশের ও কালের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালেও পলান্ন, লুচী প্রভৃতি গরম জিনিষ ব্যবহার করা হয়। যে ঘৃত দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা সাধারণতঃ বিশুদ্ধ নহে। ছানা চিনি, মাছ, দুধ, খই, মুড়ির স্থানে দূষিত ঘৃতপক্ক জিনিষের ব্যবহার ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। কি আহার—কি পোষাক সম্বন্ধে সাবেক মোটা চাল-চলন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এ বিষয়ে ইঁহারা প্রথম সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পথাবলম্বী।

পঞ্চমতঃ চিকিৎসা সম্বন্ধেও এই শ্রেণীর সহিত প্রথম সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সাধারণতঃ অপরিমিত কুইনাইন ও তীক্ষ্ণবীর্য্য উত্তেজক অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সাবেক নিয়মমত উপবাস বা দেশী গাছ-গাছড়ার ব্যবহার একরূপ লোপ পাইয়াছে।

এই সকল বিষয়ের ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে। যথা, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবা ও প্রাচীন অধ্যাপক পুরোহিতগণ এবং অন্য যাঁহারা সনাতন নিয়ম অনুসারে চলেন, তাঁহাদিগকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়। গত মানুষ গণনায় (census) হিন্দু বিধবাগণই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী সাব্যস্ত হইয়াছেন।

এই ত গেল বাঙ্গালার সাধারণ অবস্থা। বঙ্গের বাহিরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। আমি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গত ১৩২১ সালে স্থানীয় উকীল শ্রীযুত কেদার নাথ সেন মহাশয়ের সহিত ছোট নাগপুরের চাঁইবাসা নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। ওখানে যাইয়া শুনিলাম চারিদিকে জ্বর ও অন্যান্য পীড়া অত্যধিক হইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম সহরের মধ্যস্থলে যেখানে বহু লোকের ঘন সন্নিবিষ্ট বাসস্থান, সেইখানেই এই সকল পীড়ার প্রাদুর্ভাব। সহরের পশ্চিমদিকে নদীর ধারে

যেখানে সাহেবেরা বাস করেন সেখানে কোন পীড়া নাই। আবার সহরের সুদূর প্রান্তভাগে কয়েক ঘর বাঙ্গালী বাস করে—তাহাদের মধ্যেও কোনরূপ পীড়া নাই। তাহাদের বাসস্থান ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত এবং ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মধুপুর দেওঘর প্রভৃতি স্থানেও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ দেখা যাইতেছে। মধুপুরে আমার এক ঘনিষ্ট আত্মীয় পরিবারে অনেক দিন যাবত অবস্থান করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের বাটীতে জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি প্রায়ই দেখা যাইত এবং কয়েকজন ঐ স্থানেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে এরূপ বিচিত্র ঘটনা কেন? প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন দেওঘরে গিয়াছিলাম তখন পাণ্ডাপাড়া ভিন্ন অল্পসংখ্যক বাসস্থান ছিল। তাহাও বেশ ফাঁকা জায়গায়। তখন কারসটার্স টাউন, রামপাস্ টাউন প্রভৃতি হয় নাই। সে সময় ওখানকার স্বাস্থ্য অতীব উত্তম ছিল, কোনও পীড়া ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অল্পদিনেই স্বাস্থ্যলাভ হইত। আর এখন সেখানে বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি লাগিয়াই রহিয়াছে। এই সকল বিসদৃশ ঘটনার কারণ কি? এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই দেখা যাইতেছে যে স্থানের ভাল হাওয়ার উপর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। আজকাল মধুপুর ও দেওঘর সহরে পীড়ার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব থাকিলেও ঐ ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামগুলিতে সাঁওতাল প্রভৃতি ইতর জাতি সুন্দর স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছে। এই সকল কোল ও সাঁওতালগণের অবস্থা এতদূর খারাপ যে, তাহারা রীতিমত আহার বা পরিচ্ছদ পায় না এবং বিদেশী ঔষধ ব্যবহার করিবার সাধ্য নাই। এই সকল লোকের অবস্থা চাল চলন আমাদিগের দেশের প্রথম সম্প্রদায়ের অনুরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা কি ছোটনাগপুর কি সাঁওতাল পরগণার নিম্নতম সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্বর প্রায় দেখা যায় না ও তাহাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি উত্তম। অথচ অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্বর অত্যন্ত বেশী। একই দেশে একই স্থানে এরূপ বিসদৃশ স্বাস্থ্যের কারণ কি, তাহা সুধীগণের সর্ব্বতোভাবে বিচার্য্য।

স্বাস্থ্যের কারণ।

বর্ণিত অবস্থানুসারে সহজেই এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, সূর্য্যতাপ ভোগ, শুষ্কস্থানে বাস, পোষাক পরিচ্ছদ, পানাহার সম্বন্ধে সংযম, জ্বরের সময় উপবাস এবং স্বদেশজাত সামান্য ঔষধ সেবন, প্রথম সম্প্রদায়ের ঈদৃশ স্বাস্থ্য উপভোগের প্রধান কারণ। বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের আবাসভূমি বলিয়া কথিত হইতেছে। কিন্তু আজ যাহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, তাহাদিগের মধ্যে এ সমস্ত ব্যাধি নাই। তাহারাই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা করিতে সক্ষম। সাধারণতঃ তাহারা সবল সুস্থদেহ ও শ্রমপটু দেখা যাইতেছে। ইহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃসংশয়ে ধারণা করা যাইতে পারে যে, ইহারা প্রকৃতির যে সকল নিয়ম পালন করিয়া থাকে, সেই সকল নিয়ম অপর সম্প্রদায়ের লোকে প্রতিপালন করিলে, স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের মত সুস্থ ও সবল দেহে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, যে দেশের জল বায়ু ভাল, সেখানে ইহা আরোও বেশী কার্য্যকরী হইবে।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।—

এবারকার প্রথম ও শেষ আলোচনায় আমাদিগের পাঠকপাঠিকাগণকে একটি আনন্দ-সংবাদ প্রদান করিতেছি। স্বাস্থ্য সমাচারে "আয়ুর্ব্বেদের অবমাননা" "নারী জীবনের উদ্দেশ্য" "হিন্দু ডুবিল" প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজীর লেখক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশ-বৎসল ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, নবদ্বীপ গোয়াড়ীস্থ 'শ্রীবিশ্ব-মানদ মণ্ডল" নামধেয় পণ্ডিত-পরিষৎ তাঁহার "হিন্দু ডুবিল!" নামক উপাদেয়, সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া, "বিদ্যাবিনোদ" ও "সাহিত্যরত্ন" উপাধি-ভূষিত করিয়াছেন। ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বাবু ঢাকা মুন্সীগঞ্জের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসাজীব, গত ৪৩ বৎসর যাবৎ ইনি এই ব্যবসায় ব্যাপদেশে লিপ্ত আছেন; এক্ষণে ইঁহার বয়ক্রম ৬৩ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবার ন্যায় পরিশ্রমী। গত ৩৫ বৎসর যাবৎ অবিশ্রান্তভাবে Indian Mirror, Herald, Amrita Bazar Patrika, অনুসন্ধান, জন্মভূমি, বেদব্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয়—নানা সুযুক্তিবাদপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ-দ্যোতক মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া, সাধারণত দরিদ্রের চিকিৎসা, সেবা ও সাহায্য করিয়া, দেশের শাসক সম্প্রদায় ও জননায়কগণের নিকট পল্লীর শোচনীয় দুরবস্থা অপনোদনার্থে ক্রমাগত আবেদন, নিবেদন, তিরস্কার ও আক্ষেপ করিয়া, ইনি বাঙ্গালী জীবনের একটি আদর্শরত্নরূপে গণ্য হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ' ৯৫ সালের ঢাকা-ঝড়ের (Dacca Tornado) সময় কামাখ্যাচরণ নিজের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বহু বিপন্ন লোকের জীবন রক্ষা করেন, এবং প্রায় দুইমাস যাবৎ নিজ তত্ত্বাবধানে প্রায় ৬০০ শত আহত ব্যক্তির চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া নিরাময় করিয়া তুলেন। একবার রাজবাড়ী হইতে ঢাকা আসিবার পথে, কোন মহাজনের ৩ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রকে হঠাৎ নৌকা হইতে জলে পড়িতে দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল ধলেশ্বরীর বক্ষে ঝাঁপ দেন্ ও বহুকষ্টে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয়ে, "পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য-রক্ষা" নামক এক-খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া ২ লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত করান্! দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে পুস্তিকাখানির বিস্তৃত প্রচার মানসে, তিনি নাম মাত্র ⁄০ মূল্যে তদানীন্তন পূর্ব্ববঙ্গের লাট বাহাদুরের নিকট এই ষাইট পৃষ্ঠাপূর্ণ পুস্তিকাখানির একলক্ষ কপি বিক্রয় করেন। মধ্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তার আদেশে ইহা ইংরাজী, মারহাটি, উর্দ্দু ও হিন্দীভাষায় অনুবাদিত হইয়া তথাকার প্রতি গ্রামে বিতরিত হয়। এই অদ্ভুত-কর্ম্মা ডাক্তারের সমগ্র জীবনীর সম্যক আলোচনা করিলে, তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, পরার্থপরতা ও সহৃদয়তার এইরূপ অনেক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যাহা হউক, যোগ্য ব্যক্তিকেই যোগ্য রত্ন দান করা হইয়াছে। আমরা কামাখ্যা বাবুকে আন্তরিকতার সহিত অভিনন্দিত করিতেছি, এবং প্রার্থনা করি—তিনি যেন দীর্ঘতর জীবন লাভ করিয়া দেশের ও দশের সেবায় এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিয়া, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান্।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—স্থানাভাববশতঃ এই সংখ্যায় "পল্লী-স্বাস্থ্য" ও 'প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা' সন্নিবেশিত করা গেল না।

আগামী শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে ৮ই হইতে ১৮ই আশ্বিন পর্য্যন্ত আমাদিগের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২৯ সাল | ৭ম সংখ্যা

হাঁপানি—(Asthma)।

ডাক্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

এ পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা আমরা নিত্যই দেখি, নিত্যই ব্যবহার করি, অথচ, তাহাদের সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিদেবীকে যে কত পরিমাণে আয়াস স্বীকার করিতে হয়, কত জাতীয় জিনিষের সঙ্গে যে সেই সামান্য জিনিষের অদৃষ্ট এক সূত্রে বাঁধা থাকে, তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। প্রকৃতির অযাচিত দান বিধায়ে, তাহার মূল্যও কষিয়া দেখি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি চাউলের দানা ধরুন। এখনই না হয় চাউল মহার্ঘ হইয়াছে—পূর্ব্বে ইহা বেশ সুলভ ছিল। বঙ্গে, গৃহস্থের ঘরে ঘরে গোলা ছিল—কত পায়ে দলিয়া, কত ফেলিয়া-ছড়াইয়া চাউল ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এই একটি চাউলের দানা উৎপন্ন করিবার জন্য, তাহার বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। ভূমিকর্ষণ, বীজরোপণ, চারা উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ, যথোপযুক্ত পরিমাণে জলসেচন—এত পরিশ্রম করিয়া তবে একটা চাউলের দানা উৎপন্ন হইত। তাহার উপরে, জমীতে যে সার দেওয়া হইত, তাহার দোষ গুণ, জলসেকের ন্যূনাধিক্য, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি, সূর্য্যকিরণের ন্যূনাধিক্য, কীট-পতঙ্গের উৎপাত, গো-মহিষাদির উৎপাত নিবারণ—কত দিকের কতরূপ যত্ন পাইয়া তবে একটি কণা চাউল উৎপন্ন হয়। যে জমীতে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে জৈব ও লাবণিক পদার্থের তারতম্য, আবহাওয়ার অবস্থা প্রভৃতি কত জিনিষের উপরে যে একটা চাউলের দানা উৎপন্ন হওয়া নির্ভর করে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হাঁপানির কথা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই ভাবে প্রত্যেক কার্য্য-কারণের যোগ, শরীরের প্রত্যেক অংশের উপর অপরাংশের প্রভাব, প্রভৃতি অনেকগুলি কথাই বুঝিতে হইবে—নতুবা হাঁপানির মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হইবে না।

হাঁপানির কথা বুঝিতে হইলে, ঐ ব্যারামে যে যন্ত্রের বৈকল্য ঘটে, তাহারও পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

এইজন্য তৎসম্বন্ধে দুচারটি নীরস বর্ণনা-মূলক কথা বলিতে হইল। দেখিতে, কতকটা "স্পঞ্জের" (sponge). মত, কিন্তু কাযে, কামার-শালার হাপরের মত, আমাদের বুকের দুপাশে ফুকো বা

ব্যারামগ্রস্ত ফুসফুস ও শ্বাসনলীর চেহারা।

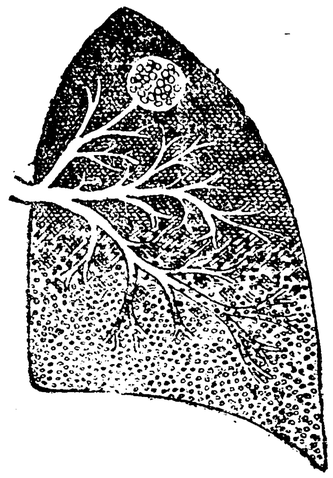

লাং (lung) বলিয়া দুইটি বেশ বড় বড় যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র দুটির গঠন ও প্রকৃতি একই রূপ। যেমন, যে কোনও ইমারতের চরম উপাদান ইষ্টক ও চুণ-সুরকি, তেমনি ফুসফুসের চরম বা ক্ষুদ্রতম খণ্ডে এই এই জিনিষ পাওয়া যায়—(১) একটি নল, (২) কোষ-সমষ্টি। জলে সাবান গুলিয়া, খড়িকা-কাঠির সাহায্যে

একটি শ্বাসনলীর ক্ষুদ্রতম অংশে স[illegible] তিনটি কোষগুচ্ছ।

সেই একবিন্দু জল লইয়া খড়ি[illegible]ান্তে একাধিক বুদ্বুদ সৃষ্টি করিলে যেমন দেখায়, [illegible] ফুসফুসের চরম খণ্ডও (final unit) অনেকটা তেমনি দেখায়। খড়িকার কাটি সংলগ্ন বুদ্বুদমালা ও ফুসফুসের ক্ষুদ্রতম অংশের দৃশ্যতঃ এই সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে গঠন ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। প্রথম তফাৎ এই যে, খড়িকার কাঠিটি কঠিন, অনমনীয়; এবং বুদ্বুদগুলি পরস্পরের গায়ে সংলগ্নমান,—একটি বুদ্বুদের ভিতরের কোঠার সঙ্গে, অপর বুদ্বুদের বা খড়িকা-কাঠির ছিদ্রের সংযোগ নাই। ফুসফুসের চরম বা ক্ষুদ্রতম খণ্ডে যে নল থাকে, তাহা নমনীয়—অর্থাৎ জোরে প্রশ্বাস লইলে, তাহার ভিতরের আয়তনকে যৎসামান্য বাড়ান যায় এবং ঐ নলের গায়ে মাংসপেশী জড়ান থাকার দরুণ, সেই মাংসপেশী কুঞ্চিত (spasm) হইয়া ঐ নলের ভিতরের আয়তন এত ছোট করিয়া দিতে পারে যে, তাহার ভিতরের পথ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়—প্রশ্বাস বায়ু প্রবেশের ও নিশ্বাস বায়ুর বাহির হইবার পথ না থাকারই মত হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, এই নলটির গায়ে যেমন মাংসপেশী জড়ান থাকে, তেমনি ইহার ভিতরের গাত্রে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane)

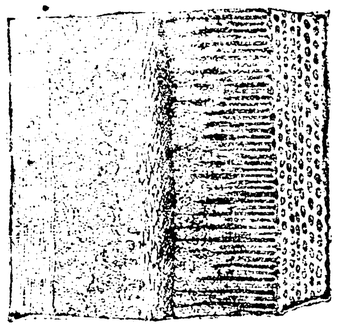

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির চেহারা—বিন্দু বিন্দু ছিদ্রগুলি ঐ ঝিল্লির মুখ।

নামক বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন এক প্রকারের ত্বক লাগান থাকে। এইবারে এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সম্বন্ধে দু'কথা বলিয়া লই। আমাদের মুখের ভিতরের চর্ম্ম আমাদের গায়ের চর্ম্ম হইতে বিভিন্ন। গায়ের চর্ম্মে লোম জন্মে, এবং তাহা হইতে গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্ম, ও সকল সময়ে এক রকম তৈলাক্ত পদার্থ, নিঃসৃত হয়। মুখের ভিতরে যে "চর্ম্ম" আছে, তাহাকে এবং ঐ জাতীয় দেহযন্ত্রের

অভ্যন্তরের দিকের চর্ম্মকেই শৈষ্মিক ঝিল্লি কহে। আমাদের মুখের লালা, নাকের সর্দ্দি—উভয়ই "শ্লেষ্মা" জাতীয় পদার্থ—অর্থাৎ, উহারা জলের চেয়ে ঘন, ক্ষার গুণাত্মক (alkali) এবং চট্‌চটে পদার্থ। এই শ্লেষ্মা আসে কোথা হইতে? যদি একটা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে চিরিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার যে দিকটা "বাহির বা উপরের পিঠ", সে দিকে অসংখ্য ছিদ্র আছে এবং উহার যে দিকটা "নিচের বা ভিতরের পিঠ", সে দিকটায় কতকগুলি কোষ (cell) আছে—সে কোষ সমষ্টিকে গ্ল্যাণ্ড (gland বা রসসঞ্চারী গ্রন্থি) কহে। এই গ্ল্যাণ্ডগুলি বড় চমৎকার জিনিষ। যেমন একই মাটির রসে জাম গাছে জাম ফলে, আম গাছে আম ফলে—তেমনি, শরীরের যেখানে যেখানে এই রসসঞ্চারী গ্ল্যাণ্ড আছে, সেই সেই জায়গার প্রয়োজনমত রস এই গ্ল্যাণ্ডগুলি সরবরাহ করে। সকল রসের মূল, রক্ত। চক্ষের জল সৃষ্টিকারী যে গ্রন্থি আছে তাহারা চক্ষের জলই সৃষ্টি করে—রক্ত হইতে সেই রস-সৃষ্টিকারী মসলা উঠাইয়া, সৃষ্টি করে। আমাদের পেটের মধ্যে যকৃত বলিয়া যে বৃহৎ গ্ল্যাণ্ডটি আছে, তাহা পিত্তই সৃষ্টি করে - সে পিত্তের মাল-মসলা (উপকরণ) রক্ত হইতেই সংগৃহীত হয়। এখন আমরা বুঝিলাম—গ্ল্যাণ্ড কি, তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্ম কত রকমের, তাহারা করে কি। কিন্তু গ্ল্যাণ্ডগুলি কি চব্বিশ ঘণ্টাই রস সৃষ্টি করিতেছে? না, তাহা নহে। চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে তাহারা সহজেই পরিশ্রান্ত ও জীর্ণ হইয়া পড়িত—এই জন্য, তাহারা চব্বিশ ঘণ্টা কাম করে না—আবশ্যক হইলে, তবে কায করে। চক্ষে কিছু পড়ুক—অমনি জলে চোখ ভরিয়া উঠিবে। জিবে খাবারের আস্বাদ বোধ হউক, অমনি লালায় মুখ ভরিয়া উঠিবে। নাসিকাভ্যন্তরে নস্যের ঝাঁজ লাগুক,—হাঁচির পর হাঁচি হইবে এবং সর্দ্দির সঞ্চার হইবে। পাকস্থলীতে খাদ্যের আগমন হউক, পাকাশয়িক রস তখনই সঞ্চারিত হইবে। আর দৃষ্টান্ত দিব না। ফল কথা, শরীরের কোনও স্থানে উত্তেজনার (stimuli) সৃষ্টি করার ফলে, তৎস্থানে রসের সঞ্চার হয়। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, চক্ষে যখন ধুলা পড়িয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তখনি সেই যন্ত্রণার অনুভূতি (রসনার বেলায়, খাদ্যদ্রব্য উপভোগরূপ সুখ-অনুভূতি) টেলিগ্রামের মত, মস্তিষ্কে সংবাদ দেয়—মস্তিষ্ক হইতে তখনি অনুমতি আসে,

বামপাশে থামের মত ঐটি মেরুদণ্ড। উহা হইতে সূত্রাকারে কতকগুলি স্নায়ুতন্তু নির্গত ও প্রবিষ্ট হইতেছে।

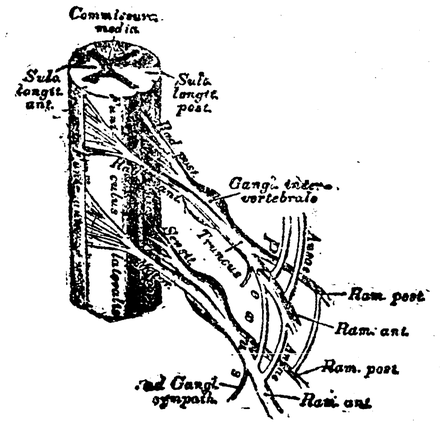

তবে রস সঞ্চারিত হয়। বাড়ীতে যেমন এক জন করিয়া কর্ত্তা থাকেন, এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে খরচ পত্রাদি করা হইয়া থাকে, এ দেহের ঠিক সেইরূপ একজন কর্ত্তা আছেন—সেটি মস্তিষ্ক (brain)। মৃত লোকের মস্তিষ্ক সজাগ থাকে না; এইজন্য, মৃতলোকের চোখে আঙ্গুল দেওয়া দূরের কথা, আগুনের ছেঁকা দিলেও, এক ফোঁটা জল পড়ে না। কাযেই, এখন বেশ বুঝা গেল যে—(১) দেহের যত যন্ত্র আছে, প্রত্যেক যন্ত্রেরই ভিতরের চর্ম্মকে "শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (বা মিউকাস্ মেম্ব্রেন) কহে। (২) এই মিউকাস্ মেম্ব্রেনের প্রধান অংশ—গ্ল্যাণ্ড বা রসসঞ্চারী গ্রন্থি। (৩) যে যন্ত্রে যে গ্ল্যাণ্ড আছে, সেই যন্ত্রের আবশ্যকমত রসই সেই সেই গ্ল্যাণ্ড তৈয়ারি করিয়া থাকে। (৪) রক্ত হইতেই প্রত্যেক গ্ল্যাণ্ড আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। (৫) প্রত্যেক গ্ল্যাণ্ডের রস সঞ্চারের জন্য, তিনটি জিনিষের আবশ্যক হইয়া থাকে; প্রথমতঃ, যে যন্ত্রের

জন্য রস প্রয়োজন, সে যন্ত্রকে উত্তেজিত করা চাই; দ্বিতীয়তঃ, সেই উত্তেজনার সংবাদ মস্তিষ্কে প্রবেশ করা চাই। তৃতীয়তঃ মস্তিষ্কের অনুমতি ব্যতীত, কোনও গ্ল্যাণ্ড রস সঞ্চার করিতে পারে না।

এতক্ষণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও তৎসংক্রান্ত গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে যত কথা বলিলাম, তাহার কারণ, বুকের ভিতরে যে শ্বাস-নল (ব্রঙ্কাই) আছে, তাহার ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, এবং সেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি গ্ল্যাণ্ডে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ, যদি ঐ ঝিল্লিতে কোনও উত্তেজনা ঘটে, তবে সেখানে এত সর্দ্দির সঞ্চার হইতে পারে যে, তাহার ফলে, ঐ শ্বাসনলী দিয়া বায়ু চলাচল করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ঐ শ্বাস নলীর নামগুলি শুনিয়া রাখা ভাল। মুখ হাঁ করিলে, জিহ্বার পিছনদিকে একটা

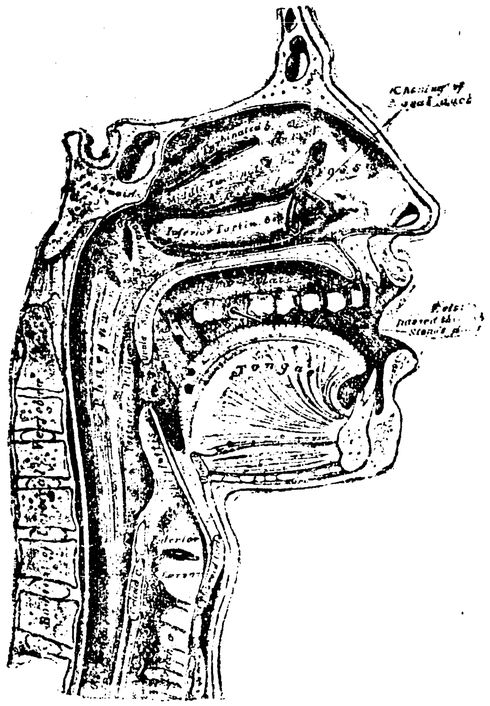

মুখ ও শ্বাসপথ গোড়া হইতে বরাবর দেখান হইয়াছে।

গহ্বর দেখা যায়—সেটা ছয়টি পথের সংযোগ স্থল; উপরের দিক হইতে আসিয়া শেষ হইয়াছে—নাসারন্ধ্রের দুইটি ছিদ্র; মাঝে, সম্মুখ দিকে, মুখের বিবর; পশ্চাতে, নিচের দিকে, খাইবার পথ (ঈসোফেগাস) ও শ্বাসপথ, ফেরিংস; এই কয়টি পথের সংযোগ স্থলকে ফসিস্ (fauces) বলে। এইখান হইতে শ্বাসনলীর আরম্ভ।

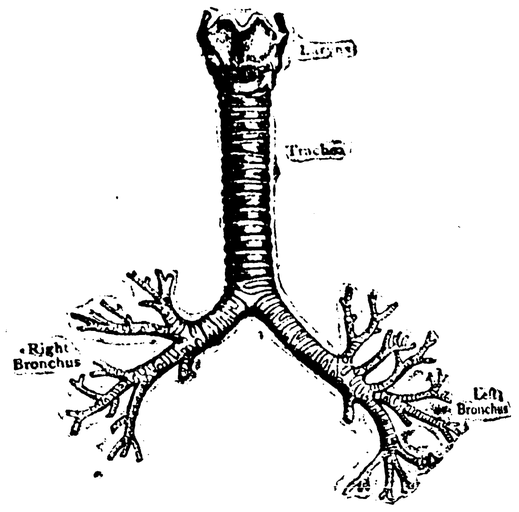

শ্বাসনলীর আকৃতি।

এইবারে যথাক্রমে শ্বাসনলীর নামগুলি বলিব:—(১) মুখবিবরের পশ্চাদংশ—ফসিস্। সেইখান হইতে যে শ্বাসনলীর আরম্ভ, তাহার নাম ফেরিংস্। (২) গলার সম্মুখ দিকে, "কণ্ঠা" বলিয়া উঁচু যেটি রোগা লোকের গলায় দেখা যায়, সেটির নাম "লেরিংস"। (৩) তাহার তলা হইতে গলদেশের শেষাংশ ও বুকের সংযোগ-স্থল পর্য্যন্ত শ্বাসনলীর যে অংশ, তাহাকে ট্রেকিয়া বলে। এই ট্রেকিয়া দ্বিখণ্ডীকৃত হইয়া দুপাশে দুইটি ফুসফুসে প্রবেশ লাভ করিয়া, সেখানে ফুসফুসের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেখান হইতে ব্রঙ্কাস্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমে ফুস্‌ফুসের মধ্যে ইহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অংশে যতই বিভক্ত হইয়াছে, ততই ব্রঙ্কিওল বা সূক্ষ্মতম ব্রঙ্কাস্ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কাযেই, ফুস্‌ফুসের যে ক্ষুদ্রতম বা চরমাংশের নলের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, তাহাদের নাম ব্রঙ্কিওল।

এইবার এই ক্ষুদ্রতম ব্রঙ্কিওলের প্রান্তস্থিত, বুদ্বুদ-প্রায় কোষগুচ্ছের (air vesicles) কথা বলিব।

বস্তুপক্ষে, নিত্যবায়ুপূর্ণ এই কোষগুলিই ফুস্‌ফুসের প্রধানের ব্যষ্টি। এই কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে লগ্ন ত বটেই, অধিকন্তু, তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগ আছে। ইহারা অতীব পাতলা এবং শ্বাসনলীর মত নমনীয় নয়, আদৌ-আকুঞ্চন-প্রসারণ-সক্ষম নহে। প্রত্যেক কোষগুচ্ছের চতুর্দ্দিকে বহু পরিসর স্থানে অসংখ্য রক্তবাহী শিরা-ধমনী কুণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে। রক্তবহা শিরা ধমণীর সঙ্গে এই কোষগুচ্ছের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যেমন ছাঁকনির সাহায্যে একদিকের বস্তু অপর দিকে প্রেরিত হয়, তেমনি এই কোষ-গুচ্ছের মধ্যে প্রশ্বাস বায়ু (inspiration) আসিয়া রক্তবহা শিরাগুলিকে অম্লজান বাষ্প (অক্সিজেন) দান করে এবং শিরাভ্যন্তরস্থ রক্ত হইতে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস নামক অবিশুদ্ধ বাষ্প উঠাইয়া লইয়া, নিঃশ্বাস (expiration) বায়ুর সাহায্যে সেই দূষিত বাষ্পকে বাহিরে প্রেরণ করে।

ফুস্‌ফুসের বর্ণনা শেষ করিলাম। এইবার আর দুইটি অত্যাবশ্যক কথা বলিব। প্রথমতঃ, হৃৎপিণ্ডের কথা। হৃৎপিণ্ডটি দুই ফুস্‌ফুসের মধ্যে ঝোলান আছে।

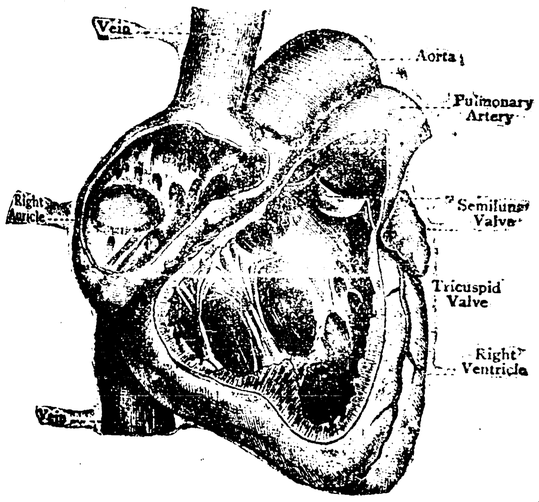

হৃৎপিণ্ড (বামদিক)।

ইহার কায, সমস্ত শরীরের মধ্যে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ নামক দূষিত বাষ্পের আধিক্য হেতু অপরিস্কার রক্তকে পাম্প করিয়া নিজের ভিতরের কোঠায় আনা এবং সেই অপরিষ্কার (অর্থাৎ কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস দুষ্ট) রক্তকে ফুস্‌ফুসের ভিতর দিয়া চালাইয়া অক্সিজেন বাষ্পের সাহায্যে পরিষ্কৃত করিয়া (অর্থাৎ রক্ত হইতে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস উঠাইয়া লইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে, রক্তের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস প্রবিষ্ট করাইয়া) সেই পরিষ্কৃত রক্তকে সমস্ত দেহের মধ্যে চালান করা। তাহা হইলে, হৃৎপিণ্ড দুইটি কায করে; এই দুই রকম কায করিবার জন্য ইহার দক্ষিণাংশে

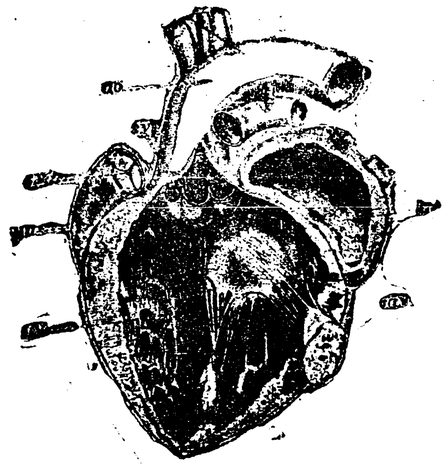

হৃৎপিণ্ড (বামদিক)।

একজোড়া কোঠা (চেম্বার) আছে এবং বামাংশেও একজোড়া কোঠা আছে। দক্ষিণাংশের কোঠায়, দেহের অপরিষ্কার (কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস-বহুল) রক্ত আমদানী হয়; বামাংশের কোঠা হইতে সুপরিষ্কৃত (অক্সিজেনযুক্ত) রক্ত সমস্ত দেহে ছড়ান হয়। হৃৎপিণ্ডের এই দক্ষিণাংশের সঙ্গেই ফুসফুসের বেশী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ফুসফুসের যে কোনও পীড়া হইলে, তন্মধ্যে অবাধ রক্ত চলাচলের স্থান কমিয়া যাওয়ার দরুণ, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশে অতিরিক্ত অপরিষ্কার রক্ত জমা হয়; হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশে অতিমাত্রায় রক্ত জমা হওয়ার ফলে, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হস্তপদাদির প্রান্তে ও ওষ্ঠে নীলিমা, মুখ বিবর্ণ প্রভৃতি দেখা যায়। আবার,

হৃৎপিণ্ডের যে কোনও পীড়া হইলেও, সেই ফল হওয়ায়, ফুসফুসের অতিমাত্রায় অপরিষ্কার রক্তের চালানি

হৃৎপিণ্ড (দক্ষিণদিক)।

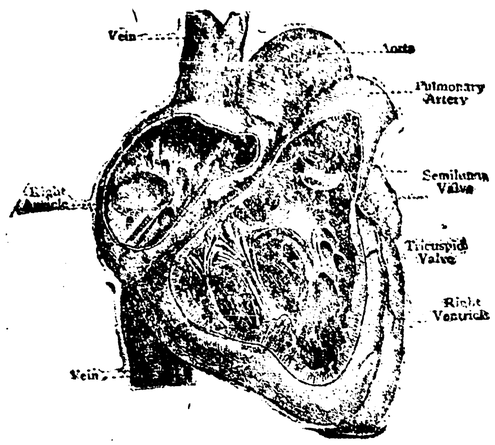

হয়, রোগী অনবরত কাশিতে ও হাঁপাইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশের সহিত ফুসফুসের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্মরণ রাখিবার জিনিষ।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জানিবার আছে নিত্য স্বভাবতঃ এই শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য চলে কিসের প্রেরণায়? অনেকেই লক্ষ করিয়া থাকিবেন যে, শিশু জন্মিয়াই চাৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং শীতকালে, হঠাৎ গায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেই, আমরা তখনিই খুব জোরে একবার প্রশ্বাস লই। অর্থাৎ, গর্ভে বাসকালীন যে শিশু গরম জলে ভাসিতে থাকে, প্রসবান্তে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায়, সে কাঁদে—অর্থাৎ, সজোরে প্রথম-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। শীতকালে গায়ে ঠাণ্ডা জল লাগিলে আমরা তাহাই করি। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, শ্বাস গ্রহণে চর্ম্ম একটি সহায়ক অঙ্গ। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণ, রক্তে মধ্যে অতিমাত্রায় কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের সঞ্চার। পূর্ব্বে গ্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, তাহা এই খানে স্মরণ করিতে হইবে। চক্ষে বালি পড়িলে যে কষ্টের অনুভূতি হয়, তাহা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্ক অনুমতি দিলে, তবে গ্ল্যাণ্ডগুলি চক্ষের জলের সৃষ্টি করে। ফুস্‌ফুসের মধ্যেও ঠিক ঐ প্রক্রিয়ায় কায হয়। অতি-মাত্রায় কার্ব্বনিক অ্যাসিড নামক দূষিত বাষ্প-সিক্ত রক্ত ফুস্‌ফুসে আনীত হইলে, তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে সেই বিষাক্ত হওনের সংবাদ প্রেরিত হয়; তাহার ফলে যে মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটে তাহার তালিকা এই:— (১) প্রত্যেক পঞ্জরদ্বয়ের মধ্যে দৃঢ় মাংসপেশী আছে; সেগুলি সংস্কুচিত হইলে, পঞ্জরগুলির নিম্নাংশকে কথঞ্চিৎ বাহিরের দিকে উল্টাইয়া দেওয়ার কায হয়। এক সঙ্গে দুই পার্শ্বের বারো জোড়া পঞ্জরের নিম্নাংশ উল্টানর ফল—বক্ষোগহ্বরের প্রসার বৃদ্ধি—অর্থাৎ, বাহির হইতে হাওয়া টানিয়া বুকের ভিতরে লইয়া যাওয়া। একটা রবারের শূন্যগর্ভ গোলকে (বলে) একটু ছিদ্র করিয়া সমস্ত হাওয়া বাহির

মস্তিষ্ক (ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের কার্য্য বিভাগ)।

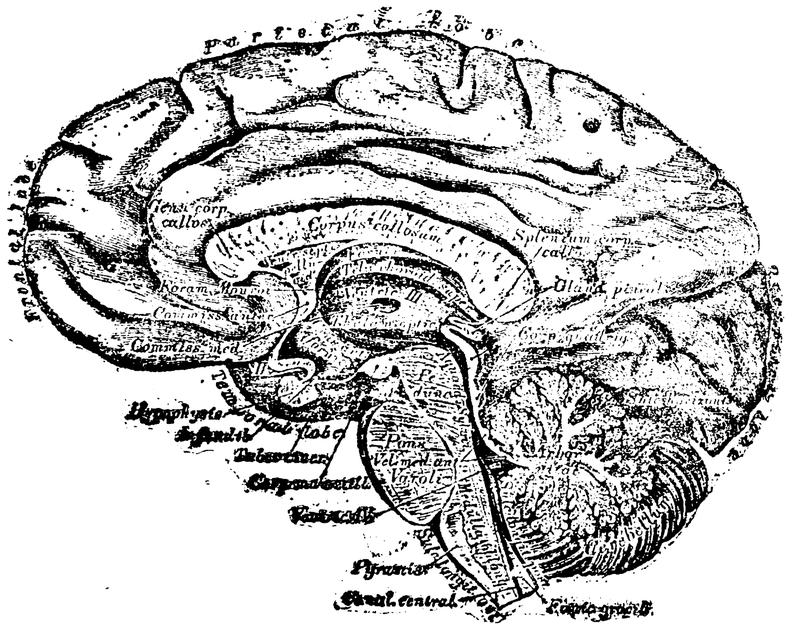

করিয়া দেওয়া যায়; এবং ঐ বলের উপর হইতে আঙ্গুলির চাপ উঠাইয়া লইলে, বাহিরের হাওয়া সোঁ-সোঁ করিয়া রবে উহার অভ্যন্তরে শোষিত হয়। পঞ্জরগুলির বাহিরের দিক উঠানর ফলও ঐরূপ—হাওয়া সোঁ-সোঁ করিয়া বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় (অর্থাৎ প্রশ্বাস গৃহীত হয়)। (২) বুক ও পেট—ইহাদের মধ্যে বিভাজক ছাদের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি মাংসপেশী আছে (diaphragm)। এইমাংসপেশীর সঙ্কোচনের ফলে, বুকের গহ্বরের প্রসারণ ঘটিয়া থাকে—বাহিরের হাওয়া বুকের ভিতরে টানিয়া লয় (প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ)। (৩) সুস্থ শরীরে, সাধারণতঃ, ঐ ঐ পেশীগুলির সঙ্কোচনেই প্রশ্বাস গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি শ্বাসকষ্ট হয়, তবে কণ্ঠের (neck) মাংসপেশী ও স্কন্ধদেশের (shoulders) মাংসপেশী-গুলিও শক্ত হইয়া অতিরিক্ত শ্বাস কার্য্যে সহায়তা করে। হাঁপানি রোগীদের কণ্ঠদেশের ও স্কন্ধদেশের পেশীগুলি প্রায়শঃই শ্বাসগ্রহণে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা উঠিয়া সোজা হইয়া ঘাড় শক্ত করিয়া বসিয়া, দুই হাত মাটিতে চাপিয়া কাঁধ তুলিয়া তবে শ্বাস লয়েন।

তৃতীয়তঃ, এই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে, এ শরীরের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে প্রত্যেক অংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহানুভূতি আছে। দৃষ্টান্ত যেমন। যদি কোনও কারণে "পেট গরম" হয় (অর্থাৎ অজীর্ণ, রুদ্ধ বা "কুপিত" বায়ু ও মলসঞ্চয় প্রভৃতি হয়), তবে উৎকাশির সৃষ্টি হয়। কাণে "কাঠি দিলে" কাশি হয়। গলায় (ফেরিংসে বা ল্যারিংসে) উত্তেজনা ঘটিলে, কাশি হয়। শুইলেই কাহারো কাহারো কাশি হয় (আল্‌টাজিভ্‌রা বৃদ্ধি হেতু)। উদরীযুক্ত রোগীর উদর হইতে দ্রুত "জল" নিষ্কাশনের ফলে কাশি হয়। প্লীহা বা যকৃত বড় হইলে, কাশি হয়। আর কত দৃষ্টান্ত দিব?

এইবারে আসল কথা পাড়িব। হাঁপানি ব্যারামটির স্বরূপ কি? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইলে, সেটা যেমন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয়, হাঁপানি ও কতকটা সেই রকমের ব্যারাম। যে ব্যক্তি ঐ ব্যারামে আক্রান্ত হয়, সে হয় ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছুই অসুস্থ বোধ করে না, বরং বেশী সুস্থই বোধ করে; এবং তদবস্থায় আহারাদি করিয়া, শয়ন করিয়া, সুখে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। নিদ্রাবস্থায়, ২।৩ ঘণ্টা থাকাব পর, অকস্মাৎ কে যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে এই বোধ করিয়া, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসে—তখন তাহার হাঁপানি আরম্ভ হইয়াছে। সে বিছানায় বসিয়াও সুস্থ বোধ করে না—দারুণ শীতকালেও গরম বোধ করে, এবং সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া জানালার নিকটে যাইয়া বায়ু সেবন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; তাহাতেও তাহার শান্তি নাই—মনে হয় যেন সে যথেষ্ট বায়ু পাইতেছে না, সে আরো হাওয়া চাহে। শীত-কালেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠে। কয়েক ঘণ্টা এই রকম কষ্ট পাইয়া, অকস্মাৎ স্বচ্ছন্দ বোধ করে—তখন তাহার হাঁপানি ছাড়িয়া যায়। ঝটিকার মত আসে, আস্তে আস্তে বা হঠাৎ থামিয়া যায়—ইহাই হাঁপানির ধর্ম্ম। ঠিক এই ধর্ম্মী আরো কয়েকটি ব্যারাম আছে, যথা—মৃগীগ্রস্ত (epilepsy) রোগীও হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাত পা খেঁচিতে থাকে এবং এক মিনিট কাল তদবস্থ থাকিয়া, শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। শূল বেদনা বা ফিক ব্যথাও (neuralgia) ঐ রকমে হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। যাহাদের আধ-কপালে (migraine মিগ্রেণ) ব্যারাম আছে, তাহাদেরও আকস্মিক পীড়ার উৎপত্তি হয়, এবং কখন ও কেমন করিয়া সে শিরঃপীড়ার উপশম হয়, তাহা তাহারা সকল সময়ে জানিতে পারে না। বাতের পীড়া (rheumatic fever), মধুমেহ (diabetes), বক্ষোশূল বা হৃৎপিণ্ডের শূল (angina pectoris), উপর্য্যুপরি অনবরত হাঁচি (paroxysmal sneezing), আমবাত (urticaria or nettle rash), উন্মত্ততা (mania), এ সকল গুলিই ঐ জাতীয় ব্যারাম—অর্থাৎ, ইহারা হঠাৎ আসে এবং অলক্ষিতে উপিয়া যায়।

অথচ "হঠাৎ", "অকারণ" বলিয়া কোনও জিনিষ

নাই। যে ব্যারামগুলির কারণ আমরা ঠিক জানি না, সেগুলিকে আমরা গায়ের জোরে "অকারণ" বলি। কিন্তু, একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, উপর্য্যুক্ত তালিকাভুক্ত প্রায় সকল ব্যারামগুলিরই একটি মূল বা সাধারণ কারণ বর্ত্তমান আছে—সেটি স্নায়ু-কেন্দ্রের অসংযম (instability of the nervous system)। এমন অনেক লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অত্যন্ত ধীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অসম্ভবরূপে সহিষ্ণু; সে রকম লোককে বাঘে ধরিলেও, সে চীৎকার করে না, নীরবে প্রাণপণে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, ফল যাহাই হউক। অপর এক শ্রেণীর লোক থাকে, যাহারা চঞ্চল প্রকৃতি, অসহিষ্ণু, রাগ-দ্বেষ-প্রবণ; তাহাদিগকে পিপীলিকা দংশন করিলে, চীৎকার করিয়া তাহারা সমস্ত পল্লীকে জড় করে। অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণীর লোকের স্নায়ুকেন্দ্রে ঘা দিলে, সংযতভাবে ও যথোপযুক্ত রূপ সাড়া (response) পাওয়া যায়; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের স্নায়ুকেন্দ্রে সেই ঘা লাগিলে, তাহার দেহের সমস্ত অংশকে আলোড়ন করিয়া স্নায়ুকেন্দ্রের সাড়া জ্ঞাপিত হয়। স্নায়ুকেন্দ্রের এই সাড়া দেওয়ার বিষয়টি (response of the central nervous system to peripheral stimulation) এখানে একটু বুঝান প্রয়োজন। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত ধরুন। আজ আমি কলিকাতায় যদি হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হই, তবে কি হয়? (ক) আমার আত্মীয়েরা আমার গ্রামস্থ পিতা-মাতাকে "তার" বা টেলিগ্রাফ করেন। অর্থাৎ, আমার কষ্ট বা বিপদসূচক বার্ত্তা টেলিগ্রাফ করা হয়, আমার গ্রামে। (খ) সেই বার্ত্তা পাইয়া, আমার পিতা ক্ষণিক চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করেন। এবং (গ) স্থধু আমার পিতা চলিয়া আসিতে পারেন; অথবা গোষ্টিবর্গ সকলকে সঙ্গে করিয়া, রোরুদ্যমান, বা চিন্তাকুল অবস্থায়, কলিকাতার বাসাবাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। এখানে পরে পরে তিনটি কায হইল :—(১) কলিকাতাস্থ আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমার কষ্ট বা বিপদের কথার অনুভূতি (feel) করিলেন; অর্থাৎ আমার কুশল চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন। (২) তাঁহাদের সেই উত্তেজনা প্রসূত কথা সংবাদবাহক "তার" আপিসের মারফত আমার গ্রামে প্রেরিত হইল, আমার পিতার নিকটে। পিতা সেই সংবাদের গুরুত্ব বিবেচনা করিলেন, অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিলেন, যথোপযুক্ত অর্থ বা খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন এবং উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন—"কাহাকে পাঠাই?" "রাম ছেলে মানুষ, শ্যামের শরীরটা তেমন ভাল নয়, হরি বড় অমনোযোগী, বিষ্ণু বেশ পাকা লোক" ইত্যাদি নানারূপ বিচার বিবেচনা করিয়া, তিনি শেষে বিষ্ণুকেই আমার নিকটে প্রেরণ করা স্থির করিলেন, এবং স্বয়ং অথবা লোক মারফতে বিষ্ণুকে সেই আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। (decision, after taking into consideration all available information)। (৩) তখন বিষ্ণু হাত-পা-চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতির সাহায্যে আমার নিকটে উপস্থিত হইল (action)। কাযেই—প্রথমে অনুভূতি চাই, তৎপরে বিচার চাই, তৎপরে কর্ম্ম চাই। আমাদের দেহে ঠিক এই ভাবেই নিত্য কায হইতেছে। নিদ্রাতুর অবস্থায় পায়ে মশক দংশন করিল, সেই কষ্টানুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরিত হইল; মস্তিষ্ক তোমার হাতের উপরে হুকুম চালাইল, তুমি হাত দিয়া মশককে তাড়াইলে বা মারিয়া ফেলিলে। কথার পিঠে কথা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—কিন্তু উপায়ান্তর নাই—বিষয়টি বড়ই জটিল। এই সঙ্গে, এখানে আরো দুইটি বিষয় তলাইয়া বুঝিবার আছে। প্রথমটি হইতেছে,—অনুভূতির আসল স্থান কোথায়? সেটি বুঝিতে হইতে আবার টেলিগ্রাফের কথা পাড়িতে হয়। টেলিগ্রাফের একটা তার যেমন কলিকাতা হইতে তোমার দেশের আপিস পর্য্যন্ত আছে, তেমনি আর একটা তার, তোমার দেশ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আছে। একটা তারে (অনুভূতি-সূচক) সংবাদ যায়, অপর তারে (কার্য্য করিবার) হুকুম আসে। আমাদের দেহেরও প্রত্যেক অংশ হইতে, নাড়ী বা স্নায়ু (nerve) নামক অতি

সূক্ষ্ম সূত্র মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত যায়, আর অপর একটি সূক্ষ্ম নাড়ী মস্তিষ্ক হইতে সেই স্থানে আসিয়া শেষ হয়।

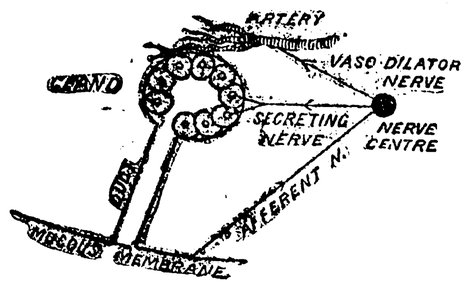

প্রতিফলিত ক্রিয়ার ছবি (reflex action.)

তোমার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে স্ফোটক হইলে, তুমি বলিবে, "আমার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়াছে!" কিন্তু বস্তুত, বেদনার অনুভূতি মস্তিষ্কে ছাড়া অপর কোথাও হয় না। দৃষ্টান্ত গ্রহণ করঃ—দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধে আহত হওয়ার

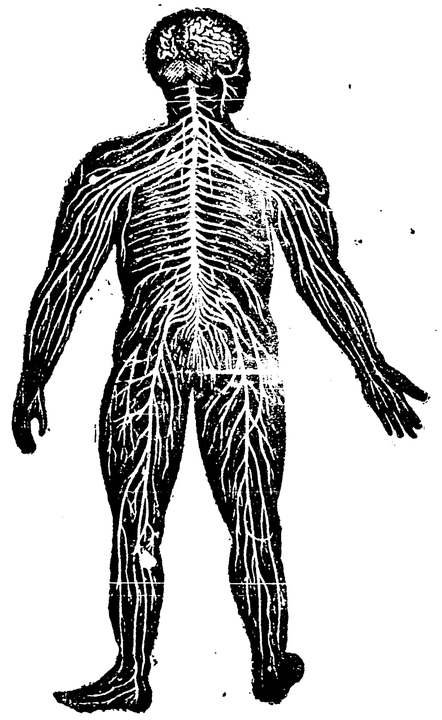

সমগ্র দেহে নাড়ীর (nerves) বিস্তৃতি।

ফলে যাহার সমস্ত বাম বাহু কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে, সে ব্যক্তিও প্রথম-প্রথম (অর্থাৎ তাহার আজন্ম অভ্যাস বশতঃ) হঠাৎ জাগ্রত অবস্থায় বলিয়া উঠে, "উঃ আমার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনা বোধ হইতেছে"—অথচ তাহার অঙ্গুষ্ঠই নাই, "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা"!!! বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে বেদনার অনুভূতি অভ্যাস-মূলক—মায়িক কল্পনা মাত্র, অভ্যাসের ফল। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের বোধ-শক্তি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নাই—বোধও মস্তিষ্কে হয়—অভ্যাস বশতঃই আমরা বলি "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনা" ইত্যাদি। অভ্যাস করিলে, এই ভ্রমকে দূর করা অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশেষ করিয়া বুঝিবার কথাটি—মস্তিষ্কের কায সম্বন্ধে। মস্তিষ্কের কায কি? (ক) এই মাত্র বুঝিলাম, বোধশক্তি (feeling) মস্তিষ্কের একটি কায (অর্থাৎ brain is the seat of sensation)। (খ) উপরে দেখাইয়াছি যে, রোগীর পিতা রাম, শ্যাম, হরি প্রভৃতির প্রত্যেকেরই অবস্থা জ্ঞাত। অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চয়ও (knowledge,) মস্তিষ্কের কায। (গ) গৃহস্থের টাকার বাক্সের বা লোহার সিন্ধুকের একটা তাকে (shelf) বা একটা "খুব্‌রি"তে (pigeon-hole) টাকা থাকে, অপরটাতে দুয়ানি থাকে, অপরটাতে নোট থাকে, অপরটাতে পয়সা থাকে ইত্যাদি; আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেও আমরা দেখিয়া বা শুনিয়া বা অভিজ্ঞতা করিয়া যত কিছু উপায়ে জ্ঞান লাভ করি, সেই সমস্ত আহৃত জ্ঞান, আহৃত সিকি দুয়ানির মত মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছাপ দিয়া যায়;—এই পূর্ব্বাহৃত জ্ঞান আবার যখন পুনরায় জাগ্রত হয়, তখন আমরা তাহাকে স্মৃতি (memory) বলি। গানের কলের (গ্রামোফোণের) সম্মুখে গান করিলে সেই গানের সুর বায়ুতে যে হিল্লোল বা স্পন্দন (vibration) সৃষ্টি করে, তাহার ফলে গানের চাক্তিতে (disc) ছাপ পড়িয়া যায়; সেই চাক্তির উপরে সূচ চালাইলে বায়ুতে সেই সেই তরঙ্গ পুনরায় উত্থিত

করিয়া সেই সেই গানকে পুনরায় গীত করে। মাস্তিষ্কের ভিতরেও সেইমত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের (knowledge)

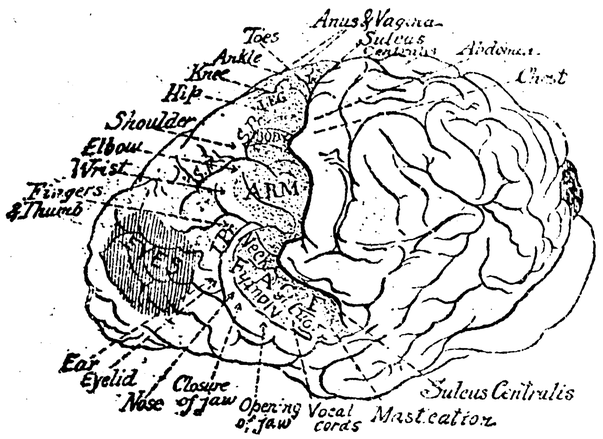

মস্তিষ্কের কোথায় দেহের কোন্ অংশের কায হয়।

ছাপ পড়ে; সেই সেই ছাপগুলি পরস্পরের সহিত সূক্ষ্ম স্নায়ু (নাড়ী) তন্তুদ্বারা সংযুক্ত থাকায়, যখন ইচ্ছা একটা ছাপ হইতে সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর পথে অপর ছাপ পর্য্যন্ত মন ভ্রমণ করিয়া স্মরণশক্তির বিকাশ ঘটায়। (ঘ) মস্তিষ্কের আর একটা কায—বিচার করা (judgment)। ইহাও উক্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু (নাড়ী) সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। কেমন করিয়া তাহা হয়, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনে কর, তুমি নির্জ্জনে কোথাও একটি সোণার বালা পথের উপরে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে। তখনি তোমার দারিদ্র্যের কথা মনে হইবে (স্মরণ), অমনি হাত বাড়াইবার জন্য মন ব্যাকুল হইবে (অর্থাৎ হাতের পেশীগুলি কর্ম্ম করিতে চাহিবে); সেই সঙ্গেই, তুমি চতুর্দ্দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিবে, কেহ দেখিতে পাইল কি না (অর্থাৎ পুলিশের কথা স্মরণ) আর লোকাপবাদের কথাও বিচার করিবে (জেলের কষ্ট, সামাজিক হেয়তা-প্রাপ্তির কথা স্মরণ ইত্যাদি)—পরে পরে, একটা পূর্ব্বাহৃত জ্ঞান হইতে অপর জ্ঞানের উদয় এবং তৎসঙ্গে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটান। এইরূপ কায অলক্ষিতে, নিমেষের মধ্যে মস্তিষ্ক মধ্যে হইয়া যাইবে। ইহাও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অথবা পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসের ফল। এই যে পুলিশ, জেল, সমাজ শাসন, তোমার আত্মীয়বর্গের ক্ষতি প্রভৃতি নানা বিষয়িণী চিন্তা, এগুলির সমষ্টি ফলই বিচার (judgment)। এই বিচারকালে, পুলিশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্ব-সঞ্চিত জ্ঞানের কথার যুগপৎ স্মরণ কার্য্য ঘটিয়া থাকে, সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে। যাহার মস্তিষ্কে এই সংযোগ তন্তুগুলি বেশ সুস্থ থাকে, এবং যাহার পূর্ব্বাহৃত জ্ঞানের ছাপগুলি বেশ সুস্পষ্ট (অর্থাৎ জাগ্রত) থাকে, সে ব্যক্তি ধীর, শান্ত, সুবিচারক হয়। আর যাহার মস্তিষ্কে এই সংযোজক তন্তুগুলি তেমন সুস্থ থাকে না, এবং যাহার পূর্ব্বাহৃত জ্ঞানের ছাপ সুস্পষ্ট থাকে না, তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলেই, এমন দ্রুত ও এলোমেলো ভাবে সে সংবাদটি সূক্ষ্মতন্তুগুলিতে ঘা দিতে থাকে যে, তাহার মস্তিষ্কের কতক অংশ জাগ্রত হয় না, কতক অংশ অতি মাত্রায় আলোড়িত হয়—তাহার ফলে সে হঠকারিতার, অবিবেচনার, দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বংশানুগত গভীর ব্যারাম (syphilis), মাদক সেবন প্রভৃতির দোষ থাকিলেই, মস্তিষ্কের (অর্থাৎ স্নায়ু কেন্দ্রের) অসংযম আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দুই কারণ ছাড়াও অপর অনেক কারণ আছে। আশা করি যে, পাঠক পাঠিকাগণ এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হাঁপানি প্রভৃতি "অকারণে" হয় না। প্রবল ঝটিকাকারে যে যে ব্যারাম আসে, সে গুলির মূলে "স্বোপার্জ্জিত" বা বংশানুক্রমিক মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য বা অসংযম। আর, যেমন এক পিতার বহু সন্তানেরা পরস্পর রক্তসূত্রে আবদ্ধ, তেমনি, অকস্মাৎ যে ব্যারামগুলি আসে, ধরিতে গেলে, তাহারা পরস্পর "জ্ঞাতি-ভ্রাতা"। অর্থাৎ, মদ্যপ পিতার এক সন্তান মৃগী, দ্বিতীয়টি হাঁপানি, তৃতীয়টি শূলব্যাধি, চতুর্থটি হৃৎপিণ্ডশূল প্রভৃতি ব্যাধি-গ্রস্ত হইতে পারে। অথবা, দুই তিন পুরুষের মধ্যে এই কয়টি ব্যারামের রকম-ফের দৃষ্ট হইতে পারে। এই কথাটি বেশ যত্ন করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে।

এক্ষণে হাঁপানি ব্যারামের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে—অসংযত স্নায়ুকেন্দ্র না থাকিলে, হাঁপানি হইবার সম্ভাবনা নয়।

এইবারে হাঁপানির সময়ে বুকের ভিতরে কি হয়, তাহার বর্ণনা করিব। (১) সব চেয়ে বেশী করিয়া লক্ষিত হয়—শ্বাস নলীর ক্ষুদ্রতম অংশ (ব্রঙ্কিয়োল গুলিতে) মাংসপেশী থাকে, তাহার আক্ষেপ (অর্থাৎ অকস্মাৎ খেঁচুনি spasm) হয়—তাহার ফলে, তাৎকালিক ও ক্ষণিকের জন্য, সেই শ্বাসনলীগুলির ছিদ্র এক প্রকার বন্ধই হইয়া যায়—বুকের ভিতরে হাওয়া সহজে ঢুকিতেও পায় না, বাহির হইতেও পায় না—বুকের মধ্যে যে হাওয়া ঢুকিয়াছিল তাহাই বুকের মধ্যে কতকটা আবদ্ধ রহিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত বুকের সমস্ত ক্ষুদ্রশ্বাসনলীর এই ভাবে আক্ষেপ হয় না, সেরূপ হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী —তবে অধিকাংশ শ্বাসনলী গুলিরই আক্ষেপ হয়—তাহাও একত্রে হয় না—এখানে আক্ষেপ সুরু হইল ত ওখানে আক্ষেপ বন্ধ হইল—পুকুরে বৃষ্টির জল পড়িলে যেমন দেখায়—এইক্ষণে এখানে একফোঁটা, পরক্ষণে ওখানে, ঠিক্ সেই ভাবেই আক্ষেপ হইতে থাকে। (২) এই ক্ষণিক আক্ষেপের ফলে, বায়ু-কোষগুলি রুদ্ধ বায়ু পূর্ণ থাকে এবং সত্বরই সে বায়ু দূষিত (অর্থাৎ অতিমাত্রায় কার্ব্বনিক অ্যাসিড বাষ্পযুক্ত) হইয়া পড়ে। তাহার ফলে, রোগী বিশুদ্ধ বায়ু পাইবার জন্য পাগল হয়। এখানে আবার দুইটি কাযের কথা বলিতে হইবে। প্রথমটি এই যে, রক্তে কার্ব্বনিক অ্যাসিড বাষ্প জমিলেই আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়—হাওয়া পাইবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে। দ্বিতীয় কথাটি এই যে, মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান আমাদের দৈহিক ক্রিয়ার উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। আমাদের মাথার পিছনে যেখানে কেশ আসিয়া শেষ হইয়াছে, ঘাড়ের সেই অংশে, মেডাল্লা অবলংগেটা (medulla oblongata) নামক মস্তিষ্কের যে অংশ আছে, সেই স্থানে আটটি দৈহিক ক্রিয়ার কেন্দ্র আছে; তন্মধ্যে—শ্বাস ক্রিয়া, ঘর্ম্মনিষ্ক্রামণ ক্রিয়া ও রক্ত চলাচল (vaso-motor) ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যতম; অর্থাৎ যদি কোনও কারণে, ফুস্‌ফুসের মধ্যে কার্ব্বনিক অ্যাসিড বাষ্পের আধিক্য ঘটে, তবে, সেই সংবাদ এই মেডাল্লাস্থ

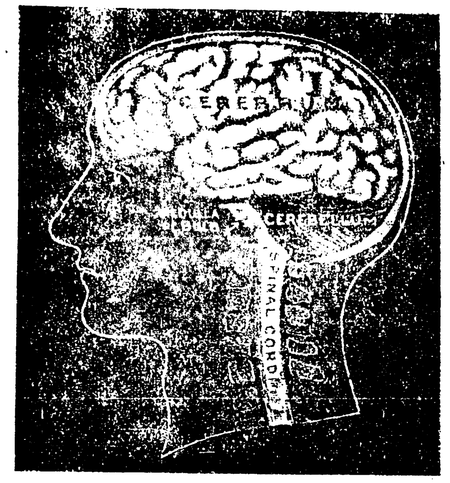

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ছবি।

শ্বাসকেন্দ্রে পৌঁছিবা মাত্রেই, খুব জোরে এবং দ্রুততর বেগে, শ্বাস প্রশ্বাস লইবার কায যে যে পেশীগুলির সাহায্যে হইয়া থাকে, সেই সেই পেশীর উপরে উক্তরূপে উক্ত কার্য্য করিবার আদেশ ঐ স্থান হইতে আইসে। (৩) হাঁপানির সময়ে, কোনও কোনও রোগীর কখনো কখনো শ্বাস-নলীগুলির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উত্তেজিত হইয়া, সর্দ্দি বা শ্লেষ্মার সৃষ্টি করে—সকল রোগীতে তাহা করে না। যাহাদের শ্লেষ্মা উঠে, প্রায়শঃই, বেশ ভাল করিয়া শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে, তাহাদিগের হাঁপ ছাড়িয়া যায়। (৪) হাঁপানির সময়ে বুকের ভিতরে হাওয়া বদ্ধ থাকার ফলে, রক্তচলাচল ভাল করিয়া করে না—কাযেই, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশ রক্তে পরিপূর্ণ থাকিয়া যায়।

এইবার হাঁপানির কারণ তথ্য আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই স্মরণ করাইয়া দিই যে, যাহাদের স্নায়ুকেন্দ্র অসংযত (un-stable) সুধু তাহাদেরই হাঁপানি হইবার কথা। অর্থাৎ, জন্মগত বা স্থানগত বা শিক্ষাগত দোষ প্রযুক্ত ক্ষেত্রটি প্রস্তুত না থাকিলে, হাঁপানি প্রায়শঃই হয় না। এই জন্য, হাঁপানিকে

কুলগত ব্যাধি বলা হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকিলে, যে যে কারণে হাঁপানির "ফিট্" হয়, তাহারা তিন শ্রেণীভুক্ত :—

(১) স্থানিক কারণ—অর্থাৎ ফুস্ফুসের কোনও দোষ হইতে উৎপন্ন। "ব্রঙ্কাইটিস্" (bronchitis) নামক ব্যারাম থাকিলে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে হাঁপানি দাঁড়াইতে পারে। আকস্মিক আবহাওয়া (meteorological) বা স্থান পরিবর্ত্তনের (climatic) ফলে, বায়ুর আর্দ্রতার তারতম্যানুসারে সর্দ্দি হইয়া, হাঁপানিতে পরিণত হইতে পারে।

(২) স্নায়বিক (cerebral) কারণ—রাগ, ভয়, দুঃখ প্রভৃতির আধিক্য হইলে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে হাঁপানি হয়।

(৩) প্রতিফলিত (reflex) কারণ—অর্থাৎ শরীরের কোনও স্থানে উত্তেজনা বা বেদনার ফলে হাঁপানি হয়; যেমন নাসারন্ধ্রে পলিপাস (polypus) বা আব (tumour) হইলে, "নাসা" হওয়ার মত নাসারন্ধ্রের গাত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজনা বা রক্তাধিক্য ঘটিলে, ধূলি বা পুষ্পরেণু বা ধান ঝাড়িবার সময়ে তাহার গন্ধ নাকে যাইলে, পালক বা পশমের কণা

প্রতিফলিত ক্রিয়ার (reflex act) ছবি।

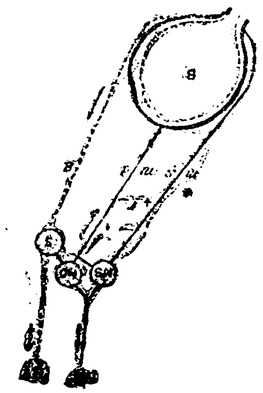

নাকে প্রবিষ্ট হইলে, বিড়াল প্রভৃতির সান্নিধ্য ঘটিলে, জরায়ুর পীড়া ঘটিলে, ক্রমাগত কোষ্ঠ কাঠিন্য হইলে, অনবরত অজীর্ণ ও "চোরা" অম্লব্যাধি হইলে, পেট গরম হইলে ইত্যাদি। ধান কাটার সময়ে ধানের গন্ধে, বা পুষ্প-পরাগ গন্ধে, বা বিড়াল প্রভৃতি জন্তুদের সান্নিধ্যে যে হাঁপানির উৎপন্ন হয়, তাহাকে রেণুজ হাঁপানি (hay fever বা hay asthma) বলে।

এইবার চিকিৎসার কথা বলিব। এখানেও একটা গোড়ার কথা বলিয়া রাখি, সেটা এই :—হাঁপানি ব্যারামটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক;—কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, হাঁপানি যত প্রবল ভাবেই হউক না কেন, উহাতে মৃত্যু প্রায় হয় না। এই ব্যারাম রোজ হয় না—অধিকাংশ স্থলে, কালেভদ্রে হয়। কাযেই, যখন হাঁপ ধরে, তখন রোগী "কষ্ট" মুক্ত হইবার জন্য পাগল হয়—কিসে হাঁপ কমিবে তাহাই চায়—হাঁপ ছাড়িয়া গেলে, "রোগ" মুক্ত হইবার জন্য তাহার আদৌ চেষ্টা হয় না। "ধরিলেই চিঁ চিঁ, ছাড়িলেই লাফ"—এই প্রবাদ বচনটির সার্থকতা দেখায়। কাযেই, চিকিৎসার কথা বলিতে যাইয়া "কষ্ট" মুক্তির কথাই বেশী করিয়া বলিব, "রোগ"-মুক্তির কথা সামান্য ভাবে বলিব।

রোগমুক্তির কথা।—যাঁহারা রোগমুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত হইতে হইবে। সেগুলি এই এই :—(১) যে দেশের জলবায়ু সহে, এমন দেশে যাইয়া মুক্তিকামী রোগীকে বাস করিতে হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাড়াগাঁয়ের মেটো হাওয়ার চেয়ে, সহরের হাওয়া বেশী হাঁপানি রোগীর সহ্য হয়। কলিকাতার মত ধূলি ও ধূমবহুল সহরে শীতকালে অত্যন্ত ধোঁয়া ও কুয়াসা হয় বলিয়া, হাঁপানি রোগীরা শীতকালে কলিকাতার বাহিরেই ভাল থাকেন। যাহাদের সর্দ্দি (ব্রঙ্কাইটিস্) হইয়া হাঁপানি হয়, খুব শুক্না আবহাওয়া দেখিয়া তাঁহাদের সেখানে থাকা ভাল। (২) হাঁপানির কারণ বর্ণনাকালে "প্রতিফলিত কারণের" তালিকাভুক্ত কারণগুলিকে ধ্বংস করিতে হইবে। নাক, গলা, বুক প্রভৃতি যেখানে যত ব্যারাম আছে, সে সমস্তকেই নির্দ্দোষরূপে সারাইয়া লইতে হইবে। (৩) ভোজনবিলাসী হইলে চলিবে না। অতি-ভোজন, গুরুপাক খাদ্য ভোজন, অসময়ে ভোজন—একেবারে দিব্য দিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সে দিনের আহার শেষ করিতে হইবে। বৈকালের আহারে দুধ, মাংস, ডিম্ব, বেশী ডাইল, ক্ষীর, দধি, মিষ্টান্ন, প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। সায়ংকালীন, সাদাসিধা "মাছের ঝোল ভাত", বা দুধ-খৈ, বা দুধ-সাগু খাওয়াই ভাল। (৪) নিত্য স্নানের অভ্যাস রাখিতে পারিলে ভাল। দিবারাত্র দরজা জানালা খুলিয়া শয়নের অভ্যাস রাখিতেই হইবে। (৫) নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধ রাখিতে হইবে। (৬) সাধ্যমত ব্যায়াম করা আবশ্যক। (৭) রোগীর কাশ হইতে ভ্যাক্সীন্ প্রস্তুত করাইয়া, তাহারই অধস্তাচিক প্রয়োগ

করা আবশ্যক। ইহাতে উপকার না হইলে, (৮) সোয়ামিন (soamin) ইন্জেক্সন করান উচিত। মাত্রানুসারে ১ হইতে ৫ গ্রেণ করিয়া, ৪।৫ দিন অন্তর দিতে হয়। ইহার প্রয়োগের পূর্ব্বে, এবং কয়েকবার প্রয়োগ করিবার পরে, মাঝে মাঝে চক্ষু ও প্রস্রাব পরীক্ষা করান ভাল। (৯) সাবধানে প্রাণায়াম ও বংশীবাদন অভ্যাস করা ভাল। এবং যে যে কায করিলে, বুকের দম বাড়ে, এমন কায খুব, খুব সাবধানে—অতি সাবধানে—অভ্যাস করা ভাল।

কষ্ট মুক্ত হইবার জন্য—(১) সেবনীয় ঔষধ।—ষ্ট্র্যামোনিয়াম টিংচার, টিংচার লোবিলিয়া ঈথার, টিংচার বেলাডনা; টিংচার হাইয়োসায়েমাস, পটাশ ব্রোমাইড, প্যারালডিহাইড, ক্লোরাল হাইড্রেট, ক্লোরেটোন, একষ্ট্র্যাকট্ গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা লিকুইড্, একষ্ট্রাকট্ ইউফরিয়া পিলুইফেরা লিকুইড্, বমনকারক ইপিকাক, ফেনাজন্, পটাশ আইয়োডাইড্, ক্যাফিন্ সাইট্রাস্। (২) ধোঁয়ার আকারে সেবনীয়—সোরাদ্রবে ভিজাইয়া শুকান ব্লটিংকাগজ। (৩) আঘ্রাণ করিবার জন্য :—অ্যামিল্ নাইট্রাইট (৩—৫ মিনিম), পাইরিডীন (১০—১৫ মিঃ), আইয়োডিক্ ঈথার, ক্লোরোফরম্। (৪) অধস্তাচিক প্রয়োগের জন্য :—অ্যাড্রেনালিন্ হাইড্রোক্লোরাইড্ সলিউসন্ (৫—১০ মিঃ), মর্ফিয়া (১/১২—১/৬ গ্রেণ), অ্যাট্রোপিন্ সাল্ফেট্ (১/১০০ গ্রেণ) (৫) গলায় ও নাসারন্ধ্রে স্প্রে-রূপে প্রয়োগের জন্য :—অ্যাট্রোপিন, কোকেন।

চিকিৎসার স্থূল কথা বলিলাম। এইবারে দু একটি সাঙ্কেতিক ইঙ্গিত দিব।—(১) যাঁহারা নাসারন্ধ্রে কোকেন প্রভৃতির স্প্রে (সূক্ষ্ম কণার আকারে ঔষধের দ্রব-প্রয়োগ) ব্যবহার করেন, তাঁহারা তখনকার মত কষ্ট মুক্ত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ কঠিনতর হইয়া দাঁড়ায়—সহজে আর কোনও ঔষধে তাহাদের উপকার হয় না। Tucker's Medicine বলিয়া যে স্প্রে-জাতীয় ঔষধ আছে, তাহার কিয়ৎকাল ব্যবহারের ফলে, রোগী অপর কোনও রকম চিকিৎসায় আরাম পান না। অতএব এই জাতীয় ঔষধের ব্যবহার বর্জ্জনীয়।

(২) পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যে রোগীর প্রায়ই এক সময়ে নিত্য হাঁপানি আরম্ভ হয়, তাঁহাদের উচিত ঐ সময়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এইটি একমাত্রা সেবন করা :—

Re Antipyrin x grs.
Caffeine ii grs. (Citrate নহে)
Pulv. Digitalis Fol. ½ gr.

অনেক সময়ে, এই এক মাত্রা দুচার দিন উপর্য্যুপরি সেবনের ফলে হাঁপানির 'পালা" বন্ধ হয়।

(৩) হাঁপানি রোগীর পক্ষে চা অপকারী বটে; কিন্তু কড়া (strong) কাফির (coffee) decoction কাথ সেবনে সামান্য হাঁপানি সারিয়া যায় এবং কমিয়াও যায়।

(৪) অবস্থা ভেদে, এই দুইটি প্রেস্কৃপসনে বড়ই উপকার পাইয়াছি :—

(ক) Re
Pot. Iod. iii grs.
Liqr. Arsenicales iii m.
Caffeine Citras vii grs.
Aq. Camphoræ ad i oz.
Every 3 hours, till relieved.

(খ) Re
Spt. Ether. Co. ½ dr.
Spt. Ether. Nitrosi i dr.
Spt. Chloroformi xx m.
Aq. Chloroformi ad i oz.
Every 2 hours, till relieved.

(৫) অধস্তাচিক প্রয়োগের ঔষধের মধ্যে—Sol. Adrenalin Hydrochloride (1 : 1000) ৫ মিঃ ই যথেষ্ট এবং আশু ফলপ্রদ। এই ঔষধটি লালবর্ণ হইয়া গেলে আর উহাকে ব্যবহার না করাই উচিত। মর্ফিয়ার মত নিশ্চয় ও আশুফলপ্রদ ঔষধ আর নাই।

(৬) যে সকল পেটেণ্ট ঔষধ হাঁপানির আরোগ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে খুব বেশী মাত্রায় আর্সেনিক আছে।

[হৃৎপিণ্ড বা বৃক্ক (kidney) যন্ত্রের বৈকল্য বশতঃ যে হাঁপানি রোগ হয় তাহার বিষয়ে কিছুই এই প্রবন্ধে লিখিত হইল না।]

সংক্রামক রোগ ও তাহা নিবারণের ব্যবস্থা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৮৬ পৃষ্ঠা, শ্রাবণ ১৩২৯)

(জনৈক দীন-সেবক সঙ্কলিত)

Oxygen gas এর ন্যায়—ozoneও একটী স্বাভাবিক Disinfectant। ইহাও Oxygenএর ন্যায় বায়ু-মণ্ডলে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা Disinfectantএর কার্য্য কতদূর সম্পাদিত হয়, তাহা বিশেষ কিছুই জানা নাই। তবে অনেকের না কি বিশ্বাস, Oxygen অপেক্ষাও ইহার দ্বারা রোগের বিষ অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয়।

উত্তাপ এবং শৈত্য দুইটী স্বাভাবিক Disinfectant। সকলেরই বোধ হয় জানা আছে যে, রোগীর কাপড়ে ও অন্যান্য পদার্থে রোগের বীজ সংস্পৃষ্ট হইলে তাহা উত্তাপ দ্বারাই বিনষ্ট হয়। কিন্তু শৈত্য দ্বারা—Disinfectantএর কার্য্য কত দূর হয় জানা নাই। বরং দেখা গিয়াছে যে, শৈত্যপ্রধান প্রদেশে অনেক ক্ষুদ্রজীব নষ্ট না হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। জাহাজে মাংস অনেক দিন রাখিতে হইলে, তাহা ত বরফের ঘরেই রাখিতে হয়। তাহাতে মাংস না পচিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে এবং ক্ষুদ্র তৃণও শীতপ্রধান স্থানে বেশ জন্মিয়া থাকে। অতএব শৈত্যকে রোগ বীজ বিনাশের উপায় বলিয়া ততটা বিশ্বাস করা যায় না। তবে জলে ধৌত করায় যে শৈত্য প্রয়োগে Disinfect হয়, ইহা কতকটা বলা যাইতে পারে। ধ্বংস করাই অগ্নির কার্য্য। এজন্য উত্তাপকেই স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সংক্রামণ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই উত্তাপ যোগে সংক্রামক রোগের বীজ নিবারণ করিবার জন্য "Disinfecting Stove" নামক এক প্রকার যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে রোগীর ঘর Disinfect করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বিলাতে অনেক কারিকর অনেক প্রকারের এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এক্ষণে উত্তাপ কি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে রোগের বীজ নষ্ট হয় তাহা জানা আবশ্যক। টীকা দিয়া তিন ঘণ্টাকাল ১৪০ ডিগ্রী ফারেণহীট উত্তাপে রাখিয়া দেখা হইয়াছে তাহাতে বসন্তের বীজ আর কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু ১২০ ডিগ্রী উত্তাপে রাখিয়া দেখা গিয়াছে তাহাতে টীকার কার্য্যকারিতা নষ্ট হয় না। প্রফেসর টিণ্ডেল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ভিন্ন ভিন্ন রোগের বীজাণু ভিন্ন ভিন্ন উত্তাপে নষ্ট হয়। যাহা হউক, ইহা অনেকটা বিশ্বাসের সহিত বলা যায় যে, ২২০ ডিগ্রী ফারেণহীট উত্তাপে দুই ঘণ্টাকাল রাখিলে সকল প্রকার সংক্রামক রোগের বীজই নষ্ট হইয়া যায়।

বিলাত শীতপ্রধান দেশ; তাই সেখানে উত্তাপ যোগে রোগের বীজ নষ্ট করিবার জন্য Disinfectant stove নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে; এবং গরীব লোকে তাহা বাড়ীতে রাখিতে পারে না বলিয়া ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি সহরে সাধারণের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান। সূর্য্যের উত্তাপ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং সূর্য্যের উত্তাপে রোগীর বস্ত্র, বিছানা ইত্যাদি কিছুক্ষণ মেলিয়া রাখিলেই বেশ Disinfect করা হয়। তবে যখন রৌদ্রের উত্তাপে কোন জিনিষ Disinfect করিতে দেওয়া হয়, তখন সে দ্রব্যের সকল স্থানে সমভাবে উত্তাপ পায় এমন ভাবে মেলিয়া দেওয়া উচিত। বস্ত্রাদি গুটাইয়া মুড়িয়া টুড়িয়া রৌদ্রে দিলে কোন স্থানে অধিক কোন স্থানে অল্প উত্তাপ

লাগিলে Disinfect করিবার উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হয় না। শীতকালে কি বর্ষাকালে যখন কোন দ্রব্য রৌদ্রে মেলিয়া দিবার সুবিধা না হয় তখন অগ্নির উত্তাপে দিয়া সংক্রামক বিষ শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। দুইঘণ্টা কাল ২২০ হইতে ২৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত ফারেণ হীট উত্তাপে কোন দ্রব্য রাখিয়া দিলে তাহাতে বেশ বিষ শোধিত হইতে পারে। সেইরূপ উষ্ণ জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া লইলেও Disinfect করা হয়। তাহার সহিত চূণ, সোডা, কার্বলিক এসিড, Chloride of lime—প্রভৃতি কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ধুইয়া লইতে পারিলে আরও ভাল হয়। রোগীর ঘরের বস্ত্রাদি রঞ্জককে দিবার পূর্ব্বে বেশ গরম জলে উপরিউক্ত কোন দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া একবার ধুইয়া শুকাইয়া দিলে বোধ হয় রোগের বীজ অপর লোকের কাপড়ে সংক্রামিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। জলে কারবলিক এসিড মিশাইতে হইলে জলে শতকরা ৫ পাঁচ ফোঁটা করিয়া, Chloride of lime মিশাইতে হইলে প্রতি গ্যালন জলে দুই আউন্স, এবং Chloride of zinc—মিশাইতে হইলে ২৪০ ভাগ জলে ১ ভাগ মিশাইলে তবে কার্য্যকরী হয়।

উত্তাপ এবং শৈত্যের পর কয়লাকে বিষ শোধন কারী Disinfectant বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কয়লা দ্বারা যদিও বিলক্ষণ রূপে দুর্গন্ধ নিবারণ হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা সংক্রামক রোগের বীজ নষ্ট হয় বলিয়া ততটা বিশ্বাস করা যায় না।

কয়লার পর বিষ শোধনের অভিপ্রায়ে Chlorine ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা কাপড়ে সংক্রামিত রোগের বীজ বিলক্ষণ নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা খুব সাবধান ব্যবহার করা উচিত। ইহার দুর্গন্ধ বড়ই ভয়ঙ্কর। ইহা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে এমন কি লোক মারাও যাইতে পারে। দুই ভাগ জলে দুই ভাগ সলফিউরিক এসিড ও সমভাগ মরণ এবং Bromide of magnetia যোগ করিলে chlorine প্রস্তুত হয়। কিম্বা চারি ভাগ—Hydrochloric acidএ এক ভাগ Bromide of magnetiaর গুঁড়া যোগ করিলেও Chlorine উৎপন্ন হয়। এক ভাগ Sulphuric এসিডের সহিত তিন ভাগ Chloride of lime মিশ্রিত করিলে সহজে Chlorine gas প্রস্তুত হয়। Chlorine gasএর গন্ধ অনেকটা Chloride of limeএর সমতুল্য। সেই জন্য অনেকে ইহার পরিবর্ত্তে Chloride of lime—ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গন্ধক দ্বারাই বিশোধন কার্য্য অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হয়।

গন্ধক বা Sulphuric acid gasএর আকারেই Disinfectionএর কার্য্য করে। গন্ধক পোড়াইলে যে ধূম বাহির হয়, তাহাতেই Sulphuric acid gas উৎপন্ন হয়। ইহার ন্যায় সুলভ এবং কার্য্যকর Disinfectant আর নাই বলিলেই হয়। ইহা ব্যবহার করিতে প্রায় কিছুই কষ্ট নাই। যে ঘর Disinfect করিতে হইবে, সে ঘরে ইহা কেবল পোড়াইলেই হয়। তবে সে ঘরের বায়ুনির্গমের সকল দ্বারই একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ঘরের দরজা, জানালা, চিমনি এমন কি ঘরের জল নালা পর্য্যন্ত যথা সম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এক পাউণ্ড গন্ধক পোড়াইলে ১০০০ কিউবিক ফিট বিষ শোধনকরী Sulphuric acid gas উৎপন্ন হয়। সুতরাং যে ঘরে ১০০০ কিউবিক ফিট বায়ু আছে, সে ঘরেই ১ পাউণ্ড গন্ধক পোড়ান উচিত। এবং হাসপাতালের ওয়ার্ডের ন্যায় যদি লম্বা ঘর হয় তাহা হইলে অনেক জায়গায় গন্ধক পোড়ান কর্ত্তব্য। একটা জলের পাত্রের উপর লোহার সিক দিয়া তাহাতে একটা লোহার পাত্রের ডিসের উপর অগ্নি রাখিয়া গন্ধক পোড়াইলে বিশেষ কার্য্যকর হয়। গন্ধকের সহিত একটু Alcohol মিশাইলে আরও ভাল হয়। লোহার ডিসে গন্ধক দিবার পূর্ব্বে উহা একবার আগুনে গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যাহাতে

ঘরের প্রত্যেক কোণ পর্য্যন্ত ধূম যায় এরূপ করিতে হইবে। ঘরে গন্ধক জ্বালাইয়া যেন দুই ঘণ্টা কাল ঘরের দরজা জানালা না খোলা হয়।

গন্ধক পোড়াইবার আরও একটী প্রণালী এই—কোন একটি পাত্রে চারি পাউণ্ড পরিমাণ জল রাখিবে। তাহাতে একটী ফুলের ছোট টব উপুড় করিয়া দিবে। টবের উপর একটা লোহার রেকাবি রাখিবে। সেই রেকাবিতে আগুন রাখিয়া তাহাতেই গন্ধক দিবে। এই গন্ধক দিয়া ছয় ঘণ্টা কি আট ঘণ্টা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবে। এইরূপে ঘর Disinfect হইলে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া ঘরে বাতাস বহিতে দিবে।

এই গন্ধকের ধূমে যেমন শীঘ্র ক্ষুদ্র বীজাণু নষ্ট হয় এমন আর কিঁছুতেই হয় না। ইহা বাতাসের সহিতও যেমন শীঘ্র মিশ্রিত হয়, এমন আর কিছু হয় না। তাই ডাক্তার ব্যাক্‌সটার, Chlorine এবং Carbolic acid অপেক্ষাও ইহাকে অধিকতর কার্য্যকর Disinfectant বিবেচনা করেন। ইহার ন্যায় সহজ প্রাপ্য এবং সুলভ Disinfectantই বা কি আছে? নিতান্ত গরীব লোকেরাও ইহা ব্যবহার করিতে পারে। তবে ইহা জানা উচিত, বস্ত্রাদি গন্ধকের ধূমে অধিক কাল ফেলিয়া রাখিলে, তাহা শীঘ্র ছিঁড়িয়া ও বিবর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কা। Nitric acidএর ধূমেও বেশ Disinfectantএর কার্য্য হয়। কিন্তু ইহা ডাক্তারদের দ্বারাই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। Iodine যেমন Disinfectant তেমনই Antiseptic অর্থাৎ ইহাতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। Bromine vapourও কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে Disinfectante রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Permanganat of potash এবং chlorine acid দ্বারায় Disinfectantএর কার্য্য বেশ হয়; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য।

Chloride of soda চূণ এবং Magnetia যোগে Cooper salt প্রস্তুত হয়। ইহাই রাস্তা এবং নর্দ্দামা Disinfect করিবার জন্য বিলাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Sulphate of iron কলেরার বিষ নাশের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর। Sulphate of copperও Disinfectant রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিষাক্ত পদার্থ; সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহা ব্যবহার করা উচিত।

Carbolic acid বোধ হয় সকলেরই নিকট Disinfectant রূপে পরিচিত। আলকাতরা হইতেই এই এসিড প্রস্তুত হয়। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। সেই গন্ধ হইতেই বোধ হয় ইহাকে Disinfectant রূপে সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যেরূপ বিষাক্ত পদার্থ, তাহাতে বড়ই সাবধানে ইহা ঘরে রাখা উচিত। অসাবধানতা বা অজ্ঞতা বশতঃ ইহা সেবন করিয়া কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। Carbolic acid বা অন্য এইরূপ কোন বিষাক্ত পদার্থ গৃহস্থের ঘরে রাখিতে হইলে, শিশির গায়ে বিষ বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। এবং ইহা কিরূপে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহাও স্পষ্ট করিয়া মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আবার কেহ যদি হঠাৎ এমন কোন বিষাক্ত পদার্থ সেবন করে, তবে তাহার ঔষধ অর্থাৎ antidoteই বা কি তাহাও লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়। Carbolic acid যেরূপ সচরাচর সকল ঘরেই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই জানা উচিত যে, ইহা হঠাৎ কেহ সেবন করিলে, Olive oilএর বা জলপাইয়ের তৈল সহিত Epsom salt এবং Solution of soda মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে Carbolic acidএর বিষ নষ্ট হয়। Carbolic আদত গুঁড়ার আকারেই থাকে। সেই গুঁড়া এক ভাগ লইয়া দশ বিশ বা চল্লিশ ভাগ জল বা তৈলে মিশ্রিত করিলে লোসন তৈয়ারী হয়। তাহাই Disinfectant রূপে ব্যবহৃত হয়। আবার সাবানের সহিত মিশাইয়াও ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কিন্তু Carbolic acid যত Antiseptic অর্থাৎ

রোগের বীজ বৃদ্ধি নিবারণে সক্ষম তত Disinfectant বা রোগের বীজ ধ্বংস করণে সক্ষম নয়। আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ অনেক পণ্ডিতই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে Carbolic acid antisepticএর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু ইহা দ্বারা Disinfectantএর কার্য্য কিছুই হয় না। বরং ইহার তীব্র গন্ধে রোগীর ও শিশুদিগের বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে। ডাক্তার জন ডান্‌কান্, Crooks, Hoop, ও Bakster প্রভৃতি সকলকারই এই মত। ডাক্তার Bakster বলেন যে অন্ততঃ শতকরা দুই ভাগ ওজনের খাঁটী এসিড্ জলে বা তৈলে না মিশাইলে কখনই Carbolic acidএর দ্বারা Disinfectantএর কার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে কোন বীজ নষ্ট না হইয়া বরং রক্ষিতই হইয়া থাকে। কারণ দেখা গিয়াছে যে, Carbolic acidএর ধূমে রাখিলে মাংস অনেক দিন পর্য্যন্ত না পচিয়া টাট্‌কা থাকে। দুগ্ধে শতকরা এক পঞ্চমাংশ মিশাইলে দুগ্ধ আদৌ নষ্ট হয় না।

যদি একান্তই Carbolic acid disinfectant রূপে ব্যবহার করিতে হয়, তবে খুব তীব্র করিয়া না লইলে কিছুই কাজ হয় না; অর্থাৎ ২০ ভাগ জলে ১ ভাগ Carbolic acid মিশাইলে তবে কার্য্যকরী হয়; অথবা ১৫ গ্যালন জলে এক গ্যালন খাঁটি এসিড মিশাইলে তাহা দ্বারা ঘরের মেজে, কাপড় বা রোগীর মলমূত্রাদি Disinfect করা যাইতে পারে। এবং খুব তীব্র Solution না করিলে Carbolicএ Disinfect করিলেও পুনরায় সেখানে রোগের বীজ জন্মিতে পারে। কারণ, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, টীকার Vaccine বীজ অল্প তীব্র Carbolic এসিড মিশাইয়া দশ দিন বাতাসে রাখিবার পর আবার সে বীজের দ্বারা কার্য্য হইয়াছে।

যাহা হউক, যদি Carbolic ব্যবহারই করিতে হয়, তবে ইহার ধূম ব্যবহার করাই প্রশস্ত। লোহার কড়াতে Carbolic acid solution দিয়া যতক্ষণ না ধূম হইয়া উড়িয়া যায় ততক্ষণ তাহার উপর রাখিয়া জাল দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই ধূম সুস্থ, অসুস্থ চক্ষু, কণ্ঠ ও ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ কষ্টদায়ক এবং ইহা যেন কখনই Condes fluid বা chlorineএর সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা না হয়। ইহাতে রোগের বীজ নষ্ট না হইয়া বরং রোগের সংক্রামণ আরও বিস্তৃত হইয়া থাকে। Carbolic acidএর একটী গুণ এই যে, ইহা Condes fluid অপেক্ষা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে, হস্তের ও গাত্রের দুর্গন্ধ সহজে নিবারিত হয়। একভাগ Carbolic acid নয় ভাগ Vinegar ও কিছু কর্পূর মিশাইয়া জাহাজের ক্যাবিন সকল অনেক সময় Disinfect করা হইয়া থাকে।

ডাক্তার বণ্ড কর্ত্তৃক প্রস্তুত Dr. Bond's Turbain এখন একটা বিখ্যাত Disinfectant হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাবানের আকারেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তারপিন Spirit হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার সুগন্ধের জন্য রোগীর ঘরের (Comode) মলাধার সুগন্ধীকৃত করিতে এবং Disinfect করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা Typhoid কিংবা অন্য কোন সংক্রামক রোগীর মল মূত্র বেশ উত্তমরূপে Disinfect করা হয়। ডাক্তার Maclin নেট্‌লী হাসপাতালে Dysentery রোগীদের শৌচাদি ইহার দ্বারা Disinfect করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। তার্পিণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘা Dress করা বেশ হয়। Sulphate of copper বা Bichromate of potash এর সহিত Turpin মিশাইলে Turpine Powder প্রস্তুত হয়। এই Powder দ্বারা রোগের বীজাণু বিলক্ষণ নিস্তেজ হয়। Typhoid fever এবং আমাশয়ের মলাদি ইহা দ্বারা বেশ Disinfect করা হয়। এবং ড্রেন ও পায়খানা Disinfect করিতেও ইহা বেশ কাজে লাগে।

Turpin এর ন্যায় Senstres ও একটী সুপরিচিত Disinfectant—ইহাও তারপিন হইতে প্রস্তুত হয়; এবং Turpinএর ন্যায় সুগন্ধ যুক্ত। এজন্য রোগীর ঘরের বায়ু ইহা দ্বারা বেশ শোধিত হয়। ইহার

ঘরের প্রত্যেক কোণ পর্য্যন্ত ধূম যায় এরূপ করিতে হইবে। ঘরে গন্ধক জ্বালাইয়া যেন দুই ঘণ্টা কাল ঘরের দরজা জানালা না খোলা হয়।

গন্ধক পোড়াইবার আরও একটী প্রণালী এই—কোন একটি পাত্রে চারি পাউণ্ড পরিমাণ জল রাখিবে। তাহাতে একটী ফুলের ছোট টব উপুড় করিয়া দিবে। টবের উপর একটা লোহার রেকাবি রাখিবে। সেই রেকাবিতে আগুন রাখিয়া তাহাতেই গন্ধক দিবে। এই গন্ধক দিয়া ছয় ঘণ্টা কি আট ঘণ্টা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিবে। এইরূপে ঘর Disinfect হইলে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া ঘরে বাতাস বহিতে দিবে।

এই গন্ধকের ধূমে যেমন শীঘ্র ক্ষুদ্র বীজাণু নষ্ট হয় এমন আর কিঁছুতেই হয় না। ইহা বাতাসের সহিতও যেমন শীঘ্র মিশ্রিত হয়, এমন আর কিছু হয় না। তাই ডাক্তার ব্যাক্‌সটার, Chlorine এবং Carbolic acid অপেক্ষাও ইহাকে অধিকতর কার্য্যকর Disinfectant বিবেচনা করেন। ইহার ন্যায় সহজ প্রাপ্য এবং সুলভ Disinfectantই বা কি আছে? নিতান্ত গরীব লোকেরাও ইহা ব্যবহার করিতে পারে। তবে ইহা জানা উচিত, বস্ত্রাদি গন্ধকের ধূমে অধিক কাল ফেলিয়া রাখিলে, তাহা শীঘ্র ছিঁড়িয়া ও বিবর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কা। Nitric acidএর ধূমেও বেশ Disinfectantএর কার্য্য হয়। কিন্তু ইহা ডাক্তারদের দ্বারাই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। Iodine যেমন Disinfectant তেমনই Antiseptic অর্থাৎ ইহাতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। Bromine vapourও কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে Disinfectante রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Permanganat of potash এবং chlorine acid দ্বারায় Disinfectantএর কার্য্য বেশ হয়; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য।

Chloride of soda চূণ এবং Magnetia যোগে Cooper salt প্রস্তুত হয়। ইহাই রাস্তা এবং নর্দ্দামা Disinfect করিবার জন্য বিলাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Sulphate of iron কলেরার বিষ নাশের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকর। Sulphate of copperও Disinfectant রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিষাক্ত পদার্থ; সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত ইহা ব্যবহার করা উচিত।

Carbolic acid বোধ হয় সকলেরই নিকট Disinfectant রূপে পরিচিত। আলকাতরা হইতেই এই এসিড প্রস্তুত হয়। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। সেই গন্ধ হইতেই বোধ হয় ইহাকে Disinfectant রূপে সকলে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যেরূপ বিষাক্ত পদার্থ, তাহাতে বড়ই সাবধানে ইহা ঘরে রাখা উচিত। অসাবধানতা বা অজ্ঞতা বশতঃ ইহা সেবন করিয়া কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহা বলা যায় না। Carbolic acid বা অন্য এইরূপ কোন বিষাক্ত পদার্থ গৃহস্থের ঘরে রাখিতে হইলে, শিশির গায়ে বিষ বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। এবং ইহা কিরূপে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহাও স্পষ্ট করিয়া মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আবার কেহ যদি হঠাৎ এমন কোন বিষাক্ত পদার্থ সেবন করে, তবে তাহার ঔষধ অর্থাৎ antidoteই বা কি তাহাও লিখিয়া রাখিলে ভাল হয়। Carbolic acid যেরূপ সচরাচর সকল ঘরেই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সকলেরই জানা উচিত যে, ইহা হঠাৎ কেহ সেবন করিলে, Olive oilএর বা জলপাইয়ের তৈল সহিত Epsom salt এবং Solution of soda মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে Carbolic acidএর বিষ নষ্ট হয়। Carbolic আদত গুঁড়ার আকারেই থাকে। সেই গুঁড়া এক ভাগ লইয়া দশ বিশ বা চল্লিশ ভাগ জল বা তৈলে মিশ্রিত করিলে লোসন তৈয়ারী হয়। তাহাই Disinfectant রূপে ব্যবহৃত হয়। আবার সাবানের সহিত মিশাইয়াও ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কিন্তু Carbolic acid যত Antiseptic অর্থাৎ

রোগের বীজ বৃদ্ধি নিবারণে সক্ষম তত Disinfectant রোগের বীজ ধ্বংস করণে সক্ষম নয়। আধুনিক তত্ত্ববিদ্ অনেক পণ্ডিতই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে Carbolic acid antiseptic এর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু ইহা দ্বারা Disinfectant এর কার্য্য কিছুই হয় না। বরং ইহার তীব্র গন্ধে রোগীর ও শিশুদিগের বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে। ডাক্তার জন ডান্‌কান্, Crooks, Hoop, ও Bakster প্রভৃতি সকলকারই এই মত। ডাক্তার Bakster বলেন যে অন্ততঃ শতকরা দুই ভাগ জলের খাঁটী এসিড্ জলে বা তৈলে না মিশাইলে কখনই Carbolic acidএর দ্বারা Disinfectantএর কার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে কোন বীজ নষ্ট না হইয়া বরং রক্ষিতই হইয়া থাকে। কারণ দেখা গিয়াছে যে, Carbolic acidএর ধূমে রাখিলে মাংস অনেক দিন পর্য্যন্ত না পচিয়া টাট্‌কা থাকে। দুগ্ধে শতকরা এক পঞ্চমাংশ মিশাইলে দুগ্ধ আদৌ নষ্ট হয় না।

যদি একান্তই Carbolic acid disinfectant রূপে ব্যবহার করিতে হয়, তবে খুব তীব্র করিয়া না লইলে কিছুই কাজ হয় না; অর্থাৎ ২০ ভাগ জলে ১ ভাগ Carbolic acid মিশাইলে তবে কার্য্যকরী হয়; অথবা ১৫ গ্যালন জলে এক গ্যালন খাঁটি এসিড মিশাইলে তাহা দ্বারা ঘরের মেজে, কাপড় বা রোগীর মলমূত্রাদি Disinfect করা যাইতে পারে। এবং খুব তীব্র Solution না করিলে Carbolicএ Disinfect করিলেও পুনরায় সেখানে রোগের বীজ জন্মিতে পারে। কারণ, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, টীকার Vaccine বীজ অল্প তীব্র Carbolic এসিড মিশাইয়া দশ দিন বাতাসে রাখিবার পর আবার সে বীজের দ্বারা কার্য্য হইয়াছে।

যাহা হউক, যদি Carbolic ব্যবহারই করিতে হয়, তবে ইহার ধূম ব্যবহার করাই প্রশস্ত। লোহার কড়াতে Carbolic acid solution দিয়া যতক্ষণ না ধূম হইয়া উড়িয়া যায় ততক্ষণ তাহার উপর রাখিয়া জাল দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই ধূম সুস্থ, অসুস্থ চক্ষু, কণ্ঠ ও ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ কষ্টদায়ক এবং ইহা যেন কখনই Condes fluid বা chlorineএর সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা না হয়। ইহাতে রোগের বীজ নষ্ট না হইয়া বরং রোগের সংক্রামণ আরও বিস্তৃত হইয়া থাকে। Carbolic acidএর একটী গুণ এই যে, ইহা Condes fluid অপেক্ষা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে, হস্তের ও গাত্রের দুর্গন্ধ সহজে নিবারিত হয়। একভাগ Carbolic acid নয় ভাগ Vinegar ও কিছু কর্পূর মিশাইয়া জাহাজের ক্যাবিন সকল অনেক সময় Disinfect করা হইয়া থাকে।

ডাক্তার বণ্ড কর্ত্তৃক প্রস্তুত Dr. Bond's Turbain এখন একটা বিখ্যাত Disinfectant হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাবানের আকারেই ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তারপিন Spirit হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার সুগন্ধের জন্য রোগীর ঘরের (Comode) মলাধার সুগন্ধীকৃত করিতে এবং Disinfect করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা Typhoid কিংবা অন্য কোন সংক্রামক রোগীর মল মূত্র বেশ উত্তমরূপে Disinfect করা হয়। ডাক্তার Maclin নেট্‌লী হাসপাতালে Dysentery রোগীদের শৌচাদি ইহার দ্বারা Disinfect করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। তার্পিণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘা Dress করা বেশ হয়। Sulphate of copper বা Bichromate of potash এর সহিত Turpin মিশাইলে Turpine Powder প্রস্তুত হয়। এই Powder দ্বারা রোগের বীজাণু বিলক্ষণ নিস্তেজ হয়। Typhoid fever এবং আমাশয়ের মলাদি ইহা দ্বারা বেশ Disinfect করা হয়। এবং ড্রেন ও পায়খানা Disinfect করিতেও ইহা বেশ কাজে লাগে।

Turpin এর ন্যায় Senstres ও একটী সুপরিচিত Disinfectant—ইহাও তারপিন হইতে প্রস্তুত হয়; এবং Turpinএর ন্যায় সুগন্ধ যুক্ত। এজন্য রোগীর ঘরের বায়ু ইহা দ্বারা বেশ শোধিত হয়। ইহার

বিষাক্ত গুণ কিছুই নাই। পায়খানাদি ইহা দ্বারা যেরূপ Disinfect হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। এবং ইহা জলে মিশাইয়া তাহাতে রোগীর গায়ের বস্ত্রাদি ডুবাইয়া দিলে অতি সহজে Disinfect করা হয়।

Professor Gamage chloride of Aluminium নামে আর একটী উৎকৃষ্ট Disinfectant আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার উপকারিতার বিষয় সকল বড় বড় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণই প্রশংসা করেন। ইহা বিষাক্ত নয়, ইহার কোন তীব্র গন্ধও নাই; অথচ ইহা দ্বারা সকল প্রকার দুর্গন্ধই দূর হয় ও পচা নিবারিত হয়। ইহার কোন গন্ধ নাই; সুতরাং গন্ধ দ্বারা ইহাতে কোন প্রকার রোগের বীজ নষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার স্পর্শে নষ্ট হইয়া থাকে। রোগীর কাপড় ও রোগীর ঘরের কাষ্ঠ ও দেওয়াল ইহাতে Disinfect করা হয়। ইহা দ্বারা নর্দ্দমাও বেশ Disinfect হয়। কোন ঘরে নূতন রং দেওয়া হইলে তাহারও গন্ধ বিলক্ষণ নিবারিত হয়।

Carbonate of lime এবং Sulphate of magnetia মিশাইয়া এক রকম—Disinfectant powder হইয়াছে। ইহার গুণ Carbolic acid powder এর সমতুল্য।

Chloride of zinc or purbushat disinfecting fluid এক ড্রাম Solutionএ ২৫ গ্রেণ zinc মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে প্রস্রাবের দুর্গন্ধ ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ বিলক্ষণ নষ্ট হয়। ৮ ভাগ জলে এক ভাগ এই Fluid দিয়া তরল করিয়া ইহা ব্যবহার করা উচিত।

Joy's perfect purifier—আলকাতরা ও কার্ব্বলিকের ন্যায় কার্য্যকর। ইহা বেশ সস্তা। গুঁড়া ও Fluid উভয় প্রকারেই ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে। Condi's fluid বোধ হয় সর্ব্বপরিচিত Disinfectant। জলে Permanganate of potash যোগ করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার রং লাল কিংবা সবুজ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা দুর্গন্ধ ও রোগের বীজ উভয়ই নষ্ট হইয়া থাকে। অথচ ইহার কোন বিষাক্ত গুণ নাই। সুতরাং ইহাতে দুই প্রকার উপকার। ইহা জলে মিশাইয়া রোগীর ঘরে ছড়াইলে ঘরের দূষিত বায়ু বিলক্ষণ নষ্ট করে। Condi's fluid কোন প্রকারে দূষিত জলে মিশাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার রং পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এবং জলের দূষিত পদার্থকে Oxydize করিয়া ফেলে। Condi's fluid antiseptic নয়। সুতরাং Carbolic acid যেমন রোগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ নষ্ট করে ও কোন দ্রব্য পচিতে দেয় না, ইহাতে তাহা হয় না। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে Carbolic acidএর সহিত Condis fluid কখনও মিশাইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে।

যেখানে অন্য কোন Disinfectant না পাওয়া যায়, সেখানে Vinegar দ্বারা বেশ Disinfectantএর কার্য্য হয়। সুবিখ্যাত পরোপকারী হাওয়ার্ড যে সকল জেলের অপরিষ্কার ঘর দেখিতে যাইতেন সেখানে Vinegar ছড়াইয়া তাহার দূষিত বায়ু নষ্ট করিতেন। Vinegarএ বাস্তবিক প্রস্রাবের গ্যাস এবং দুর্গন্ধ নষ্ট করে। সুতরাং ইহা যে অনেকটা Disinfectant এর কার্য্য করে তাহা বলা বাহুল্য। Typhoid fever রোগীর মলমূত্রাদি Disinfect করিতে বিশ গুণ পরিমাণ জলে একভাগ Hydrochloric acid মিশাইয়া ব্যবহার করিতে গ্লাসগোর ডাক্তার Dongale উপদেশ দেন।

পল্লী-উন্নতি।

লেখক—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এ।

গত শ্রাবণ সংখ্যা "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রিকাতে মাননীয় ডাক্তার রায় শ্রীগোপাল চন্দ্র মিত্র বাহাদুর মহাশয় লিখিত 'পল্লী-উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া মনে হইল যে, পল্লীর বেতসকুঞ্জ ও কুঞ্জবন (বেত ঝাড়, ও বাঁশ ঝাড় যেমন কবিদের কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে ও কবিতার 'মসল্লা' যোগাইয়া থাকে—কবিতার মধ্যে শুনিতে বেশ শ্রুতিমধুর হয়,—তেমনি 'পল্লী উন্নতি'—'পল্লী সংস্কার' প্রভৃতি অনেক গল্প লেখকদের—গল্প লেখার মসল্লা যোগায় কাগজে পড়িতে বেশ ভাল শুনা যায়।

মোটর হাঁকাইয়া সহরের পিচ্ দেওয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া—বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া গরম চায়ের কাপ মুখে ধরিয়া—কল্পনাতে পল্লীর ছবি মনে আঁকিয়া কলিকাতা নেশায় মস্‌গুল হইয়া তাহারই উপর দুই দুটা তুলির টান্ দেওয়া অতি সহজ ব্যাপার। আমাদের দেশী বিদেশী কর্ত্তাদের সকল কাজই—"ধরি মাছ না ছুঁই পানি"।

পল্লীর সুখ দুঃখের ইতিহাস, তাদের জীবন মরণের কাহিনী, তাদের বুক ফাটা ক্রন্দন, তাদের অনশনের কথা যে তাদের অপেক্ষাকৃত ধনী ভাইদের মনে পড়ে—তাতেই তারা চরিতার্থ। বরষার এই ভীষণ প্লাবনে তাদের ঘরের দাওয়ায় জল, কাহারও ঘর বা জলের তলে, উপরে ভীষণ বারিবর্ষণ; পেটে অন্ন নাই, ছেলে মেয়ে দুই দিন একটু দুধ পায় নাই;—আবার জল সরিয়া গেলে চারিদিকে কর্দ্দম, তার মধ্যে পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। মৃত পালিত পশু ও পচা পাতার দুর্গন্ধ, চারিদিকে বিসূচিকা, রক্ত আমাশয় প্রভৃতি লাগিয়া যায়। তখন, সে কাহিনী, সে দৃশ্য সহরবাসী কর্ত্তারা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিবেন।

বিষের যে কি জ্বালা তা 'আশীবিষ' যাকে দংশন করে নাই সে ত বুঝিবে না। সে ভাবিবে ওটা ওদের ভড়ং—ন্যাকামি।

পল্লীর আর্থিক অবস্থা, স্থানীয় অবস্থা, পল্লীবাসীর মানসিক অবস্থা, তাদের নিকট হতে দূরে থাকিলে কিম্বা দুই একদিন "বজরাতে" চড়িয়া pleasure trip দিয়া আসিলে ত বুঝিতে পারা যায় না।

"ডাক্তার মিত্র" মহাশয়ের একটি 'দফা'—অর্থাৎ 'ঘরে ঘরে চরকা চালাইতেই' 'মহাত্মা গান্ধী' ও তাঁহার শিষ্যগণ, নানা ক্লেশ ভোগ ও চেষ্টা করিয়াও সম্যক সফল হইতে পারিতেছেন না। শুধু কাগজে লিখিয়া রাখাই যদি ঐ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়—তবে বলিবার কিছুই নাই। যদি ওগুলি suggestion হয়—তবে সত্যের খাতিরে এই বলিতে হইবে যে, উহার দুই একটি মানিয়া চলিতেই সমস্ত পল্লী অস্থির হইয়া উঠিবে।

যেমন "প্রত্যেক লোককে গ্রামে ফিরাইয়া লওয়া, যাহারা সহরতলীতে বাস করিতেছেন",—যতদিন পল্লী পরিত্যক্ত না হইয়া কর্ম্মের কেন্দ্র না হইতেছে সহরবাসীর প্রবল বস্তুতন্ত্রতার নেশা কাটিয়া যাইতেছে—ততদিন এটা সম্ভব কি? যেমন ডাক্তার কার্ত্তিক বোস মহাশয়কে—ডাক্তার মিত্র মহাশয় সুদূর পল্লী প্রাঙ্গণে ফিরাইয়া লইতে সমর্থ হইবেন কি? যাক্—।

"সারা দেশময় Drainage"—সম্ভব কি?

"গ্রামের সমস্ত লোককে কুইনাইন খাওয়ান দরকার চার মাসের জন্য"—দেবে কে? দুই বেলা পেট ভরিয়া ভাত জুটিয়া থাকে কি?

"একাধিক জলাশয়"—প্রতি চারটি, পাঁচটি গ্রামের মধ্যে যদি একটি পানীয় জলের পুকুরের বন্দোবস্ত হয় তবেই তাহারা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

প্রতি গ্রামে একটি 'ইঁদারা' হওয়াই কঠিন ব্যাপার! স্থানীয় জমিদার, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকাল বোর্ড শতং জীবতু।

"সমস্ত ফসল কিনিয়া রাখা"—এত টাকা বিনা সুদে মহাজন কর্জ্জ দেবে কি?—দেয় কি? এক একটি মহাজন এক একটি 'জলৌকা'—তারা যে কৃষকের রক্তে মানুষ। তাহারা বিনা সুদে টাকা দিয়া নিজেদের আয় বন্ধ করিবে কি? পল্লীর বাহিরে আসিলে—দূরে থাকিলে এ সকল জানা অসম্ভব। মনে রাখিবেন এ সমস্ত ব্যবস্থা শুধু একটি পল্লীগ্রামের জন্য হইবে না - সমগ্র পল্লীগ্রামের জন্য করিতে হইবে।

"বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ"—হাসিও পায় কান্নাও আসে। যারা শতকরা ৯৫ জন ঋণজালে জর্জ্জরিত, যাদের কঙ্কালসার 'বলদ' জোড়া মহাজনেরা অতর্কিতে মাঝে মাঝে ক্রোক করে, যাদের গড়ে দৈনিক আয় ৵০র অধিক নয়,—তারা যে কি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করিবে তাহা আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের বোধগম্য হইল না।

পূজনীয় ডাক্তার মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, গ্রামে যে পতিত জমি আছে তাহাই কর্ষণ করিয়া তাহার ফসলের মূল্য হইতে সমস্ত আর্থিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। গ্রামের কঙ্কালসার কৃষকগণ রোগে শোকে ভুগিয়া তাদের ব্যাধিপ্রপীড়িত অস্থিময় দেহ লইয়া গ্রামের যে জমি 'বরগা' লয়, তাহাই চাষ দিয়া উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ গ্রামে গোচারণ ভূমিরই অভাব। পতিত জমিটুকুই গোচরণ ভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু যে পতিত জমি আছে তাহার আয় ও 'জঙ্গলের কাঠের' আয় হইতে এই সমস্ত 'বৃহৎ যান্ত্রিক ব্যাপারের' ব্যয়ের কিয়দংশ নির্ব্বাহ হইবে কি?

অনেক কথা বলিবার ছিল—তাহা আমাদের প্রাণের কথা; কিন্তু সহরবাসী, সুখী ভাইদের নিকট বাহুল্য ভয়ে চুপ করিয়া রহিলাম। পূজনীয় ডাক্তার মিত্র মহাশয় যে যে "দফা" আঁটিয়াছেন, তাহা সম্ভব ও সাধ্য হইলে "আমার সোনার বাঙ্গালা" যে আজ সত্য সত্যই স্বর্গে পরিণত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা যে আর হয় না। শুধু কল্পনাই রহিয়া যায়।

যে দেশের শতকরা ৯২।৯৩ জন অশিক্ষিত, নিরক্ষর —তাদের জন্য গ্রাম্য বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও সর্ব্বোপরি—গ্রামের কৃষক ও গরীবদের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় বিশেষ ভাবে দরকার।

তাদের আর আঁধারে রাখিলে চলিবে না। তাদের তুলে ধর, চোখ খুলে দাও। যাহাতে তোমাদের লেখা খবরের কাগজ তাহারা সুদূর পল্লীতে বসিয়া পড়িতে পারে—তার ব্যবস্থা কর। নইলে তাহাদের উন্নতির কথা যে শুধু তোমরাই পড়, তাদের কাণেও পৌঁছায় না।

প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা।

প্র ১।—অতিশয় কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভোরবেলায় খালি পেটে গরম জলের সহিত যথেষ্ট লেবুর রস পান করিলে কি উপকার হইয়া থাকে? (খ) কোষ্ঠকাঠিন্য মাথা ব্যথা, রক্তহীনতা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও শুক্রক্ষয়গ্রস্ত এবং অজীর্ণতাও সঙ্গে সঙ্গে আছে। এরূপ রোগে কিরূপ পথ্যাহার এবং কি নিয়মে থাকা উচিত? উক্ত রোগে বৈকালে লেবুর রসের সহিত মিশ্রির সরবত পানে কোন উপকার হয় কি? (অ, চ, মিত্র, ব্রাহ্মণগাঁ, ঢাকা)

উঃ ১। (ক) হইতে পারে। (খ) এই রোগের

এরূপ উপসর্গগুলি অপরিমিত শুক্রক্ষরণের ফল ও বাহ্যিক কার্য্য ব্যতীত আর কিছু নহে। এ বিষয়ে "গুপ্ত প্রকাশ" নামে ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন। রাত্রে একতোলা পরিমাণ জাঁতায়-ভাঙা বা শিলে গুঁড়া করা ইসক্‌গুল ভিজাইয়া রাখিয়া মিশ্রি সহযোগে সরবৎ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান করা উচিত। যদি নিয়মিতরূপ স্বপ্নে রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে ঠিক তৎপূর্ব্বে সহবাস করা যায়, তা' ছাড়া অন্য সময় যাহাতে সংযম অভ্যাস করা চাই। রাত্রে দুধ ভাত ও আহারের সহিত লেবু এবং দধি ভক্ষণ করা উচিত। কোষ্ঠ সাফের জন্য ১০।২০টি কিশমিসের সহিত দুধ-ভিজি রাত্রে আহার করিবেন। বড় পাকা মৎস্য, অতিরিক্ত মাংস, পিঁয়াজ, গরম মশলা দ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ। এক কথায় সহজ পাচ্য যে কোন খাবার প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে খাইবেন ও যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন। ঐরূপ সরবৎ পানে উপকার হয়।

প্র, ২।—(ক) একশিরা হয় কেন? যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন এবং শারীরিক মোটেই নয়, তাঁহাদের কি এই রোগ হওয়া সম্ভব? অল্প অল্প আরম্ভ হইলে কি করিলে উপশম হয় বা আর হইবার ভয় থাকে না? (খ) যাঁহাদের অত্যধিক ঘাম হয়, এমন কি শীতের দিনেও অবিশ্রান্ত নির্গত হয়—স্নান করার মত, তাঁদের কি কোন শারীরিক হানির ভয় আছে? এবং এরূপ ভীষণ ঘাম হবার কারণ কি? (স, বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীঘাট)।

উ, ২। (ক) ইহার উত্তর ডাক্তারি পুস্তকে সন্তোষজনকভাবে পাইবেন; দুইচারি কথায় বুঝান অসম্ভব, কোষের মধ্যে জল জমিয়া (Hydrocele) বা মাংস বৃদ্ধি হইয়া (Scrotal tumour) বা প্রদাহ (Orchitis) জন্য একশিরা হয়।—অসম্ভব নহে। (১) ল্যাঙ্গট ব্যবহার করা (২) কোষ্ঠ সাফ রাখা (৩) কুস্বপ্ন-অভ্যাস পরিত্যাগ করা (৪) যতদূর সম্ভব না দাঁড়ান (৫) আহারের নিয়ম পালন। প্রথম অবস্থায় Hydro-cura ব্যবহার করিয়া অনেকে বিশেষ ফল পাইয়াছেন। (খ) তাঁহাদের অন্যান্য উপসর্গ ও প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর পরিচয় না পাইলে ও রোগী পরীক্ষা ব্যতীত জবাব দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমজনিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অন্যতম কারণ হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁহাদিগের kidney (মূত্রগ্রন্থি) ঘটিত কোন ব্যায়রাম হওয়ার সম্ভবনা থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবের অস্বাভাবিক বর্ণ হয় এবং পিঠের নিম্নভাগে বেদনা অনুভূত হয়।

প্র, ৩।—(ক) কি উপায়ে পাঁকুইয়ের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? (খ) অনেক শিশু তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃ স্তন্য পান করিয়া থাকে, ইহা শিশু অথবা জননী কাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী অনিষ্টকর? (গ) ছারপোকার দেহে কালা জ্বরের বীজ পাওয়া যাইতেছে, ইহা যথার্থ কি না? এবং ছারপোকার বংশ কি প্রকারে নির্বংশ হইতে পারে? (ঘ) আরশোলার (তেলেপোকা) বংশ কিসে ধ্বংস হয়? (ন, বা, দেবী, আরারীয়া)

উ, ৩।—ঈষদুষ্ণ মিছরীর রস কিম্বা ১ আউন্স জলে দশ gr. Argenti Nitras Sol. মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে পারেন। পলতা, হীরাকস্ ও ত্রিফলা সমভাগ একত্র বাটিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেও এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। (খ) উভয়েরই। (গ) যথার্থ।—'ধরা আর মারা' ছাড়া নির্ব্বংশ করিবার আর প্রকৃষ্ট পদ্ধতি জানা নাই। তবে বিছানা পত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিয়ম মত রৌদ্রে দেওয়া উচিত। 'কিটিংস্ পাউডার' কিম্বা pyrethrum (আকর-করা বচ)এর গুঁড়া বিছানায় রাখিলে কতকটা উপদ্রব কমে। অথবা খাট পালঙ্কে ছারপোকার বাসা থাকিলে গরম জলের সহিত কেরোসিন বা তার্পিন তৈল মিশ্রিত করিয়া মাঝে

মাঝে ধুইয়া ফেলা উচিত। (৪) ইহার কোন প্রতিষেধক নিদান শাস্ত্রে আছে বলিয়া মনে হয় না; ঘরদ্বার-আসবাব পত্র পরিষ্কার রাখাই একমাত্র উপায়। ১৫নং ক্লাইভ রো, মেসার্স গ্রাণ্ডেজ মওইর (Messrs. Grandage Moir & Co Ltd.) কোম্পানির নিকট "Brunolium" নামক এক প্রকার paint পাওয়া যায়, তদ্দারা কক্ষ, আসবাব প্রভৃতি রঙ করাইয়া লইলে (প্রায় সাড়ে তিন সের ৫০।৬০ বর্গ ফুট স্থানে লাগান যায়) ছারপোকা, উইপোকা, আরশুলা প্রভৃতি ক্ষতি-কারক কীট পতঙ্গাদি নিবারিত হয়।

প্র, ৪।—(ক) প্রায় ২ বৎসর যাবৎ স্বপ্ন বিকার আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। দিবা রাত্রে স্বপ্নে বীর্য্যপাত হইয়া যায়। এক বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছি—কোন উপকার না পাইবার কারণ কি? স্ত্রীসঙ্গমের পরও এবং কোন-কোনদিন স্বপ্নে রেতঃপাত হইবার কারণ কি? কি ঔষধ সেবনে এইরূপ অস্বাভাবিক বীর্য্যপাত নিবারিত হয়? প্রায় তিন বৎসর অম্বলের ব্যায়রামে এবং ১০ বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া আসিতেছি; এখনও জ্বর বৎসরে ৩।৪ বার হয়। অম্বল ক্বচিৎ টের পাই। প্লীহাটি বর্দ্ধিত অবস্থায় আছে; এমতাবস্থায় কি করা যায়? অনেকে আমার শরীর খারাপ বিধায় মাছ মাংস খাইতে উপদেশ দেয়; ইহা এখন এই অবস্থায় খাইতে আরম্ভ করা ঠিক কি? (খ) স্বপ্ন বিকারাবস্থায় অল্প অল্প করিয়া কোদাল মারা শীর্ণ শরীরের পক্ষে হিতকারী কি না? ইহা ছাড়া অন্য কোন রকম ব্যায়াম ভাল কি না এবং কি ব্যায়াম দ্বারা শরীর সবল হইতে পারে? (অ, কু, শূর, জুলিয়া টি ষ্টেট, আসাম)

উ, ৪। যদি ব্রহ্মচর্য্যই এক বৎসর যাবৎ অভ্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে স্ত্রী-সঙ্গমের পর স্বপ্নে রেতঃপাত হইয়া যায় কিরূপ? কোন্ ব্রহ্মচর্য্য পদ্ধতিতে স্ত্রী-সঙ্গমের ব্যবস্থা বিধান আছে? শুধু মাছ মাংস ও একবেলা হবিষ্যান্ন খাইলেই কি ব্রহ্মচর্য্য হইল? আপনার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে নিবন্ধ অসম্ভবরূপ বিস্তৃত হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা" (সিরাজগঞ্জ, পাবনায় গ্রন্থকারের নিকট কিম্বা রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ সংস্বতী লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য), শ্রদ্ধাস্পদ অশ্বিনীবাবুর "ভক্তিযোগ", স্বামী নিগমানন্দ প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য সাধন" (আর্য্যদর্পণ অফিস, জোড়হাট, আসামে পাওয়া যায়), ৮চন্দ্রনাথ বসুর "সংযম শিক্ষা" ও কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ" ৩ ভাগ, প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ ও তাল্লিখিত উপদেশানুযায়ী যথাসাধ্য কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবেন। ধাতু-দৌর্ব্বল্য ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে পরের মাসে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। যদি প্রকৃতই ১ বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিয়া থাকেন এবং মৎস্য মাংসের অভাবে কোনরূপ মানসিক কষ্ট বোধ না করেন, তাহা হইলে এখন উহা খাইতে আরম্ভ করা উচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় শরীর গতিক বুঝিয়া ২।১ মাইল ভ্রমণ ব্যতীত অন্য কোন বিধিবদ্ধ সশ্রম ব্যায়ামের বিধান আপাততঃ দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

প্র, ৫। (ক) পান (তাম্বুল) খাওয়া উচিত কি না? (খ) ঘোলের উপকারিতা কি এবং সহজে কি উপায়ে ঘোল তৈয়ার করা যায়? (মু, চাঁ, মাড়বারী ও ন, র্ন, দত্ত, খুলনা)

উ, ৫। (ক) আষাঢ় মাসের "স্বাস্থ্য সমাচার" ৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন। (খ) ভাল দই জল দিয়া তরল করিয়া ঘোল-প্রস্তুতের ছোট যন্ত্র সাহায্যে ঘোল তৈয়ারী করিতে হয়; তদভাবে পাথরের পাত্রে, হাত দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া অল্প অল্প জল মিশ্রিত করিয়াও তৈয়ারী করা চলে; এমন ভাবে জলের সহিত মেশা চাই যাহাতে কোনরূপ দলা না থাকে। দই ও ঘোলের উপকারিতা প্রায় একরূপ। উভয়ের মধ্যে Lactic Acid Bacillus নামক যে অম্লোৎপাদনকারী জীবাণু বর্ত্তমান থাকে, তাহা

পাকনালী ও অন্ত্র মধ্যস্থিত অনিষ্টকর জীবাণুর (Colon Bacilli প্রভৃতি) ধ্বংসসাধন করে, পরিপাকের সহায়তা করে ও পেট ঠাণ্ডা করে। দধি অপেক্ষা ঘোল সহজ-পাচ্য।

প্র, ৬।—২ মাসের শিশুর কফ বা সর্দ্দি হইলে কিসে তাহা নিবারণ করা যায়? কফরোগ হইতে শিশুকে কিরূপে রক্ষা করা যায়? এখানকার একটি বৃদ্ধ লোক শূকরের তৈল সেবন করাইতে বলেন। ইহার গুণাগুণ কি তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। (আর, সি, দে, মউলমিন, বর্ম্মা)

উ, ৬ "কফরোগ" বলিলে সামান্য উৎকাশি হইতে নিউমোনিয়াকে বুঝাইতে পারে। গলার ভিতর ঘ্যাজ্‌ভিড্ বাড়িয়া, ... গরম হইয়া, কাণের ভিতর ঘোল হইয়া, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া—কত কারণে কাশি হয়। এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। স্থানীয় সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই উচিত; কারণ অতি সামান্য কারণেই ছেলেদের বুকে সর্দ্দি বসিয়া ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হয়। শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে ডাঃ বসুর লেবরেটরী-নির্ম্মিত "সিরাপ বাকস্" কিম্বা "সিরাপ বাকস্ উইথ হাইপো-ফস্ফাইট্ এণ্ড টলু", সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্, ব্রঙ্কো-নিউমনিয়া, নিউমনিয়া প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ। শিশুর সামান্য সর্দ্দি কাশিতে তুলসী পাতার রস ও গলায় একটি রসুনের কোষ বাঁধিয়া দেওয়া এবং ঘুংড়ী কাশি উৎকাশি, হাঁপানি প্রভৃতিতে নিশাদল ১ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি, ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর তুলসী পাতার রস সহ গরম করিয়া সেবন করান অতি সুন্দর টোট্‌কা। শূকরের তৈল কি বুঝিলাম না। যদি টাট্‌কা শূকর-চর্ব্বিকে ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, তবে তাহা শিশুর পক্ষে দুষ্পাচ্য; বুকে মালিশ করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে কোন উপকার দর্শে কি না সে বিষয়ে আমরা সম্যকরূপ অবগত নহি।

প্র, ৭।—আমার দালান ঘরে ভয়ঙ্কর মশা এবং বিছানায় খুব ছারপোকা হইয়াছে। প্রতিকারের সংক্ষেপে ব্যবস্থা কি? (ম, না, গোস্বামী, কালিগঞ্জ, নদীয়া)

উ, ৭।—মশা ও ছারপোকা তাড়ান এক প্রকার অসম্ভব। ৩ নং উত্তর পাঠে আপনার কিছু সাহায্য হইতে পারে। ১৩২৭ কার্ত্তিক সংখ্যা স্বাস্থ্য-সমাচারে "ম্যালেরিয়ায় আত্মরক্ষা" নামক প্রবন্ধে মশক ধ্বংস সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করুন্। ১৯২১ সালের জুন সংখ্যার "Industry" নামক পত্রিকায় (22, Shambazar Bridge Road, Calcutta) মশা নিবারণ সম্বন্ধে অনেক সহজ উপায় ও নূতন তথ্য আলোচিত হইয়াছে। The Kamalasini Trading Co. (Tanjore, S. I. Ry.)র নিকট হইতে ।৵৹ দিয়া 'Mosquito Destroyer' বা The Calcutta Small Industries Co. (Post Box 967, Calcutta)র নিকট হইতে "Pest-All" নামক ঔষধ আনাইয়া ব্যবহার করিতে পারেন। Quinine sulphate ১ গ্র্যাম্, 95% Alcohol ৩২ গ্র্যাম্ ও জল ১১ গ্র্যাম্ একত্র মিশ্রিত করিয়া গায়ে মাখিলে মশা কামড়াইতে পারে না।

প্র, ৮।—(ক) ব্যায়াম সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কে কে ভাল বহি লিখিয়াছেন? (খ) ব্যায়াম করিবার সময় কোন্ ঋতুতে কিরূপ পোষাক ব্যবহার করা উচিত এবং খালি গায়ে ব্যায়াম করিলে অপকার কি? (গ) শীতকালে ভোরে উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়ামাদি করা উচিত কি না? (ঘ) ব্যায়াম করিবার কতক্ষণ পরে স্নানাদি করা উচিত?

উ, ৮।—ক) শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায় এম্ এ, বি-এল-লিখিত "স্বাস্থ্য ও শক্তি" মূল্য ১৲ (বেচু চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা) (খ) গ্রীষ্মে পোষাক ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। শীত বা বর্ষায় সামান্য একটা গেঞ্জী গায়ে দিয়া করিতে পারেন; ব্যায়াম শেষ হইবার কিছুক্ষণ পর তাহা খুলিয়া ফেলিবেন। (গ) উচিত—তবে জামা গায় দিয়া। (ঘ) দম

স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ও ঘাম বন্ধ হইলে, অর্থাৎ অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট পরে।

প্র, ৯। (ক) ছুলির প্রতিষেধক কি? Medicinal soap (যথা cuticura) ব্যবহারে কোন ফললাভের সম্ভাবনা আছে কি? (খ) পুরাতন patent ব্যবহারে কোন আপত্তি আছে কি? (অ, মুখোপাধ্যায়, শিমলা পাহাড়)

উ, ৯। ক) পাশ্চাত্য দেশের প্রস্তুত কয়েকটি তথাকথিত ছুলির ঔষধ আছে বটে, কিন্তু কোনটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। Cuticura প্রভৃতি সাবানে উপকারের আশা খুবই কম। দুইটি টোটকা জানা আছে, ইহাতে উপকার হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে; (১) মূলার বীজ ও আপাং পাতা বাটিয়া সেই রস মুখে প্রলেপ দিতে হয়। (২) শুষ্ক কলার পাতা পোড়াইয়া ছাই করিবেন, এই ছাই গরম কিম্বা ঠাণ্ডা জলে ভাল করিয়া গুলিয়া ৪ পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন, এই জলের সহিত অল্প হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ছুলি সহজে সারিতে পারে। (খ) যদি পেটেন্ট ব্যবহার করা অভ্যাস থাকে, আপত্তি নাই।

প্র, ১০। ডাম্বল exercise বাঙ্গালীর পক্ষে কি অপকারী? (খ) কতক্ষণ ব্যায়াম করা উচিত। (গ) কি কি খাদ্য আহার করিলে অম্বলের ব্যায়রাম হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? (ঘ) ব্যায়াম করিয়া স্নান করা এবং কিছু খাওয়া উচিত কি না এবং কি খাওয়া উচিত। (ঙ) অম্বলের রোগীর শীতল জল, না গরম জল পান করা উচিত?

উ, ১০। (ক) না; ডাম্বলের ভার লঘু ও ব্যায়ামের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে ভাল হয়। (খ) ক্ষেত্র, পাত্র ও অভ্যাস অনুযায়ী সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিতে হয়; তবে মধ্যে মধ্যে ২।১ মিনিট করিয়া বিশ্রাম লওয়া প্রয়োজন। সামান্য মাত্রায় পরিশ্রম অনুভূত হইলেই ব্যায়াম স্থগিত রাখা চাই; যতটা সহজে বিনাকষ্টে হয়, ততটাই ভাল। (গ) খাদ্যের তালিকা দেওয়া অসম্ভব। এবিষয়ে 'খাদ্যকথা' নামক পুস্তক ও ১৩২৪ সালের স্বাস্থ্য-সমাচারের বৈশাখ সংখ্যায় যথাক্রমে ২ ও ২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করুন। সহজে যাহা হজম হয়, তাহাই খাইবেন। রাত্রে গুরুপাক ও অধিক মাত্রায় ভোজন কিছুকাল বন্ধ রাখিবেন ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিবেন না। (ঘ) স্নান ও আহার করিতে পারেন—কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর। আপনার রুচি অনুযায়ী অল্প পরিমাণে যাহা ইচ্ছা খাইতে পারেন। (ঙ) গরম জলই প্রশস্ত।

প্র, ১১। এতদ্দেশে একটা প্রথা আছে, প্রসবের পরে বুকে দুগ্ধ সঞ্চারের জন্য প্রসূতিকে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য খাওয়ানো হয়। যারা কোন নৈতিক নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া (as a principle) মৎস্য ভক্ষণের পক্ষপাতিনী নয়, তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে সুখী হইব। (অ, বা, ঘোষজায়া, চাঁদপুর)

উঃ ১১।—প্রাকৃতিক নিয়মের কাল, স্থান বা পাত্র ভেদে তারতম্য ঘটিতে পারে, কিন্তু একেবারে ব্যত্যয় ঘটে না। স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার, মাছ মাংসের উপরে কোনও দিন নির্ভর করে না। যে মুহূর্ত্তে জরায়ু বা পো-নাড়ীর মধ্যে ফুলের (placenta) জন্ম হয়, সেই ক্ষণ হইতেই স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চারের জোগাড় হইতে আরম্ভ হয়। মাতৃস্তন ও জরায়ু একই সূত্রে বাঁধা আছে। বর্ত্তমানকালে, আপনার দোষ. আমরা সন্তানের জন্মকে একটা ব্যারামের কোঠায় ঠেলিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুতঃ কিন্তু গর্ভধারণ জীবদেহের একটা নৈসর্গিক কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। মৎস্য মাত্রেই কামোদ্দীপক, অতএব প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে স্তন্য বৃদ্ধিকর বটে। গাভীদিগের দুগ্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্য লাউ খোলা, কলাইয়ের ভূসি দেয়—অতি মাত্রায় আবশ্যক হইলে যোনিপথে বাঁশের চোঙ্গা দ্বারা "ফুকা" পর্য্যন্ত দেয়। মানুষের বেলাও, পোয়াতীকে দুধ, ঘি, মাখন, সাগু, বার্লী, সুজি, ভাত প্রভৃতি খাওয়াইলে দুগ্ধের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। "ফুকা" দেওয়ার ব্যাপার হইতে জরায়ুর সঙ্গে স্তনের সম্বন্ধের কথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝা যায়।

আলোচনা।

খাদ্যে বিষ।—

ইদানীং বিলাত হইতে তার যোগে প্রায়ই সংবাদ আসিতেছে যে, বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া অনেক লোক মারা যাইতেছে। মাস কয়েকের মধ্যে এইরূপ কয়েকটি সংবাদ এদেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। রন্ধনের দোষে রন্ধন-স্থালীর সহিত খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগ বশতঃ কোন কোন স্থলে খাদ্য বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল; এবং সেই খাদ্য যাহারা উদরস্থ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মারা পড়িয়াছিল, এবং অনেকেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। আর ক্ষেত্র-বিশেষে সংরক্ষিত খাদ্য (preserved food) খাইয়াও লোকে মারা গিয়াছিল অথবা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে একটা সাদৃশ্য এই ছিল যে, প্রধানতঃ প্রাণীজ খাদ্যই বিষাক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ; খুব সাবধান না হইলে প্রাণীজ খাদ্য মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতিই সচরাচর বিষাক্ত হইয়া উঠে। এদেশেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আমরা এই স্বাস্থ্য সমাচারে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া দিয়াছি যে, নানা কারণে প্রাণীজ খাদ্য বিষাক্ত হয় অথবা রোগবীজাণুর দ্বারা পূর্ণ হয়। সেইরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে পীড়া না হইয়া যায় না। অতএব মাংস-ভোজী ব্যক্তিরা অতঃপর সাবধান হইবেন, এরূপ আশা করিতে পারি।

ব্যবস্থাপক সভায় অদ্ভুত অবস্থা।—

সে দিন বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ব্যায়াম প্রভৃতি কয়েকটি বাবদে গবর্ণমেণ্ট কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ব্যায়াম সম্বন্ধে উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য ৩১১৫ টাকা, ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য ১৫০০০ টাকা, ছাত্রদের খেলাধূলার উপকরণ সংগ্রহার্থ ৬২৫০ টাকা, চিকিৎসা বাবদে ৩০৯১২৭ টাকা, কলিকাতার হাসপাতাল সমূহের শুশ্রূষাকারিণীগণের সংশ্রবে ৫০০০ টাকা, সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা বাবদে ৩৯৯৯১৬ টাকা, এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের জন্য আরও কিছু কিছু টাকা চাওয়া হইয়াছিল। কয়েকজন সদস্য কিন্তু প্রত্যেক দফার টাকাই হয় দিতে একেবারে অস্বীকার করেন, আর না হয় কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন! কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহাদের একজনেরও একটাও আপত্তি টিকে নাই—সকল দফার টাকাই মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় এই সকল সদস্যের ভাব গতিক কিছু বুঝা যায় না। এ যেন penny wise and pound foolish ধরণ। যেন, কারণ থাকুক আর নাই থাকুক. টাকা না-মঞ্জুর করিবার জন্যই ইঁহারা বাড়ী হইতে কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। আমরাও কম আশ্চর্য্য হই নাই। একে ত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদে যৎসামান্য টাকা খরচ করা হয়। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সে টাকা কিছুই নয় বলিতে গেলে। সেই যৎকিঞ্চিৎ টাকাও মঞ্জুর করিতে মাননীয় সদস্যগণ নারাজ কেন? দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হইলে কি তাঁহাদের স্বদেশবাসীর, তথা তাঁহাদের নিজেদেরই মঙ্গল হইবে না! অবশ্য যে টাকা মঞ্জুর করা হইল, সে টাকার যাহাতে অপব্যয় কিম্বা অপব্যবহার না হয়, এবং যে যে বাবদে যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হইল, সেই সেই বাবদে যাহাতে সেই পরিমাণ টাকাই খরচ হয়,—অন্য বিষয়ে খরচ না হইয়া যায়,—সদস্যগণের তাহা দেখা উচিত—সে বিষয়ে সুব্যবস্থাও করা উচিত। কিন্তু সে দিকে ত কাহারও লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ

হইল না। আমরা আশা করি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ন্যায় প্রয়োজনীয় বিষয়ে টাকা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়া মাননীয় সদস্যগণ মন্ত্রীগণের কার্য্যে পদে পদে বাধা উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের নিজেদের এবং নিজ দেশের ক্ষতি করিবেন না। বরং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া, স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও অধিক টাকা মঞ্জুর করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

কাগজের ঠোঙ্গা।—

মুদীর দোকানে, বেণের দোকানে খুচরা কোন জিনিষ কিনিতে গেলে, জিনিষগুলি কাগজের ঠোঙ্গায় পরিবেশন করা হয়। যখন কাগজ এত সস্তা ছিল না, তখন,—আমাদের সেই বাল্যকালে—আমরা দেখিতাম, তরল জিনিস ছাড়া অন্য সকল জিনিসই প্রায় সালপাতায় দেওয়া হইত। সালপাতা একবার ব্যবহার করিবার পর আর তাহা দ্বিতীয়বার (বাসন মাজা ছাড়া) আর কোন কাজে লাগিত না। কিন্তু কাগজ সস্তা হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ব্যবহার বাড়িয়া যাওয়ায়, একটা নূতন বিপদের সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। মুদী ও বেণের দোকানে যে কাগজের ঠোঙ্গা ব্যবহৃত হয়, সেই ঠোঙ্গা যে কাগজ হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় গৃহস্থ ঘরে ব্যবহৃত পুরাতন কাগজ। কোন্ গৃহস্থের ঘরে কি কাজে কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এক শ্রেণীর লোকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পুরাতন শিশি বোতল ও পুরাতন কাগজ সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া গিয়া এক যায়গায় জমা করে। যাহারা কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া দোকানে দোকানে সরবরাহ করে, তাহারা প্রায় এই 'হকার'দের সংগৃহীত কাগজ ব্যবহার করে। কেবল গৃহস্থ বাড়ী নয়, অন্যান্য সূত্রেও ব্যবহৃত কাগজ হকারদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। রেলওয়ে আপিস, বড় বড় ব্যবসায়ী আপিস, আদালত প্রভৃতি স্থানে পুরাতন কাগজ ওজন দরে 'হকার'দের বিক্রয় করা হয়। এবং তাহা প্রায় এই ঠোঙ্গা প্রস্তুতের কাজে লাগে। এই সকল কাগজে নির্ম্মিত ঠোঙ্গায় খাদ্য দ্রব্য বিলি করা কতদূর স্বাস্থ্য-নীতি সঙ্গত তাহা আমরা জনসাধারণকে এবং সাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। গৃহস্থ-বাড়ীতে কি ভাবে এই সকল কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহা নিজের নিজের বাড়ীতে সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। আপিস অঞ্চলেও এক একখানি কাগজ যে কত হাত ঘুরে, কত স্থানে যাতায়াত করে, তাহাও একটু ভাবিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। ব্যাধিগ্রস্ত, রুগ্ন ব্যক্তিরা, কিম্বা সুস্থলোকেও বিশেষতঃ ছেলেরা ময়লা হাতে এই কাগজ যে ব্যবহার করে না, এ কথা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন কি? কাগজের ঠোঙ্গাগুলির উপর দুই চারিদিন একটু লক্ষ্য রাখিলেই, সকলেই দেখিতে পাইবেন, তাহাতে কত বিচিত্র রকমের লেখা, কত ময়লা লাগিয়া রহিয়াছে। এই সব ময়লার ভিতর রোগ বীজাণু থাকা অসম্ভব কি? আর না থাকিলেও, ঠোঙ্গায় যেরূপ ময়লা লাগিয়া থাকে তাহা দেখিলেই ঘৃণা হয়। কাগজের ঠোঙ্গা আজকাল দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এক টাকার নোটের যখন প্রচলন হয়, তখন কথা উঠিয়াছিল যে, নোটের সাহায্যে রোগ বিস্তৃত হইতে পারে। বহু ব্যবহৃত নোটগুলির ময়লা চেহারা দেখিলে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তথাপি, নোট লোকে যথেষ্ট সাবধানতার সহিত ব্যবহার করে। কিন্তু সাধারণ কাগজ ব্যবহার করিবার সময়ে লোকে এতটা সাবধান হইতে পারে না। সুতরাং তাহার অপব্যবহার হওয়া খুবই সম্ভব। সেই কাগজ হইতে ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করা নিশ্চয়ই আপত্তিকর। কাগজের ঠোঙ্গার সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারদের যেমন সুবিধা হইয়াছে, খরিদ্দারেরও সেইরূপ সুবিধা হইয়াছে। কাগজের ঠোঙ্গার ব্যবহার বন্ধ করিবার উপদেশ দেওয়া যায় না, দিলেও কেহ শুনিবে না। কিন্তু একবার ব্যবহার করা কাগজে ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিতে কিছুতেই দেওয়া চলিতে পারে না। সাহেবদের অনেক খাদ্য কাগজের ঠোঙ্গায় প্রদান করা হয়। গ্রেট-ইষ্টার্ণ হোটেলে পাঁওরুটী খরিদ করিতে গেলে তাহা কাগজের ঠোঙ্গায় মোড়া অবস্থাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু সে কাগজ দেশী ঠোঙ্গার মত শতবার ব্যবহার করা কাগজ নয়; তাহা নূতন। তাহাতে কোনরূপ ময়লা লাগিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের মুদিখানা ও বেণের দোকানেও যাহাতে নূতন কাগজে প্রস্তুত ঠোঙ্গা ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা এখন কথাটা পাড়িয়া কেবল সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম। সাধারণের ভাবগতিক বুঝিয়া আমরা এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

দেশব্যাপী বন্যা।—

বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল! চারিদিকে হাহাকার। এবার বাঙ্গালায় যেরূপ বন্যা হইয়াছে, সে রকম বন্যা—অতি বৃদ্ধেরাও তাঁহাদের জীবনকালের মধ্যে ঘটিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারিতেছেন না! এই বন্যায় কত মানুষ, কত গোরু-বাছুর, কত ভেড়া ছাগল যে মরিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কত লোকে যে গৃহহীন, নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যাইতেছে না। কত লোকের যে ঘর-বাড়ী, যথা-সর্ব্বস্ব বন্যার জল-স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা এখনও অনির্ণীত রহিয়াছে। কত নর নারীর পরণের একখানি কাপড় পর্য্যন্ত নাই—তাহারা সম্পূর্ণ নগ্ন। খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব এতই তীব্র যে, সার পি, সি, রায় মহাশয় বন্যাপীড়িতগণের সাহায্যার্থ গিয়া অবস্থা দেখিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, প্রতি সপ্তাহে ৫০০০০ টাকা করিয়া সাহায্য দরকার। গবর্ণমেণ্ট যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহা অভাবের তুলনায় সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্যের তুল্য। সংবাদপত্রে এমনও দেখা গিয়াছে বন্যাপীড়িত স্থান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সার পি, সি, রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইতেছেন! দেশের এই ঘোর বিপদে জন সাধারণ উদাসীন নহেন। চারিদিকে দলে দলে দেশ-সেবক যুবকেরা গান গাহিয়া সাহায্য সংগ্রহ করিতেছেন। যে সময়ে এই আলোচনাটি লেখা হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। জন সাধারণ যথাসাধ্য মুক্ত হস্তে অর্থ, চাউল, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিতেছেন। বন্যার সাহায্যের দরুণ অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে মহিলাগণও, এমন কি বারনারীগণ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া মিলিত কণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বাড়ী বাড়ী অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেক নেতৃস্থানীয় মহিলা, স্বেচ্ছা-সেবিকাগণ সহ অন্ন-বস্ত্র ঔষধ পথ্য লইয়া বন্যাপীড়িত স্থান সমূহে আর্ত্তগণের সেবার্থ গমন করিয়াছেন।

এ সকলই ত হইতেছে। কিন্তু আরও একটী কথা ভাবিবার আছে। সেটী বন্যার পরবর্ত্তী অবস্থা। বন্যায় যে লোকক্ষয় ও জীবজন্তু ধ্বংস হইয়াছে তাহা ত হইয়াছেই। কিন্তু তাহাতেই বন্যার ধ্বংসলীলার পর্য্যবসান হইবে না। এরূপ ঈতির আনুষঙ্গিক আর একটী বিষয় আছে—সেটী মহামারী। বন্যায় যে সকল লোক মরিয়াছে, যে সকল পচনশীল দ্রব্য বন্যার স্রোতজলে ভিজিয়া গিয়াছে—সেই সমস্ত নরনারীর দেহ, জীব জন্তুর দেহ ও অন্যান্য দ্রব্য পচিয়া এক দফা মহামারীর সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, বন্যার জলে বহু বিস্তৃত স্থান আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে। ভূমির সেই আর্দ্রতার দরুণও এক দফা দেশের স্বাস্থ্য খারাপ হইবে। আমাদের তাহাই মহা ভাবনার কথা।

সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার এই বিপদের দিনে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন; যথাসাধ্য সাহায্যও প্রেরণ করিতেছেন। এই বন্যা সংবাদে বিলাতের পর্য্যন্ত টনক নড়িয়াছে। সুতরাং বন্যাজনিত দুঃখ ক্লেশ নিবারণ কল্পে আশু যাহা কিছু করা দরকার, তাহা শ্রীভগবানের

ইচ্ছায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে হইয়া যাইলেও যাইতে পারে। কিন্তু বন্যার পরবর্ত্তী এবং অনিবার্য্য মহামারা নিবারণ কল্পেও কিছু করিবার আছে। সে ব্যবস্থাও এখন হইতে করিয়া যাইতে হইবে। জলে ডুবিয়া কিম্বা ভাসিয়া যত লোক মরিয়াছে, তাহার উপর রোগে আরও অনেক বেশী লোক যাহাতে না মরে, তাহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকার বুঝিয়া আমরা সর্ব্ব-সাধারণের এবং বিশেষ করিয়া চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই ব্যাপারে অনেক কর্ম্মী চাই, ঔষধ চাই, পথ্য চাই, এবং অর্থও চাই।

লণ্ডন ও কলিকাতার স্বাস্থ্য।—

বিশ্বদূত রুটার সম্প্রতি তারযোগে এই সংবাদটুকু প্রেরণ করিয়াছেন :—

Health statistics for London show that the past wet summer has been singularly free from epidemic. The death rate has remained very low ranging from 8 3 per thousand in the first week in September to 9. 7 in the last week of September.

অর্থাৎ লণ্ডনের স্বাস্থ্য বিবরণে প্রকাশ এইরূপ যে গত গ্রীষ্ম ঋতুতে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল; এই সময়ে লণ্ডনে সংক্রামক রোগ আদৌ ছিল না। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ৮.৩ এবং সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দেখা যায়, মৃত্যুর হার হাজারকরা ৯.৭ এর বেশী উঠে নাই। সুতরাং মৃত্যুর হার খুব কম ছিল বলিতে হইবে।

কলিকাতার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে, লণ্ডনে ঐ সময়কার মৃত্যু-সংখ্যা কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। আর কলিকাতার লোক-সংখ্যা অপেক্ষা লণ্ডনের লোক-সংখ্যা অন্ততঃ সাতগুণ বেশী। সম্প্রতি লণ্ডন কাউন্টীর যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরের লোক-সংখ্যা ৭৪৮০২০১। লণ্ডনের চারিদিকে যে স্থানটা গ্রেটার লণ্ডন নামে অভিহিত হয়, তাহার লোক-সংখ্যা গত দশ বৎসরে পাঁচলক্ষ বাড়িয়াছে। গতবারে কলিকাতায় যে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহা ঠিক হয় নাই; সুতরাং তাহার উপর ততটা নির্ভর করা যায় না। তাহা হইলেও লণ্ডনের তুলনায়,—কলিকাতার লোক-সংখ্যা যদিই কিছু বাড়িয়া থাকে, ত সে অতি সামান্য মাত্র। লণ্ডনও ইংরেজ রাজ্যের সহর, কলিকাতাও ইংরেজের হাতে গড়া সহর। এই দুই সহরে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও ইংরেজেরই দান। তথাপি এই দুই সহরে স্বাস্থ্যের এত তারতম্য কেন? কলিকাতা সহরের রাজপথগুলিতে একবার ঘুরিয়া আসিলেই তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। মরিতে অবশ্য দেশীয় লোকেরাই বেশী পরিমাণে মরিয়া থাকে; এবং কলিকাতার দেশীয় অংশের অবস্থা দেখিলে তাহাদের মরিবার কারণ বুঝিতেও বেশী বিলম্ব হয় না। রাস্তার আবর্জ্জনা ত জমিয়া থাকেই। তাহার উপর রাস্তায় কোন জীবজন্তু, যথা গরু, বাছুর, কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতি মরিয়া পড়িয়া থাকিলে তাহা যে কত বিলম্বে স্থানান্তরিত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। রাস্তার ড্রেণগুলি যখন পরিষ্কার করা হয়, তখন ড্রেণের ভিতর হইতে যে ময়লা উঠে, তাহা আমরা তিন চার দিন রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আর সহরতলীর অবস্থার কথা না তোলাই ভাল। কোন প্রয়োজনে সহর হইতে কাহাকেও একবার সহরতলীতে যাইতে হইলে রাস্তার দুই পার্শ্বের খোলা নর্দ্দমাগুলির দুরবস্থা দেখিয়া চক্ষুর যেমন পীড়া জন্মে, সেই সকল নর্দ্দমার দুর্গন্ধে তেমনি অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিবার উপক্রম হয়। আর লণ্ডন? সেখানকার বন্দোবস্ত এমনই সুন্দর যে রাস্তায় এক টুক্‌রা কাগজ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিবার যো নাই—আবর্জ্জনা ত দূরের কথা। আমরা কেবল প্রসঙ্গ ক্রমে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবর্জ্জনা ও ড্রেণের অবস্থার কথা তুলিলাম। কলিকাতার স্বাস্থ্য ভাল না থাকিবার আরও অনেক কারণ আছে। সে সকল কথা তুলিতে গেলে একখানি মহাভারত লিখিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা নয় কি?

বাঙ্গালার বীরমল্ল

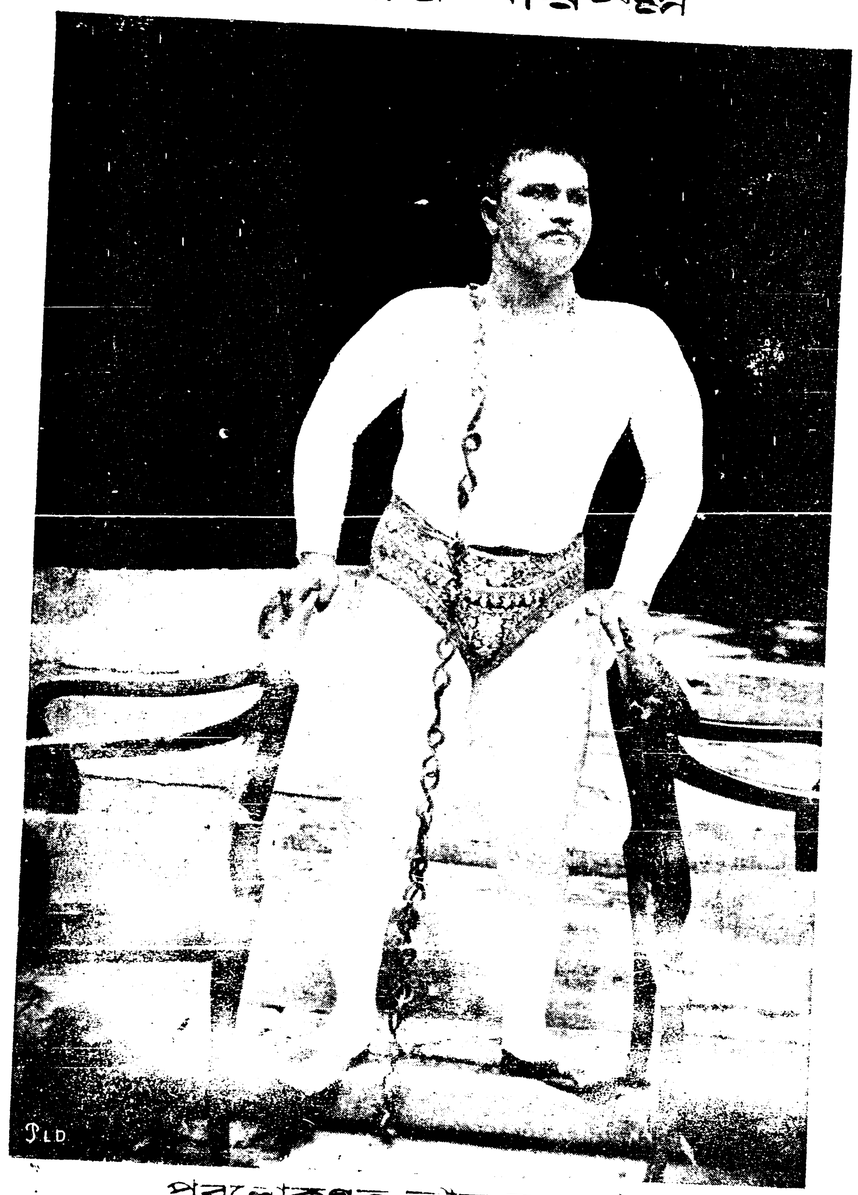

পরলোকগত ভীম ভবানী।

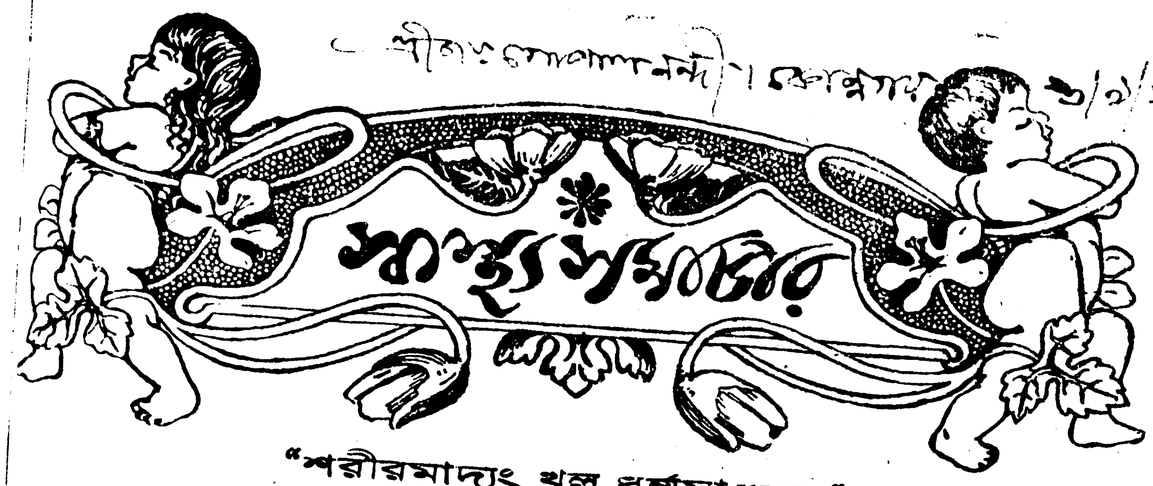

শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার বসু।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

সাইকেলে—কলিকাতা হইতে বারাণসী।

স্বাস্থ্য সমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্‌"

১১শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল { ৮ম সংখ্যা

বাঙ্গালা কি প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর, ভাদ্র ও আশ্বিন, ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

লেখক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ সেন, বি-এল্।

বিজ্ঞান (Science)।

সাধারণ জ্ঞানের কথা বলা হইল। এখন বিজ্ঞান কি ... তাহা দেখা যাউক। অগ্রে আমরা পাশ্চাত্য ...নের কথা বলিব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুসারে

(ক) জ্বরোৎপত্তির কারণ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা বলেন (anopheles) ...ফেলিস নামক মশা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির ...হইতে বিষাক্ত জীবাণু দংশন দ্বারা সংগ্রহ করিয়া ... মনুষ্যকে দংশন করিয়া তাহার শরীরে উহা ... করায়, এবং তৎকারণে দংশিত ব্যক্তির জ্বর ...য়। কিন্তু এই বিষাক্ত জীবাণু কোথায় কি ... প্রথমে উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা স্থির করিতে ...ন নাই।

(খ) প্রতিষেধক বিধি।

...হাদিগের মতে প্রতিদিন কিছু কিছু কুইনাইন ..., এবং মশারির ভিতর শয়ন ইত্যাদির দ্বারা মশার কামড় হইতে অব্যাহতি পাইলে জ্বর হইতে পারে না। এ কারণ মশক ধ্বংসের নানা উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে।

(গ) চিকিৎসা।

ইঁহাদিগের মতে কুইনাইন সেবনই ইহার একমাত্র ঔষধ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্থল বিশেষে ইঁহারা রোগীকে অত্যধিক কুইনাইন সেবন করাইয়া থাকেন।

অতঃপর আমরা প্রাচ্য বিজ্ঞানের কথা বলিব। প্রাচ্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে—

(ক) সর্ব্ব প্রকার রোগোৎপত্তির কারণ—

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগ মিথ্যা ন চাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়াণাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতুসংগ্রহঃ ॥
শরীরং যত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়ো মতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণংসমঃ ॥

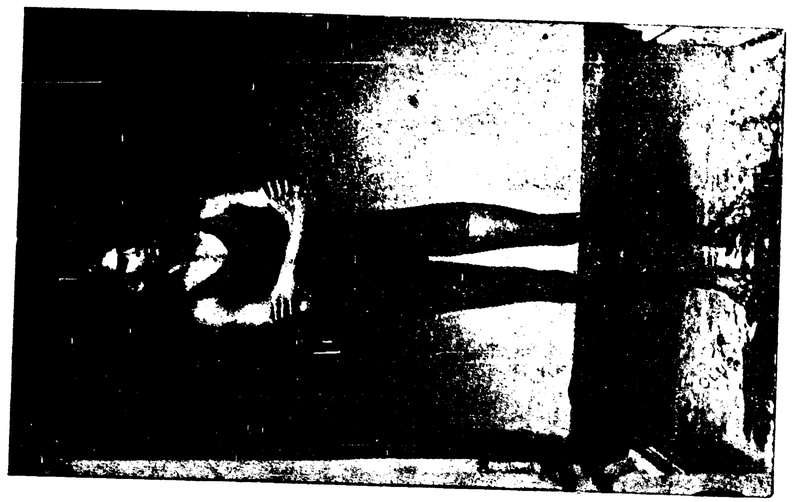

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥

চরক সংহিতা সূত্রস্থানম্।

অস্যার্থঃ—

"**কাল ঋতু বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থ** (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য যথা—অন্ন, জল, বায়ু, সূর্য্যতাপ, পোষাক পরিচ্ছদাদি যাহা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়) এই তিনের মিথ্যা যোগ, অযোগ ও অতিযোগ, শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধির কারণ। শরীর ও মন ব্যাধিগণের আধার। আর কাল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের যথাযোগ অরোগিতার কারণ। (দৃষ্টান্ত—শীতকালে শীত না হওয়াতে কালের অযোগ, শীতকালে বর্ষা হওয়াতে কালের মিথ্যাযোগ, শীতকালে অত্যধিক শীত হওয়াতে কালের অতিযোগ হয়।) বায়ু, পিত্ত ও কফকে শারীরিক দোষ কহে। মানস দোষ সত্ত্ব (বায়ু) রজ (পিত্ত) এবং তম (কফ)। যাহা বিকৃত হইলে রোগ হয় তাহাকে দোষ বলে।

সকল প্রকার শারীরিক ব্যাধির কারণ সাধারণ ভাবে বলা হইল।

এক্ষণে জ্বরোৎপত্তির কারণ বিশেষভাবে যেরূপ লিখিত আছে তাহার আলোচনা করা যাউক।

"অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি।"

চরক সংহিতা, নিদান স্থানম্, ১ম অধ্যায়।

অস্যার্থঃ—

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ (অসাত্ম্য অর্থাৎ যাহার যে জিনিষ সহ্য হয় না এরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ অর্থাৎ ভোগ্য জিনিষ), প্রজ্ঞাপরাধ (বুদ্ধির দোষ) এবং পরিণাম (কাল বা ধাতু) জ্বরোৎপত্তির ত্রিবিধ কারণ। অর্থাৎ ধাতু বিশেষে শরীরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বুদ্ধির দ্বারা ভোগ্য দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার না করিয়া ঐ দ্রব্য ব্যবহার করা জ্বরোৎপত্তির কারণ।

চিকিৎসার দোষে ও রোগীর আহার বিহারের দোষে জ্বর পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে।

"বিগত ক্লমসন্তাপমব্যথং বিমলেন্দ্রিয়ম্।
যুক্তং প্রকৃতি সত্ত্বেন বিদ্যাৎ পুরুষমজ্বরম্॥"

(চরক সংহিতা, চিকিৎসিত স্থানম্, ৩য় অধ্যায়।)

অস্যার্থঃ—

জ্বর মুক্ত হইলে পুরুষ বিগত ক্লান্তি, বিগত-সন্তাপ, ব্যথাহীন ও বিমলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে ও পূর্ব্বব সত্ত্ববান্ হয়।

"দুহ্নত্যেষু চ দোষেষু যস্য বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পেনাপ্যপচারেণ তস্য ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

চরক সংহিতা, চিকিৎসিত স্থানম্, ৩য় অধ্যায়।

অস্যার্থঃ—

"দোষ সকল (বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও কফ) অনুচিতরূপে ও অসময়ে নিঃসারিত হওয়ার পর জ্বর নিবৃত্ত হয়, তাহা স্বল্প মাত্র অপকারেই প্রত্যা হয়।"

পাঠকবর্গ, এই পুনরাবৃত্ত জ্বরকে ম্যালেরিয়া ব যায় না কি?

(খ) প্রতিষেধক বিধি।

আমরা এখন প্রাচ্য শাস্ত্রোল্লিখিত প্রতিষেধক বি সমূহের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহা সকলে স্বীকার করিবেন যে, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটে ও স্বভাবের নিয়মানুসারে ঘ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা মানুষের ক্ষম নহে। ঋতু পরিবর্ত্তন বন্ধ করা যখন মানুষের ক্ষমতা অতীত, তখন ঋতুর এরূপভাবে অনুসরণ করা কর্ত্ত যাহাতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হেতু মানব শরীরের পরিবর্ত্ত কোনরূপ পীড়ার উদ্ভব না হইতে পারে। ঋষিগণ এতৎসম্বন্ধে সে সব নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছে তাহাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঋতু-পরিচর্য্যা নামে অভিহি ইহা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

কিন্তু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা স্মরণ রা আবশ্যক যে স্বাস্থ্য রক্ষার একটী প্রধান সূত্র শরীরকে নাতিশীতোষ্ণ রাখিতে হইবে; অর্থাৎ বেশী গরম নহে অথচ বেশী নরমও নহে, এরূপভাবে রাখিতে

বেশী গরম হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা নরম, ও নরম হইলে উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা গরম করিতে। বিবেচনা পূর্ব্বক স্নান ও পানাহার দ্বারা এবং দি ব্যবহার দ্বারা ইহা অনেক পরিমাণে হইতে পারে। ইহাতে ফলোদয় না হইলে সেবন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য কার্য্য করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম ঋতু। এ সময় প্রখর সূর্য্যতাপে রের রস শুষ্ক হইয়া যায় ও পরিপাক শক্তি হয়। এ সময়ে লঘু ও শীতল দ্রব্য আহার শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। চিনির সরবৎ অম্ল পুরাতন তেঁতুল মিশ্রিসহ ভিজাইয়া তাহার সরবৎ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। ত্রিফলার জল মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে নাতিশীতোষ্ণ থাকে।

আষাঢ়, শ্রাবণ, বর্ষাকাল। এ সময়ে কোন রৌদ্র হেতু শরীর গরম, কোন দিন বর্ষা নরম হইয়া থাকে। এ সময়ে নানা প্রকার পচিয়া বাষ্প (gas) উৎপন্ন হয় ও জল হয় বায়ু, পিত্ত, কফ ত্রিধাতুরই বিকৃতি ঘটে। একালে ত্রিদোষ নাশক দ্রব্য ব্যবহার করা। এ সময়ে পরিপাকশক্তি অধিকতর দুর্ব্বল হয়; লঘু দ্রব্য আহার করা উচিত। কিন্তু শীত- বা বর্ষার দিন প্রচুর অম্ল, লবণ ও স্নেহযুক্ত খিচুড়ি ও লুচি প্রভৃতি খাওয়া যাইতে পারে। জল নানা কারণে দূষিত হয় বলিয়া তাহা করা নিষিদ্ধ। বৃষ্টির জল, ভাল পুকুরের জল, জল, অভাবে জল গরম করিয়া তাহা শীতল কর্পূর সংযোগে পান করা বিধেয়। এ সময়ে লবণ সহ আদা খাইলে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পরিমাণমত ধনে পাতার ক্বাথ গরম গরম পিত্ত শান্ত হয়, অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং সহজে নির্গত হয়। একমুষ্টি ধনে ও একমুষ্টি পটলের অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করা ভাল। পরিমাণে কিছু বেশী কম হইলে বড় আসে যায় না।

ভাদ্র আশ্বিন মাস শরৎকাল। বর্ষাকালে পিত্ত সঞ্চয় হইতে থাকে; শরৎকালে সূর্য্যতেজ বশতঃ সঞ্চিত পিত্ত কুপিত হয়। একালে গুড় প্রভৃতি মধুর ও পিত্তনাশক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। এ সময়ে শুক্তানি খাওয়া ভাল। কাঁচা হলদি গুড় সহ খাইলে, নাল্তের জল কি ছোলা ভিজান জল কি চিরতার জল খাইলে পিত্ত নাশ হয়। পলতা (পটলের পাতা) ভাজা কি পল্তার বড়ি পিত্তের পক্ষে উপকারী। সর্ব্বোপরি বর্ষা ও শরৎকালে ধনে পল্তা একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ বয়স বিবেচনায় অর্দ্ধপোয়া পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই তিন দিন খাইলে জ্বর হয় না।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্ত কাল। এই সময়ে শরীরে শ্লেষ্মা ও পিত্তের সঞ্চয় হয়। কার্ত্তিক মাসে গরম কাটিয়া গিয়াঅল্পে অল্পে শীত আসিতে থাকে। এই সময়ে অল্পে অল্পে শীতবস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিতে হয়। নতুবা হঠাৎ শীতল বাতাস লাগিয়া শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জনিত নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয়। দেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, আশ্বিন মাসে লেপ কাঁথা গায়ে না দিলে কার্ত্তিক মাসে উহা ব্যবহার করা যায় না; যদি করা হয় তাহা হইলে শূকর হইতে হয়। ইহার মূল কারণ, অল্পে অল্পে লোকে যাহাতে শীতবস্ত্র ব্যবহার করে, প্রকারান্তরে তাহারই উপদেশ দেওয়া হইতেছে। কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের কিছুদিন পর্য্যন্ত ঋতু পরিবর্ত্তন হেতু অর্থাৎ গরম যাইয়া শীত আসিতে থাকায় শরীরে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয় এবং শ্লেষ্মার ভাগ বেশী হইলে জ্বর হয়। হঠাৎ বেশী ঠাণ্ডা লাগিয়া মারাত্মক ব্যাধির (যথা নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা) আক্রমণ উপস্থিত হয়। এক ঋতুর শেষ সপ্তাহ হইতে পরবর্ত্তী ঋতুর প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত কালকে ঋতুসন্ধি কহে। এই সময়ে অল্পে অল্পে পূর্ব্ব ঋতুর নির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ

করিয়া পরবর্ত্তী ঋতুর বিধির অনুসরণ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টম দিবস পর্য্যন্ত কালকে যমাষ্টকা বা যমদংষ্টা বলে অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যমের দ্বার খোলা থাকে। ইহার অর্থ এই যে কার্ত্তিক মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঋতু পরিবর্ত্তন হেতু চিরদিনই প্রতিবৎসর লোকের পীড়া ও মৃত্যু হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণের অষ্টম দিন হইতে শরীর ঋতু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে সক্ষম হয় এবং সেই সময় হইতে পীড়া ও মৃত্যু হ্রাস হইতে থাকে। কোন কোন মতে বলা হয় যে কার্ত্তিকের ১৫ই এর পর হইতে অগ্রহায়ণের ১৫ই পর্য্যন্ত ঋতু পরিবর্ত্তন হেতু নানা প্রকার পীড়ার আশঙ্কা থাকে; সুতরাং এই সময়ে সাবধান থাকিলে সহসা পীড়া হইতে পারে না। যে বৎসর ঋতু বিপর্য্যয় বেশী হয়, সেই বৎসর পীড়া ও মৃত্যু বেশী হয়। একালে গরম ও গুরু জিনিষ খাওয়া এবং যাহাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি না হইতে পারে সেইরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য।

এই ঋতুতে প্রত্যহ আদা ও লবণ এবং সপ্তাহে ২।৩ দিন শিউলির পাতার রস লবণসহ খাইলে শ্লেষ্মা-জনিত পীড়া হইতে পারে না। আদা পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে। শিউলির পাতার রস শ্লেষ্মা নষ্ট করে ও জ্বরের প্রতিষেধক, অর্থাৎ জ্বর হইতে দেয় না। আর জ্বর হইলেও তাহা নাশ করে এবং আম পরিপাক করে। লবণ পরিপাক বৃদ্ধি করে ও রেচক; অর্থাৎ বাহ্যে করায়। বেশী শ্লেষ্মা হইলে এবং বাহ্যে না হইলে, আদা ও শিউলির পাতার রস একত্র লবণসহ খাইলে শরীর সুস্থ হয়।

এই সময়ে খাঁটী সর্ষপ তৈল নিয়ম মতে ব্যবহার করিলে শ্লেষ্মাজনিত কোন পীড়া হইতে পারে না। বেশী শ্লেষ্মা বোধ হইলে রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে উভয় পদতলে ভাল করিয়া সর্ষপ তৈল মাখিয়া পরে শুষ্ক কাপড় কি গামছা দিয়া মুছিয়া নিদ্রা গেলে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। শরীরের কোন স্থানে শ্লেষ্মার দরুণ ব্যথা বোধ হইলে তথায় কিছুক্ষণ সর্ষপ তৈল মালিশ করিলে (কর্পূর কি শুঁটের গুঁড়া সহ হইলে আরও ভাল হয়) এবং কিছুক্ষণ (২০।২৫ মিনিট) উহা নাকে টানিলে শ্লেষ্মা নাক ও মুখ দিয়া বহির্গত হয় ও তৎকারণে শরীরে ব্যথা থাকে না। উহা শুষ্ক বোধ হয় এবং মাথাধরা দূরীভূত হয়। শ্লেষ্মার দরুণ বুকব্যথা বোধ হইলে সর্ষপ তৈল ভাল করিয়া মালিশ করিয়া আকন্দ পত্রের কুঁড়াযুক্ত পিঠ গরম করিয়া তথায় কিছুক্ষণ সেক্ দিলে শ্লেষ্মা উঠিয়া পড়ে ও ব্যথা দূরীভূত হয়। প্রতিদিন সর্ষপ তৈল ভাল করিয়া শরীরে মাখিয়া স্নান করিলে ত্বক দৃঢ় হয় ও শৈত্য সহ্য করিতে সক্ষম হয় এবং শ্লেষ্মাজনিত পীড়ার আশঙ্কা থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে জেলে মালোরা কি শীত কি গ্রীষ্ম, কি রাত্রি, কি দিন, কি সকাল, কি সন্ধ্যা, কি দ্বিপ্রহর দিন, কি মধ্যরাত্রি সকল সময় জলে মৎস্য ধরে; কিন্তু তাহারা জলে ডুব দিবার পূর্ব্বে সর্ষপ তৈল মাখিয়া থাকে। ইহাদিগের নিউমোনিয়া ব্যায়রাম হইতে দেখা যায় না। এখানে সর্ষপ তৈলের অন্য কয়েকটী গুণ পাঠককে জ্ঞাত করা উচিত মনে হইতেছে। ইহা গাত্রে মাখিলে চুলকনা হয় না। উহা নাভির চারিদিকে মর্দ্দন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। চক্ষু উঠার উপক্রম হইলে উহা সন্ধ্যা ও সকালে কি স্নানের সময় বেশীক্ষণ নাকে টানিলে চক্ষু উঠে না। প্রত্যহ স্নানের সময় উহা কুল্লী করিলে দাঁত দৃঢ় হয়, উহার গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে না। প্রত্যহ কর্ণে দিলে উহা ভাল থাকে। যদি কাণ কামড়ানি হয় তবে গরম করিয়া কাণে দিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিলে ও পরে কাণে তুলা দিয়া রাখিলে কাণ কামড়ানি সারে। সকলেরই খাঁটী সর্ষপ তৈল রীতিমত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি আদা শিউলির পাতার রস ও সর্ষপ তৈল বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে শ্লেষ্মাজনিত পীড়ার হাত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যায়। ইদানীং সর্ষপ তৈলের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

শ্লেষ্মাজনিত পীড়া যথা নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস্ বৃদ্ধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ইহা বিজ্ঞ ডাক্তারগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।

পৌষ মাঘ শীতকাল। শীতকালে শীতল বায়ু স্পর্শে শরীরের তাপ কমিয়া যায়। নিয়মিত তাপ রক্ষার জন্য গরম বস্ত্র পরিধান, গরম ঘরে বাস ও গরম দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। একালে সূর্য্যতাপ ও অগ্নিতাপ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তৈল ও ঘৃতের দ্বারা শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তৈল ও ঘৃতে পাক করা জিনিষ যথা পিষ্টক, পলান্ন, খিচুড়ি প্রভৃতি ভোজন খাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিলে একালে কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা নাই।

ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত কাল। শীতকালে শরীরের মধ্যে যাহা সঞ্চিত থাকে,—বসন্তকালে শীতকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মা সূর্য্যতাপে তরল হইয়া শরীরের ভিতর চলাচল করে। এবং সর্দ্দি কাশী বুক পিঠ ব্যথা জ্বর প্রভৃতি ব্যায়রাম উৎপাদন করিতে পারে। এই সময়ে শীতের ভাগ কম ও গরমের ভাগ বেশী হইতে থাকে; সেজন্য অল্পে অল্পে শীতল বস্ত্র ত্যাগ করিতে হয়। হঠাৎ শীতবস্ত্র সমুদায় ত্যাগ করিলে বাহিরের ঠাণ্ডা বায়ু লাগিয়া অধিকতর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করিয়া ব্যায়রাম উৎপাদন করে। গরম বোধ হওয়া মাত্র হঠাৎ বেশী ঠাণ্ডা জিনিষ খাইলেও ঐরূপ ব্যায়রাম হয়; সুতরাং অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়া উচিত। হঠাৎ শীতবস্ত্র পরিত্যাগ ও বেশী ঠাণ্ডা দ্রব্য পান ও আহার করিয়া বহুলোক শ্লেষ্মাজনিত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকে এবং অনেকে কালমুখে পতিত হয়। এইকালে অল্পে অল্পে গ্রীষ্ম কালের উপযোগী আহার বিহার অভ্যাস করিতে হয়। দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে শ্রীপঞ্চমীর দিন কলাইয়ের ডাউল বেগুন দিয়া রাঁধিয়া পর দিবস প্রাতে উহা খাইতে হয়। সাধারণতঃ শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে ক্রমে ক্রমে গরম পড়িতে থাকে; সুতরাং এই সময় হইতে যাহাতে মানব শরীর অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হয় এই প্রথা প্রকারান্তরে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। হেমন্তাগমে শরীর গরম হইতে শৈত্য ও বসন্তাগমে শরীর শৈত্য হইতে গরমে পরিণত হইতে থাকে। এই দুই কালে বিবেচনা পূর্ব্বক শরীর নাতিশীতোষ্ণ (বেশী গরম ও নহে বেশী নরমও নহে এইভাবে) না রাখিতে পারিলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে হেমন্ত ও বসন্তকালে নিউমোনিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি গুরুতর পীড়া দেখা যায়। ইহার একটী প্রধান কারণ ঋতুর উপযোগী আহার বিহার না করা বলিয়া বিবেচিত হয়। বসন্তকালে প্রত্যহ প্রাতে একটু আদা লবণসহ খাইলে এবং উপরে যেরূপভাবে সর্ষপ তৈল ব্যবহার করার নিয়ম বলা হইয়াছে তদনুযায়ী উহা ব্যবহার করিলে শ্লেষ্মা ঘটিত পীড়া হইতে পারে না।

ঋতু পরিচর্য্যা সংক্ষেপে বলা হইল। শুধু ঋতু পরিচর্য্যা করিলে চলিবে না। পীড়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে পানাহার সম্বন্ধে মিতাচারী হওয়া এবং বিশুদ্ধ জল বায়ু ও প্রচুর সূর্য্যতাপ উপভোগ করা এবং শুষ্ক স্থানে বাস করা অতীব কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। অস্মদ্দেশে জল বায়ু ও সূর্য্যকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। জল নারায়ণ (আপোনারায়ণঃ) বায়ু ব্রহ্ম (বায়ো ব্রহ্মঃ) এবং সূর্য্য দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বায়ুকে প্রাণ এবং এবং জলকে জীবন বলে। বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ ষষ্ঠী পূজা হইতে দুর্গোৎসব পূজা পর্য্যন্ত ধুপ ধুনা জ্বালানর ব্যবস্থা আছে এবং কোন স্থানে কোন জিনিষ পচিয়া দুর্গন্ধ হইতে পারে বলিয়া ভাল গোবর দ্বারা ঐ স্থান পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে। পানীয় জলের জন্য প্রত্যেক গ্রামে খোলা স্থানে একটী করিয়া পুকুর নির্দ্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থা আছে। উহাতে অবাধে সূর্য্যতাপ ও বায়ু সঞ্চরণ করিতে পারে এবং

কোনরূপে পত্রাদি পচিয়া কি অন্য কোন কারণে জল দূষিত হইতে পারে না। এরূপ ভাবে ঐ পুকুর রক্ষা করা চাই। এই পুকুরকে হংসোদক (বর্ত্তমান Reserve Tank) বলে। জল ও বায়ু বিশুদ্ধ না হইলে কোনও ক্রমে উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করা যাইতে পারে না। সূর্য্যতাপ জলবায়ু ও স্থানের সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট করিয়া ও স্থানের শুষ্কতা সম্পাদন করিয়া উহাদিগকে বিশুদ্ধ করে।

(গ) চিকিৎসা।

জ্বরের তিনটী অবস্থা; জ্বরের পূর্ব্বরূপ, জ্বর অবস্থা এবং জ্বরমুক্ত অবস্থা। এই তিন অবস্থায় বিবেচনা-পূর্ব্বক চলিলে জ্বরজনিত বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। সাধারণ জ্বর সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম বলা যাইতেছে।

প্রথম অবস্থা

জ্বরের পূর্ব্বরূপ।

জ্বর হইবার পূর্ব্বে আলস্য বোধ করা, চক্ষু জলে ছল ছল করা, শরীর ভারবোধ ও কামড়ানি, হাইতোলা, পরিপাক ভাল না হওয়া এবং আহারে অনিচ্ছা, মুখে শ্লেষ্মার দরুণ দুর্গন্ধ বোধ, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ এবং জল বাতাস কখন ভাল বোধ করা কখনও না করা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কেহ বা ইহার কতক, কেহ বা ইহার বেশী লক্ষণ অনুভব করিতে পারেন; এক সময়েই যে এক ব্যক্তিকে সমুদায় লক্ষণ অনুভব করিতে হয় এরূপ নহে।

এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরের অবস্থা বোধে স্নান করা না করা কি কেবল মস্তক ধৌত করা, সামান্য উপবাস অর্থাৎ দিনে অন্ন ও রাত্রে খই, চিড়াভাজা, মুড়ি, ইত্যাদি শুষ্ক লঘুপাক দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য; যদি শরীর রসস্থ বোধ হয় তাহা হইলে মস্তক ধৌত করা ও দিনের বেলা অন্ন আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কেবল মাত্র ক্ষুধা অনুযায়ী লঘুপাক শুষ্ক দ্রব্য আহার করাই উচিত। আর এই অবস্থায় শিউলির পাতার রস লবণ সহ অথবা টুক্‌রা আদা, লবণ সহ, এবং শরীর ভার ও কামড়ানি বোধ করিলে শিউলির পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস লবণসহ দুইবেলা করিয়া দুই একদিন খাইলে জ্বর না হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি শ্লেষ্মার দরুণ মাথা ভার ভার বোধ হয় ও কামড়ায় তাহা হইলে সর্ষপ তৈল দুইবেলা কিছুক্ষণ ধরিয়া নাস্ টানিলে উপকার হয়; শরীরের অন্য কোন স্থানে বেদনা বোধ হইলে সেইস্থানে সর্ষপ তৈল ভাল করিয়া মালিশ করিলে এবং নাকে সর্ষপ তৈল টানিলে বেদনা অনেকটা দূরীভূত হইবে। আর বুকে বেদনা বোধ হইলে ইহা ভিন্ন তৈল (ফুটাইয়া গরম করিয়া লইলে মন্দ হয় না) মালিশ করিয়া, তথায় আকন্দের পাতার কুঁড়া-পিঠ আগুনে গরম করিয়া তাহার সেক পুনঃ পুনঃ দিয়া, কিছুক্ষণ গরম কাপড়ে আবৃত রাখিলে সারিয়া যায়; সময়মত বিবেচনা পূর্ব্বক এই প্রণালী অবলম্বন করিলে জ্বর শ্লেষ্মাধিক্য ব্যাধি এমন কি, ইনফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যারামের সম্ভাবনা কম হয়। বলা বাহুল্য সর্ষপ তৈল খাঁটী হওয়া চাই, এবং অবস্থা বিবেচনায় ইহা বেশী কি কম সময় কথিতমত ব্যবহার করিতে হয়।

দ্বিতীয় অবস্থা

জ্বর।

সাধারণতঃ পিত্ত ও শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে উপবাসই একটী প্রধান ঔষধ।

"লঙ্ঘনেন ক্ষয়ংনীতে দোষে সংধুক্ষিতেঽনলে,
বিজ্বরত্বং লঘুত্বঞ্চ ক্ষুচ্চৈবাস্যোপজায়তে॥
প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥"

(চরকসংহিতা চিকিৎসিতস্থানম্ তৃতীয় অধ্যায়)

অস্যার্থ—

লঙ্ঘন দ্বারা দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত ও অগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে রোগীর বিজ্বরত্ব, দেহের লঘুত্ব ও ক্ষুধা সঞ্চার হইয়া থাকে। এরূপ লঙ্ঘন দিবে যেন প্রাণের ব্যাঘাত না হয়; আরোগ্য রোগীর বলের প্রতি নির্ভর করে এবং চিকিৎসা আরোগ্যের জন্য। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে—

"দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥"

অস্যার্থ—

"পীড়া অল্প দোষবিশিষ্ট হইলে শুদ্ধ লঙ্ঘন, মধ্যবিধ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক দোষ বিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষ বিশিষ্ট হইলে শোধন ক্রিয়াদ্বারা (বমন বিরেচক অর্থাৎ জোলাপাদি দ্বারা) দোষ সকল শরীর হইতে একেবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ নিঃসৃত হইয়া যায়।"

লঙ্ঘন বলিলে যে সম্পূর্ণ উপবাস করিতে হইবে এরূপ নহে। রোগীকে অবস্থা বিবেচনায় কাঠখোলার খৈ, খৈ'র মণ্ড, মুড়ি, যবের মণ্ড (বার্লি), মুগের কি মসুরের ডালের ক্বাথ বা Jucice কিস্‌মিস্, বেদানা, ডালিম, খোসা ছাড়ান কচি পানিফল কি কচি কাঁকুড়, ন্যাস্‌পাতি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। উপবাস সাধারণতঃ বড় বেশী হইলে ৭ দিনের অধিক আবশ্যক হয় না; অষ্টম দিবসে জ্বর বিচ্ছেদ হয়; তাহা না হইলে জ্বর কঠিন জানিয়া অন্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উপদ্রববিহীন সাধারণ জ্বরে অল্প ঔষধ দিলেই জ্বর শান্তি হয়। প্রাতঃকালে ধনে ও পলতার (পটোল পত্রের) ক্বাথ অর্থাৎ পাচন গরম গরম এবং বৈকালে শিউলিপাতার রস লবণ সংযুক্ত করিয়া (ইহাতে লোহা বন্ধাইয়া দিয়া অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহ রসের মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে আরও ভাল হয়,) সেবন করা বিধেয়। ধনে ও পলতার সহিত হেতে (বুন) পেঁপুলের মোথা সংযোগ করিলে আরও ভাল হয়। শ্লেষ্মা বেশী বোধ হইলে শিউলির পাতার সহিত আদা ছেঁচিয়া তাহার রস উক্ত প্রকারে সেবন আরও উপকারী; যদি গাত্রে কি পৃষ্ঠে ব্যথা থাকে, তাহা হইলে শিউলির পাতা, আদা, বেলের পাতা এবং কৈওথড়া একত্র করিয়া ছেঁচিয়া তাহার রস লবণ সংযুক্ত করিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়। যদি পলতা (পটলেরপাতা) না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকালে-বৈকালে শিউলির পাতার রস উক্ত প্রকারে খাইলেও জ্বরের অনেক উপশম হয়। রোগীর জ্বরের সঙ্গে যদি বুকে ব্যথা হয়, তাহা হইলে তথায় খাঁটি সর্ষপ তৈল বিশেষ করিয়া মালিশ, সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যার পর আকন্দের পাতার কুঁড়াযুক্ত পিঠ আগুনে তপ্ত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার সেক দিয়া বুক কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে এবং নাকে ঐ তৈল পুনঃ পুনঃ টানিলে শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া পড়ে এবং ব্যথা দূরীভূত হয়। * মাথায় শ্লেষ্মাজনিত ভারবোধ কি কামড়ানি অনুভব করিলে ঐ তৈল পুনঃ পুনঃ টানিলে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মাথা পরিষ্কার হয়। তুলসীর পাতার রস মধুসহ এক ঝিনুক পরিমাণ বৈকালে ও সন্ধ্যার পর সেবন

---

* লেখকের বিধানগুলির অধিকাংশের সহিত পল্লী-গৃহী মাত্রেই এখনও যে পরিচিত তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমাদিগের "সমাচার" বিশেষ ভাবেই পল্লীবাসী-দিগের উপকারার্থ ও আগ্রহানুকূল্যে প্রকাশিত হয়; সুতরাং লেখক এ সকল পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বণগুলির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ও সবিস্তার বর্ণন না করিয়া যদি কোন দুষ্প্রাপ্য বা লুপ্তপ্রায় ভেষজ বা ওষধির সন্ধান ও গুণাগুণ বলিয়া দিতে পারিতেন, কিম্বা তাহার পূর্ব্ব-প্রবন্ধাংশের অনুরূপ কতকটা মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিতেন,—তাহা হইলে পাঠকদিগের অধিকতর উপকার সাধন করিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রায় সকল মারাত্মক ও জটিল ব্যাধির প্রথম পূর্ব্বলক্ষণ—জ্বর; সেই সকল স্থলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত নিজমতে টোট্‌কা-টাট্‌কা সেবন সকল সময় নিরাপদ নহে এবং ঐ জ্বর অন্য কোন কঠিন ও উপদ্রবযুক্ত ব্যাধির সূচনা বা সামান্য উপদ্রবহীন জ্বর মাত্র—তাহা অনভিজ্ঞ গৃহী বা প্রয়োগবিধি-জ্ঞানহীন রোগীর বিচার করার ক্ষমতা নাই। তবে সাধারণ ও অতি সামান্য সর্দ্দিজ্বর প্রভৃতিতে এই সকল টোট্‌কায় অনেক সময় উপকার দর্শে।—

স্বা, স, সম্পাদক।

করাইলে ছোট ছোট ছেলেদের শ্লেষ্মাযুক্ত জ্বরে উপকার হয়। তুলসীর পাতার রস শ্লেষ্মার পক্ষে মহোপকারী; ইহাতে পার্শ্ববেদনাও সারে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ক্বাথ বা রস এক একবারে যেন এক ছটাকের কম না হয়; শিশুগণকে এক ঝিনুক, বালকগণের পক্ষে বয়স বিবেচনা করতঃ তদূর্দ্ধ পরিমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে। একমুষ্টি ধনে ও এক মুষ্টি পটলের পাতা অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া গরম গরম খাইতে হইবে। আদা এক গিরা কি দুই গিরার বেশী আবশ্যক হয় না। যদি জ্বরের প্রথম অবস্থা হইতে কথিতমত প্রণালী অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে সাধারণতঃ অল্প সময়ের মধ্যে জ্বরের শান্তি হয়। সাধারণ জ্বর কথিত লঙ্ঘন ও ঔষধ সেবন দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে। উপদ্রবযুক্ত কঠিন জ্বরের চিকিৎসা সুনিপুণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানই কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অবস্থা

জ্বর অবস্থা।

উপরোক্ত প্রকারে উপবাস ও ঔষধ দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মার দোষ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া শরীর সুস্থ হইতে থাকে। শরীর শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে মল আপনিই নির্গত হইয়া যায়। ইহা নিঃসারণ জন্য কোন জোলাপের আবশ্যক করে না, শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক ও কোষ্ঠ নিয়মমত পরিষ্কার হইলে সে সময় শরীর নির্ব্যাধি মনে করিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে চরক ঋষির উক্তিএই যে,—

"বিগতক্লমসন্তাপথব্যথং বিমলেন্দ্রিয়ম্।
যুক্তং প্রকৃতিসত্ত্বেন বিদ্যাৎ পুরুষমজ্বরম্॥"

[চরকসংহিতা চিকিৎসাস্থান তৃতীয় অধ্যায়]

অন্বয়ার্থ—

"জ্বরমুক্ত হইলে শরীরের ক্লান্তি থাকে না, তাপ থাকে না, ব্যথা থাকে না, মন প্রফুল্ল হয়।" কথিত প্রকারে শরীর নির্ব্যাধি না করিলে স্বল্প অপকারেই জ্বর পুনরাবৃত্ত হয়। এসম্বন্ধে উক্ত ঋষির বচন এই যে:—

"হ্রস্বতেষু চ দোষেষু যস্য বা বিনিবর্ত্ততে।
স্বল্পেনাপ্যপচারেন তস্য ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ॥
চিরকাল পরিক্লিষ্টং দুর্ব্বলং দীনচেতসম্।
অচিরেনৈব কালেন স হন্তি পুনরাগতঃ॥"

অন্বয়ার্থ—

দোষসকল ক্রমে ক্রমে নিঃসারিত না হইয়া অনুচিতরূপে ও অসময়ে নিঃসারিত হওয়ার পর যে জ্বর নিবৃত্ত হয়, তাহা স্বল্পমাত্র অপকারেই পুনরাবৃত্ত হয়; এইরূপে প্রত্যাগত জ্বর রোগীকে বহুদিবস পর্য্যন্ত পরিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও দীনচিত্ত করিয়া পরিশেষে বধ করে।

(পাঠক, স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে এক্ষণে দেশে যাহাকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলা হয়; তাহার সহিত ঋষি-কথিত পুনরাবৃত্ত জ্বরের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে কি না?)

উপরোক্ত প্রকারে জ্বর ত্যাগ পাইলে, একটী কি দুইটী নাটার মধ্যস্থ শাঁস, দুই কি চারিটী গোল মরিচ সহ গুঁড়া করিয়া তিনটী বড়ি করিতে হইবে। ইহার এক একটী বড়ি একঘণ্টা অন্তর খাইতে হইবে। পরদিবস এই প্রকারের দুইটী এবং তৎপর দিবস একটী বড়ি খাইলে জ্বর একেবারে বন্ধ হইবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া একটী কি দুইটী নাটার শাঁসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি রোগী কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ বরাবর খাইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে দুইটী নাটার শাঁস দিতে হইবে; ছোট ছেলেদের পক্ষে একটী শাঁস দিলে উপকার হইবার সম্ভব। সাধারণ জ্বর ইহাতেই বন্ধ হয়।

জ্বর বন্ধ হওয়ার এক কি দুইদিন পরে, প্রথম দিবসে ওগ্‌রা (মুসুরের ডাউল ও পুরাতন চাউল, সামান্য একটু তৈল ও হলদি দুই একটী লঙ্কাসহ পক্ক) খাওয়া ও তৎপর পাঁচ-সাত দিন—দিবসে ভাত এবং রাত্রে শুষ্ক ও লঘু পাচ্য দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। ইহার

দ্বারা ক্ষুধা ও শরীর গতিক বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে দুইবেলা খাওয়া। শাস্ত্রে জ্বর ও বিজ্বর অবস্থায় রোগীর যেরূপ পালন করা কর্ত্তব্য তাহা সংক্ষেপে একটী শ্লোকে বলা হইয়াছে। যথা:—

"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরান্তে লঘু ভোজনম্।"

অন্বয়ার্থ—

জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন এবং জ্বর বন্ধের পর লঘু ভোজন করা কর্ত্তব্য।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তির বল সঞ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত স্নান, গুরুভোজন, শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়ামাদির অতি চেষ্টা করা নিষিদ্ধ। কথিত বর্জ্জনীয় বিধি সকল লঙ্ঘন করিলে পুনরায় জ্বর হইতে পারে।

জ্বরের সময় পানীয় জল সিদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। সিদ্ধ জল সম্বন্ধে চরক ঋষির মত—

"দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ং হিতং।
স্রোতসাং শোধনং বল্যং রুচিস্বেদকরং শিবং॥

অন্বয়ার্থ—

সিদ্ধজল—দীপন (অগ্নিবৃদ্ধি কারক), পাচন (পরিপাক কারক), স্রোতশোধক (রস, রক্ত প্রভৃতি চলিবার পথশোধক), বলকারক ও রুচিকারক এবং স্বেদ কারক।—(জ্বর ত্যাগ করায় বলিয়া স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্মকারক)। জল এরূপভাবে সিদ্ধ করিতে হইবে যে তাহার অর্দ্ধেক কি সিকি অংশ কমিয়া যায়; সামান্য একটু গরম করিলে চলিবে না।

শাস্ত্র হইতে কথিত ঔষধ ও পথ্যাদির গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল; ইহা জানিতে পারিলে রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করা সুফলজনক হইতে পারে।

ধান্য পটোলম্।

"দীপনং কফবিচ্ছেদি বাত পিত্তনুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদিশৃতং ধান্য পটলয়োঃ॥"

অন্বয়ার্থ—

ধনে ও পটল পত্রের ক্বাথ জ্বরঘ্ন, পাচক, রেচক (যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়), অগ্নির উদ্দীপক, কফনাশক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমক (অর্থাৎ সহজ স্বাভাবিক ও সমান অবস্থায় আনয়নকারক) ধনে ও পটলের পাতা প্রত্যেকেই পিত্ত সান্ত্বনা করে।

হেতে (বন) পিঁপুলের মূল—শ্লেষ্মানাশক, অগ্নিদীপ্তিকারক, রেচক। কৈওথড়া—গাত্র বেদনা নাশক। আদা—অগ্নিদীপ্তিকারক, কফনাশক ও রেচক। শেফালিকা পত্র—কফঘ্ন, জ্বরঘ্ন, আমপাচক, রেচক। বিল্বপত্র—শ্লেষ্মানাশক ও রেচক। তুলসী পত্র সম্বন্ধে চরকসংহিতায় লিখিত আছে যে—

"হিক্কাকাস বিষশ্বাস পার্শ্বশূল বিনাশনঃ।
পিত্তকৃৎ কফবাতঘ্ন সুরসঃ পূতিগন্ধঘ্নুৎ॥,

(২৭ অধ্যায় সূত্রস্থান)।

অন্বয়ার্থ—

তুলসী—হিক্কা, কাস, বিষ, শ্বাস, পার্শ্বশূল (প্লুনিউমোনিয়ার লক্ষণ) নাশক, পিত্তকারক, কফ-বাতনাশক ও পূতিগন্ধনাশক।

নাটারশাঁস—শ্লেষ্মানাশক ও জ্বর নিবারক। গোলমরিচ—অগ্নিউদ্দীপক ও কফনাশক। সর্ষপ তৈল—বহুগুণ বিশিষ্ট; ইহার গুণ সম্বন্ধে ঋতু-পরিচর্য্যাংশে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। যব (বার্লি)—অগ্নিবর্দ্ধক, মল সংগ্রাহক (যাহা তরল মল ঘন করে) শ্লেষ্মা, পিত্ত ও তৃষ্ণানাশক। মুগ—লঘু, মলসংগ্রাহক, কফ, পিত্তনাশক ও জ্বর নিবারক, মসুর—লঘু, মল সংগ্রাহক, কফ পিত্ত এবং জ্বর নাশক, ভাত—লঘুপাক ও শ্লেষ্মাকর। রুটী—রুক্ষ, অন্নাপেক্ষা গুরুপাক। খৈ—(কাঠখোলায় ভাজা)—লঘু, অগ্নি-উদ্দীপক, রুক্ষ, বলকারক এবং ইহা বমি, পিত্ত, কফ ও দাহনাশক; খৈএর মণ্ড (অর্থাৎ খৈ সিদ্ধ করিয়া ন্যাকড়া দিয়া রগড়াইয়া ছাঁকিলে যে রস বহির্গত হয় তাহা)—উক্ত গুণ বিশিষ্ট এবং অতিসার নাশক। ওগরা (মসুর ডাউল ও চাউল সিদ্ধ)—রুক্ষ এবং রুটী অপেক্ষা লঘুপাক। কিস্‌মিস্—তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মুখের তিক্ততা ও কাশনাশকারক। মিষ্ট দাড়িম—অগ্নিদীপক, সংগ্রাহক, জ্বর নাশক ও পিত্ত

শ্লেষ্মানাশক। পেয়ারা—স্নিগ্ধ ও মুখের বিরমনা নাশক। পটোল—পিত্তনাশক ও লঘুপাক। আনারস—ক্রিমি নাশক, শ্লেষ্মাজনক ও রুচিকারক। কাঁকুড়ের জালি—কফঘ্ন, পিত্তনাশক ও কিঞ্চিৎ গুরুপাক। পানিফল—গুরু, পিত্ত ও দাহনাশক, পিণ্ড খর্জ্জুর—কফ ও জ্বরনাশক, বলকারক। নাশপাতি—লঘু, ও ত্রিদোষ নাশক। কমলালেবু—কফোৎক্লেশী (কফ তরল করিয়া বাহির করিয়া দেয়) পিত্ত, পিপাসা ও বমিনাশক।

(ক্রমশঃ)

সংক্রামক রোগ ও তাহা নিবারণের ব্যবস্থা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—১৮২ পৃষ্ঠা, কার্ত্তিক ১৩২৯)

(জনৈক দীন সেবক-সঙ্কলিত)

সংক্রামক রোগ নিবারণের প্রথম উপায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা। (১) রোগীকে অন্যান্য পরিজনবর্গ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিতে হইবে। (২) Disinfectant দ্বারা রোগীর কাপড় এবং তাহার ঘরের প্রত্যেক পদার্থ বিশেষরূপে Disinfect করিতে হইবে। রোগীর কাপড় এবং মলমূত্রাদি দ্বারাই রোগ সাধারণতঃ সংক্রামিত হইয়া থাকে। Typhoid Fever এবং Choleraর মলমূত্রাদি disinfect না করিয়া ফেলিয়া দিলে তাহা ড্রেন দিয়া মৃত্তিকার ভিতর গিয়া চারিদিকে সেই রোগ বিস্তার করে। মৃত্তিকার ভিতর রোগের বীজ সঞ্চারিত হইয়া, কোন রূপে পানীয় জলের কি দুগ্ধের সহিত মিশিলে বা বায়ুর সহিত কোন প্রকারে শুষ্ক গুঁড়ার আকারে উড়িয়া গেলে রোগ সংক্রামিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা। এজন্য রোগীর সংসৃষ্ট কোন পদার্থ disinfect না করা অপেক্ষা পাপ এবং অপরাধ আর কিছুই নাই। রোগীর বিছানাদি disinfect না করিয়া বাতাসে ঝাড়িয়া রোগের বীজ সঞ্চারিত হইতে দেওয়াও একটী ভয়ঙ্কর অপরাধ। সুতরাং এ সকল বিষয়ে লোকের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। (৩) প্রতিবেশী ও পরিজনদিগের ঘর হইতে রোগীর ঘর স্বতন্ত্র করিয়া দিতে হইবে।

প্রথমতঃ রোগীর ঘরে মশারি, আলনা, কারপেট, কাঠ-কাঠরা প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য থাকুক, তাহা যেন না ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলা উচিত। বলিতে কি রোগীর যাহাতে কোন প্রয়োজন নাই এমন কোন দ্রব্যই সে ঘরে রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যে ঘরে যে কোন দ্রব্য থাকে তাহাতে রোগের বীজ সঞ্চারিত হইয়া অন্যত্র সংক্রামণ করে।

ঘরটীতে যাহাতে পরিষ্কাররূপে বায়ু সঞ্চালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বায়ু দ্বারাই যথেষ্ট রূপে disinfectএর কার্য্য হয়। ইহাতে যেমন oxygen gas আছে তাহাই প্রকৃতির স্বাভাবিক disinfectant.

বিলাতে রোগীর ঘরের বাহিরের দিকের দরজার নিম্নে Sanitary carbolic acid, Chlorine বা Condy's fluid এ ভিজাইয়া একখানি কাপড় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ করিলে বিশেষ

বার হয়। ইহাতে রোগের বীজ বাহিরে যাইতে না।

মতঃপর sulphurous acid gas দ্বারা রোগীর disinfect করিতে হইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে হইয়াছে।

ঘরের দরজা আর যে কিছু কাষ্ঠ থাকে, তাহা চার গ্যালন জলে ১পিণ্ট Carbolic acid াইয়া সেই জল দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার রূপে ধুইয়া ত হইবে। আর ঘরে যদি কাগজপত্র থাকে, া একেবারে পোড়াইয়া দিতে হইবে। যদি ঘরটী রাম করা হয়, তাহা হইলে ঘরটীতে গন্ধকের ধূম া বেশ গরম চূণে Carbolic acid মিশাইয়া ওয়ালগুলি চূণকাম করিয়া দেওয়া উচিত।

রোগীর বিছানা কার্পেট বা অন্য কোন গৃহসজ্জা rbolic acid মিশ্রিত জলে ধৌত করিয়া রোগীর াদি disinfect করিবার জন্য বিলাতে যেমন য়া আছে, তেমন ব্যবস্থা যদি বিশেষ কোন ন থাকে, তবে সেইখানে পাঠাইয়া দিতে হইবে। ীর গাত্র-বস্ত্রাদি কখনই যেন সাধারণ রজকালয়ে ন হয়। বিলাতের ন্যায় এদেশেও সংক্রামক ীর বস্ত্রাদি disinfect এবং ধৌত করিবার জন্য বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

রোগী কাপড় ত্যাগ করিবা মাত্র তাহাকে তৎক্ষণাৎ itary Condy's fluid মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া া উচিত। রোগীর বস্ত্র ধুইতে যদি Condy's ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে তাহা পুনরায় জলে ধুইয়া তবে সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, তাহা না কাপড়ে দাগ লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনা। Sulphurous acid গ্যাসে disinfect য়া লইলেও বেশ হয়। কিন্তু তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কোন প্রকারের কাপড় ছিঁড়িয়া যাইবার া আছে।

াটীতে রোগ সংক্রামিত হইলে বাড়ীর নর্দ্দামার পায়খানার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পায়খানার কমোড গামলা প্রভৃতি carbolic acid, Condy's fluid দ্বারা সর্ব্বদা ধৌত করা উচিত এবং নর্দ্দামাতে ঐ সকল disinfectant এর প্রচুর জল দিয়া প্রতি দিন ধুইয়া দিতে হইবে।

পরিশেষে, যে ব্যক্তি রোগীর সেবা করে, তাহার কখনও পশমী বা কোন প্রকার গরম কাপড় পরা উচিত নহে। তাহার কেবল সুতার কাপড় পরা উচিত। কারণ গরম কাপড়ে রোগের বীজ সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা আছে। রোগীর সেবার কাজ করিয়া তখনই carbolic সাবানের জলে হাত ধোয়া কর্ত্তব্য এবং রোগীর ব্যবহারের পর গ্লাস, প্লেট বাসন ইত্যাদি disinfect করিয়া বেশ গরম জলে তাহা ধুইয়া লওয়া আবশ্যক। রোগীর ঘরে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ দুগ্ধ কখনই রাখা উচিত নহে। এবং সে ঘর হইতে সুস্থ ব্যক্তিদিগের ঘরে যেন কিছুই লইয়া যাওয়া না হয়। রোগীর খাদ্য যদি তাহার আহার করিয়া উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহাকে প্রথমে disinfect করিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। এবং রোগীর সেবা কারী ব্যক্তি রুমাল গামছাদি ব্যবহার না করিয়া যেন ছেঁড়া নেকড়া ব্যবহার করেন। এবং পরে তাহা পোড়াইয়া ফেলেন। এ নিয়ম পালন করিলে রোগ সংক্রামণ যথেষ্ট পরিমাণে নিবারণ হয়। বসন্ত রোগীর গাত্রেই রোগের বিষ বাহির হয় সকলেই জানেন। তাহার মুখ, নাসিকা এবং চক্ষু হইতেও বিষাক্ত নির্য্যাস বাহির হয়। Sir Thomas Watson বলেন যে বসন্ত রোগ যেমন সংক্রামক এমন আর কোন রোগই নহে। এবং ইহা যেমন দূর হইতেও সংক্রামিত করে এমন আর কিছু করে না।

এই রোগীর মুখ, নাসিকা ও চোখের নির্য্যাস Condy's fluid দ্বারা disinfect করা আবশ্যক। Sulphurous acid এজন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর গাত্রে carbolic acidএর সহিত তৈল ও Glycerine মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। রোগীর

গাত্রের খোসা, বা রেণুতেই এই রোগের বিষ অধিক পরিমাণে নিহিত থাকে এবং সেই রেণু যদি রোগীর সেবকদিগের অসাবধানতা বশতঃ উঠিয়া যায়, তাহাতেই রোগ বিস্তার হইয়া থাকে; সুতরাং বসন্ত রোগী বা অন্য কোন সংক্রামক রোগীর গাত্র ধৌত করিবার সময় Turbine Soap, Right's Coal Tar Soap, Calvert's Carbolic Soap কিম্বা Sanitas Soap ব্যবহার করা উচিত। এই সকল সাবানে গাত্রও ধৌত হয়; এবং disinfectantএর কার্য্য হয়। রোগীর গাত্রে Carbolic acid যুক্ত তৈল মাখাইলে তাহার গাত্রের আঁইস উঠিতে পারে না। এবং তাহাতে তাহার disinfect করা হয়। কোন বাটীতে বসন্ত রোগ হইলে সে বাটীর সকল বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই পুনরায় টিকা লওয়া উচিত। এবং ছোট ছোট ছেলেদের টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে প্রচলিত হরিদ্রা গাত্রে মাখাইয়া দিলেও বিশেষ উপকার হয়। Scarlet fever হইলেও তাহার ব্যবস্থা ঐরূপ। এ রোগেও গাত্রের আঁইস দ্বারা রোগের বিষ নিঃসৃত হয়। এই রোগীর কণ্ঠ ও মুখ হইতে যে থুথু বা গয়ের উদ্গীরণ হয় তাহাতেও সংক্রামক বিষ নিহিত থাকে। ডাক্তার যখন উপদেশ দিবেন তখন রোগীর গাত্রে কর্পূর মিশ্রিত তৈল মালিশ করা উচিত এবং রোগী একটু আরোগ্য হইলে স্নানের সময় উপরিউক্ত সাবান সকল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগীকে তখন একদিন অন্তর একদিন স্নান করাইয়া দিলে ভাল হয়। রোগীর গাত্রের ঘা সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া না গেলে সুস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাকে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। এই নিয়ম অবহেলা করিয়া বালকদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে দিয়া যে Scarlet fever বিস্তার হইতে দেওয়া হয় ইহার ন্যায় অন্যায় আর কিছুই নাই। কণ্ঠের উদ্গীরণ disinfect করিতে Condy's fluid ব্যবহার করা উচিত।

হাম হইলেও উপরি উক্ত প্রকার তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে। এবং যে পাত্রাদিতে রোগী থুথু বা গয়ের ফেলে তাহা chloratine কিংবা chloride of zincএর জলে disinfect করা কর্ত্তব্য।

Whooping Coughএর সংক্রামণী শক্তি বড়ই প্রবল। এ রোগ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যাহাতে বায়ু উত্তমরূপে disinfect করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

Dyphtheriaরও সংক্রামণী শক্তি সামান্য নয়। সুতরাং এ রোগ হইলে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। রোগীর নিঃশ্বাসেই এ রোগের বীজ বিচরণ করে। এইজন্য রোগীকে চুম্বন করিয়া অনেকের এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। রোগীর মুখ যে নেকড়াতে মুছাইয়া দেওয়া হয়, তাহা ব্যবহারের পরই পোড়াইয়া ফেলা উচিত। Typhus feverএর ন্যায় এ রোগেও আক্রমণেও বায়ুকে disinfect করা বিধেয় এবং মল-মূত্রাদিও Chlorine Condy's fluid প্রভৃতি দ্বারা disinfect করা আবশ্যক।

Typhoid feverএ রোগী যে বমনাদি করে তাহাতেই বিষ অধিক বিচরণ করে। এই বমনাদি সেবাকারীদের অসাবধানতা-বশতঃ জলে কিম্বা দুধে মিশিয়া রোগের সংক্রামণ বিস্তার করিয়া থাকে। অতএব রোগীর মলমূত্র বমনাদি সর্ব্ব প্রথমেই Nuriotic acid কিংবা vitole জলে disinfect করা উচিত। একভাগ ঐ ঔষধে ২০ ভাগ জল দিয়া solution করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর পাত্র হইতে মলমূত্রাদি ফেলিয়া দিয়া chloride of lime দিয়া কিছুক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিতে হইবে। মল মূত্রাদি disinfect না করিয়া কখনও যেন পায়খানায় বা নর্দ্দমায় তাহা ফেলিয়া দেওয়া না হয়। বিলাতের পল্লীগ্রামেই এই রোগ অধিক বিস্তৃত হইতে দেখা যায়—তাহার কারণ, সেখানকার লোক মল-মত্রাদি disinfect না করিয়া মাঠে, কোয়া, বা নদীর ধারে তাহা ফেলিয়া দেয়। তাহা হইতেই

সংক্রামণ বিস্তার হইয়া থাকে। Typhoid feverএর সংশোধনে sulphate of copper, chlorine, sulphate of iron এবং তীব্র carbolic acid ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Typhoid fever হইলে রোগীর বিছানাও বিশেষরূপে disinfect করা কর্ত্তব্য।

Choleraতেও যে রোগীর মল ও বমনেতেই রোগের বিষ নিহিত থাকে তাহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কিসে এই বিষ দোষ শোধিত হয় তৎবিষয়ে অনেকেরই অনেক প্রকার মতভেদ আছে। যাহা হউক, Sulphate of iron দ্বারা রোগীর মলাদি বেশ disinfect হয়, ইহাই অনেকের অভিমত। Typhoid feverএ যে সকল disinfectant ব্যবহৃত হয়, ইহাতেও সেইগুলি উপযোগী বলিয়া আবার অনেকের অভিমত। এই রোগের প্রকোপ-কালে Carbolic acidএর ধূম, Chlorine gas এবং Nitrous acid ধূমাদি দ্বারায় বাটীর দূষিত বায়ু disinfect করা উচিত; Dr. Buddএর মত এই যে Choleraর আক্রমণ সময়ে যত রকমের disinfectant ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা করা কর্ত্তব্য।

Dysentery ও Typhoid feverএর সংক্রামণী শক্তি choleraর ন্যায় প্রবল নয়। কিন্তু chlorine gas দ্বারা এই রোগের মল disinfect করিলে ইহার সংক্রামণ নিবারণ হয়। তীব্র carbolic acid solutionএও বেশ disinfectantএর কার্য্য হয়।

Yellow fever অতি ভয়ানক সংক্রামক রোগ। রোগীর বমন কোনরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়াই এই রোগ বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই রোগের সংক্রামণ নিবারণ করিতে nitrus acidএর ধূম বিশেষ উপকারী। Carbolic acid এবং chlorineএ বিশেষ উপকার হয়।

কোন প্রকার সংক্রামক রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত সেই মৃত দেহের সৎকার করা উচিত। কারণ তাহা হইতেই সংক্রামণ বিস্তারের যথেষ্ট আশঙ্কা। মৃত্যু হইলেই মৃতদেহ প্রথমতঃ তীব্র carbolic acidএর সহিত chloride of limeএর sotutionএর মিশাইয়া তাহাতেই আবার একখানি কাপড় ভিজাইয়া সেই কাপড়ে মুড়িয়া রোগীকে তাহার পর যদি সুবিধা হয় একটী বাক্সে করিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। শবদেহ যে কাপড়ে মোড়া হইবে তাহা ২০ ভাগ জলে ১ ভাগ carbolic acid দিয়া এবং ৪০ ভাগ জলে ১ ভাগ chloride of lime দিয়া তাহারই solutionএ ভিজাইয়া লইবে। এবং বাক্সে করিয়া যদি শবদেহ লইয়া যাওয়া হয় তাহাতে উপরি উক্ত solution মিশাইয়া কাঠের গুঁড়া দিয়া তাহাতেই লইয়া যাওয়া উচিত। Carbolic powder কিম্বা sanitas powder দ্বারাও মৃতদেহ disinfect করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এবং যে ঘরে রোগীর মৃতদেহ কিছুক্ষণের জন্যও থাকে nitrus acidএর ধূমে সে ঘরের দূষিত বায়ু disinfect করা আবশ্যক। কোন কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এবং হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে শ্মশানে শবদেহ লইয়া যাইবার সময় শবের সঙ্গে সঙ্গে ধূমাদি জ্বালাইয়া লইয়া যাইবার প্রথা আছে। অন্ততঃ সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তির শব বহনের সময় এরূপ ধূমাদি জ্বালাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা মন্দ হয় না।

আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। Disinfection সম্বন্ধে Dr. Greens চিকিৎসকদিগকে যে কয়েকটী সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই উপদেশগুলি সকলেরই স্মরণ করিয়া পালন করিতে চেষ্টা করা উচিত।

নিষেধক উপায়।

(১) রোগীর ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

(২) অগ্নিস্থান ও রোগীর মাঝে কখনও দাঁড়াইবেন না। কিন্তু রোগী এবং জানালার মধ্যে দাঁড়াইয়া রোগীকে দেখিবেন।

(৩) যদি সম্ভবপর হয় রোগীর ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে কোট বা গায়ের জামা খুলিয়া যাইবেন।

(৪) অনাবশ্যক কোন প্রকার পরীক্ষার জন্য রোগীর ঘরে ঢুকিবেন না।

(৫) যত অল্প সময় রোগীর ঘরে থাকিতে পারেন ততই ভাল।

(৬) রোগীর ঘরে যতক্ষণ থাকিবেন ততক্ষণ ঢোক গিলিবেন না।

(৭) রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়া কোন প্রকার antiseptic জলে হাত ধুইবেন।

(৮) Toilet Sanitas সাবান দিয়া ভাল করিয়া মুখ ধুইবেন। এবং fluid মিশান জলে কুলি করিবেন ও চোখ, মুখ, নাসারন্ধ্র ধৌত করিবেন।

(৯) রোগীর ঘর হইতে বাহির হইয়াই গয়ের তুলিয়া ফেলিবেন। এবং হাঁচিয়া ফেলিবেন।

(১০) বলকারক আহার ব্যায়াম এবং মিতাহারের দ্বারা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন।

এতদ্ব্যতীত (১১) রোগীর ঘরে যেটুকু নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করা হয়—কোন antiseptic পদার্থ দ্বারা তাহা শুদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। Macan gas inhaler নামক যে শ্বাস গ্রহণের যন্ত্র আছে তাহা দ্বারা মুখ ও নাসিকা দিয়া নিশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া তাহা শোধন করিলে ভাল হয়। Dr. Greens বলেন যে তিনি কাশ রোগীর ঘরে যাইবার পূর্ব্বেই এই যন্ত্র carbolic acidএ ভিজাইয়া লন। রোগীর ঘরে গিয়া তাহাতেই নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করেন। এই উপায়ে তিনি ১২ মাসের মধ্যে ২।৩ শত Typhus fever রোগীর চিকিৎসা করিয়াও সে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হন নাই। যদিও এই যন্ত্র লইয়া রোগী দেখিতে যাওয়া একটু খারাপ দেখায় কিন্তু তাঁহার মতে যাহা দ্বারা একজনের জীবন নিরাপদ হয় তাহা করিবে; যদি একটু খারাপ দেখায়—তাহাতে আর যায় আসে কি?

এক্ষণে কোন পীড়ায় প্রধানতঃ কিরূপ disinfectant ব্যবহার করা উচিত জানা আবশ্যক।

Typhus feverএর বীজ আবদ্ধ ঘরের দূষিত বায়ুতেই প্রায় বিচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই রোগ হইলে ঘরে যাহাতে বিশেষভাবে বায়ু সঞ্চালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বায়ু সঞ্চালিত স্থান অপেক্ষা আবদ্ধ স্থানেই রোগের বীজ অধিক বিচরণ করে। বায়ু সঞ্চালিত স্থানে oxygen gasই disinfectantএর কার্য্য করে। Typhus feverএ যে disinfectant বায়ুর সহিত সহজে মিশ্রিত হইয়া যায় তাহাই অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সেই জন্য chlorine gas Typhus দূষিত ঘর শোধনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাহাতে রোগীর বিশেষ বিরক্তিকর না হয়। Typhus রোগে carbolic ও sanitas ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিলাতের কয়েকটী জেলে Typhus fever হওয়াতে nitrous acid ব্যবহার করাতে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ১৭৮৫ সালে সিদনেস্ নামক স্থানের একটী millor জেলে একবার ২০০ যুদ্ধের কয়েদীকে আবদ্ধ করা হয়; তাহার মধ্যে ১৫০ জন কয়েদীর Typhus fever হয়। ১০জন সহচর ও ২৪জন নাবিকেরও সেই fever হয় এবং ৩ জন চিকিৎসকও মারা যায়। কিন্তু nitric acid gas জ্বালাইবার পর একজন মাত্র সহচরের উক্ত পীড়া হয় এবং যাহাদের পীড়া হইয়াছিল তাহাদেরও অসুখ অনেক হ্রাস হয়। ১৭৯৭ সালেও সেইরূপ Typhus feverএর প্রকোপ হওয়াতে আবার nitrous acid ব্যবহার করায় সেইরূপ উপকার হয়। ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশেও Typhus feverএর প্রকোপ হইলে nitrous acidএ নিবারিত হইতে দেখা গিয়াছে।

Typhus fever হইলে রোগী বস্ত্রাদি ত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা কোনরূপ disinfectantএর জলে ধুইয়া লওয়া উচিত। Typhus feverএ রোগীর নিশ্বাসে এবং গাত্রের নির্য্যাসেই রোগের বীজ বাহির হইয়া থাকে। সেইজন্য রোগীর গাত্রের বস্ত্রাদি অবিলম্বেই disinfect করা কর্ত্তব্য। রোগের আক্রমণের প্রথম সপ্তাহের শেষ ভাগ হইতে আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত এই রোগ সংক্রামণের অনেক আশঙ্কা; এবং রোগীর কাছে একপ্রকার Typhusএর গন্ধ বাহির হইয়া থাকে।

সাত ঘাটের জল।

শরীরের মধ্যে কত দ্রুত বেগে রক্ত চলাচল করে—তাহা জানেন কি? বক্ষের স্পন্দন সংখ্যা যদি মিনিটে ৬০ বার ধরা যায়, তাহা হইলে রক্ত ঘণ্টায় ৯ মাইল বেগে (প্রায় মার্টিন কোম্পানির ছোট রেল-গাড়ীর মত) চলাচল করে, অর্থাৎ দিনে ২২০ মাইল বা বছরে ৮০,০০০ মাইল চলে।

* * * * *

তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামক যে উগ্র বিষাক্ত পদার্থটি থাকে, তাহা শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে "পাইরিডাইন" (Pyridine) নামক উহার অন্যতম উপাদানটি নাকি কতকগুলি সাংঘাতিক ব্যাধি নিবারক। তেসারিণী নামক একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন—কলেরা, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণু সহজেই তামাকের ধোঁয়ায় বিনষ্ট হয়; তিনি আরো বলেন বেশীক্ষণ অগ্নির সংস্পর্শে থাকিলে নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থটি অন্য পদার্থে রূপান্তরিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং তখন পাইরিডাইন্ নামক পদার্থটি অধিকতর শক্তিশালী ও কার্য্যকরী হয়। সুতরাং তামাক, সিগারেট প্রভৃতি অপেক্ষা দোক্তা, জর্দ্দা, কাঁচা তামাক পাতা, গুড়ি প্রভৃতি খাওয়া শরীরের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর। তামাক-সেবীরা না কি সহজে সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না—ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, ফরাসীদেশে তামাক পাতার রস কীটবিনাশক ঔষধরূপে শিশিতে পুরিয়া বিক্রীত হয়। আমাদের দেশে অনেক স্থানে পুরাতন হুঁকার জল বা তামাক পাতা ভিজান জল উঁইয়ের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্থির করিয়াছেন যে, তামাক সর্প-বিষের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ৫ তোলা পরিমাণ তামাকপাতা ১০ তোলা জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া সেবন করাইলে কিছুক্ষণের মধ্যে রোগী বমন করিতে আরম্ভ করে; ২।৪ বার বমির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ কাটিয়া যায়। বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চাষীদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি প্রচলিত আছে যে, তামাকের ক্ষেতের মধ্য দিয়া কোন জাতীয় সর্পই গমন করে না।

* * * * *

সহযোগী "হিজলী হিতৈষী" লিখিয়াছেন—রিঠা নামক যে এক প্রকার ফল কাপড় কাচার কার্য্যের জন্য বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাতে নাকি সর্পদংশন আরোগ্য হয়। সাপে-কাটা লোককে এই রিঠা খাওয়াইলে ও কোনমতে ঘুমাইতে না দিলে, অল্পক্ষণ পরে রোগীর বিষ নামিয়া যায়। যাবৎ রিঠার স্বাদ সুমিষ্ট বলিয়া রোগী অনুভব করে, তাবৎ শরীরের মধ্যে বিষের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে হয়, কিন্তু রিঠা বিস্বাদ ঠেকিলেই নির্ব্বিঘ্নে বলা যায় যে বিষের ক্রিয়া নষ্ট হইয়াছে। এ বিষয় পাঠকগণের মধ্যে কেহ পরীক্ষা ও আলোচনা করিবেন কি?

* * * * *

৪২।১, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-নিবাসী স্বাস্থ্য সমাচারের একজন পুরাতন হিতৈষী গ্রাহক ও অবসর প্রাপ্ত সব্-জজ শ্রীযুত হরিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, "কানচিড়া" নামক একটি লতার পাতার রস যে স্থানে শুঁয়াপোকা লাগে—সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ঐ পাতা ডোবা ও নর্দ্দামার ধারে, ভগ্ন প্রাচীরের গায়ে ও ভিজা

জলাস্থানে জন্মায়। বর্ষার সময়ে শূঁয়াপোকারও যেমন খুব বৃদ্ধি ও প্রাদুর্ভাব, সেইরূপ এই সময়ে এই লতাও খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়। শূঁয়াপোকা লাগিলে বা কামড়াইলে প্রথমতঃ শূঁয়া বা লোমগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, পরে "কানচিড়ার পাতা ধৌত করিয়া হাতে রগড়াইয়া তাহার রস আহত স্থানে দিলে সমস্ত বিষ ও অনিষ্ট নিবারণ হয়।" আমরা ইহার গুণাগুণ এখনও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই; পাঠকগণের মধ্যে যে কেহ এ সম্বন্ধে হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন; এবং এক আনার ডাক টিকিট সহ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে, তিনি সানন্দে লতাটির নমুনাও পাঠাইয়া দিতে পারেন। শূঁয়ার যন্ত্রণায় ডুমুরের পাতার রস প্রলেপনেও আশু উপকার হয়।

* * * * *

প্রায় মাস দুই পূর্ব্বে ক্রমাগত কয় সপ্তাহ ধরিয়া অনেকগুলি সংবাদ পত্রের স্তম্ভে "এইবার সকলে কাঁদ, প্রাণ ভরিয়া কাঁদ," এইরূপ শীর্ষক একটি আজগুবি সংবাদ পাঠ করিয়াছি। ব্যাপারটা কি জানেন? আলমার্থ রাইট নামক একজন বীজাণু-তত্ত্ববিশারদ না কি অনেক মাথা ঘামাইয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, এক ফোঁটা চ'খের জলে লক্ষ লক্ষ রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। এই আবিষ্কারের সত্যতা সম্বন্ধে সেদিন না কি বিলাতে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; একটি কাঁচের নলের মধ্যে কোন রোগের অসংখ্য বীজাণু পুরিয়া এক ফোঁটা টাট্‌কা চ'খের জল ফেলিয়া দেওয়া হয়, ফলে তৎক্ষণাৎ বীজাণুগুলি সবংশে নিহত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে। শুনিয়াছি, অশ্রুজলের রোগ-নাশক গুণের কথা চীন দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পরিজ্ঞাত ছিল। চীনাদের দেশে কাহারও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে বা অপর কোন শোকের কারণ ঘটিলে চীনারা কাঁদিবার সময় এক একটি তুলার নুটি লইয়া কাঁদিতে বসে, এবং প্রত্যেক ফোঁটা অশ্রু তাহারা সেই তুলার নুটি দিয়া মুছিয়া লয়। পরে অশ্রু সিক্তিত সেই নুটি শুকাইলে সযত্নে তুলিয়া রাখা হয়, এবং তাহা নানা রোগে বহিঃপ্রয়োগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, ভবিষ্যতে কোন কারণে আমাদিগের চ'খের জল ফেলিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে, আমরা এই নবাবিষ্কৃত সত্যটি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

* * * * *

১৯২১ ভারতবর্ষের আদমসুমারী বা লোকগণনার বিবরণ কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, সমগ্র ভারতে পূর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুজাতির সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে, খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ ও মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে লেপ্‌টেনান্ট কর্ণেল্ উপেন মুখার্জী হিন্দুজাতি যে ধ্বংসের পথে—তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার পরে, অনেক স্বদেশ হিতৈষী মনিষীগণই এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, নানাদিক দিয়া ইহার আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রদ্ধাষ্পদ ডাক্তার কামাখ্যা বাবুও "হিন্দু ডুবিল" শীর্ষক প্রবন্ধে এই জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে টানিয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, 'কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।"

এ ধ্বংশ-জল তরঙ্গ রোধিকে কে?—
হরে মুরারে হরে মুরারে!

* * * * *

এডওয়ার্ড জি, ব্রাউন তাঁহার "আরবীয় ঔষধাবলী" (Arabian Medicine) নামক গ্রন্থে একটি বড় মজার আরোগ্য-সংবাদ চয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; এই তথ্যটি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি জামী নামক পারস্য দেশীয় কবি তাঁহার "স্বর্ণ-শৃঙ্খল" নামক কাব্যগ্রন্থে মূল পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একদা পারস্যের বাদসা প্রাসাদের কোন বাদী নফু-

...া একখানি চৌকী উঠাইতে গিয়া হঠাৎ বাত-...াক্রান্তা হইয়া পড়ে, দেখিতে দেখিতে তাহার ...র গাঁটগুলি ফুলিয়া উঠে, অবস্থা এরূপ সঙ্গীন ...া পড়ে যে, তাহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবারও ...তা লোপ পায়। তৎক্ষণাৎ হকিম সাহেবের ...র পড়িল; তিনি উপস্থিতমত কোন দাওয়াইয়ের ...বস্ত না করিয়া, মানসিক চিকিৎসার (তদ্বির-ই ...সানি') আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ...হার ঘোম্‌টা, পরে পরিধেয়খানি উঠাইবামাত্র, ...ী সলজ্জ কুণ্ঠায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল ...ং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাতের আক্রমণ একেবারে ...িয়া গেল। স্বর্গীয় স্বনামধন্য ডাক্তার দুর্গাচরণ ...ন্দ্যোপাধ্যায়ও এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে একটি ...াগিনীকে আরাম করিয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় ...ঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন।

* * * * *

এবার কালায় ধলায় বুঝি পার্থক্য লোপ পাইতে ...ল। সম্প্রতি অক্টেভিও ফেলিক্স পেদ্রোস্ নামক ...কজন অল্প বয়স্ক বৈজ্ঞানিক একরূপ মজার উপায় ...াবন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বিনা আয়াসে অল্প দিনের ...্য মিশ্ কালো বর্ণ ধবধবে জুঁইয়ের মত রঙ্‌য়ে ...ণত হইবে।

এই উপায়টি প্রথমে ইন্দুর ও বানরের উপর ...টাইয়া দেখা হইয়াছিল; এখন না কি মানুষের উপর ...ীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা চলিতেছে। ঘটনা ...ম্পরায় শুনা যাইতেছে যে ২১৪ জন মানুষের ...র পরীক্ষায় পেদ্রোসের অলৌকিক উদ্ভাবনাটি ...র্য্যকরী হইয়াছে। ইন্দুর ও বানরের বেলায় ...লো চামড়া সাদা হইতে প্রায় দুই সপ্তাহ ...য় লাগিয়াছিল; মানুষের বেলায় প্রায় একমাস ...িবে। আফ্রিকা ও আমেরিকার হোম্‌রা-চোম্‌রা ...ফ্রীভায়ারা এই সংবাদে আকাশের চাঁদ ...তে পাইয়া—ইতিমধ্যেই প্রেদোসের সহিত পত্র-...ার সুরু করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশের দাঁড়কাক ভায়ারা এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন যে?

* * * * *

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরের জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার ভরোনফ্, বানরের গ্রন্থি মানুষের দেহের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে লাগাইয়া বৃদ্ধেরও নব-যৌবন আনিয়া দিতে পারেন এইরূপ একটা খবর কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকেই হয় ত শুনিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসা কৌশলে ৪১৫টি বৃদ্ধকে যুবক বানাইয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভরোনফের প্রসাদে লিয়ারদেৎ নামক লণ্ডনের এক অশীতিপর বৃদ্ধ সত্য সত্যই যুবকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মাথার অধিকাংশ স্থলে টাক্ ও বাকী অংশ শনের মত সাদা চুলে ভরা ছিল, আহার-বিহারে তিনি কার্য্যতঃ একেবারে শক্তি-সামর্থ্য রহিত হইয়া গিয়াছিলেন; এখন তাঁহাকে দেখিলে না কি অতি বড় আত্মীয়-বান্ধবেরাও চিনিতে পারেন না,—এক মাথা কালো কালো চুল, রঙ উজ্জ্বল হইয়াছে, গায়েও শক্তি আসিতেছে। এখন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি না কি প্রত্যহ আট মাইল রাস্তা হাঁটিতে সক্ষম। আমাদের দেশের ঠাকুরদাদারা প্রায়শঃ ঠাট্টা করিয়া সুন্দরী নাতনীদের বিবাহ করিতে চাহেন; কিন্তু ভরোনফের চিকিৎসা-কৌশল একবার যদি তাঁহাদের যুবা সাজাইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পাণি-প্রার্থনা-প্রস্তাব প্রকৃত হইয়া পড়িবে কি না—কে জানে? হায় রাজা যযাতি! তুমি এ সময় কোথায়?

* * * * *

আজকাল বিলাতে স্নানের সময় কর্দ্দম দ্বারা গাত্র-মার্জ্জনার খুব ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সেখানকার চিকিৎসক মহলে রব উঠিয়াছে যে, স্নানের সময় মাটি মাখিলে গাত্রের লোমকূপগুলি বেশ পরিষ্কার থাকে, গায়ে ময়লা জমে না, চর্ম্মের অব্যবহিত নীচে বেশ রক্ত সঞ্চালন হয়, মুখের মেচেতা, ব্রণ, কাল দাগ প্রভৃতি

নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি মাটি বিশেষে চুলকণা, ঘামাচি, দদ্রুরোগ পর্য্যন্ত আরাম হইয়া যায়। সেইজন্য গত কয়েক মাস যাবৎ ইংরাজ মহিলাগণ সুবিধামত ও সুযোগমত দূরবর্ত্তী জলাশয়ে গিয়াও কর্দ্দম-স্নানে মাতিয়া আছেন। অনেক সুন্দরী—হাতে-মুখে কাদা মাখিয়া কি শোভা খুলে, তাহা ও-রসে-বঞ্চিত ব্যক্তিদিগকে দেখাইবার জন্য নানাবিধ ভঙ্গিমায় ফটো তুলাইয়া প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে প্রচার করিতেছেন। অথচ, একবৎসর পূর্ব্বে কোন ইংরাজ-ললনা কাদা মাখার কথা শুনিলে 'পতন ও মূর্চ্ছা'র উপক্রম করিতেন। "কালস্য কুটিলা গতি"ই বটে! আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই স্নানের সময় কাদা মাখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস—শাস্ত্রানুমোদিত এই সাতটি স্নানের মধ্যে ভৌম স্নানটি মৃত্তিকা লেপন দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। নদীমাতৃকা স্থানে এখনও অনেকেই নদী বক্ষের নরম আঠালু মাটি দিয়া প্রত্যহ গাত্র মার্জ্জনা পূর্ব্বক স্নান সমাপন করেন; 'টার্কিস্ বাথ্' সোপের' ব্যবহার তাঁহারা একরূপ জানেন্ না বলিলেই হয়। যাহা হউক, সভ্য প্রতীচ্য 'কালা আদ্‌মীর' 'মরচে-ধরা' কু-সংস্কারগুলির একে একে ভক্ত হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া আমরা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি।

* * * * *

রুসিয়া নামক দেশটি যেমন অতিকায়, ইহার এক একটি ঘটনাও সেইরূপ অসাধারণ ও আজগুবী। রুসিয়ারই উত্তরাংশে মৃত্তিকা-গর্ভে আদিম যুগের সর্ব্ববৃহৎ আধুনিক হস্তীজাতির পিতৃপুরুষরূপ 'ম্যামথ্' নামক জানোয়ারগুলির কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী 'পেত্রোগ্রাদ্' হইতে 'মস্কো' হইয়া জাপান উপকণ্ঠবর্ত্তী "ব্লাদিভস্তক" পর্য্যন্ত একটি রেলপথ খোলার চেষ্টা চলিতেছে; শেষ হইলে জগতের মধ্যে সেটি দীর্ঘতম রেল-লাইন্ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যুদ্ধে শৃঙ্খলারক্ষা করিয়া পলায়ন-বিদ্যায়ও রুস্‌জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার রুসিয়ার সাইবেরিয়া নামক প্রদেশে একটি অতিকায় মানব আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি না কি দেহের দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে-ওজনে, ভোজনে ও শয়নে মানবজাতির মধ্যে অদ্বিতীয়! মানুষটির নাম ক্যজানফ্। ৩৪ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর সম্প্রতি ইঁহাকে হাঙ্গেরীর একটি প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। উচ্চতায় তিনি ৯ ফিট ৩ ইঞ্চি সাধারণ মানুষ ৫ ফিট ৬-৯ ইঞ্চি), প্রস্থেও তদনুরূপ, বলও অসীম। তাঁহার হাতের আঙ্গুলের ডগা হইতে কব্জী পর্য্যন্ত ৩ ফিট ১ ইঞ্চি, বুকের ছাতি ৫৬ ইঞ্চি (সাধারণ লোকের ৩২—৩৬ ইঞ্চি), মস্তকের বেড় ২৫ ইঞ্চি (সাধারণ লোকের ১৬—১৯ ইঞ্চি) ও ওজন প্রায় সাড়ে পাঁচ মণ। তাঁহার খাদ্য প্রায় চারিজনের খাদ্যের সমান্ এবং প্রয়োজন হইলে ৬ জনের আহারও উদরসাৎ করিতে পারেন। তিনি দিন-রাত্রিতে চারিবার পুরামাত্রায় ভোজন করেন এবং মোটের উপর ৩।৪ সের দুধ, ২০।২৫টি ডিম, ২ সের মাংস, ৫।৬ খানি লম্বা বড় পাঁউরুটি, ১॥—২ সের আলু, মটর প্রভৃতি শাক-তরকারী খাইয়া থাকেন। বিনা নেশায় ৫।৬ পাইন্ট মদ্য পান করিতে পারেন। এই অতিকায় মানুষটি প্রায় আঠারো ঘণ্টা নিদ্রা যান এবং যতটুকু সময় জাগিয়া থাকেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তন্দ্রাবেশে নেত্র দুটি তাঁর ঢুলু ঢুলু করে। বোধ হয় ত্রেতার কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরের বকাসুর—এই দুয়ের রাসায়নিক সংমিশ্রণে কলিতে এই অপূর্ব্ব ধরণের জীবটির সৃষ্টি হইয়াছে!

—(নৃ)।

পরলোকগত ভীম ভবানী।

"স্বাস্থ্য-সমাচার"-প্রচারে ব্রতী হইয়া অবধি এগার বার কাল আমরা বাঙ্গালী জাতিকে ব্যায়ামের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছি। আমাদের সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বিধাতা পুরুষই বলিতে পারেন। বর্ত্তমানকালে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রণালীর

[ভীম ভবানী পাঁচমণ ওজনের প্রকাণ্ড বার্-বেল ভাঁজিতেছেন।]

এমন কোনই ব্যবস্থা নাই, যদ্দ্বারা আমাদের কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিবার অবকাশ মিলিতে পারে। শ্রেণীর শ্রমজীবী, কৃষক, মজুর, মুটিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যতটুকু শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, তদনুপাতে তাহাদের শরীরের পেশীগুলি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে,

এবং শরীরও সেই অনুপাতে সবল হইয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অর্থাভাবে তাহাদের গৃহ-কর্ম্মগুলি নিজেরাই সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়; সেই কারণেই তাহাদের স্বাস্থ্য কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিত হয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর নরনারীদের শারীরিক পরিশ্রম করিবার সুযোগ অল্পই ঘটিয়া থাকে।

[সার্কাসে খেলা দেখাইতে নামিবার অনতিপূর্ব্বে ভীম ভবানী।]

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অর্থাভাবে অধিক সংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত করিতে পারেন না বলিয়া সামান্য সামান্য কর্ম্মগুলি নিজেরাই করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু একটু শ্রমসাধ্য কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাঁহাদিগকে মুটে-মজুরদের সাহায্য লইতে হয়। আর ধনী সম্প্রদায়ের কথা না বলিলেও চলে। তাঁহাদের শত দাস দাসী সর্ব্বদা তাঁহাদের আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকে, এবং প্রভু হাঁ করিবামাত্র তাঁহার মনের কথা

বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম সম্পাদন করে। বস্তুতঃ চাকররা তাহাদের প্রভুকে এক রকম ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করে।

অথচ এক সময়ে এই বাঙ্গালা দেশে বাহুবলের চর্চ্চা আপামর সাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অশ্বারোহণ, লাঠিখেলা, নৌকায় দাঁড় টানিয়া বাচ্‌খেলা, বন্দুক ও তরবারি চালনা ভদ্রতার অপরিহার্য্য

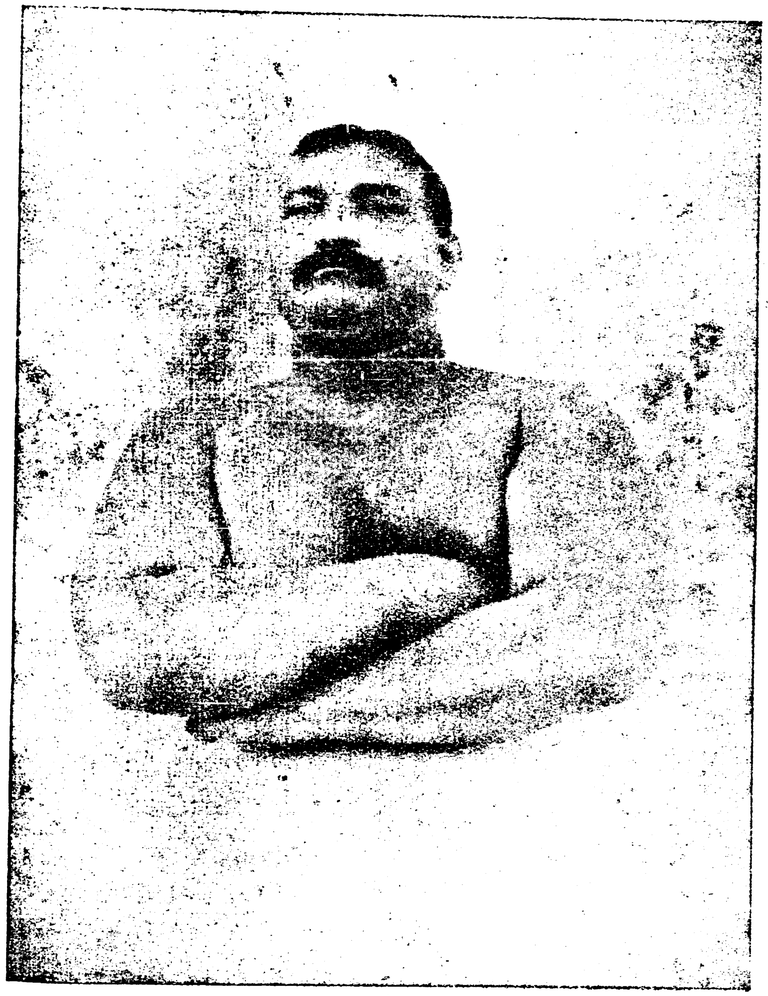

[ভবানীর আধুনিকতম প্রতিকৃতি।]

বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এবং কিছু দিন পর পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা রূপ অরাজক ও বিশৃঙ্খল ছিল, চুরি ডাকাতি অত্যাচার অবিচারের স্রোত যেরূপ অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত ছিল, তাহাতে বাহুবলের চর্চ্চা না করিলে আত্মরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে গৃহস্বামী স্বয়ং লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইতেন, এবং পরিজনবর্গের সাহায্যে লাঠির জোরে ডাকাত তাড়াইতেন। মোট কথা, তখন কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা প্রয়োজন বশতঃ ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর

লোককেই অশ্বারোহণ করিতে লাঠি খেলিতে, কুস্তি করিতে, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত।

তার পর দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহুবলের চর্চ্চার প্রয়োজন বেশী রহিল না; তার উপর বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে ও সভ্যতার মোহে বাহুবলের চর্চ্চা হীন হেয় কাজ বলিয়া গণ্য হইল। তার পর এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে কেহ বাহুবলের চর্চ্চা করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

এমন অবস্থায়ও যখন কোন বাঙ্গালী বাহুবলের

[ভবানীর বুকে মুর্শিদাবাদ-নবাবের বিরাটকায় বুনো হাতী।*]

চর্চ্চা করিয়া, শক্তিসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, এবং দেশ বিদেশে বলবীর্য্যবান বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, তখন কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়! আজ আমরা যে বীর পুরুষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি, তিনি সেইরূপ একজন শক্তি সাধক। বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট বোধ হয় "ভীমমূর্ত্তি বা ভীম ভবানীর" নাম

* ব্লক কয়খানি "মানসী ও মর্ম্মবাণীর" সৌজন্যে পরিগৃহীত।

অপরিচিত নয়। তাঁহার আসল নাম ছিল ভবেন্দ্র মোহন সাহা। শৈশবে তিনি রুগ্ন, দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি একদা তাঁহার এক সমবয়সী বালকের নিকটে বড় অপমানিত হন। তাহার শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ তিনি মার খাইয়াও পাল্টা জবাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রহার করিতে না পারিয়া বড় মনস্তাপ প্রাপ্ত হন। সেই দিন হইতে শক্তি সঞ্চয় বালক ভবেন্দ্রের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাহার ফল—ভীম ভবানী। অপমানিত, প্রহৃত হইবার দিন হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়। তিনি সেই দিনই গিয়া দর্জ্জিপাড়ায় গুহ মহাশয়দের প্রসিদ্ধ কুস্তির আখ্‌ড়ায় ভর্ত্তি হন, এবং প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হইতে থাকে। তাঁহার সে শৈশবের দৌর্ব্বল্য অন্তর্হিত হয়, ক্ষীণ শরীর পুষ্ট হইয়া উঠে। চারি পাঁচ বৎসরের নিয়মিত ব্যায়ামেই ভবেন্দ্র মোহনের দেহ বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তি ধারণ করে। তাঁহার সেই বীর মূর্ত্তি দেখিয়া মাদ্রাজের পালোয়ান প্রোফেসর রামমূর্ত্তি মুগ্ধ হন, এবং সাদরে তাঁহাকে নিজের সার্কাসের দলে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। রামমূর্ত্তির দল দেশ বিদেশে খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। ভবানীও দলের সঙ্গে থাকিয়া প্রোফেসরের কাছে শিক্ষা লাভ করিতেন।

রামমূর্ত্তির দল একবার যবদ্বীপে খেলা দেখাইতে গিয়াছিলেন। সেখানে একজন স্থানীয় পালোয়ান রামমূর্ত্তিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। ভবানী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, সাকরেদ্ উপস্থিত থাকিতে গুরুর যুদ্ধে নামা কখনই সঙ্গত নহে; যবদ্বীপের পালোয়ান আগে সাকরেদের সঙ্গে লড়ুন। সাকরেদ যদি পরাজিত হন, তখন স্বয়ং গুরু রামমূর্ত্তি লড়িবেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যও হইল। সেই মল্লযুদ্ধে ভবানী অল্প সময়ের মধ্যেই যবদ্বীপের পালোয়ানকে পরাজিত করিলেন। সেই দিন হইতে ভবানী সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি রামমূর্ত্তির দল ছাড়িয়া প্রোফেসর কৃষ্ণ বসাক মহাশয়ের হিপোড্রোম সার্কাসে যোগ দিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বাহুবলের পরিচয় দেন। সার্কাসে কিরূপ ভাবে বলের পরিচয় দিতে হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন, অনেকে হয় ত প্রত্যক্ষও করিয়াছেন। মোটর গাড়ী টানিয়া রাখা, গুরুভার দ্রব্য উত্তোলন করা, দাঁতে করিয়া ভারী জিনিস তোলা, মাল বোঝাই গরুর গাড়ী বুকের উপর তোলা, বুকের উপর দিয়া হাতী চালানো—এ সব ভবানী ছেলে খেলার মত অবলীলা ক্রমে সম্পাদন করিতেন। একবার একখানি চলতি মোটর গাড়ী টানিয়া থামাইয়া পুরস্কার স্বরূপ তিনি সেই গাড়ীখানিই লাভ করেন।

নানা দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বাহুবলের অদ্ভুত পরিচয় দিয়া বহু পুরস্কার লাভ করিয়া ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভবানী অবশেষে স্বদেশে খেলা দেখাইতে আরম্ভ করেন। একখানা নয়, দুইখানা নয়, তিনখানা পর্য্যন্ত মোটরের গতিরোধ করিয়া ভবানী একবার ভরতপুরের মহারাজকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের অনুরোধে তিনি নিজের বুকের উপর দিয়া সদ্যধৃত প্রকাণ্ডকায় বন্য বারণ চালাইয়া দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। জাপান সম্রাট্ মিকাডো একবার ভবানীর অমানুষিক বলের চাক্ষুস প্রমাণ পাইয়া, তাঁহাকে একখানি সুবর্ণ পদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এইরূপ কত সার্কাসের সহিত সমগ্র এসিয়াখণ্ডের সমস্ত উল্লেখযোগ্য সহর ও নগরে তাঁহার অসামান্য শক্তি-নৈপুণ্য দেখাইয়া, অসংখ্য সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক শাল আলোয়ান্, চেন্, ঘড়ী, অঙ্গুরী ও নগদ মুদ্রা প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়া ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ভবানী একরূপ স্থায়ীভাবে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তার পর কোন সার্কাসের দল হইতে তাঁহার কর্ম্ম গ্রহণের কোন

প্রস্তাব আসিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে বিদেশে যাইতে দিতেন না। কলিকাতায় বা উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানে কোন দল আসিলে ভীমভবানী মাতার অনুমতি লইয়া তাহাতে যোগ দিতেন।

তার পর তাঁহার জীবনের একটি পতনের মুহূর্ত্ত আসে। বহুকালপূর্ব্ব হইতেই ভবেন্দ্রদের বাটী ছিল—অধুনা মনোমোহন থিয়েটারের ঠিক সম্মুখে বিপরীত ফুটপথে, হলদে রঙের একতলা বাটী—নীচেই একটি বিলাতী মদের দোকান; এখন সে বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার উপর কলিকাতা ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট্ ট্রাষ্ট্ কর্ত্তৃক "সেণ্ট্রাল য়্যাভেনিউ" নামক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে পড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে সুবিধামত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইতেন; তাহাই তাঁহার কাল হইল। অল্পদিন পরে কুসংসর্গদোষে তাহার পান দোষ ও চরিত্র দোষ ঘটে এবং ক্রমশঃ তিনি আযৌবনসিদ্ধ বীরত্বময় জীবনের উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া দিয়, আলস্য ও জাড্যময় আমোদ-প্রমোদের পঙ্ক-পল্বলে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। কিন্তু এরূপ অবনতির জীবন তাঁহাকে বেশী দিন বহন করিতে হয় নাই। একদিন কয়েকটি পেশোয়ারী পালোয়ানের হস্তে ঈষৎ নির্য্যাতিত ও অপমানিত হইয়া, তাঁহার ভিতরের সুপ্ত সিংহ জাগরিত হইয়া উঠে; তিনি ক্ষণিকের মোহনিদ্রা ধূলিকণার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া, কৈশোরের মত পুনরায় ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া, ব্যায়াম ও শক্তিচর্চ্চার মনোনিবেশ করেন। তারপর বৎসরাধিক কাল হইল, তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আগাসীর সার্কাসের সহিত তাঁহার চিত্তচমকপ্রদ খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে গোবর গুহের* ন্যায় পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিতে যাইবেন—এইরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্জ্জীব বাঙ্গালা-মাটির বীর শিশুর সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিধাতা পুরুষ পূর্ণ করিলেন না।

গত ২৯শে অক্টোবর আগাসীর সার্কাসে খেলা দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার মাথার মধ্যে দারুণ বেদনা ও শরীর অসুস্থ বোধ হয়; তৎক্ষণাৎ বাড়ী আসিয়া তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। গত ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ২টার সময় টাইফয়েড্ ও নিউমোনিয়া রোগে বাঙ্গালার গৌরব-স্তম্ভ চিরকুমার ভবানী ৩৩ বৎসর বয়সে ৭টি ভাই ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহা প্রস্থান করিয়াছেন।

পাঠকদের মধ্যে কে আজ বাঙ্গালীর এই ভারত-বিশ্রুত শক্তিমান্ বীরের শূন্য আসন পরিপূরণ করিতে চাহ—এস, অগ্রভাগে দাঁড়াও; আজ সেই মৃত মল্লের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া ভীমভবানীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তোল।—ওগো, শক্তিময়ীর আত্ম-বিস্মৃত সন্তান, পারিবে কি?

* আগামী সংখ্যায় বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ বীর গোবর গুহের জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল

DOUBLE COLOUR PAGE

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গে

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?—মানুষ তৈয়ারী করা! কিন্তু, আমরা যথার্থ মানুষ হইয়াছি—না, আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা যথার্থ মানুষ হইতেছে—তাহা ভাবিয়া ও খতাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বিশ্বের সভায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের স্থান কোথায়—কত পশ্চাতে, তাহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতীকার করিতে গিয়া দেখি,—ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের নিজেদের উদাসীনতা ও দৈন্য যতটা দায়ী, তদপেক্ষা বেশী দায়ী তাঁহারা—যাঁহারা উপযাচক হইয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

* * * *

সুতরাং এ ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব নিরাকরণে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য যথাসাধ্য নিয়োজিত করিয়া, বাকীটুকুর জন্য আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষক ও শিক্ষাদাতাদের নিকট অভাবের হাহুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস শুনাইতে, অভিযোগের অশ্রুজল ফেলিতে ও বিকল্পে সমালোচনা ও ভর্ৎসনার তীব্র কশাঘাত করিতে নিশ্চয়ই হইবে,—নান্য পন্থা অয়নায়ঃ। যাহা চাহিব—তাহাই পাইব না জানি; যতটুকু ত্রুটি দেখাইব, ততটুকুই তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইবে না বুঝি, যতখানি পরিবর্ত্তন ও পরিশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত করিব—ততখানিই গ্রাহ্য হইবে না মানি, তবু ও 'নেই মামার' পরিবর্ত্তে যদি 'কানা মামা' পাওয়া যায়—এই আশায়, আমরা প্রতি মাসে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিতে মনস্থ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পুত্রের উন্নতিকামী অভিভাবকদিগেরও চিন্তার কিছু কিছু খোরাক যোগান হইবে। আগাছার জঙ্গল কাটিতে গিয়া উপকারী তরুর গায়েও অনবধানতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃত দুই একটা কুঠারাঘাত পড়িতে পারে; সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা ক্ষমা চাহিয়া রাখিতেছি। অলমতি বিস্তারেন।

* * * *

ভারতের বাহিরে নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যাঁহারা এদেশের শিক্ষার বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানকার দারুণ শিক্ষার অভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন; কয়েকজন হাসিয়া বলিয়াছেন—"এ দেশের লোক, এই শিক্ষা—এই অভিজ্ঞতা—এই শক্তি লইয়া জগতের অন্যান্য সভ্যজাতিদের পাশে আসিয়া তালে তালে পা ফেলিতে চায়,—স্বরাজের আশা করে—স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে? আশ্চর্য্য!" বিংশ শতাব্দীতে এত বড় একটা বিপুল রাজ্য—যাহার শাসন-বল্গা একটা সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির হস্ত লগ্ন—সেদেশ যে এত বড় একটা বিষয়ে এরূপভাবে অভাবগ্রস্ত থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে আমরা নিজেরাই হতভম্ব হইয়া পড়ি। সভ্য পাশ্চাত্যে—যেখানে শতকরা ৯৭ জন শিক্ষিত ও অন্ততঃ ১০ জন রীতিমত সুশিক্ষিত, সেখানে আমরা—প্রাচীন সভ্যতার লুপ্ত-কীর্ত্তি গরীয়ান্—আমরা কি না শতকরা ৭ জনের বেশী লিখিতে পড়িতে জানি না। ইহা কি কম দুঃখের কথা!

* * * *

আমাদের মধ্যে এই যে শতকরা সাতজন লেখা-পড়া-জানা বলিয়া ধরিতেছি, তাহার মধ্যে হাজারকরা একজনও ঠিকমত শিক্ষিত কি না সন্দেহ এবং লক্ষের ভিতর একটিও রীতিমত সুশিক্ষিত পাওয়া যথার্থই দুষ্কর। শতকরা সাতজন যাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আসিয়া ভর্ত্তি হয়, তাহাদের ছয়জনই শিক্ষার দ্বারা নিজেকে 'মানুষ' করিবার জন্য আসে না, আসে—অদূর ভবিষ্যতে মোটা মাহিনার চাকুরী পাইবার লোভে। ফলে ৪ জন হয় ২০৲ হইতে ৫০৲ মাহীয়ানার কেরাণী, ১ জন থাকে বেকার, আর ১ জন হন্—হয় বিদেশী আইন্-কুঞ্জের অর্থ-গৃধ্নু কোকিল (উকীল), নয়ত মরণাপন্নের প্রাণান্তকর বেলেস্তারা (ব্যারিষ্টার), নয়ত মানবজীবনের ধ্রুবতারারূপী 'সহস্রমার' (ডাক্তার), না হয়ত জমীদারের এষ্টেটের ম্যানেজার-'সুপারীঠিন্ঠন্-নায়েব অথবা বড় জোর হুকুমের খিজমৎগার চুণোপুটি হাকিম! বিদ্যালয়ে যতটুকু শিক্ষা পান্, চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার দশ আনা

প্রস্তাব আসিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে বিদেশে যাইতে দিতেন না। কলিকাতায় বা উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থানে কোন দল আসিলে ভীমভবানী মাতার অনুমতি লইয়া তাহাতে যোগ দিতেন।

তার পর তাঁহার জীবনের একটি পতনের মুহূর্ত্ত আসে। বহুকালপূর্ব্ব হইতেই ভবেন্দ্রদের বাটী ছিল—অধুনা মনোমোহন থিয়েটারের ঠিক সম্মুখে বিপরীত ফুটপথে, হলদে রঙের একতলা বাটী—নীচেই একটি বিলাতী মদের দোকান; এখন সে বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার উপর কলিকাতা ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট্ ট্রাষ্ট্ কর্ত্তৃক "সেণ্ট্রাল য়্যাভেনিউ" নামক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে পড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে সুবিধামত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইতেন; তাহাই তাঁহার কাল হইল। অল্পদিন পরে কুসংসর্গদোষে তাহার পান দোষ ও চরিত্র দোষ ঘটে এবং ক্রমশঃ তিনি আযৌবনসিদ্ধ বীরত্বময় জীবনের উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলিয়া দিয়, আলস্য ও জাড্যময় আমোদ-প্রমোদের পঙ্ক-পল্বলে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। কিন্তু এরূপ অবনতির জীবন তাঁহাকে বেশী দিন বহন করিতে হয় নাই। একদিন কয়েকটি পেশোয়ারী পালোয়ানের হস্তে ঈষৎ নির্য্যাতিত ও অপমানিত হইয়া, তাঁহার ভিতরের সুপ্ত সিংহ জাগরিত হইয়া উঠে; তিনি ক্ষণিকের মোহনিদ্রা ধূলিকণার মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া, কৈশোরের মত পুনরায় ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া, ব্যায়াম ও শক্তিচর্চ্চার মনোনিবেশ করেন। তারপর বৎসরাধিক কাল হইল, তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আগাসীর সার্কাসের সহিত তাঁহার চিত্তচমকপ্রদ খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে গোবর গুহের* ন্যায় পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার শক্তির পরিচয় দিতে যাইবেন—এইরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্জ্জীব বাঙ্গালা-মাটির বীর শিশুর সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বিধাতা পুরুষ পূর্ণ করিলেন না।

গত ২৯শে অক্টোবর আগাসীর সার্কাসে খেলা দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার মাথার মধ্যে দারুণ বেদনা ও শরীর অসুস্থ বোধ হয়; তৎক্ষণাৎ বাড়ী আসিয়া তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। গত ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ২টার সময় টাইফয়েড্ ও নিউমোনিয়া রোগে বাঙ্গালার গৌরব-স্তম্ভ চিরকুমার ভবানী ৩৩ বৎসর বয়সে ৭টি ভাই ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহা প্রস্থান করিয়াছেন।

পাঠকদের মধ্যে কে আজ বাঙ্গালীর এই ভারত-বিশ্রুত শক্তিমান্ বীরের শূন্য আসন পরিপূরণ করিতে চাহ—এস, অগ্রভাগে দাঁড়াও; আজ সেই মৃত মল্লের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া ভীমভবানীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তোল।—ওগো, শক্তিময়ীর আত্ম-বিস্মৃত সন্তান, পারিবে কি?

* আগামী সংখ্যায় বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ বীর গোবর গুহের জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল

DOUBLE COLOUR PAGE

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গে

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?—মানুষ তৈয়ারী করা! কিন্তু, আমরা যথার্থ মানুষ হইয়াছি—না, আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা যথার্থ মানুষ হইতেছে—তাহা ভাবিয়া ও খতাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বিশ্বের সভায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে আমাদের স্থান কোথায়—কত পশ্চাতে, তাহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতীকার করিতে গিয়া দেখি,—ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের নিজেদের উদাসীনতা ও দৈন্য যতটা দায়ী, তদপেক্ষা বেশী দায়ী তাঁহারা—যাঁহারা উপযাচক হইয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

* * * *

সুতরাং এ ক্ষেত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব নিরাকরণে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য যথাসাধ্য নিয়োজিত করিয়া, বাকীটুকুর জন্য আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষক ও শিক্ষাদাতাদের নিকট অভাবের হাহুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস শুনাইতে, অভিযোগের অশ্রুজল ফেলিতে ও বিকল্পে সমালোচনা ও ভৎর্সনার তীব্র কশাঘাত করিতে নিশ্চয়ই হইবে,—নান্য পন্থা অয়নায়ঃ। যাহা চাহিব—তাহাই পাইব না জানি; যতটুকু ত্রুটি দেখাইব, ততটুকুই তাঁহাদের স্বীকার্য্য হইবে না বুঝি, যতখানি পরিবর্ত্তন ও পরিশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত করিব—ততখানিই গ্রাহ্য হইবে না মানি, তবু ও 'নেই মামার' পরিবর্ত্তে যদি 'কানা মামা' পাওয়া যায়—এই আশায়, আমরা প্রতি মাসে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিতে মনস্থ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পুত্রের উন্নতিকামী অভিভাবকদিগেরও চিন্তার কিছু কিছু খোরাক যোগান হইবে। আগাছার জঙ্গল কাটিতে গিয়া উপকারী তরুর গায়েও অনবধানতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃত দুই একটা কুঠারাঘাত পড়িতে পারে; সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা ক্ষমা চাহিয়া রাখিতেছি। অলমতি বিস্তারেন।

* * * *

ভারতের বাহিরে নিঃস্বার্থভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যাঁহারা এদেশের শিক্ষার বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখানকার দারুণ শিক্ষার অভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন; কয়েকজন হাসিয়া বলিয়াছেন—"এ দেশের লোক, এই শিক্ষা—এই অভিজ্ঞতা—এই শক্তি লইয়া জগতের অন্যান্য সভ্যজাতিদের পাশে আসিয়া তালে তালে পা ফেলিতে চায়,—স্বরাজের আশা করে—স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে? আশ্চর্য্য!" বিংশ শতাব্দীতে এত বড় একটা বিপুল রাজ্য—যাহার শাসন-বল্গা একটা সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির হস্ত লগ্ন—সেদেশ যে এত বড় একটা বিষয়ে এরূপভাবে অভাবগ্রস্ত থাকিতে পারে, তাহা ভাবিতে গেলে আমরা নিজেরাই হতভম্ব হইয়া পড়ি। সভ্য পাশ্চাত্যে—যেখানে শতকরা ৯৭ জন শিক্ষিত ও অন্ততঃ ১০ জন রীতিমত সুশিক্ষিত, সেখানে আমরা—প্রাচীন সভ্যতার লুপ্ত-কীর্ত্তি গরীয়ান্—আমরা কি না শতকরা ৭ জনের বেশী লিখিতে পড়িতে জানি না। ইহা কি কম দুঃখের কথা!

* * * *

আমাদের মধ্যে এই যে শতকরা সাতজন লেখা-পড়া-জানা বলিয়া ধরিতেছি, তাহার মধ্যে হাজারকরা একজনও ঠিকমত শিক্ষিত কি না সন্দেহ এবং লক্ষের ভিতর একটিও রীতিমত সুশিক্ষিত পাওয়া যথার্থই দুষ্কর। শতকরা সাতজন যাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আসিয়া ভর্ত্তি হয়, তাহাদের ছয়জনই শিক্ষার দ্বারা নিজেকে 'মানুষ' করিবার জন্য আসে না, আসে—অদূর ভবিষ্যতে মোটা মাহিনার চাকুরী পাইবার লোভে। ফলে ৪ জন হয় ২০৲ হইতে ৫০৲ মাহীয়ানার কেরাণী, ১ জন থাকে বেকার, আর ১ জন হন্—হয় বিদেশী আইন্-কুঞ্জের অর্থ-গৃধ্নু কোকিল (উকীল), নয়ত মরণাপন্নের প্রাণান্তকর বেলেস্তারা (ব্যারিষ্টার), নয়ত মানবজীবনের ধ্রুবতারারূপী 'সহস্রমার' (ডাক্তার), না হয়ত জমীদারের এষ্টেটের ম্যানেজার-'সুপারীঠন্ঠন্-নায়েব অথবা বড় জোর হুকুমের খিজমৎগার চুণোপুটি হাকিম! বিদ্যালয়ে যতটুকু শিক্ষা পান্, চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার দশ আনা

কাজে লাগে না, চারি আনা ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া যান আর অবশিষ্ট দুই আনা শিক্ষা কলমের খোঁচায় জর্জ্জরিত দেহ লইয়া "পালাই-পালাই" ডাক ছাড়ে। এই ত আমাদের শিক্ষার অবস্থা !

*　　*　　*　　*

এখন শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলি। সমগ্র ভারতের ১২॥ কোটি পুরুষ শিক্ষার্থীর জন্য ছোট বড় সকল রকমের শিক্ষাস্থলের সংখ্যা হইতেছে—১৪৪৯৯৩। তন্মধ্যে আর্ট কলেজে ১৪৮, ব্যবসা ও শিল্প শিক্ষার কলেজ ৬৫, মধ্য বিদ্যালয় ৮১৫৫৬ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৬৮৮ ও ইহাদের ছাত্র সংখ্যা ৬১১৭৪৭৩। এই সংখ্যা হইতে হিসাব করিয়া বুঝা যায় যে প্রতি নয় শতাধিক ছাত্রের জন্য ভারতে মাত্র একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। আমেরিকায় গড়পড়্তা হিসাবে প্রতি ৩০০ জনে এক একটি করিয়া শিক্ষার স্কুল এবং প্রতি ৮০ জন স্ত্রী পুরুষের পশ্চাতে এক একটি করিয়া (সরকারী, বেসরকারী, বৈতনিক বা অবৈতনিক) শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ১৯২০—২১ সালে ভারত-গভর্মেণ্ট্ পুরুষদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৮৫০৯৯১৭৲ টাকা খরচ করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

তারপর স্ত্রী শিক্ষার জন্য কিরূপ খরচ হইয়াছে শুনুন্। স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা যে পুরুষাপেক্ষা আরো কত বেশী শোচনীয়—তাহা যে যাহার নিজের গৃহের দিকে চাহিলে ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতে শিক্ষার উপযুক্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় বারো কোটি। ইহাদের জন্য আর্ট কলেজ ১২টি, ব্যবসা ও শিল্প শিক্ষার কলেজ ৩টি, মধ্য বিদ্যালয় ৮১৮টি, এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২,৪৭৫টি এবং ছাত্রী সংখ্যা ১২১০৫৬৮। সর্ব্বশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ২৩৩০৮। এই সংখ্যা হইতে জানা যায় যে প্রায় প্রতি পাঁচ হাজার স্ত্রীলোকের জন্য এক একটি শিক্ষালয় আছে। স্ত্রী-শিক্ষার ইহা অপেক্ষা আর কি দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে পারে? ভারতীয় স্ত্রী-লোকের মত শিক্ষার এরূপ শোচনীয় অধোগতি আর বোধ হয় পৃথিবীর কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী অনেকাংশে আমরা নিজে। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কুসংস্কার, উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ও পর্দ্দা-প্রথা স্ত্রীদের শিক্ষার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; তা' ছাড়া স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার সাধারণ চেষ্টার পশ্চাতে দারিদ্র্য ত তাহার সহস্র শীর্ণ বাহু দিয়া আমাদের টানিয়া ধরিয়া আছে। ১৯২০—২১ সালে গভর্মেণ্ট স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছেন ৬৮৬২৯২০৲ টাকা।

*　　*　　*　　*

সুতরাং দেখা যাইতেছে সরকার বাহাদুর প্রাথমিক শিক্ষার্থ স্ত্রী ও পুরুষদিগের জন্য খরচ করিয়াছেন কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি কোটি টাকা। সমগ্র ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী (৫ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক) যদি সাতকোটি বালক বালিকা ধরা যায়, তাহা হইলে এক বৎসরে প্রত্যেক বালক বা বালিকার জন্য গভর্মেণ্ট্ প্রায় দশ আনা খরচ করিয়াছেন, অর্থাৎ মাসে তিন পয়সার কিছু বেশী খরচ করিয়াছেন। তারপর গভর্মেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ব্যয় হইয়াছে ১১৬১২০৬০৪৲। শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে ঐ দুই তরফ হইতে মোট ব্যয় হয় ষোল কোটির কিছু উপর। বৃটিশ-শাসিত ভারতে সমগ্র নর-নারীর সংখ্যা যদি মোট্ ২৪ কোটি ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক নর নারীর শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর গড়্পড়্তা প্রায় বারো আনা খরচ হয়, অর্থাৎ মাসে একটি আনা মাত্র। আমেরিকায় শিক্ষার জন্য গভর্মেণ্ট হইতে মোট সংখ্যক লোকের প্রতি জনের পিছু গড়্পড়্তা ব্যয় করা হয় প্রায় সাড়ে বত্রিশ টাকা, তা ছাড়া প্রজা-সাধারণের তরফ হইতে (মিউনিসিপ্যালটি প্রভৃতি দ্বারা) আরো অনেক টাকা খরচ করা হয়। ভারতের রাজস্ব-মুনাফা ও সামরিক ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষার ব্যয় অতি সামান্য। তাই ৩২ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ত্রিশকোটি আজ অজ্ঞানতা-তিমিরে ডুবিয়া আছে, অর্থাৎ আজ অখিল-জ্ঞানের রাণী বিশ্ব-শিক্ষাদাত্রী লুপ্তগৌরবা ভারত জননী ত্রিশকোটি দ্বিপদবিশিষ্ট পশুকে অঙ্কে স্থান দিয়া আছেন! পৃথিবীর উপরে বাস করিয়াও আমরা আজ রসাতলে গিয়াছি!

*　　*　　*　　*

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সের মত আমেরিকা সম্পূর্ণ শিল্পজীবী জাতি নহে। আমাদের দেশে যেমন শতকরা ৮৫ জন কৃষি অবলম্বী, সেইরূপ সেখানকারও শতকরা প্রায় ৫২ জনের কৃষি-জীবন ভরসা। কিন্তু সেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দেশে একটা সামান্য চাষা—একটা নগণ্য নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ান্ বা সামোয়ান্ যাচিত ভাবে শিক্ষার যেরূপ সুযোগ পায়, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ চাহিয়াও তার শতাংশের একাংশ সুবিধা, সামর্থ্য ও সুযোগ পায় না। আজ যে দরিদ্র কামারের ছেলে, কাল সে শিক্ষার প্রভাবে ও নিজ প্রতিভা গুণে সেখানকার প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে ধরুন—কোন কামার হাতুড়ী পিটিয়া যে পয়সা রোজগার করে, তাহার দ্বিগুণ ধার করিয়াও, সে পুত্রের পড়ার খরচ যোগাইতে পারে না; উচ্চ শিক্ষালয়ের কেবলমাত্র বড় কেরানীদের দক্ষিণ হস্তের সম্মান বাড়াইতে রীতিমত কিছু 'ঘু—ষ্' না দিলে, পুত্রটি তাঁহার 'ঘু—ষি' খাইয়া সরস্বতীর পাদ-পীঠের উপর হইতে গড়াইতে গড়াইতে কামার বাপের সেই সনাতন হাপরের নিকট হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া, [illegible] কাটিতে কাটিতে দিন যাপন করে।

বাপের ভদ্রাসনের বিনিময়ে, বিদ্যালয়ের জীবন্ত সরস্বতীগণ যদি তাঁহার প্রতি কৃপা কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বৃন্দাবনী চাদরের* মত তাহার গায়ে দুই একটা ডিগ্রীর ছাপ পড়িয়া যায়। আর বাছাধনকে পায় কে? ৩০৲ র কেরাণীগিরি করাই চাই। অদৃষ্টের ফেরে তাহাও যদি না জুটে, তাহা হইলে সপুত্র পরিবার তিনি অনশনে মরিতে প্রস্তুত হইবেন, তবুও সেই পৈত্রিক হাতুড়ী হাপর-নেহাইয়ের নাম স্মরণ (শরণ লওয়া দূরে থাক্) করিতেই তিনি শরমে মরিয়া যাইবেন (বিলাতী শিক্ষার এমনই মোহিনী মায়ার !) সমাজ-রূপী বুড়ো শালিকও ছাড়িবার পাত্র নহেন; পক্ষপুট খসিয়া পড়িয়াছে, গাত্র লোম ঝরিয়া যাইতেছে, মৃতপ্রায় হইয়া দিন গণিতেছেন, তবু দাঁড়ে বসিয়া গলায় জাত্যাভিমান ও ছুঁৎমার্গের মোহন সঙ্গীতে আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন। তাই, সর্ব্বাঙ্গে ডিগ্রীর ছাপ থাকিলেও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাহার একহাতে পৈত্রিক হাতুড়ী ও অন্যহাতে সনাতন হাপরের বিভীষিকা দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠেন; তাই পল্লী-সমাজের ধুরন্ধর এক নমঃশূদ্র উকীলকে Bar Libraryর সাধারণ চাকরের সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। যাক্—সে কথা।

*　　*　　*　　*

সমগ্র আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে প্রায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ অধিবাসীর বাস। তন্মধ্যে ৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালক বালিকাগণের সংখ্যা ২ কোটি ২৮ লক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেখানকার বালক বালিকাগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন শিক্ষা লাভ করে; আমাদের দেশে নব্বইয়ের শূন্য ত্যাগ করিয়া শতকরা নয়টি বালক মধ্য-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পাইলে বা পারিলে, দেশ-মাতৃকা আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করিতেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মার্কিনরাজ্যে স্কুল কলেজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ; এতাবৎকাল বোধ হয় আরও দুই সহস্র বাড়িয়াছে। শতকরা ৯০টি ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা ষ্টেটের হস্তে ন্যস্ত। আর এখানে শতকরা দশটি বিদ্যালয় ষ্টেট পরিচালিত কি না সন্দেহ! ২৪॥ কোটি ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য গভর্মেণ্ট প্রতি বৎসর নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করেন অন্যূন ১০ কোটি টাকা; আর ৯ কোটি সাতলক্ষ অধিবাসীর জন্য শিক্ষা বাবদ আমেরিকার গভর্মেণ্ট প্রতি বৎসর ব্যয় করিয়া থাকেন কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৩০০ কোটি টাকা! অর্থাৎ এদেশ অপেক্ষা ৭৫ গুণ অধিক!

জাপানের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪॥০ কোটী, প্রায় বাঙ্গালার সমান। তথায় ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা পঁয়ষট্টি লক্ষ। ইহাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য জাপানের মত 'পুঁট্‌কে' দেশে ২৬ হাজার বিদ্যালয় বর্ত্তমান। জাপানে শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য কম করিয়া ৫৭০০ বিদ্যালয় আছে। জাপানে শতকরা অন্ততঃ ৯২ জন লেখা পড়া জানে। জার্ম্মাণীর অনেক রাজ্যে—প্রত্যেক পাঁচ বৎসর বয়স্ক ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেই হইবে—এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে!

*　　*　　*　　*

ইহার উপর আর মন্তব্য চলে না। যে দেশের রাজা দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পথে—"গরজে গয়লা ঢেলা বয়-" ভাবে চলেন, সেখানে আমরা একদিকে শিক্ষার জলীয় দুধ ও অন্যদিকে স্বাস্থ্যের ইট পাটকেল ছাড়া আর বেশী কি পাইব? তবুও অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমানে অন্যান্য জাতির তুলনামূলক ইতিহাস আলোচনা করিয়া, যাহা পাই, তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, সন্তুষ্ট থাকিতে চাই না। এখন চাই-গয়লা বাঁকের দুই দিকেই নির্জ্জলা খাঁটি দুগ্ধের কেঁড়ে বহন করুক। স্বদেশ জননীর অসহায় শিশুগুলি সেই দুগ্ধ পান করিয়া সুস্থ সবল ও শিক্ষিত হইয়া জীবন ধারণ করুক্। Let the country once more flow with milk and honey of hlealth and education!

*　　*　　*　　*

* * * *

এইবার স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক্।

আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে—লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না। শুধু বিবাহ স্থলে নয়—এই প্রবচনটা অনেক স্থলেই—বিশেষতঃ সরকারী চাল-চলনের ক্ষেত্রে খুব খাটে। মৈমনসিংহে একটী মেডিকাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব বহুকাল হইতে মঞ্জুর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ "লাখ কথা" এখনও পূর্ণ হয় নাই বোধ হয়, কাজেই এখনও কাজ আরম্ভ হইল না। সে দিন বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের সার্জ্জন জেনারেল ডিয়ার সাহেব মৈমনসিংহে আসিয়া মেডিক্যাল স্কুলের স্থান ও হাসপাতাল দেখিয়া, সিবিল সার্জ্জন, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও মেডিক্যাল স্কুল ফাউণ্ডেসন কমিটির সঙ্গে আলাপ করিয়া, এই শীত ঋতুতে কার্য্যারম্ভের চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন!

ঈশ্বরগঞ্জে জলকষ্টের সূচনা দেখিয়া জেলা বোর্ড একটী নলকূপের ব্যয় বাবদ ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। "মৈমনসিংহ সমাচার" বলিতেছেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট হইতে প্রস্তাবিত সাহায্যের অঙ্গীকার এ পর্য্যন্ত না পাওয়ায় কূপটি খনিত হইতে পারিতেছে না। গবর্মেণ্টের এ দীর্ঘ সূত্রিতা কেন? আরও কিছু দিন জলকষ্ট না ভোগ করিলে বোধ হয় ঈশ্বরগঞ্জবাসীরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে অর্থরূপ 'কেষ্ট' পাইবে না। অথবা মেওয়া ফলিতেছে বলিয়াই কি সবুর করিতে হইতেছে?

Out of evil cometh good. বন্যায় সর্ব্বনাশ যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছেই। তবে ইহাতে সামান্য একটু উপকারও হইয়াছে, যে জন্য বিশেষ ভাবে আমরা একটু সুখী। "দেশের বাণী" বলিতেছেন, উত্তর বঙ্গের বন্যায় ২৭৫০ বিঘা জমির গাঁজার ফল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে গাঁজাখোর ও গবর্মেণ্টের সমূহ ক্ষতি হইলেও আমরা একটুও দুঃখিত নহি।

বনগ্রাম থানার অধীন কয়েকখানি গ্রামে গো-মড়ক আরম্ভ হওয়ায় অনেক গোরুকে টিকা দেওয়া হয়। ফলে মড়ক বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গর্ভিণী গাভীর গর্ভপাত হইয়াছে। "এক কর্ত্তে হ'ল আর, দোষ গুণ কব কার!"

কাটোয়ার "প্রসূন" একটী বড় সুপ্রস্তাব করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীরা ব্যায়ামে পারদর্শিতার সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে বিশ্ববিদ্যালয় যেন তাহাদিগকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি না দেন। অতি উত্তম প্রস্তাব। এই ব্যবস্থা কিছু কঠোর হইবে স্বীকার করি, কিন্তু রোগও যে তেমনি কঠিন। এই সঙ্গে আরও একটী নিয়ম হইলে ভাল হয়। ব্যায়ামে পারদর্শিতার সার্টিফিকেটের সঙ্গে সঙ্গে শরীর নীরোগ fit and efficient না হইলে যেন কোন যুবক বিবাহ না করে, এবং মেয়ের বাপেরা মেয়ের জন্য পাত্র নির্ব্বাচনের সময় যেন এই দুইটী বিষয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, এবং যে পাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইবে, তাহাকে যেন কোন মতে কন্যা সম্প্রদান না করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিবাহের বাজারে ব্যায়ামে পারদর্শিতার সার্টিফিকেট এবং শরীরের fitness ও efficiencyর দাবী করিবার সময় আসিয়াছে। সেনাবিভাগের চাকুরীর ত কথাই নাই,—সিবিল বিভাগেও যে কোন সরকারী চাকুরী পাইতে হইলেই physically fit হওয়া দরকার। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে গেলে, সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে গেলে, অশ্বারোহণ-বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হয়। পূর্ত্ত বিভাগে, বন বিভাগে শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা খুব কড়া ভাবেই লওয়া হইয়া থাকে। এমন কি, সামান্য সরকারী কেরাণীগিরি (clerkship) পরীক্ষা দিতে গেলেও শরীর সুস্থ ও যোগ্য অবস্থায় থাকা চাই। সিবিল ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রবেশ করিতে হইলেও এই ব্যবস্থা। কেবল বি-এ, এম-এ, ডাক্তারী কিম্বা আইন পরীক্ষার বেলাই কোন সুব্যবস্থা নাই। কেন থাকিবে না? বিশ্ববিদ্যালয় ও মেয়ের বাপেরা যদি ব্যায়ামে পারদর্শিতার দাবী করেন, তবে তাহা একটুও অন্যায় হইবে না। আমরা অন্তরের সহিত এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি!

বাঙ্গালার জগজ্জয়ী মল্লবীর।

শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ গুহ।

ওরফে গোবর গুহ।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } পৌষ, ১৩২৯ সাল { ৯ম সংখ্যা

হিন্দু ডুবিল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-রত্ন।

বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার।

নানা বর্ণের ছিট্, শালু ও পাকা পাড়, প্রস্তুত কার্পাস, রেশম ও পশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে একমাত্র ভারতবাসীরাই জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম প্রদেশে কালিকট্ নামক স্থানে পাকা ছিট্ প্রস্তুত করিবার প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। ১৭০০ খ্রীঃ হলণ্ডবাসীরা ভারতে আসিয়া ইহা প্রথমে শিক্ষা করিয়া যান। হলণ্ড হইতে পাশ্চাত্য জাতিরা শিক্ষা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই জন্যই অদ্য ইংরেজী ছিট্‌কে "কেলিকো প্রিণ্টিং" বলিয়া থাকে। আমাদের পৈতৃক ধনের কণামাত্র অবলম্বন করিয়া বিদেশীয়েরা কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, আর আমরা বিদেশীয়দের কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত হইতেছি এবং কুড়ি টাকা মাহিয়ানার একটী চাকরী পাইলে জীবন ধন্য হইল বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কি শোচনীয় অধঃপতন!

বিদেশীয়েরা আমাদের শিল্প বাণিজ্য শিখিয়া কি উপায়ে নানাবিধ চাক্‌চিক্যশালী কৃত্রিম দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে আমাদিগকে প্রদান করিয়া আমাদের ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন, তাহা এদেশের প্রত্যেক লোকেরই আলোচনা ও আন্দোলন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের কারিকরগণ পূর্ব্বে কি কি দ্রব্যাদি দ্বারা কাপড়ে রং, পাকা পাড় এবং কার্পাস, রেশম ও পশম রঞ্জিত করিতেন, তাহাই আমরা

সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিব। প্রাচীন ভারতে (এখনও কোন কোন স্থানে) দেশীয় এই সমস্ত বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা কাপড়ে পাকা রং ও পাকা পাড় প্রস্তুত করা হইত; যথা—কুসুমফুল, মঞ্জিষ্ঠা, মালচ (আউচ), হরিদ্রা, আল্‌তা, লাক্ষা, বাব্‌লা, হরীতকী, জাম, পেয়ারা, মাজুফল, বকম কাষ্ঠ, কৃমিদানা, খদির, ঢাঁইফুল, ভেলার আঠা, নানাবিধ বৃক্ষের গঁদ প্রভৃতি এবং হীরাকষ, ফটকিরি, চাখড়ি, গিরিমাটি, নীল প্রভৃতি উদ্ভিদ ও ধাতব দ্রব্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর ছিল; ইহাদের কোনটির মধ্যে বিন্দুমাত্র বিষাক্ত ধর্ম্ম নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ছিট্ প্রস্তুত করিবার আচার্য্য ভারতবর্ষ। সুতরাং এদেশে অতি পরিপাটী রূপে নানা বর্ণের ছিট্ প্রস্তুত হইত। তবে তাঁহারা বাহ্য চাক্‌চিক্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া স্বাস্থ্যের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বিদেশীয়েরা স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ও বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা ঐ সমস্ত রং প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এজন্যই বিদেশীয়েরা সুলভ মূল্যে চাক্‌চিক্যশালী বস্ত্র ও দ্রব্যাদি তৈয়ার ও বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বে এদেশে কুসুমফুল, মঞ্জিষ্ঠা লাক্ষা, কৃমিদানা প্রভৃতি নির্দ্দোষ উদ্ভিদ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভারতীয় দ্রব্যাদি বিশেষ আদরের পণ্য ছিল। পূর্ব্বে মঞ্জিষ্ঠা না হইলে শালু কাপড়ের লালরং হইত না, আজ কাল বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে লাক্ষার রং, কুসুমফুলের রং, মঞ্জিষ্ঠার রং, কৃমিদানার রং অতি সুলভে সহজে প্রস্তুত হইতেছে। এই জন্যই বিদেশীয় ছিট্ ও অন্যান্য দ্রব্য এত সস্তা।

বিদেশীরা কি কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড়, নানা-রঙ্গের ছিট্, এবং কার্পাস, পশম, রেশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। বিদেশীয়েরা থান কাপড় প্রভৃতিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা কমলা রং করিয়া থাকেন; যথা—অর্দ্ধসের সুগার্ অব্ লেড্, (ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ), ৫ সের বিশুদ্ধ জলে মিশাইয়া উহাতে কাপড় ভিজাইতে হয়। পরে কাপড় শুকাইয়া চূণের জলে ভিজাইতে হয়। উহাতে শিরিস দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কাপড় শুকাইয়া চূণের জলে ভিজাইয়া জলে অনেকবার ধৌত করিয়া লইতে হয়। পুনরায় ঐ কাপড় শুকাইয়া বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশের (ভয়ানক উগ্র দ্রব) জলে ভিজাইয়া এবং চূণের জলে রাখিয়া আগুনের তাপে ফুটাইলে সুন্দর কমলা রং হইবে।

২। চাঁপাফুলের মত পাকা রং করিতে হইলে, সুগার্ অব্ লেড্ (পাইরোলিগ্‌নেট্ বা এসিটিট্ অব্ লেড্), হিরাকস, গরম জল ও গঁদ দরকার হয়।

৩। পাকা নীল-রং করিতে হইলে মনছাল (মনঃশিলা—ভয়ানক বিষাক্ত), নীলচূর্ণ, বাথাল্লি ও গঁদ দরকার হইয়া থাকে।

৪। কাপড়ের পাকা পাড় ও পাকা ছিট্ করিতে হইলে সুগার অব্ লেড্, এসিটিক এসিড্, ফট্‌কিরি প্রভৃতি দ্বারা রং তৈয়ার করিতে হয়।

৫। পাকা কাল রং তৈয়ার করিতে হইলে, পাইরোলিগ্‌নেট্ অব্ লাইম্ বা আয়রন্ লিকর্ অথবা ব্ল্যাক্ লিকর্ দরকার হয়। হীরাকসের জলে সুগার্ অব্ লেড্ মিশ্রিত করিয়া বা এসেটিট্ অব্ লাইম্ বা সুগার্ অব্ লেড্ হীরাকসের সহিত মিশাইয়া ব্ল্যাক্ লিকর্ বা আয়রন্ লিকর্ নামক কাল রং প্রস্তুত হয়।

৬। ঘোর লাল রং বিদেশীয়েরা এইরূপে তৈয়ার করেন, যথা—সুগার্ অব্ লেড্ ৭৷৷০ সের, সোডা ১ সের ও গরম জল ৫০ সের। প্রথম গরম জলে ফট্‌কিরি দ্রব করিয়া উহাতে সোডা দিতে হয়, পরে উথলিয়া উঠিলে সুগার্ অব্ লেডের চূর্ণ দিতে হয়। পরে ভালরূপ নাড়িয়া তাহাতে গঁদ দিলেই

উহা ঘন হয় ও কাপড়ে ছাপ দিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে।

৭। ফিকা লাল রংএর জন্য ফট্‌কিরি ৪ সের, সুগার্ অব্ লেড্ ৩ সের ও জল ৩ সের দরকার হয়।

৮। অত্যন্ত ফিকা লাল রং করার জন্য সুগার্ অব্ লেড্ ৭৷৷ সের, ফট্‌কিরি ১৮৷৷ সের, চাখড়ি চূর্ণ ১৷৷০ সের ও জল ৫০ সের আবশ্যক হইয়া থাকে।

৯। পূর্ব্বে আমাদের দেশে রং পাকা করার জন্য গোময় ব্যবহৃত হইত। এখন বিদেশীয়েরা উহার পরিবর্ত্তে আর্সেনিয়েট্ অব্ সোডা (ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ) ফস্ফেট্ অব্ সোডা, সেলিসেট্ অব্ সোডা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১০। পূর্ব্বে এদেশে খদির, জাঙ্গাল প্রভৃতি দ্বারা রং তৈয়ার করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশ্ প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা খদিরের পাকা রং করিয়া থাকেন। বিদেশীয়েরা কাপড় খদিরের জলে ভিজাইয়া ও শুকাইয়া, পরে বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশের উষ্ণ জলে ভিজাইয়া বারবার শুকাইয়া লইয়া থাকেন।

১১। কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ দিয়া শুকাইলে, চূণগোলা দিতে হয়। পরে ঐ বর্ণ নীল হইলে কাপড়খানি শিমুলক্ষারের (শঙ্খবিষ) বা আর্সেনিয়েট্ অব্ পটাশের জলে ফুটাইলে হরিৎ বর্ণের রং হইবে।

১২। সুগার্ অব্ লেড্ বা নাইট্রেট্ অব্ লেডের জলে কাপড় ভিজাইয়া, পরে ঐ কাপড় বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশে ভিজাইলে ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হয়। কিন্তু কমলা রঙ্গের পাকা রং করিতে হইলে ঐ হরিদ্রাবর্ণ কাপড় চূণের জলে ফুটাইলে বাইক্রোমেট্ অব্ লেডের বর্ণ কমলা হইয়া থাকে। আজকাল বিদেশীয়েরা কমলা রঙ্গের ধূতির সুতা ঐরূপে রঞ্জিত করিয়া থাকেন।

১৩। নীলরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র বা নীল ছিট্‌কে এসিটেট্ অব্ লেডের জলে মগ্ন করিয়া পরে বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশের জলে মগ্ন করিলে ঐ স্থান পীতবর্ণ হয়।

১৪। বিদেশীয়েরা সুতা, রেশম, পশম প্রভৃতি প্রুসিয়েন্ ব্লু দিয়া রঞ্জিত করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হীরাকসের জলে কাপড় ডুবাইয়া পরে চূণের জলে ধৌত করিতে হয়। সির্কা বা অন্যান্য অম্ল মিশ্র দিয়া পরে ফেরোসায়েনাইড্ অব্ পটাশ্ (অতি ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ), টার্টারিক্ এসিড্ প্রভৃতি পদার্থ এবং চূণগোলার জলে ভিজাইয়া ঐ কাপড়খানিকে শঙ্খবিষ বা আর্সেনিয়েট্ অব্ সোডার জলে মগ্ন করিয়া ঘোর হরিদ্বর্ণ রং করা হয়।

১৫। মেজেণ্টার্।—আজকাল এই দ্রব্যটী এদেশের সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইতেছে। লাল কালীর জন্য, হোলির পিচ্‌কারির জন্য, শীল মোহরের কালীর জন্য, বিলাসিনীদের করতল ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করার জন্য, চিত্রকরদের নানা দ্রব্য রং করার জন্য, কাপড়ে লাল ও নানা রং করার জন্য, মেজেণ্টার্ এদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এদেশে দেশীয় নানা বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা আবির প্রস্তুত করা হইত। এক্ষণে মেজেণ্টার্ দ্বারা আবিরের রং করা হইতেছে। ফলতঃ বিদেশীয় অধিকাংশ দ্রব্যই মেজেণ্টার দ্বারা রং করা হইয়া থাকে। এই মেজেণ্টার্ ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ। ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে তৈয়ার করা হয়, যথা—

(১) এনিলিন্ নামক পদার্থই এই শ্রেণীস্থ রং সকলের জননী। আল্‌কাতরা চুয়াইলে একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ন্যাপ্‌থা কহে। ন্যাপ্‌থা চুয়াইলে বেন্‌জোল্ পাওয়া যায়। এই বেন্‌জোল্ হইতে নানা উপায়ে এনিলিন্ প্রস্তুত হয়। মেজেণ্টার্ অনেক রকমে প্রস্তুত হয় ও নানাবর্ণের মেজেণ্টার্ তৈয়ার করা হয়।

(২) ঐ এনিলিন্, সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্, বাই-ক্রোমেট্ অব্ পটাশ্ প্রভৃতি দ্বারা নানা উপায়ে বেগুনী বর্ণের মেজেণ্টার্ প্রস্তুত হয়।

(৩) এনিলিন্, শঙ্খবিষের (আর্সেনিয়াস্ এসিড্) সহিত মিশাইয়া মেজেণ্টার্ প্রস্তুত হয়। (1)

এক্ষণে পাঠক, ঐ সমস্ত ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়া কি, তাহাও একবার ধীরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখুন।

সীসধাতুঘটিত নানা লবণ বা ঔষধ বিদেশীয়েরা অধিকাংশ শিল্পাদিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সীসধাতু ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ। এই বিষাক্ত পদার্থ নানা উপায়ে আমাদের শরীরস্থ হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। (2) যথা—

(১) বিষাক্ত পদার্থ কতকটা অধিক মাত্রায় খাইয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

(২) বিষাক্ত পদার্থ নিশ্বাসপথে শরীরস্থ হইলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৩) বিষাক্ত পদার্থ ঘর্ম্মপথে বা লোমকূপ দ্বারা শরীরস্থ হইলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৪) বিষাক্ত পদার্থের ধূম শরীরস্থ হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

(৫) বিষাক্ত পদার্থ ক্ষত দ্বারা শরীস্থ হইলেও বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে।

অতএব দেখুন, কেবল যে বিষাক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে খাইয়া ফেলিলেই বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা নহে; অন্যান্য কারণেও কোন প্রকারে বিষ শরীরস্থ হইলেই বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে অধিক মাত্রায় উক্ত বিষ (সুগার অব্ লেড্) খাইলে বা শরীরস্থ হইলে প্রবল ভাবে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর অল্প পরিমাণে শরীরস্থ হইলে অতি ধীরে ধীরে বিষলক্ষণ প্রকাশ হয়। এই সীসধাতু সংসৃষ্ট বিদেশী বস্ত্রাদি আমরা ব্যবহার করায় আমাদের নিশ্বাস পথে ঘর্ম্ম পথে ক্ষত দ্বারা প্রতিনিয়ত তিল তিল বিষ আমাদের শরীরস্থ হইতেছে। এক্ষণে সীসধাতু ঘটিত ঔষধ তিল তিল পরিমাণে বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই উল্লেখ করিবে।

অল্পমাত্রায় কিছুকাল সেবন বা উপরিউক্ত কোন কারণে শরীরস্থ হইলে সীসধাতু প্রথমতঃ মুখ, তালু ও নাসারন্ধ্রের শুষ্কতা, প্রস্রাবের হ্রাস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, পাকাশয়ে ক্লেশ, ও উদরে বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য বিবমিষা বমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ ভিন্ন মাড়ীর অন্তভাগ ও ওষ্ঠ ও গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ নীলবর্ণ দেখা যায়। জিহ্বাতে সর্ব্বদা মিষ্ট আস্বাদ, নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ, শরীর শীর্ণ, চক্ষুর বর্ণ অস্বচ্ছ ও পীত, ধমনীর মন্দগতি, মানসিক বিষণ্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসকল লক্ষণ ক্রমে সীসশূল ও সীস পক্ষাঘাতে পরিণত হইয়া থাকে।

সীসশূল (কলিকা পিক্টোনাম্ বা লেড্ কলিক) প্রকাশ পাইলে উদরে ভয়ানক বেদনা হয়, নাড়ীর নিকটস্থ অন্ত্র সকল যেন মর্দ্দিত হইতেছে এইরূপ বোধ হয়। ঐ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়। উদরস্থ পেশী সকল কুঞ্চিত ও কঠিন হইয়া উঠে। মল বদ্ধ হয়। উদর চাপিলে রোগী একটু আরাম বোধ করে। কখন কখন পিত্ত বমন হয়।

সীস-পক্ষাঘাত হইলে স্পর্শবোধ হ্রাস, কখন কখন পেশীসঞ্চালনের শক্তি হ্রাস, কখন বা উভয়ই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন, পেশী সকলে এবং সন্ধিমধ্যে বাতের ন্যায় বা স্নায়ুশূলের ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়। কখন বা পেশী সকল আক্ষিপ্ত হয়। এই পক্ষাঘাত প্রায়ই হস্ত ও পদকোষ্ঠদ্বয়কে আক্রমণ করে। ক্রমশঃ অধঃশাখা-শক্তি ক্ষীণ হয় এবং সমুদায় পেশী দুর্ব্বল হয়। এজন্য কোন কর্ম্ম করিতে শরীর-কম্প হইতে থাকে। কখন বা ঐ বিষ মস্তিষ্ককে আশ্রয় করে। তখন মৃগী, সংন্যাস প্রভৃতি পীড়া হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। (3)

পাঠক। উপরি উক্ত লক্ষণসংযুক্ত নানাবিধ পীড়া আপনারা বোধ হয় এদেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছেন।

অধিক দিন আর্সেনিক্‌ঘটিত ঔষধ অল্পমাত্রায় (ঔষধীয় মাত্রায়) সেবন করিলে বা উপরি উক্ত কোন কারণে তিল তিল পরিমাণ আর্সেনিক্ শরীরস্থ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ক্রমে প্রকাশ পায়; যথা :—

প্রথমে চক্ষু ও পাকাশয় আক্রান্ত হয়। অক্ষিপল্লব অল্পমাত্র শোথগ্রস্ত হয়, এবং চক্ষু রক্তবর্ণ এবং জলপূর্ণ ও তীব্র বেদনাযুক্ত, কখন কখন দৃষ্টির ক্ষীণতা উপস্থিত হইয়া থাকে। নাসারন্ধ্র, মুখ ও গলনালী রক্তবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত হয়। পিপাসা, এবং মুখ ও গলনালীর শুষ্কতা উপস্থিত হয়। আহারও বা ক্ষুধা লোপ হয়, উদরে ভারবোধ হইয়া থাকে। আবার চর্ম্ম শুষ্ক, মলিন ও রুক্ষ হয়; চর্ম্মের বিকৃতি অর্থাৎ একৃজিমা বা আর্টিকেরিয়া (আমবাত) উপস্থিত হয়। এভিন্ন, করতলে ও পদতলে ফোস্কা ও কোমলতা হইয়া ছাল উঠিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, নানারূপ চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয় এবং

মস্তকে দপদপানি বেদনা উৎপন্ন হয় এবং সন্ধি সকলের প্রদাহ ও স্ফীতি প্রকাশ পায়। অনিদ্রা উপস্থিত হয় বা স্বপ্ন বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। ইহার পরেও যদি বিষ আরও শরীরস্থ হইতে থাকে তবে কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়, মুখ মধ্যে ক্ষত হইয়া যায়। বিবমিষা, বমন এবং উদারাময় আরম্ভ হয়, রক্ত-মিশ্রিত কর্দ্দমবৎ ভেদ হয় ও বিরেচনকালে সাতিশয় বেদনা ও কুন্থন (আমাশয়) উপস্থিত হয়। চুল, লোম উঠিয়া যাইতে থাকে ও নখ স্খলন হয়। কখন বা রক্তমিশ্রিত কফ-সহযোগে কাসি উপস্থিত হয় এবং রোগী ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে। চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, এবং নাড়ী দ্রুতগামী হয়। শাখাদ্বয়ে বেদনা, স্নায়বীয় বেদনা, স্পর্শলোপ, কম্প, পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে স্মরণ-শক্তি লোপ পায়। (4)

উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত পীড়া আজকাল এইদেশেও ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে না?

আর্সেনিক সংগ্রাহক বিষক্রিয়া করে, অর্থাৎ অতি অল্প মাত্রায় (ঔষধীয় মাত্রায়) কিছুদিন ক্রমাগত সেবন করিলে হঠাৎ একদিন এই বিষের গুরুতর লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ডাক্তার হাজ্‌বেণ্ড মহোদয় লিখিয়াছেন যে আর্সেনিক ঘটিত ঔষধগুলি দ্বারা বিষাক্ত হইলে ওলাউঠার ন্যায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। (5) ফলতঃ বিচক্ষণ ডাক্তার ভিন্ন ওলাউঠা ও আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্তের লক্ষণ প্রভেদ করিতে পারেন না।

---

(1) "Metallic arsenic, fly powder, arsenic acid largely used in the manufacture of Magenta, aniline red, or fuchine and the arseniates of potash and soda, are all poisonous." (See Forsensic Medicine by Dr. Husband M. D., p. 294)

(2) Poison—"A poison may be defined as any substance which, introduced into the system or applied to the body, is injurious to health and distroys life.' (See Ditto p 222)

(3) Symptoms of Chronic poisoning by lead—The patient generally complains, of feeling unwell and of general debility. He then suffers from pain of a twisting, grinding nature, felt in the region of the Navel. The bowels are confined. The appetite becomes capricious, and may be entirely lost. The mouth is parched, the breath foetid, the countenance sallow, the skins dry, and general emaciation sets in. (See ditto P.314.)

(4) Chronic Poisoning with Arsenic.

Irritation and redness of the eyes and nostrils. Dryness of the mouth and throat. Loss of appetite, Colicky pains, cramps, irritability of bowels mucous discharges, depression, convulsiens paralysis etc. (See Ditto p. 296

(5) The symptoms resembles an attack of Cholera. (See Ditto P. 279)

সকলেই জ্ঞাত আছেন যে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ একটী অতীব প্রবল সাংঘাতিক বিষ। নির্জ্জলাবস্থায় এই ঔষধ একবিন্দু গলাধঃ করা মাত্রেই মৃত্যু হয়। এই ঔষধ সংসৃষ্ট সমস্ত লবণও ভয়ানক বিষাক্ত, বলা বাহুল্য। ফেরি-সায়েনাইড্ অব্ পটাশ প্রবল বিষাক্ত পদার্থ। উক্ত এসিড সংযুক্ত ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করিলে বা উহার ধূম গ্রহণ করিলে বা কোন প্রকারে উহা শরীরস্থ হইলে নিম্ন লিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়; যথা :—প্রথমতঃ শিরোঘূর্ণন, কর্ণকুহরে শব্দ এবং অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য বোধ হয়। ১৮—২০ মিনিটের মধ্যে রোগী অচেতন হইয়া পড়ে।

অচেতন অবস্থায় চক্ষু স্থির ও উজ্জ্বল, কনীনিকা প্রসারিত ও অবশ, শ্বাসগতি কষ্টকর, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীর শীতল, পাণ্ডুবর্ণ এবং ঘর্ম্মাভিষিক্ত, আক্ষেপ, মলমূত্র নির্গমন এবং মৃত্যু সংঘটিত হয়। মৃত্যু না হইলে নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় রোগী উঠিয়া বসে। (6)

বাইক্রোমেট অব পটাশ ভয়ানক উগ্র দ্রব ও অতি প্রবল দাহক। ইহা শরীরস্থ হইলে শরীরের বিধান নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন, যাহারা বাইক্রোমেট অব পটাশ নাড়াচাড়া করে, তাহাদের মুখে, গলদেশে ও নাসিকায় একপ্রকার দুরারোগ্য ক্ষত জন্মিয়া থাকে। (7)

উপরি উক্ত লক্ষণসংযুক্ত নানাবিধ উৎকট ও দুরারোগ্য পীড়া আজকাল আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই—প্রতি গৃহেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ সীস, আর্সেনিক্, হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্, ক্রোমিক এসিড্ প্রভৃতি সাংঘাতিক বিষাক্ত পদার্থসংসৃষ্ট বিদেশীয় বস্ত্রাদি হইতে অণু-অণু-পরিমাণ বিষ অলক্ষিত ভাবে প্রতিনিয়ত আমাদের নিশ্বাসপথে, ঘর্ম্মপথে, ক্ষত দ্বারা, ধূম গ্রহণে শরীরস্থ হইতেছে এবং আমরা নিত্য নূতন নূতন উৎকট ও দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছি এবং আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোক অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, অযথা জড়, অকর্ম্মণ্য, জীর্ণ, শীর্ণ হইয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। পাঠক! ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আপনারা উপরি উক্ত লক্ষণ সংযুক্ত পীড়া কখনও দেখিয়াছেন কি? বোধ হয় আপনারা কখনও দেখেন নাই। তখন (৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে) প্রাচীন কর্ত্তারা সকলেই নীরোগ, বলিষ্ঠ, মস্তিষ্কশালী ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিগত ৪০।৫০ বৎসরকাল হইতেই অর্থাৎ আমরা যে সময় হইতে বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন হইতেই আমাদের দেশে নিত্য নূতন নূতন উৎকট দুরারোগ্য রোগ প্রকাশ পাইতেছে এবং শত সহস্র লোক অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। ফলতঃ আমাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবনতি ও অকাল মৃত্যুর অন্যান্য কারণ আছে সত্য, কিন্তু বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করাও ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। যাহা হউক আমরা এই গুরুতর বিষয়টী এদেশের বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি। ভরসা করি তাঁহারা দয়াপূর্ব্বক এ সম্বন্ধে আরো সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে অনুসন্ধান করিবেন ও তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল জন সাধারণকে জানাইয়া বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার হইতে দেশবাসিগণকে নিবৃত্ত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিবেন। যাঁহারা বিদেশী বস্ত্রাদি সস্তা ও সুন্দর ইত্যাদি বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই গুরুতর বিষয়টি চিন্তা ও আলোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

(6) (See ditto p. 376.)

(7) The bichromate of Potash is a powerful poison, and death may occur from its direct action on the nervous system. Externally it produces deep fistulous sores, * * Dyers not infrequently suffer severely on their arms when using it in the course of their trade' (See ditto p. 325)

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, বিদেশীয়েরা বিশেষতঃ জার্ম্মানি ভারতে যে কেবল সুলভ মূল্যের বস্ত্র ও দ্রব্যাদি পাঠাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দেশে প্রায় কেহই ব্যবহার করেন না। কেবল ভারতবাসীর ব্যবহারের জন্যই ঐ সকল সুলভ বিদেশীয় দ্রব্য ভারতে প্রেরিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এদেশে কাঁচা রঙ্গের সুন্দর সুন্দর ছিট্ কাপড়ই জার্ম্মানি হইতে প্রচুর পরিমাণে আসিয়া থাকে। ঐ সমস্ত কাঁচা রঙ্গের ছিট্ কাপড় হইতে বিষাক্ত পদার্থ ঘাম প্রভৃতি সহযোগে গায়ে লাগিয়া লোমকূপের মধ্যদিয়া অতি সহজে শরীরস্থ হয়। এইরূপে আমরা বিদেশী কাঁচা রঙ্গের ছিট্ কাপড় ব্যবহার করিয়া নিত্য নূতন নূতন দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছি। সাহেবেরা কখনও এই সমস্ত কাঁচা রঙ্গের ছিট্ কাপড় ব্যবহার করেন না। (৪)

এ দেশের জনক-জননী তাঁহাদের সন্তানগণকে কখনও বিদেশী নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর ছিট্ দ্বারা প্রস্তুত পোষাক ব্যবহার করাইবেন না। অনেক জনক জননী তাঁহাদের সন্তানকে সুলভ মূল্যের বিদেশী সুন্দর পোষাক পরাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই আনন্দ কি জন্য যে অতি শীঘ্রই নিরানন্দে পরিণত হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহারা কেহই জানেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন না। ফলতঃ ঐ সমস্ত কাঁচা রঙ্গের বিদেশী ছিট কাপড় হইতে বিষাক্ত পদার্থ তিল তিল পরিমাণে শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং শিশু ক্রমে ক্রমে উপরি উক্ত নানা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হয়। অতএব হে জনক জননীগণ, আপনারা আর কখনও বিদেশী মনোমুগ্ধকর সস্তা দ্রব্যাদি শিশুগণকে ব্যবহার করাইবেন না। বিদেশী দ্রব্যগুলি মহাকাল বা মাকাল ফল মনে করিবেন। বিদেশী দ্রব্য দেখিতে অতি সুন্দর ও সস্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐগুলি বিষাক্ত পদার্থে পরিপূর্ণ!! আপনাদের প্রাণাধিক পুতলিগণকে আর কখনও ঐ বিষপরিপূর্ণ দ্রব্যগুলি ব্যবহার করাইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না।

(৪) আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে উপরি উক্ত বিষয়গুলি গ্রহ করিয়াছি। যথা :—

Encyclopædia Britanica; Bancroft's Philosophy permanent colours; O'nell's Chemistry of Calico Printing and dying and Dictionary of Dying; Napier's Manual of Dying; Crook's Dying and Calico Printing; Calvert's Dying and Calico Printing; Ure's Dictionary of Art; British Manufacturing Series; G. H. Hurst's Garment Dying and Cleaning; G. Duerr's Bleaching and Calico Printing.

আমেরিকায় মদ্য বর্জ্জনের সুফল।

আমেরিকা ত মদ্য বর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলাফল কিরূপ হইল, তাহা জানা দরকার। কারণ, যদি মদ্য-বর্জ্জন করিয়া কোন সুফল না ফলিয়া থাকে, তবে রাজস্বের ক্ষতি করিয়া মদ্য বর্জ্জন বিধি প্রচলিত রাখিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ, এক শ্রেণীর আমেরিকান এই আইন তুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহারা ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। আইন্ কর্ত্তারা সেইজন্য মদ্য বর্জ্জন আইন প্রচলিত রাখিবার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা ভাবিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের যদি দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিতে পারা যায়, যে, মদ্য বর্জ্জনের আইন প্রচলিত করায় সুফল ফলিয়াছে, তাহা হইলে আইন প্রচলিত রাখিবার জন্য জোর দাবী করা চলে। নহিলে আইন তুলিয়া দিতে হয়।

এখন মদ্য বর্জ্জনে সুফল কি কুফল ফলিল, তাহা জানিবার উপায় কি? মদ্যপান করিলে যে সকল অনিষ্ট হয়,—অর্থাৎ স্বাস্থ্যের ক্ষতি, মাতাল অবস্থায় অপরাধের অনুষ্ঠান, দারিদ্র্য প্রভৃতি—মদ্য বর্জ্জন করায় সেগুলি যদি বন্ধ হইয়া থাকে, কিম্বা কমিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, মদ্য বর্জ্জনে দেশের উপকার হইয়াছে। আর, যদি দেখা যায়, এসকল অনিষ্টের মাত্রা একটুও কমে নাই, তাহা হইলে বুঝা গেল যে, মদ্য বর্জ্জন করিয়াও কোন উপকার পাওয়া যায় নাই।

আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া গঠিত মাসাচুসেট্‌স (Massachusetts) এই রকম একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। মদ্য বর্জ্জন আইন এখানে খুব কড়া ভাবে প্রচলিত। এই রাজ্যে মদ্য বর্জ্জন আইন প্রচলিত থাকায় কিরূপ ফল ফলিয়াছে,—সম্প্রতি বোষ্টন নগরের সায়েন্টিফিক টেম্পারেন্স ফেডারেশনের সেক্রেটারী কোরা ফ্রান্সেস ষ্টডার্ড সে সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই রিপোর্ট পাঠ করিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মদ্য বর্জ্জন আইনের কল্যাণে মাসাচুসেট্‌স প্রদেশের গরীব লোকদের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। সম্প্রতি লিটারারী ডাইজেষ্ট নামক একখানি বিখ্যাত মার্কিন সাময়িক পত্র সেই রিপোর্টের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সঙ্কলন করিলাম।

মিস কোরা ফ্রান্সেস ষ্টডার্ডের রিপোর্ট পাঠ করিয়া বোষ্টন নগরের সুবিখ্যাত ডাক্তার রিচার্ড সি, ক্যাবট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বড়লোকদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আইনের দৌলতে দরিদ্র সম্প্রদায়ের অবস্থার যে অনেকটা উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে দেশে দরিদ্র সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান মদ্যপ ছিল। এখন স্ত্রীলোকদের মধ্যে মদ্য পানের পরিমাণ অনেকটা কমিয়াছে। সতের বৎসরের কম বয়সের বালক বালিকার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিলেও সুফলই ফলিয়াছে বলিতে হইবে। অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া আগে যত লোক মরিত, এখন আর তত লোকের মৃত্যু হয় না। মাতালদের মধ্যে আগে যত দুর্ঘটনা ঘটিত, এখন আর তত ঘটিতেছে না। মদ্যপানের ফলে পূর্ব্বে যত লোক পাগল হইয়া যাইত, এখন সেটা অনেকটা কমিয়াছে। মদ্য বর্জ্জনের এই সুফল দর্শনে আনন্দিত না হইয়া থাকা যায় না।

মিস ষ্টডার্ডের রিপোর্টে প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি অনেক 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স' সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার বক্তব্য বেশ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মদ্য বর্জ্জিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সাত বৎসরের (১৯১২ হইতে ১৯১৮) সহিত মদ্য বর্জ্জিত দুই বৎসরের (১৯২০ ও ১৯২১) তুলনা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—

(১) মাতলামির জন্য গ্রেপ্তারের পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে।

(২) মাতাল স্ত্রীলোকদের গ্রেপ্তারের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশেরও কম।

(৩) মাতলামির জন্য দণ্ড স্বরূপ যাহাদিগকে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করা হয়, তাহাদের সংখ্যা সিকি দাঁড়াইয়াছে।

(৪) কারাগারে কয়েদীর সংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়াছে।

(৫) যে সকল শিশুকে পিতামাতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের মধ্যে শতকরা ১৮জন পিতা ও শতকরা ৩জন মাতা মাতাল ছিল। মদ্য বর্জ্জনের পর ঐরূপ মাতাল পিতার সংখ্যা শতকরা ১জন। মাতাল মাতা আদৌ ছিল না।

(৬) স্কুলে বালক বালিকার উপস্থিতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৭) ছেলে মেয়েদের ভাল খাওয়া পরার সুবিধা হইয়াছিল।

(৮) মদ্য পানের ফলে মৃত্যু সংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়াছিল।

(৯) হাসপাতালে মাতাল রোগীর সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী কমিয়াছিল।

(১০) গৃহস্থ লোকদের প্রায় মাতালদের আড্ডায় দেখা যাইত না।

(১১) জননেন্দ্রিয়-ঘটিত পীড়া বহু পরিমাণে কমিয়াছিল।

(১২) অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে যাহারা পাগল হইয়া যায়, এরূপ রোগীর সংখ্যা অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছিল।

(১৩) সরকারী কর্ম্মশালায় (alms house) লোক সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছিল।

মিস ষ্টডার্ড সংগৃহীত ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ হইতে ৪০টি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই একটা নমুনা স্বরূপ এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

৩নং তালিকা। মাতলামির ফলে গ্রেপ্তার।

বৎসর	নগরগুলিতে	সমগ্রপ্রদেশে	লোকসংখ্যা
১৯১২	৮৭৫৮৬	৯৮৬৫১	
১৯১৩	৯৪৪৪৫	১০৪৯৩৬	
১৯১৪	৯৮৫১৫	১০৮১৮৫	
১৯১৫	৯৬৮৬৬	১০৬১৪৬	৩৬৯৩১০০
১৯১৬	১০৭২৯৫	১১৬৬৫৫	
১৯১৭	১১৮১৪৬	১২৯৪৫৫	
১৯১৮	৮৫৪৪৭	৯২৮৩৮	
১৯১৯	৭২৮৪৯	৭৯২১২	
১৯২০	৩৪৪১৫	৩৭১৬০	৩৮৫২৩২৬
১৯২১	৫৪২৫২	৫৯৫৮৪	
প্রথম ৭ বৎসরের (১৯১২—১৮) গড়পড়তা	৯৮৩২৮	১০৮১২৩	

মদ্যবর্জ্জিত দুইবৎসরের (১৯২০—২১) গড়পড়তা

		৪৩৩৩৩	৪৮৩৭২	
শতকরা		৫৫	৫৫	হ্রাস
৭ নং টেবল—		১৯১২—১৮	১৯২০—২১	হ্রাস শতকরা
স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার	সকল কারণে	১২৯৪৩	৭৮৮৪	৩৯
	মাতলামির জন্য	৭২৭৩	২২৫১	৬৯
৯ নং টেবল—				
জেলে কয়েদী	মোট	৫৮৩৯	২৮১৯	৫২
	স্ত্রী	৭৩২	২৯১	৬০
১৮ নং টেবল—				
মদ্যপানের ফলে মৃত্যু	প্রত্যক্ষ	২২৫	৭৮	৬৫
	খুনজখম	১০৭	৯৩	১৩
	আত্মহত্যা	৪৮৯	৪৩২	১১
কুৎসিত পীড়া		১২৭৫৬	৮৩১৬	৩৫

এই সকল তালিকা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, মাত্র দুই বৎসর মদ্য বর্জ্জিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে।

মাসাচুসেট্‌স প্রদেশে যে সকল সমাজ-সেবক বা তাঁহাদের সঙ্ঘ (social worker বা social service association) আছেন, তাঁহারাও মিস ষ্টডার্ডের সমর্থন করিতেছেন যে, মদ্য বর্জ্জিত হওয়ায় গরীব লোকদের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। মদ্যপান জনিত দারিদ্র্য অনেকটা কমিয়াছে। অনেক মাতাল এখন শোধরাইয়া গিয়াছে—তাহাদের শরীর-মনের অবস্থা পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অনেকটা ভালই। বোষ্টন নগরস্থিত মুক্তি ফৌজের শাখার রিপোর্টে প্রকাশ, তাঁহাদের কাছে যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিত, তাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মদ্যপানের দরুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। মদ্যপান নিসিদ্ধ হইবার পর হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকে আর সাহায্য লইতে আসে না।

কারণ, মদ্য বর্জ্জন করায় তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা ঘুচিয়াছে। মদ্যপান নিষেধ সূচক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ ছিল মদ্যপান করিবার জন্য অর্থের অপব্যয়। কাজেই তাহাদিগকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য দাতব্য সমিতিগুলির নিকটে সাহায্য-প্রার্থী হইতে হইত। এখন এই শ্রেণীর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র শতকরা দুইজন সাহায্যের জন্য অপরের কাছে হাত পাতিতে বাধ্য হয়। বাকী শতকরা ৯৮ জনের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারিবারিক জীবনে সুখ দেখা দিয়াছে।

গর্ভিণী-আক্ষেপ

বা

"পুয়ের পেরাল্ এক্ল্যাম্পিসিয়া।"

(Puerperal Eclampsia.)

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্।

তিনটি রোগিনীর বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের আরম্ভ করিব—পরে, বক্তব্য বলিব।

১। রোগিনী শ্রীমতী পদ্মবালা দাসী; বয়ক্রম ১৮ বৎসর। স্বাস্থ্য অতি সুন্দর। ১৩ বৎসর বয়সে ঋতু প্রগমে আরম্ভ হয় এবং বরাবরই নিয়মিত সময়ে ও পরিমাণে হইয়াছে। বাল্যাবস্থায় স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। নয় মাস কাল গর্ভবতী অবস্থার বিবরণ এই :—

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি হইতে তিনি এই এই লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেন :—প্রস্রাবের ক্রমিক অল্পতা, অম্লাধিক্য, শিরঃপীড়া, রাত্রে নিদ্রার মধ্যে চমকাইয়া উঠা। এ সকল লক্ষণ উপর্য্যুপরি কিছুদিন ধরিয়া বুঝিতে পারিলেও, তিনি তৎসম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও বলেন নাই; পরে রোগের অবস্থায় জিজ্ঞাসা করায় এ সকল কথা বাহির হইয়া পড়ে।

৮ই জানুয়ারি প্রাতঃকালে শিরোবেদনা অধিক হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে বিবমিষা থাকায়, হোমিওপ্যাথিক নক্সভমিকা ৬ ক্রম ২ মাত্রা সেবন করেন। বেলা ১০ টায় একবার কঠিন দাস্ত হয় এবং মাথাধরার বৃদ্ধি অনুভূত হয়। বেলা ১ টার সময়ে কলতলায় মুখ ধুইতে যাইয়া সেখানেই হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং অজ্ঞানাবস্থায় হস্ত পদের আক্ষেপ (convulsion) হইতে থাকে ও মুখ হইতে সফেন লালা নির্গত হয়। তদবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ইপিকাক ২ মাত্রা খাওয়ান হয়। বেলা ৩৷৷০ টায়, রোগিনীর অচৈতন্যাবস্থায়, বিছানায় মূত্রত্যাগ হয়। বেলা ৫৷৷০ ঘটিকায় হোমিওপ্যাথিক ওপিয়ম পড়ে এবং রাত্রি ৮টায় রোগিনীর প্রস্রাবের পীড়া বোধ হয়, কিন্তু প্রস্রাব কিছুই হয় নাই। রাত্রি ৯৷৷০ টায় চোয়াল ধরিয়া যায় (lockjaw) এবং সারা রাত্রি রোগিনী অস্থির থাকেন।

৯ই জানুয়ারি—প্রাতে ২ আউন্স প্রস্রাব হয়; প্রস্রাবের ১/৮ অংশ অ্যালবুমেন এবং প্রস্রাবটি অত্যন্ত ঘোলা, জ্বর নাই। কিন্তু রোগিনীর অর্দ্ধ-চৈতন্য অবস্থা। বৈকালে জ্বর ৯৯.৪; নাড়ী—মিনিটে ১৪০ বার

স্পন্দিত, অসমগতি (irregular) এবং অতীব কোমল (soft)। জিহ্বা শ্বেতবরণাচ্ছাদিত ময়লাযুক্ত। পিপাসা অতীব তীব্র। সারাদিনে কয়েক ফোঁটা মাত্র প্রস্রাব হইয়াছিল এবং দাস্ত একবার হইয়াছিল। রাত্রি দশ ঘটিকায় প্রসব বেদনা অনুভূত হইয়াছিল।

১০ই জানুয়ারি—ভোর ৫ ঘটিকায় পালসেটিলা (হোমিওপ্যাথিক মতে) পড়ে। এই দিনে বেলা টার সময়ে আমি প্রথম আহূত হই এবং বেলা প্রায় সাতটায়, একটি মৃত বালিকা প্রসূত হয়। এই বালিকার হস্ত-পদাদি নীলাভ। সেই লাইকার অ্যামনিয়াই বা প্রসবের সময়ে যে জল বাহির হয় সেটা দুর্গন্ধযুক্ত; ফুলটি আস্ত পড়িয়াছিল, প্রসবের সময়ে মৃদু একটি আক্ষেপ (fit) হয়। যোনিদ্বারে কোনও রকমের দেওয়া হয় নাই। তখন হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত প্রস্রাব না হওয়ায়, বেলা ৫ ঘটিকার সময়ে এই এই প্রেস্কৃপসন্ করি—

১নং

R.
Calomel Gr V
Jalapin Gr V mix.

রাত্রি ৯ টায় শয়নকালে অল্প জলের সহিত সেবনীয়।

২নং

R. "Tabloid" Thyroid Gland (gr 2½ each) (B. W. & co)—১ শিশি।

এই একটি করিয়া চাক্তি, প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর নিম্নলিখিত মিকশ্চারের সহিত সেবনীয়।

৩নং

R.

Liqr. Ammon, Citrates	dr. iii
Spt. Etheris Nitrosi	m. xx
Tinc. Digitalis	m. ii
Sodii Phosphas	gr. xv
Decoc. Scoparii	ad. 1 oz

Mix pt. Mist J. send 8 such.

তিন ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

৪নং

R. "Soloid" Saline (Normal) 1 Phial.
(B. W & Co).

এক পাইণ্ট ফুটন্ত জলে ২ চাক্তি দ্রব করিবে। ঐ জল শীতল করিয়া মুহুর্মুহুঃ পান করাইবে।

পথ্য :—ঐ ৪নং জল, সোডার জল effervescent soda water; জল পান করিতে না চাহিলেও সারাদিনে রাত্রে অন্ততঃ এক বোতল ঐ জল পান করাইতেই হইবে। তিন ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প করিয়া দুধ ও সোডার জল একত্রে মিশাইয়া সেবনীয়।

অন্যান্য ব্যবস্থা :—প্রস্রাব হইলেই ধরিয়া রাখিবে; যোনিদ্বারে যখনই "নেকড়া" বদলাইবার সময় হইবে, আইজল (Izal 1 in 200) লোসন দিয়া ধুইয়া তবে absorbent gauze দিয়া বাঁধিবে।

ঐ ১০ই জানুয়ারি তারিখে, বৈকালে জ্বর হয় ৯৯.৪, এবং রাত্রি ১১৷৷০ টায় একটি জোরে আক্ষেপ হয়। রাত্রি বারোটার সময়ে শলা দ্বারা ২ আউন্স ঘোলা প্রস্রাব বাহির করা হয়।

১১ই জানুয়ারি।—জ্বর সমস্ত দিন ৯৭.৮ ছিল ও সন্ধ্যায় ৯৯ হয়। রোগিনী চঞ্চল ও বিনিদ্র হওয়ায়, এই ঔষধটি বৈকালে দেওয়া হয়।—

R.

Magnesii sulphatis	dr. iij
Chloral Hydras	dr. ss
Pot. Bromidi	gr. xx
Syr. Simplex	dr. ss
Aq. Camphoræ	ad. i oz

Mix. To be taken at once (10 A. M.) and again at 6 P. M. তাহার ফলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগিনী সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে চার ঘণ্টা ঘুমান; চক্ষুর্দ্বয় রক্তাভ। সে ঘুম একটানা ৩০।৪০ মিনিটের বেশী স্থায়ী নহে, এবং ঘুম ভাঙিলেই রোগিনী ক্রন্দন করেন, নতুবা ভয় পাওয়ার লক্ষণ দেখান।

ভোর হইতে প্রাতে ৮ টার মধ্যে তাঁহার তিনবার আক্ষেপ হইয়া গিয়াছিল; প্রাতে ৮ টার পর হইতে আর আক্ষেপ হয় নাই বটে; কিন্তু রোগিনী যখন তখন কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। ২৪ ঘণ্টায় ২৯ আউন্স প্রস্রাব ও ৪ বার পাতলা দাস্ত হইয়াছিল। এই দিনে বৈকালবেলায়, ১০ই তারিখের ৩নং প্রেস্কৃপসনের বদলে এই প্রেস্কৃপসন করা হয়—

R.

Liqr. Am. Citrates	dr. iv
Tr. Digitalis	m. iij
Spt. Etheris Nitrosi	m. xx
Spt Juniperii	dr. ss
Decoc. scoparii (Fresh)	ad 1 oz

One every 3 hours.

এবং রোগিনীর নিদ্রার জন্য রাত্রিকাল হইতে এই মিকশ্চার বদল করা হয়—

R.

Bromidia	dr. ss.
Magnes. Sulph.	dr. i
Chloral Hydras	dr. ss.
Syrup Aromat.	dr. p.
Aq. Camphore	ad oz 1

Mix. To be taken at once (9. p.m.)

১২ই জানুয়ারি।—নাড়ী মিনিটে ১৩৫ বার স্পন্দিত। জ্বর সারাদিন ধরিয়া ৯৯°। প্রস্রাব অনেকবার একটু একটু করিয়া হইয়াছিল; ক্রমশঃই রং পরিষ্কার (অর্থাৎ রং ক্রমশঃ স্বচ্ছ এবং জলবৎ)। বারম্বার পাতলা দাস্ত হইয়াছিল। জিহ্বা সরস (moist) বটে কিন্তু পুরু সাদা ময়লাযুক্ত। স্তনে ব্যথা অনুভূত হইতেছিল। জরায়ু বৃহদায়তন ও ব্যথাযুক্ত। লোকিয়া বা রক্তস্রাব পরিমাণে সামান্য ও সামান্য দুর্গন্ধযুক্ত। চৈতন্য কথঞ্চিৎ হইয়াছিল। এবং সমস্তদিন বিনিদ্র থাকায় সন্ধ্যায় Bromidia dr. দেওয়া হয়; তাহাতে নিদ্রা না হওয়ায়, রাত্রি ৯ টার ½ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক বিধানে দেওয়া হয়। তাহার ফলে রাত্রি এগারটা হইতে রোগিনী সারারাত্রি নিদ্রা যায়—কিন্তু সারা রাত্রে আর প্রস্রাব হয় নাই। এইদিন সন্ধ্যাবেলায় ১১ তারিখের প্রস্রাব কারক মিকশ্চারটি হইতে Tr. digitalis উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৩ই জানুয়ারি।—অনেকবার পরিষ্কার প্রস্রাব হইয়াছিল। প্রস্রাবের মধ্যে অ্যালবুমেন প্রায় নাই বলিলেই হয়। জেলাপ (Pulv jalap co. dr.) দেওয়ায় অনেক বার জলবৎ তরল দুর্গন্ধময় দাস্ত হইয়াছিল। নাড়ী মিনিটে ১৩০ বার স্পন্দিত। আজ চক্ষু ও জ্ঞান বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। জ্বর সারাদিন ৯৯°৪। আজ খাদ্য পরিবর্ত্তন করা হইল—হর্লিকস্ মল্‌টেড্ মিল্কফুড, বেদানার রস, ছানার জল, সোডার জল, ডাবের জল। বৈকালে অতি মাত্রায় পেট কামড়ায় ও গা বমি করে; তজ্জন্য এই ঔষধটি দেওয়া হয়:—

R.

Salol	gr. viii
Spt. Chloroformi	m. xv
Syr. Zingiberis	m. xx.
Sodii Bicarb	gr. x
Tt. Card. Co.	m xx

Aq. camphoræ ad dr. 1. mix. Send 6 such. One every 2 hours.

১৪ই জানুয়ারি।—সমস্ত দিনরাত গায়ের উত্তাপ ৯৮°; নাড়ী মিনিটে ১০৪ বার স্পন্দিত। জ্ঞান বেশ পরিষ্কার আছে—অনর্থক ক্রন্দন নাই। লোকিয়ার বা রক্তে দুর্গন্ধ নাই, জরায়ু বেশ ছোট হইয়াছে, তাহার ব্যথাও নাই। একটা seidlitz powder দুপুরে দেওয়ায় ৫ বার পাতলা দাস্ত হইয়া গিয়াছে।

আজ হইতে Liqr Ergotae Purif. (Hewlett) 3i মাত্রায় দুইবার দিতে আরম্ভ করা গেল। অপর সমস্ত ঔষধ বাতিল করিয়া ঐ আর্গট এবং নিম্ন লিখিত মিকশ্চার দেওয়া গেল:—

R.

Liqr. Am. Citrates	dr. iii
Pot. Citras	gr. x
Spt. Juniperii	dr. ss
Syr. Aromat.	dr. ss
Decoc. Scoparii (fresh)	add oz 1

One dose every 3 hours.

১৫ই জানুয়ারি। লোকিয়ার মাত্রা সামান্য বাড়িয়াছে এবং একটা ক্ষুদ্র কাল রক্তদলা বাহির হইয়াছে। স্তনের দুধ কমিতেছে, প্রস্রাবে এখনো সামান্যভাবে অ্যালবুমেন পাওয়া যায়। প্রস্রাব ও বাহ্য বেশী হইতেছে। সারাদিন নিদ্রা হয় নাই। ক্ষুধা বোধ হইয়াছে। রাত্রে ঘুম বেশ হইয়াছে। বৈকালে সামান্য মাথা ধরিয়াছিল। আজ হইতে প্রত্যহ প্রাতে Kutnow's powder 3ii দেওয়া হইতেছে।

১৮ই জানুয়ারি।—প্রত্যহই রাত্রে বেশ নিদ্রা হইতেছে। জিহ্বার অগ্র ও ধার পরিষ্কার হইয়াছে। মাথার ব্যথা নাই, ওভারির স্থানদ্বয় (তলপেটের দুপাশে) ব্যথাযুক্ত। লোকিয়া বা রক্ত কম এবং দুর্গন্ধ হীন। নাড়ী মিনিটে ৯৮ বার স্পন্দিত। গায়ের উত্তাপ ৯৭°। ক্ষুধা বেশ; লবণ ও ঝাল খাইবার স্পৃহা। প্রস্রাব বেশ হইতেছে। দুইদিন Kutnow's powder বন্ধ থাকায় দাস্ত হয় নাই। প্রথম দিনে (৮ই) পড়িয়া গিয়া আক্ষেপ হইবার কালে রোগিনী নিজ জিহ্বা কামড়াইয়া ক্ষত করিয়া ফেলেন; সেই ক্ষত সারিবার মত হইয়াছে।

১৯ জানুয়ারি।—এনিমা বা মলদ্বারে সাবান জল সাহায্যে দাস্ত করান হয়। সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখাইয়া গরম জলে গা মোছান হয়। পথ্য—বিস্কুট, ফলমূল পাউরুটির টোষ্ট, কর্ণফ্লাওয়ার, দুধ, ছানার জল, ডাবের জল, সোডার জল। ঔষধ আর্গট একবার করিয়া; অপর সকল ঔষধ বন্ধ।

২২ জানুয়ারি।—ভাত দিয়া বিদায়।

২। শ্রীমতী সুমতি, বয়ক্রম ১৬। এই তাহার প্রথম গর্ভ,—৯ মাসের। ১৯১১ সালের ৪, ৫, ৬ই জানুয়ারি তারিখে, হঠাৎ মাথা ধরিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সমস্ত শরীরে কোথাও পেশীর স্পন্দন বা "নাচ" অনুভব করেন নাই, বা প্রস্রাবের ক্রমিক হ্রাসও অনুভব করেন নাই। এবং দৃষ্টিরও কিছু বৈকল্য জানিতে পারেন নাই। বাহ্যেও বেশ পরিষ্কার হইত।

৭ই জানুয়ারি প্রাতে ৮ টায় "মাথাটা কেমন কেমন বোধ" হইতে লাগিল। সাড়ে ৮ টায় সর্ব্বাঙ্গে রীতিমত আক্ষেপ বা খেঁচনি হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ সময় হইতে বেলা ৫ টার মধ্যে ৮৯টি গুরুতর আক্ষেপ হয় এবং আক্ষেপের সংখ্যাতিরেকের সহিত চৈতন্যের ক্রমশঃ লোপ হইতে থাকে। প্রত্যেক আক্ষেপ ১ বা ১½ মিনিটকাল স্থায়ী; প্রথম তিনটি আক্ষেপ ১৫ মিনিট অন্তর এবং শেষের গুলি ১।১½ ঘণ্টা অন্তর হইতে থাকে। পদে বা অপর কোথাও স্ফীতি লক্ষিত হয় নাই। বেলা ১১॥০ টায় প্রথমে রোগিনীকে দেখিয়া অধস্ত্বাচিক প্রণালীতে ½ গ্রেণ মর্ফিয়া প্রয়োগ করি এবং যখনই আক্ষেপ হয় তখনই ক্লোরোফরমের ঘ্রাণ দিই। বেলা ১ টায় নাড়ী অসমগতি, মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত এবং অতীব চাপযুক্ত (high tension)। বেলা ১০ টার পর হইতে বাক্য রোধ হইলেও ঘাড় নাড়িয়া বেলা ৩।৪টা পর্য্যন্ত রোগিনী কথার উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন। প্রত্যেক আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর প্রবল ভাবে সঙ্কোচ হইতেছিল। বেলা ৫ টায় আরম্ভ করিয়া, ৬ টায় অস্ত্রোপচার সাঙ্গ করা হয়; সজোরে জরায়ু গ্রীবাকে প্রসারিত করিয়া সন্তান বাহির করা হয়। প্রসব কালীন ক্লোরোফরম দেওয়া হয়! পেরিনিয়ম ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রভূত রক্ত স্রাব হয়। অস্ত্রোপচার কালীন, ক্যাথিটারের সাহায্যে ১০ আউন্স স্বচ্ছ প্রস্রাব বাহির করা হয়। ঐ প্রস্রাবের ⅛ অংশ অ্যালবুমেন ছিল। অস্ত্রোপচারের পরে ১ ঘণ্টা আর আক্ষেপ হয় নাই। সন্ধ্যা সাতটায় রোগিনী ছটফট করিতে থাকে, এবং দন্তে দন্তে

সংঘর্ষণ করিতে থাকায়, ৳ গ্রেণ মর্ফিয়া পুনরায় অধিস্তাচিক বিধানে দেওয়া হয়। রাত্রি ৮ টায় ৫ গ্রেণ ক্যালমেল খাওয়াইয়া দেওয়া হয় এবং ৬ আউন্স Glucose দ্রব (১ পাইন্ট পরিশ্রুত জলে ১ আউন্স গ্লুকোজ) অন্ত্রপথে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং vaporole Pititrina (B. W. & co) একটা অধস্তাচিকরূপে দেওয়া হয়।

রাত্রি ৮ টায় রক্তস্রাবে "ন্যাকড়া" ভিজিয়া যায়। সেই সময়ে নাড়ী ১২০ এবং শ্বাস প্রশ্বাস ৩২ বার মিনিটে চলিতেছিল। রাত্রি ১১৷৷০ টায় রোগিনীর অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যু ঘটে।

৩। শ্রীমতী সরযূবালা, বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর। এই প্রথম গর্ভ, পূর্ণ নয় মাস। পূর্ব্বাপর স্বাস্থ্য বেশ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রেল ভোর বেলা ৪ ঘটিকায়, ঘুমাইতে ঘুমাইতে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ হইতে থাকে; আক্ষেপান্তে রোগিনীর চৈতন্যাপহরণ ঘটে। পরে, প্রাতে ৭ টায় দ্বিতীয়বার এবং ৯৷৷০ টায় তৃতীয়বার আক্ষেপ ঘটে এবং বেলা সাড়ে ১০ টায় ফর্সেপ্‌স্ সাহায্যে মৃত কন্যাকে প্রসব-দ্বারের বাহির করা হয়। ৪ ঘটিকা হইতে সমস্ত দিন রাতই রোগিনী অচৈতন্যাবস্থায় থাকে এবং ২।৩ দিন যাবৎ তাহার জ্ঞানোদয় হয় নাই। পরে ক্রমশঃ জ্ঞান হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রোগিনীর পূর্ব্বস্বাস্থ্য বেশ ছিল। এই ঘটনার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে হইতে, শিরঃপীড়া এবং বসিয়া থাকিলেও ক্ষণিকের জন্য যখন তখন চক্ষে অন্ধকার দেখা—ও গা বমি, এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার পরে রোগিনীকে ব্রোমাইড ও ক্লোরাল, এবং প্রস্রাব করার ঔষধ, তরল খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় প্রায় ১ মাস কালের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ হয়। তিন চার মাস পরে অকস্মাৎ রোগিনীর মুখ ফুলে ও প্রস্রাবে পুনরায় বেশী বেশী অ্যালবুমেন পাওয়া যায়; ১০।১২ দিন চিকিৎসায় রোগিনী সুস্থ হয়। এক বৎসরের পরে, পুনরায় প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাওয়া যায় (জানুয়ারি ৩রা ১৯০৯) তৎকালে তাহাকে এই ঔষধ দেই :—

R.

Tr. Ferri perchlor	m. x
Tr. Digitalis	m. v
Tr. Apocynam, cannab.	dr. ½

Decoc ; scoparii ad 1 oz mix 8 such. Thrice daily after food.

এই ঔষধ ১০।১২ দিন সেবন করার পরেই রোগিনী আরোগ্য লাভ করে। পরে ১৯০৯ সেপ্টেম্বরে রোগিনীর "বেরি বেরি" বা এপিডেমিক ড্রপ্সি (সংক্রামক শোথ) ব্যাধির আক্রমণ হয়। ঐ ব্যাধির ফলে রোগিনীর হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (dilatation of heart) ও চক্ষুর্দ্বয়ে দৃষ্টির লোপ হয়। রোগিনী এক কালীন অন্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে চক্ষু চিকিৎসার কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক চক্ষুর্দ্বয়ের পরীক্ষা করান হয়; তাঁহারা এক বাক্যে সকলেই বলিয়াছিলেন, যে, রোগিনীর গ্লকমা ও অ্যালবুমিন ইউরিকে রেটিনাইটিস্—উভয় দোষই ঘটিয়াছিল; তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে রোগিনীর কখনো পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে না। এই ঘটনার ৭ দিন পরে রোগিনীকে কোনও খৃষ্টানী Faith Healerএর নিকটে হইয়া যাওয়ায়, রোগিনীর দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আইসে; ঐ চিকিৎসকের নিকটে যাইবার পূর্ব্বে রোগিনী সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন, আসিবার সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে চক্ষুষ্মতী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার হৃৎপিণ্ডের বা প্রস্রাবের দোষের কিছুই হ্রাস হইল না। প্রায় মাসাবধি ভুগিয়া তিনি সুস্থা হয়েন। পরে অকস্মাৎ ১৯১০ সালের ১লা এপ্রেল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ৬ই এপ্রেল তারিখে রাত্রি ১ ঘটিকার সময়ে ১০৮° ফা, জ্বরে অচৈতন্যাবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন।

এইবারে একল্যাম্প্‌সিয়া সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুইচার কথা বলিব।

আজকাল ধারণা এই যে, খাদ্য হইতে উদ্ভূত প্রোটিড্ বা আমিষ জাতীয় কোনও পদার্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া একল্যাম্পসিয়ার সৃষ্টি করে। গর্ভের সময়ে ভুক্তদ্রব্যের যথারীতি পরিপোষণ ক্ষমতার (মেটাবলিজমের) ব্যতিক্রম ঘটে, অর্থাৎ যে খাদ্য খাওয়া যায় তাহার রীতিমত পরিপাক, তাহা হইতে মলের সৃষ্টি ও তাহার পুষ্টি সাধক অংশের শোষণ—এই সকল ক্রিয়ার এক কালীন ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। তাহার ফলে, শরীরে কোনও কোনও বিষের সৃষ্টি হয়, এবং সেই বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। যাহার প্রমাণ আমরা বমন, একল্যাম্প্‌সিয়া প্রভৃতিতে পাইয়া থাকি। সর্পবিষের (Foxalbumin) সহিত এই জাতীয় বিষের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইউরিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ কিছু নাই। এবং এই বিষটি অম্লাত্মক (acid) এই শেষের কথাটি স্মরণ করিয়া রাখা উচিত। দেহের মধ্যে নানা প্রকারের জীবাণুজ বিষের সহিতও এই বিষের সাদৃশ্য নাই, যে বিষের ক্রিয়ার ফলে একল্যাম্পসিয়া হইয়া থাকে।

সেই বিষ ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য হইতেই সৃষ্ট হয়—গর্ভ হওয়ার দরুণ স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রমের ফলেই সৃষ্ট হয়। একল্যাম্প্‌সিয়া ব্যাধি বড়ই মারাত্মক, কিন্তু ইহার আরম্ভ বড়ই আস্তে আস্তে ও অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। হয় ত গর্ভিনীর মুখমণ্ডল কিছু ফুলা ফুলা বোধ হইল, একটু পদদ্বয়ের স্ফীতিও হইল, তৎসঙ্গে কোষ্ঠ কাঠিন্য, শিরঃপীড়া, গা বমি, চোখে ঝাপসা দেখা বা কখনও কখনও ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার দেখা—এই ভাবেই এই দারুণ ব্যাধির সূত্রপাত হইয়া থাকে। পরে অকস্মাৎ আক্ষেপ বা চৈতন্যলোপ হইয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য যে, এই ব্যারামের অতি প্রাকাল হইতেই প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাওয়া যায়। ও রোগিনীর নাভীর চাপ খুব পড়ে। যদিও বেশীর ভাগ রোগিনীতে ঐ সকল সামান্য লক্ষণ হইতে ঐরূপ গুরুতর লক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তথাপি সময়ে সময়ে এমনও দেখা যায় যে গর্ভিনীর দেহে উহার কোনও লক্ষণ দেখা দিল না—মাত্র প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাওয়া গেল, তাহাও আবার হয় ত প্রসবের পরে। ঐ অ্যালবুমেন পাওয়ার জন্যই অনুমান করিয়া হইতে হইবে যে, রোগিনীর একল্যাম্পসিয়া হইয়াছিল।

সাধারণতঃ, গর্ভের ছয় মাস কাল গত না হইলে একল্যাম্পসিয়া হয় না। তৎপূর্ব্বে প্রকৃত ইউরিমিয়া হইতে পারে, যদি, পূর্ব্বাহ্ন হইতেই বৃক্কের পুরাতন ব্যাধি (Chronic kidney disease) বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যদি একল্যাম্পসিয়া ধরে, তবে শীঘ্রই প্রসবের সূচনা হয়। প্রসবান্তে অধিকাংশ স্থলে ঐ ব্যাধির সম্পূর্ণ শান্তি হয়। কিন্তু সকল সময়ে তাহা হয় না। [আমার প্রথম রোগিনীর বেলায় তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার এ যাবত তিন চারিটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে কিন্তু আর কোনও গর্ভে কোনও বাধা হয় নাই।]

কিন্তু যে স্থানে প্রসবান্তে ঐ ব্যাধির সম্পূর্ণ উপশম না হইল, সে স্থলে রোগিনী পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। আমার শেষোক্ত রোগিনীর বিবরণ পাঠে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, প্রস্রাবের কোন্ দোষ থাকিলে একল্যাম্পসিয়া উপস্থিত হইতে পারে? সাধারণতঃ, চিকিৎসকদিগের মধ্যে ধারণা আছে যে, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাইলেই, গর্ভিনীর বিপদের আশঙ্কা সূচিত হয়। কিন্তু জানা গিয়াছে যে, ছয়মাস্ বা ততোধিক কাল স্থায়ী যত গর্ভিনীর প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ২ জনের আক্ষেপাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে অ্যালবুমেন্ থাকিলেই একল্যাম্প্‌সিয়া সূচিত হয় না। তবে কি ২৪ ঘণ্টায় গর্ভিনীর প্রস্রাবে কতটা ইউরিয়া বা কতটা এমোনিয়া আকারে মোটামুটি নাইট্রোজেন বাহির হয়, তাহাই বিপদ-জ্ঞাপক?

না, তাহাও নহে। আমাদের আশঙ্কাসূচক তিনটি লক্ষণ একত্রে পাওয়া চাই—(১) প্রস্রাবে ক্রমাগতই অ্যালবুমেন্ পাওয়া গেলে (২) প্রস্রাবের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিলে এবং (৩) রক্তের চাপ (Blood pressure) বেশী থাকিলে। যদি ছয়মাস বা ততোঽধিক কালস্থায়ী রোগিনীর দেহে এই তিনটি লক্ষণ একত্রে পাওয়া যায়, তবেই বিপদের সমূহ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট হেতু হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি Eclampsism বলিয়া একটী নূতন বাক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐ বাক্যের অর্থ এই যে, নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলি ছমাস বা ততোধিক দীর্ঘ স্থায়ী কোন গর্ভধারিণীর দেহে লক্ষিত হইলে, সে গর্ভিনীর পক্ষে একল্যাম্পসিয়া অবশ্যম্ভাবী; সে লক্ষণগুলি যথা—

(ক) যে সকল লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও একল্যাম্পসিয়ার আক্ষেপ উপস্থিত হয় না:—(১) সারা দিনে যতটা প্রস্রাব হওয়া উচিত, তাহার পরিমাণের ক্রমিক হ্রাস; (২) প্রস্রাবে ক্লোরাইডের অনুপাতের ক্রমিক হ্রাস; (৩) প্রস্রাবে এই এই জাতীয় অ্যালব্যুমেনের উদয়—অ্যাস্‌ব্যুমোস্, পেপ্‌টোন্, অ্যাসিটো সলুব্‌ল্ অ্যালবুমেন (aceto soluble-albumen); (৪) প্রস্রাবে ইউরোবিলিনের আবির্ভাব এবং তৎসঙ্গে কামলার (Jaundice) উদয় (৫) শোথ।

(খ) যে যে লক্ষণাবলীর আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে:—(১) রক্তচাপের (Blood pressure) আধিক্য; (২) দৃষ্টি-বৈকল্য—সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে দৃষ্টির লোপ অথবা চক্ষের সম্মুখে যখন তখন বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় বোধ; (৩) শিরঃপীড়া (ক্রমাগত স্থায়ী) অথবা শিরোঘূর্ণন্, অথবা নিদ্রালুতা বা মানসিক অবসাদ; (৪) পাকস্থলীতে বেদনানুভূতি, (৫) শ্বাসকৃচ্ছ্রতা (হাঁপের মত ভাব)। (৬) কর্ণ কুহরে নানা প্রকারের কাল্পনিক শব্দবোধ, কাঁণ ভোঁ ভোঁ করা, (৭) শারীরিক পেশী বিশেষের আকস্মিক পক্ষাঘাত বোধ। উক্ত দশ বারো দফা লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তবে আক্ষেপের আবির্ভাব হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আক্ষেপ ব্যতিরেকেও একল্যাম্পসিয়া হইয়া থাকে। সে সকল রোগিনীদের মধ্যে কেহ অকস্মাৎ জ্ঞান হারাইয়া বসেন; কাহারো বা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুশূল অর্থাৎ দাঁতে মুখে শূল বেদনা উপস্থিত হয়; কেহ বা খেয়াল (hallucination) দেখেন, এই—সকল রোগিনীর প্রস্রাবে অ্যালবুমেন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং তাহাদের মূতদেহে সাধারণ একল্যাম্পসিয়াসূচক চিহ্নগুলিও বর্ত্তমান থাকে।

আক্ষেপের বর্ণনা।—রীতিমত একল্যাম্পসিয়া আক্ষেপের চারিটি স্তর অছে। সে গুলি এই:—

(ক) আভ্যুদয়িক অবস্থা (preliminary stage) অর্দ্ধ হইতে ১ মিনিটকাল স্থায়ী। এই অবস্থায়, চক্ষের পল্লবদ্বয় মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে থাকে (চোখনাচা); শিবনেত্র হইতে থাকে; নাশাগ্রের পেশীগুলির মন্দ মন্দ আক্ষেপ হইতে থাকে। শিরশ্চালন হইতে থাকে।

(খ) টনিক্ কুঞ্চনাবস্থা (একটানা শক্ত হওয়া)।—গর্ভিনীর সমস্ত শরীর শক্ত ও ধনুষ্টঙ্কার আকার গ্রহণ করে। মাথাটা বাম দিকে হেলিয়া পড়ে, ঘাড় বাঁকিয়া যায়, মেরুদণ্ড বাকিয়া যায়। চোয়াল সজোরে বন্ধ হয়, হস্তের মুঠি বন্ধ হয়, শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং রোগিনী প্রায়ই নিজ জিহ্বা দংশন করিয়া ফেলে। এই অবস্থা ১৫।২০ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী।

(গ) ক্লনিক্ কুঞ্চনাবস্থা (খেঁচুনি)।—এই অবস্থা কয়েক সেকেণ্ড কাল স্থায়ী। তাবৎ দৈহিক পেশীর আক্ষেপ হইয়া থাকে। মুখে "গাঁজা ভাঙে।"

(ঘ) অচৈতন্যাবস্থা।—আক্ষেপের সংখ্যার অনুপাতে ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে; অর্থাৎ যে

স্থলে ঘন ঘন আক্ষেপ হয় সেই স্থলে অচৈতন্যাবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

বারম্বার আক্ষেপ হইলে, এই এই কুফল গুলি ক্রমশঃই দেখা দেয়:—

(১) হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য।—প্রথমে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যার (quick pulse) বৃদ্ধি হইতে থাকে; পরে নাড়ী অলস-গতি হইয়া বন্ধ হইয়া আসে (slow pulse).

২) ফুসফুসাভ্যন্তরে শৈরিক রক্তাধিক্য।—বারম্বার আক্ষেপের ফলে এবং হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশতঃ ফুসফুসে রক্ত জমিয়া যায়। এবং গর্ভিনীর অচৈতন্যাবস্থায় মুখের লালা শ্বাস পথে নীত হইয়া "অ্যাস্‌পিরেসন্ নিউ মোনিয়ার" সৃষ্টি করে। যে পরিমাণে ফুস ফুসের বিপদ ঘনাইয়া আসে, সে অনুপাতে হৃৎপিণ্ড ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

(৩) করোটি গহ্বরাভ্যন্তরে ধমনীছেদ (মাথার শির ছিড়িয়া যাওয়া)। ধামনীক রক্তচাপের (rise in arterial blood pressure) আধিক্যবশতঃ এবং মস্তিষ্কের মধ্যে বিষ সঞ্চালনের ফলে, মাথার ভিতরে ধমনী যখন-তখন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে।

(৪) জ্বরাধিক্য।—ক্রমশঃ টেম্পারেচার ১০৪° বা ১০৫° ডিগ্রী উঠিতে পারে।

(আগামী বারে সমাপ্য)।

গোবর গুহ।

এক সময়ে লেপ্টেন্যাণ্ট সুরেশ বিশ্বাসের নাম বাঙ্গলা দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দেশে-বিদেশে বাঙ্গালী জাতির বদ্‌খ্যাতি রটিয়াছিল যে, বাঙ্গালী জাতি নির্বীর্য্য, ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি। যাহারা এই কথা রটাইয়াছিল, তাহাদের কি উদ্দেশ্য, কি স্বার্থ ছিল, তাহা না জানিয়া শুনিয়াই আমরা বেদ-বাক্যের ন্যায় এই কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এবং মনে করিতাম, আমরা সত্য সত্যই তবে বুঝি ভীরু, কাপুরুষ, নির্বীর্য্য জাতি। লেপ্টেন্যাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস আমাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস ঘুচাইয়া দেন।

সুরেশ বিশ্বাস তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের কাছে, চলিত কথায়, ডানপিটে বলিয়া পরিচিত ছিলেন। একদিন কি খেয়ালে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। তিনি কোথায় গেলেন, তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিল—কেহই কিছু জানিল না। কয়েক বৎসরের পর সংবাদ আসিল যে, সুরেশ বিশ্বাস ইয়োরোপের এক দেশের সেনাদলের লেপ্টেন্যাণ্ট হইয়াছেন। নিঃসহায়, নিঃসম্বল বাঙ্গালী যুবক কপর্দ্দকহীন অবস্থায় সুদূর ইয়োরোপে গিয়া, নিজের চেষ্টায় সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়া, সেই দেশের সেনাগণের সঙ্গে সমকক্ষতা করিয়া, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, অবশেষে সেই সেনাদলে লেপ্টেন্যাণ্টের পদ লাভ করেন। একে তিনি বিদেশী, তাহার উপর তিনি ভীরু, কাপুরুষ, বীর্য্যহীন বাঙ্গালী। তাঁহার পক্ষে এই সেনানীর পদ লাভ তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে। কিন্তু লেপ্টেন্যাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারকেও জাগ্রত সত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইয়োরোপ যোদ্ধার জাত। সেখানে লেপ্টেন্যাণ্ট

সুরেশ বিশ্বাসের ন্যায় সহস্র সহস্র লেপ্টেন্যাণ্ট আছেন। সুতরাং ইয়োরোপে সুরেশ বিশ্বাসের কার্য্যে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁহার স্বদেশ—বাঙ্গলাদেশে ইহা তৎকালে অভূতপূর্ব্ব, অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। বিদেশে সুরেশ বিশ্বাসের কার্য্যে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইয়াছিল কি না, জানি না,—না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালা দেশে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাঁহার স্বজাতীয় লোকেরা যথেষ্ট আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী জাতি ভীরু, কাপুরুষ, বীর্য্যহীন—আমাদের এই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। বঙ্গ-কবি তাঁহার স্বজাতির উদ্দেশে গাহিয়াছিলেন—

"ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি!"

সে অপবাদ লেপ্টেন্যাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তার পর বহু বৎসর আর বাঙ্গালীর বীর্য্যবত্তা, সাহস, পুরুষত্বের পরিচয় দিবার কোন সুযোগ ঘটে নাই। কেবল এইটুকু জানা গিয়াছিল যে, লেপ্টেন্যাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস ইয়োরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজীল দেশে গিয়া তত্রত্য সেনাদলে কর্ণেলের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

অবশেষে গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী-জাতির ডাক পড়িল। প্রথমে বাঙ্গালী যুবকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আহতগণের সেবা কার্য্যের জন্য গমন করেন। সেই কার্য্যে তাঁহারা যথেষ্ট শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দেওয়ায়, বাঙ্গালী যুবকগণকে লইয়া ৪৯ সংখ্যক "বাঙ্গালী পল্টন" গঠিত হয়। এই বাঙ্গালী পল্টন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালীজাতি সাহসে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পৃথিবীর অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। বাঙ্গালী পল্টন দেখাইয়াছেন যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইলে, এই ভীরু কাপুরুষ ভেতো বাঙ্গালীও পৃথিবীর অপর সকল সাহসী, বীর্য্যবন্ত, রণকুশল জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ। বাঙ্গালীর ভীরুতা অপবাদ ঘুচিয়াছে বটে, তথাপি কিন্তু বাঙ্গালীদের লইয়া স্থায়ী কোন সেনাদল গঠিত হইল না,—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আজ আবার একটী যুবক দেশ-বিদেশে বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ মল্লগণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই স্বনাম-ধন্য, ক্ষণজন্মা যুবকটী আর কেহই নহেন,—কলিকাতা দর্জিপাড়ার প্রসিদ্ধ গুহ বংশীয় গোবর গুহ, ওরফে শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ গুহ বি-এ। আত্মীয় স্বজনের কাছে, বন্ধু-বান্ধব মহলে তিনি সাধারণতঃ গোবর বাবু নামে পরিচিত।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক বলিলে আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা বড় প্রীতিপ্রদ নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-যন্ত্রের পেষণের কল্যাণে, উচ্চ শিক্ষালব্ধ যুবক বলিলেই ক্ষীণজীবী, চশমাধারী, কুব্জপৃষ্ঠ, স্থূলদেহ একটী মানবকের চিত্র আমাদের মানস ফলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই সকল যুবকের এক একজন এক একটী বিদ্যার জাহাজ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের স্বাস্থ্য অতি ক্ষীণ, দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল; চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া লইলে একেবারে অন্ধ বলিলেও চলে। শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ গুহও শিক্ষিত যুবক; কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত দলভুক্ত নহেন। তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। তিনি তাঁহার বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন। গুহ বংশের অন্ততঃ তিন পুরুষ বাহুবলের চর্চ্চা করিতেছেন। যতীন্দ্র গুহ উচ্চ শিক্ষালাভ করিলেও বাহুবলের চর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। সেই বাহুবলের চর্চ্চার কল্যাণেই আজ তিনি ভুবন-বিখ্যাত বীর। ইয়োরোপ; আমেরিকায় তিনি আজ যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতিরও সেইরূপ গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজ আমরা এখানে সেই

বীর-পুরুষের বীরত্ব কাহিনীর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গোবর বাবু ওরফে যতীন্দ্র গুহ দর্জ্জিপাড়ার বিখ্যাত গুহ বংশের সন্তান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহুবলের চর্চ্চা এই বংশের একটী বিশেষত্ব। যতীন্দ্রের পিতামহ অম্বিকাচরণ গুহ ওরফে অম্বু-গুহ বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। গোবরের খুল্লতাত ক্ষেত্রচরণ গুহ অথবা ক্ষেতু গুহও পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাহুবলের চর্চ্চায় জাতির হিসাবে পাঞ্জাবীগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠতর; পাঞ্জাবে অনেক বিখ্যাত পালোয়ান জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই পাঞ্জাবী লোক-প্রসিদ্ধ পালোয়ানগণের মধ্যে অনেকেই অম্বু গুহ ও ক্ষেতু গুহের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহারা অনেক বিখ্যাত পাঠান পালোয়ানগণকেও মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। যতীন্দ্র বাবুও পিতামহ ও খুল্লতাতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

যতীন বাবুর বয়স বেশী নয়। ১৮৯২ সালে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং এখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসরের বেশী নয়। কলিকাতার রিপন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন, এবং তথায় পুনরায় কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বহু-ভাষাবিৎ। শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য তুলনীয়। মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ শতমুখে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও রাজনীতি জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সমতুল্য বলিয়া গণ্য। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশীলতা ও যুক্তি সহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার জন্য তুলনীয় সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি ইয়োরোপের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সকল দেশের ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তত্রত্য প্রধান প্রধান বহু জাতির শিল্পকলা ও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছেন।

এ সকল ত গেল তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয়। তিনি যতটা জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিলেও আজকালকার বাজারে যে কোন বাঙ্গালী যুবক নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারেন। এবং এই অর্দ্ধেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেই তাঁহার এত সময় লাগে ও এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, আর কোন বিষয়ের চর্চ্চা করিবার তাঁহার অবসর থাকে না। কিন্তু কর্ম্মযোগী গোবর বাবু এতটা মানসিক পরিশ্রমের পরও ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালেই তিনি পঠদ্দশাতেই নিয়মিত ভাবে উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম করিতেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম পালোয়ান-দিগকে পরাস্ত করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা ১৯১৩ সালের ঘটনা। এই সময়ে কোহ্লাপুরের মহারাজ তাঁহার বীরত্ব দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে অনেক বহুমূল্য উপহার প্রদান করেন। ইহার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করেন।

জ্ঞানার্জ্জন তাঁহার বিলাত যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, বিলাতে অবস্থিতি কালে রীতিমত লেখাপড়া করিতে করিতেই তিনি ব্যায়াম-চর্চ্চাও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি সেখানে কয়েকজন বিখ্যাত পালোয়ানকে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে ইংল্যাণ্ডের তদনীন্তন শ্রেষ্ঠ পালোয়ান জানি এসেলের সঙ্গে তাঁহার কুস্তি হয়। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি "বৃটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়নশিপ" লাভ করেন। তার পর তিনি ক্রমে ক্রমে জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ান কার্লসকট, স্কটল্যাণ্ডের জিমি ক্যাম্বেল, বেলজিয়মের হেনসন প্রভৃতি বিখ্যাত ও নামজাদা পালোয়ান-গণের সঙ্গে কুস্তি করেন। জার্ম্মাণ পালোয়ানকে

তিনি দুই ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে পরাজিত করেন। অপরাপর সকল ইয়োরোপীয় পালোয়ানও তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে।

ইয়োরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে গোবর ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ১৯২০ সালে তিনি পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন। এবার তিনি ইয়োরোপে না গিয়া আমেরিকায় গমন করেন, এবং তত্রত্য শ্রেষ্ঠতম পালোয়ানগণকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে আবার ইয়োরোপে আসিয়া তিনি ইটালীর প্রসিদ্ধ পালোয়ান রাণাটো গারভিলি, ইংল্যাণ্ডের ভুবন-বিখ্যাত স্যাণ্ডো, প্রসিদ্ধ পালোয়ান ষ্টেচার এবং বুলগেরিয়ার সুবিখ্যাত জন গ্রাণ্ডচিনকে পরাস্ত করেন। ষ্টেচারের সঙ্গে তাঁহার একঘণ্টা ১৭ মিনিট ও গ্রাণ্ডচিনের সঙ্গে ৪৩ মিনিট লড়াই হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্কণ্টজ, হেণ্ডারসন, টমি ডেবাঙ্ক, বেইলি, উইল্‌কি, জিথকো, গারডিনি, স্যানটেড, রোমানো, লিউইস, গ্রেণোভিচ প্রভৃতি কত পালোয়ানের সঙ্গে যে তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সকল সংবাদ এখনও এদেশে আসিয়া পৌছে নাই। বলা বাহুল্য, এই সকল পালোয়ানই নামজাদা এবং সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত; ইঁহারা সকলেই গোবরের কাছে পরাজিত হন। গোবর এখন সমগ্র পৃথিবীতে অদ্বিতীয় মল্লবীর। এখন আর ভয়ে কোন পালোয়ান তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িতে চাহে না।

গোবরের সম্বন্ধে আমেরিকান সংবাদপত্রসমূহে ব্যক্তিগত ভাবে এবং তাঁহার মল্লক্রীড়ার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে অনেক বিচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সকল বিবরণ বড় কৌতুককর ও চিত্তাকর্ষক। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ তাহার ও কিছু কিছু পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়।

মল্লযুদ্ধের সময় যুদ্ধের কতকগুলি নিয়ম ও সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হয়। কয়েকজন মধ্যস্থ সেই সকল নিয়ম ও সর্ত্ত পালিত হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন এবং কোন্ পক্ষের জয় ও কোন্ পক্ষের পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা মধ্যস্থগণই করিয়া থাকেন। মল্লদের মধ্যে কেহ যুদ্ধের নিয়ম বা সর্ত্ত লঙ্ঘন করিলে মধ্যস্থগণ তাঁহাকে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা করেন। মধ্যস্থগণ নিরপেক্ষ হইলে অবশ্য সুবিচারই হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যস্থগণ কোন একজন মল্লের পক্ষপাতী হইলে অনেক ক্ষেত্রে সুবিচার হয় না,—মধ্যস্থেরা অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রিয়পাত্রকেই জয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন।

১৯২১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার কানসাস নগরে লিউইসের সঙ্গে গোবরের কুস্তি খেলা হয়। এই যুদ্ধে প্রথমবার গোবর পরাস্ত হন। দ্বিতীয়বার তিনি জয় লাভ করেন। কিন্তু তৃতীয়বার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গোলমাল করায় জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। কিন্তু মধ্যস্থগণ সে দিন গোবরকে পরাজিত বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু পরদিন অবিসম্বাদিত রূপে নির্দ্ধারিত হয় যে, লিউইস খেলার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অসদুপায় অবলম্বন করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেইজন্য বিচারকেরা অবশেষে গোবরকেই প্রকৃত জয়ী বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন।

আমেরিকার শিকাগো সহরের জন হেকেনস্মিথের সঙ্গে যখন গোবরের কুস্তি খেলা হয়, তখন এই চুক্তি হইয়াছিল যে, গোবর এক ঘণ্টার মধ্যে হেকেনস্মিথকে হারাইয়া দিবেন। স্থান শিকাগো। রঙ্গক্ষেত্রের চারিদিকে সহস্র সহস্র দর্শক—সকলেই হেকেনস্মিথের স্বদেশবাসী; সুতরাং স্বভাবতঃই হেকেনস্মিথের বিজয়কামী। মধ্যস্থরাও বলা বাহুল্য, হেকেনস্মিথের এক-জাতি-ভাই।

যথারীতি খেলা আরম্ভ হইল। হেক ও গোবর দুই জনেই পরস্পরের উপর তাঁহাদের জানিত কুস্তির সকল রকম কৌশল ও প্যাচ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হেকের একটা সুবিধা এই ছিল যে, সহস্র সহস্র দর্শক তাহার পক্ষে থাকিয়া নানা উৎসাহসূচক

বাক্যে তাহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু গোবর একা—তাঁহার পক্ষে একটী কথা বলিবার কেহ ছিল না। সে যাহাই হৌক, ৩৭ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যে গোবর হেকেনস্মিথকে এমন সুন্দর কৌশলে চিৎ করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার জয় অস্বীকার করিবার কোন উপায় রহিল না। হেকেনস্মিথের পরাজয়ে দর্শকেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গোলমাল আরম্ভ করিল। কিন্তু গোবরের জয় এমন সুনিশ্চিত হইয়াছিল যে, নিতান্ত অন্যায় না করিলে তাহা নাকচ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই দর্শকেরা আর বেশী বাড়াবাড়ি করে নাই।

আইল্যাণ্ড গ্রোভ পার্কে টুট্‌সমণ্ড নামক পালোয়ানের সঙ্গে গোবরের কুস্তি খেলা হয়। সে খেলার এই সর্ত্ত ছিল যে, তিনবার খেলা হইবে; এবং তৃতীয় বারের খেলায় যে জিতিবে সেই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হইবে।

প্রথম বাজীর খেলা আরম্ভ হইল। চার মিনিট ১০ সেকেণ্ড পরে মণ্ড গোবরকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া জয়লাভ করিলেন। পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর দ্বিতীয় বাজীর খেলা আরম্ভ হয়। উভয়েই নানা রকম কুস্তির প্যাঁচ কষিয়া পরস্পরকে কাবু করিবার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বাজীর খেলা আরম্ভ হইবার পর ২৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ড বাদে গোবর প্রথমবার মণ্ডকে চিৎ করিয়া জয়ী হইলেন। দশ মিনিট বিশ্রামান্তে তৃতীয় বাজীর খেলা আরম্ভ হইল। উভয় পালোয়ানই প্রাণপণ করিয়া পরস্পরকে হারাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক একবার গোবর প্রায় পরাজিত হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন, এবং শেষ বাজীর খেলা আরম্ভ হইবার ১৩ মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড পরে এবারও গোবর মণ্ডকে চিৎ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং তাঁহারই জয় হইল।

গোবর গুহের সম্মুখে সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন ও সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করিয়া লইবেন,—তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যেন আমরা গোবর গুহকে দেখিতে পাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

(১) মানুষের স্নেহের বৃদ্ধি সাধারণতঃ আঠার বৎসর পরে আর হয় না। ব্যায়ামাদির ফলে শরীরের কিছু বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলে বা অন্য প্রকার কারণে সে বৃদ্ধি কমিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ায়।

(২) হলুদে রঙ্গের প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল থাকে—ইহাই বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত।

(৩) যাহাদের মন সর্ব্বদাই সামান্য কোন কারণে বিরক্ত হয় তাহারা প্রায়ই মোটা হইতে পারে না। রোগা লোকের মেজাজ প্রায়ই খিটখিটে বা খারাপ।

(৪) বিলাতের বড় বড় ডাক্তারেরা বলেন—যদি কেহ গালের নীচে হাত রাখিয়া নিদ্রা যায়, তাহা হইলে তাহার চক্ষু বসিয়া যায়। যদি কেহ কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইতে অভ্যাস করে তাহা হইলে সে শীঘ্রই বক্র হইয়া পড়ে। বেশী উঁচু বালিসে শয়নে নাক বক্র করিয়া তুলে। যাহারা বামদিকে কাৎ হইয়া শুইয়া থাকে, তাহাদের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া ভাল হইতে পারে না। যাহারা চিৎ হইয়া ঘুমায় তাহাদের রক্ত সঞ্চালনে বাধা পড়ে,—শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ডানপাশে কাত হইয়া নিদ্রা যাওয়া স্বাস্থ্যকর।

(৫) পৃথিবীর চারিভাগের একভাগ লোকই ১৭ বৎসরেই মারা যায়। গড়ে প্রত্যেক মানুষ ৩৭ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

(৬) অনেকে বিশ্বাস করেন লবণের মধ্যে রোগ বীজাণু থাকিতে পারে না। ফ্রান্সের জনৈক ডাক্তার র‍্যাপিন্—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, টাইফয়েড, ডিস্‌পেপসিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বীজাণু লবণের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে পারে।

(৭) নর দেহের মধ্যে জিহ্বার ডগায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুভূতি শক্তি আছে। তাহার পর যথাক্রমে ওষ্ঠদ্বয় ও আঙ্গুলের ডগায় হয়।

(৮) প্যারিসের জনৈক বিখ্যাত ডাক্তার বলেন—অনেক সময় দাঁতের ব্যারামের জন্য মানুষের মাথায় অকালে টাক পড়িয়া যায়।

(৯) নিউইয়র্কের অধ্যাপক ডাক্তার এডলফস্ নফ্ বলেন—আহারের সময় অল্প পরিমাণ এবং দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যার মধ্যে বহুবার প্রচুর পরিমান জলপান করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা হ্রাস হয়। তিনি আরও বলেন—যাহাদের যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা উচিত।

(১০) জলে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ মিশাইয়া সেই জলে শিশুদিগকে স্নান করাইলে তাহাদের ত্বক কোমল ও মসৃণ হয়।

সাত ঘাটের জল।

গত মাসে ডাক্তার ভরোনফের অদ্ভুদবার্দ্ধক্য-চিকিৎসার আবিষ্কার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ব'লা হ'য়েছে—তা পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ থাক্‌তে পারে। এই চিরযৌবনের সাধনা সম্বন্ধে আজ আরও দু'একটি কথা বল্‌ব। অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ইউজিন্ ষ্টীন্যাক্‌ই (Prof. Eugene Steinach) সর্ব্বপ্রথম ভরোনফের প্রসিদ্ধ আবিষ্কারের সূত্র ধরে বারো বৎসর গভীর গবেষণা ও পরীক্ষার পর বার্দ্ধক্য বিতাড়নের কৌশলটি নিরাপদে মানুষের উপর খাটিয়ে দেখে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। এখন এঁর চার পাঁচটি শিষ্য ইয়োরোপের নানা স্থানে এই প্রক্রিয়ায় রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ ক'রে বেশ দু'পয়সা রোজগার কচ্ছেন। বৃদ্ধকে যুবায় পরিণত করার প্রক্রিয়াটি না কি খুব সামান্য ও সহজ। "থাইরয়েড্ গ্লাণ্ড" নামক গলনালীর নিম্ন-ভাগে একটি গ্রন্থি আছে; এইটি সময় বিশেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে মানুষের গলগণ্ড রোগের সৃষ্টি করে; এই গ্রন্থিটিতে অস্ত্রোপচার ক'রে কোন যুবা বানরের গল-গ্রন্থি ঐ স্থানে জুড়ে "কলম" করে দেওয়া হয়। এ কাজ না কি ১০ মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হ'য়ে যায়। তার পর ১০ দিনের মধ্যে রোগীর শরীরে "বসন্তের শিহরণ" জাগ্‌তে থাকে এবং এক মাসের মধ্যেই তিনি একেবারে "নবীন-নাগর-নটবর-সুন্দর" কলেবর পরিগ্রহ করেন; তখন না কি তাঁকে তাঁর ছেলে পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারে না।

প্রফেসর ষ্টিন্যাকের একজন বড় শিষ্য সেদিন ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ কাইজারের দ্বিতীয় বার বিবাহ করার অনতিপূর্ব্বে, হল্যাণ্ডে গিয়ে "থাইরয়েড্ গ্লাণ্ড অপারেশন" দ্বারা তাঁকে যুবত্ব প্রদান কত্তে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন; ফলে—কাইজারের বয়স বছর দু'এক ক'মেছে বটে, কিন্তু মোটেই তাঁর আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। ঐ শিষ্যটি কিছুদিন হ'ল তাঁর জরানাশক বীজ বপন কত্তে লণ্ডনে এসে আবির্ভূত হ'য়েছেন। শোনা যাচ্ছে ষ্টিন্যাকের চিকিৎসা কৌশলে ভিয়েনার ৬০ বছরের এক খুড়্‌থুড়ে বুড়ী, "ললিত লবঙ্গলতা" গোছের যুবতীতে পরিণত হ'য়েছেন। হতভাগিনী ৪০ বৎসরকাল পুত্র মুখ দর্শনে একেবারে বঞ্চিতা ছিল। তার পর পুনর্যুবতীত্ব প্রাপ্তি মাত্রই নাকি সে গর্ভবতী হ'য়ে পরে সম্প্রতি একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রেছে। যাক্, বুড়ীর গয়ায় পিণ্ডি

দেবার এতদিনে একটা লোক মিলল বটে, কিন্তু পিণ্ড দেবার দিনটি পেছিয়ে গেল কি না কে জানে!

তার পর "শেষ বেশ" শুনুন্। বিলাতের এল্‌ফ্রেড্ উইলসন্ নামে এক বিপত্নীক ধনী গত মাসে ভিয়েনায় গিয়ে ষ্টিন্যাকের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নিজের "যৌবন-জল-তরঙ্গ" ফিরিয়ে আনেন্। ভদ্রলোকের বয়স ছিল ঠিক বাহাত্তর বছর, তাই বোধ হয় "বাহাত্তুরে"য় ধরেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই উইলসন্ বেশ শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে গেলেন; টাক মাথায় ভ্রমর কালো চুল গজিয়েছে, লোল চর্ম্ম মসৃণ হ'য়ে তার ভিতর থেকে গোলাপী আভা উঁকী মার্‌ছে, ক্ষিধেও বেড়েছে, শক্তিও এসেছে; গোটা কয়েক গোঁপের চুল কাঁচা হ'ল না দেখে তিনি একদিন গোঁপ কামিয়ে "গোবিন্দ অধিকারী" সেজে পড়্‌লেন আর কি? তার পর বিয়ের সন্ধানে উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন। এক "নার্সের" সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকঠাক্—গায়ে-হলুদের (?) জিনিষপত্র শুদ্ধ কেনাকাটা সারা। একদিন সকালে গৃহকর্ত্রী গরম চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন—উইলসন্ বুড়োর খুড়ী—"যুবোর")—অঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা, তিনি ভবের ডেরাডাণ্ডা তুলে একেবারে চির যৌবনের দেশে মহাপ্রস্থান ক'রেছেন। খোদার উপর খোদ্‌কারী মানুষে সয়, কিন্তু খোদা কি সয়?

দেহী আমরা সকলেই, কিন্তু দেহ-সম্বন্ধে সঠিক ও বিস্তার খবর আমরা কয়জন রাখি?—হাজারকরা বোধ হয় একজনও না। বিলাতের পার্লামেণ্টে মর্ড অমুক "বেরি" কবে হাই তুলেছিলেন বা সেনিসিলভ্যানিয়ায় কোন্ ৯০ বছরের পাদ্‌রী প্রথম বার দার-পরিগ্রহ করেছেন, তার আমূল বৃত্তান্ত দেশের অনেক বাল-বৃদ্ধ-বনিতা বোধ হয় শোনাতে পারবে; কিন্তু নিজের দেহে কয়খানা হাড় বা রক্তপিণ্ডটি কোথায়—সে খবর জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই "আম্‌তা আম্‌তা" ক'রে ঢোঁক গিল্‌তে সুরু করবেন। বৈষ্ণব-কবিদের "ভাড়াটে-ঘর" রূপ আমাদের এই স্থূল কলেবরটী একটি বিরাট, অপরূপ ও অত্যাশ্চর্য্য কারখানা। দেহ সম্বন্ধে সম্যক ও নিখুঁত তত্ত্ব এখনও পর্য্যন্ত মানব জ্ঞানের করায়ত্ত হয় নাই; এ সম্বন্ধে সামান্য একটি ব্যাপার জান্‌তে গেলেই সমস্ত জীবন কেটে যায়।

মোটামুটি আমাদের দেহে প্রায় তের চৌদ্দ সের রক্ত আছে; এক একবার স্পন্দনে হৃদ্‌পিণ্ড থেকে প্রায় একসের রক্ত শরীরের চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে; প্রতিদিন এমনি ক'রে উহা প্রায় সাড়ে চার মণ রক্ত গ্রহণ ও বর্জ্জন করে। আমাদের হৃদয় প্রতি মিনিটে ৭০ বার স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ ঘণ্টায় চার হাজার দুইশ বার, একদিনে একলক্ষ আটশবার ও বছরে তিনকোটি সাতলক্ষ বাইশ হাজার দুইশ বার স্পন্দিত হয়। আমাদের প্রত্যেকের ফুসফুসে প্রায় চার সের বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সদা সর্ব্বদা মজুত থাক্‌ছে; আমরা প্রতিদিন প্রায় দুইহাজার চারশ মণ বায়ু নিশ্বাস দ্বারা ভিতরে গ্রহণ করি। ফুস্‌ফুস্‌টি অসংখ্য বায়ু-কোষ দ্বারা নির্ম্মিত একটি স্পঞ্জের মত থলি বিশেষ; এক একটি ফুসফুসে যতগুলি বায়ুকোষ আছে, সেগুলি একে একে খুলে ছড়িয়ে দিলে প্রায় বিশ হাজার বর্গ মাইল ভূমি অধিকার করবে। আমাদের দেহে ছোটবড় প্রায় একশ ষাটখানা হাড়, ও প্রায় পাঁচশ মাংস পেশী আছে। খুব কম ক'রে ধরলেও আমাদের দেহে প্রায় এককোটি নাড়ী ও শিরা-ধমনী আছে। আমাদের গাত্রে পর-পর তিন পর্দ্দা চাম্‌ড়া আছে; সমস্ত চামড়ার আয়তন প্রায় সতেরশ বর্গ ইঞ্চি, প্রতি বর্গ ইঞ্চি চাম্‌ড়ায় ৩৫০০টি ক'রে লোমকূপ আছে; তাহ'লে হিসেব ক'রে দেখা যাচ্ছে আমাদের শরীরে মোটমাট্ ৫৯৫০০০০ লোমকূপ বর্ত্তমান্। তারপর—"বুঝ জ্ঞানী যে জান সন্ধান!"

বাঙ্গালার লাট্ লর্ড লিটন্ সে দিন ভারতীয় রেড ক্রশ সোসাইটির প্রাদেশিক শাখায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ। উহার মধ্যে বৎসরে ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়,—মরে অন্যূন ৮৪ হাজার; বসন্তরোগে প্রায় ৫০ হাজার আক্রান্ত হ'য়ে ১৭ হাজার মা শীতলার শীতল অঙ্কে চিরবিশ্রাম লাভ করে, বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩, কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগে মরে প্রায় ৩ লক্ষ। সকল রকম জ্বরে মৃত্যুর হার ১০ লক্ষেরও উপর। শিশু মৃত্যু হাজার করা দুই শ'য়েরও উপর। যক্ষ্মা, রক্তামাশয়, সূতিকা, মৃগী,, হাম, পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগে আরও যে ২।১০ লক্ষ প্র ত বৎসরে শমন-সদনে নীত হন্ —সেটি হচ্ছে "অধিকন্তু ন দোষায়!"

দেশের কিঞ্চিদূর্দ্ধ সাড়ে চার কোটি লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভোগে ক'জন?—তি ন কো টি! এতে আর জাতির জীবনী-শক্তি থাকবে কিসে? একদিকে রোগ, অন্যদিকে দারিদ্র্য, একদিকে ম্যালেরিয়া মহামারী প্রভৃতি, অন্যদিকে 'ম্যয় ভুখা হুঁ'র মস্তবড় হাঁ,—একেবারে তীর্থামৃত যোগ আর কি!

ঘরের কর্ত্তা বাইরের কর্ত্তা—সব হোম্‌রা চোম্‌রা কর্ত্তাই ম্যালেরিয়া মার্‌বার কতরকম ফন্দী-ফিকির খাটালেন। জল্পনা কল্পনা হ'ল আঠারো আনা, কাজ হ'ল ফক্কিকার। কেউ বল্লেন, এনফিলিশ নামক মশক কুল যে-কোন উপায়ে হোক্ সমূলে নিপাত কর, কেউ বল্লেন—ডোবা-খানা তড়াগাদি বুঁজিয়ে দাও, কেউ বল্লেন—ভরি ভরি কুইনাইন্ খাও, কেউ বল্‌ছেন—পুকুরে কই, মৌরলা, তিন্‌চোখা, বাণ প্রভৃতি মাছ ছড়িয়ে দাও, তারা দুদিনে মশক কুল নির্ম্মূল ক'রে দেবে। কিন্তু এ সব করে কে? যাদের পেটে একটু বিদেশী বিদ্যা ঢুকেচে, তারা কল্‌কাতায়, পল্লীর জমিদার বছরের মধ্যে ১১ মাস হয়ত কল্‌কাতায় দুর্জ্জয়লিঙ্গে। পোড়া পল্লীর রথী অনেক, কিন্তু সারথি যে একটিও নেই! হা-ঘরে হা-ভাতে 'হা-সরস্বতে' যারা—তারা মুখ বুজে কর্ত্তাদের লম্বা চওড়া কর্ম শোনে, কিন্তু কি ক'রে কাজ আরম্ভ কত্তে হয় তাও জানে না, কোত্থেকে এই বিপুল আয়োজনের পয়সা আস্‌বে তাও জানে না, বেচারীরা মুখ বুজে গ্রাম্য হাতুড়ের পাচন-বড়ি (না—পাচন-বাড়ি?) খায় আর নির্ব্বিবাদে 'জয় মা, সর্ব্ব পাপহরা ম্যালেরিয়া, মাগো' ব'লে তার গোগ্রাসে ঢুকে পড়ে। দেশের লোকের স্বাস্থ্য ফেরাতে হ'লে, চাই—শিক্ষার সার্ব্বজনীন সুযোগ ও সুবিধা; আর চাই দুবেলা দুমুঠো পেট ভ'রে ভাত। তখন কোন রোগ বালাই-ই এম্‌ন ক'রে বাংলার বুক থেকে তাজা তাজা প্রাণগুলোকে দক্ষিণ দ্বারের অভিমুখে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। মেক্সিকো, ইটালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি সব জায়গায়ই ২।১০ বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী বধ হ'য়ে গেল, কিন্তু রাম-লক্ষণের জন্ম-ভূমিতে এ তাড়কাকে আর কিছুতেই তাড়ান গেল না!

সহযোগী 'সময়' লিখ্‌ছেন যে, সম্প্রতি আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক কেরোসিন তেল জমিয়ে বরফের মত শক্ত কর্‌বার উপায় স্থির ক'রেছেন্। এই জমান কেরোসিন কিন্তু বরফের মত গল্‌বে না, একে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে, বর্‌ফির মত কেটে কয়লা বা কাঠের মত ব্যবহার করা যায়। বাতির মত এটি ঘরে জ্বালিয়ে রাখাও চল্‌তে পারে—কোন পল্‌তে পর্য্যন্ত দরকার হয় না। এতে বেশ জল মিশিয়ে তরল ক'রে জ্বালান যেতে পারে। জমান ও সঙ্কোচন হওয়ার দরুণ এর উত্তাপ ও প্রজ্বলন শক্তিও না কি খুব বৃদ্ধি পায়। একটি দিয়াশলাই কাঠি খরচ ক'রে জমান কেরোসিনকে সহজেই জ্বালানো যায়; শেষ পর্য্যন্ত এর আলো সমানই থাকে—বাড়ে না বা কমে না। আগুন লেগে কেরোসিনের যে বিভ্রাট ঘটে, এতে তা হবার কোন ভয় নাই।

খবরটি বড় জবর গোছের বল্‌তে হবে। গৃহস্থালির দিয়া, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া, নিরাপদের দিক এমন জমাট কেরোসিনের বরফি উদ্ভাবন করা সুন্দর কাজ হ'য়েছে। কেরোসিনের বরফি চলনের সঙ্গে সঙ্গে যেন কেরোসিন তেলের ব্যবহারটা একেবারেই উঠে যায়। তাহ'লে অন্ততঃ একটা বড় বিষয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। হ'লে বাংলা মুল্লুকের অভাগী কুমারী ও নিগৃহীতা বধূদের কাপড়ে কেরোসিন লাগিয়ে আত্মহত্যার আশঙ্কাটা একেবারে দূর হয়। তবে যদি তাঁরা কেরোসিনের বরফি (জ্ঞানে বা অজ্ঞানে) টপাটপ্ মুখে পুরেন্—সে স্বতন্ত্র কথা!

কয়েক মাস পূর্ব্বে সাহিত্য-বিশারদ, সুরেন বাবু, সমাচারে' "প্রসূব বৈচিত্র্য" নামক প্রবন্ধে জগতে যে কত রকম উপায়ে এবং এক সঙ্গে কতগুলি সন্তান প্রসূত হয়, তার কয়েকটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

দেশ-বিদেশে আরও কয়েকটি প্রসব-বৈচিত্র্যের অসাধারণ ব্যাপার ঘটেছে, সেগুলি শুনলে পাঠকগণের চক্ষু কপালে উঠ্‌বে—তায় আর সন্দেহ নাই।

আয়র্লাণ্ডের বেলফাষ্ট সহরে একটি স্ত্রীলোকের সম্প্রতি ৫টি সন্তান এক সময়ে প্রসব হ'য়েছে। সন্তান কয়টি মারা গিয়েছে, কিন্তু প্রসূতি বেঁচে উঠেছেন।

মনমউথ সায়ারের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের জনৈক স্ত্রীলোক কিছুদিন পূর্ব্বে পঞ্চমবার যমজ সন্তান প্রসব ক'রেছেন: ইতঃ পূর্ব্বে আরও চারবার তিনি যমজ সন্তানের জন্মদান ক'রেছেন। মোটমাট তিনি সতেরটি সন্তানের জননী। এই রমণী নিজেও তাঁর মায়ের যমজ সন্তান; তাঁর মা ২টি মেয়ের জননী এবং তিনি নিজেও তাঁর মায়ের যমজ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

মেক্সিকো দেশের একটি রমণী এক সঙ্গে আটটি সন্তান প্রসব ক'রেছেন। লণ্ডনের হাঁসপাতালে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর একটি জননীও এক সঙ্গে আটটি সন্তান প্রসব ক'রেছেন। দুঃখের বিষয় উভয় ক্ষেত্রেই শিশু গুলি মারা গিয়েছে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিংসবার্গে একটি স্ত্রীলোকের একেবারে পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেদিন পঞ্জাবের রোটক নামক সহরের কিং এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল্ হাঁসপাতালে একটি ব্রাহ্মণ-পত্নী এক সঙ্গে ৫টি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রেছেন। সুখের বিষয় ছেলেগুলি সব বেঁচে আছে, আর আকারেও বেশ বড় হ'য়েছে। ব্রাহ্মণীর যদি দক্ষিণ হস্তের বেশ ভালো রকম যোগাড় থাকে, তাহ'লে বৎসর বৎসর তিনি এম্‌নি ক'রে "পাঁচী" নামের কার্য্যতঃ সার্থকতা প্রদর্শন করুন্—আমাদের কোন আপত্তি নেই।

এ সকলের সেরা হচ্ছে—রুশিয়ার জনৈক স্ত্রীলোকের কথা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার একটি স্ত্রীলোককে রাজমাতা ক্যাথারাইনের নিকট হাজীর করা হয়। এই স্ত্রীলোকটির নাকি ৫৭টি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে দশবার দুটি ক'রে, সাতবার তিনটি ক'রে এবং চারবার চারটি ক'রে সন্তান স্ত্রীলোকটি প্রসব ক'রেছেন! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! এই সাতান্ন সন্তানের স্বর্গগত জনক-জননীর অবরগত জড়দেহকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকৃতে পার্‌ছি না। মা ষষ্ঠী, বাংলার ঘরে ঘরে এমন কৃপা কর্‌তে পার—যদি বাপ মা ও ছেলেগুলি সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবি হ'য়ে বেঁচে থাকে, আর তাদের খাবার পরবার সুশিক্ষিত হবার কোন ভাবনা না থাকে। তবে দেখো মা, সাতান্নটিই হোক্ আর ৮৭টিই হোক্—সবগুলি যেন পুত্র সন্তান হয়, না হ'লে অতগুলি মেয়েকে পাত্রস্থ কর্‌তে হ'লে বাপের বিশলাখ টাকার জমিদারীও ঠাঁই পাবে না।

(নৃ')।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গে

শিক্ষায় যে ভারতবর্ষ সকল জাতির পশ্চাতে, সে কথা আজ কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। ইহা জন্য কতক দায়ী আমরা নিজে, অবশিষ্টটুকু দেশের শাসক সম্প্রদায়। প্রথমতঃ গভর্মেণ্ট্ চাহেন্ যে, দেশের সর্ব্বসাধারণ জ্ঞানের আলোক পাইয়া যাহাতে 'হুজুগেদের' দলে না মিশে বা নিজেদের জাতীয় দুরবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে। শিক্ষার পশ্চাতে যে টাকা খরচ করা উচিত, তাহার শতাংশের একাংশ কাঁদিয়া 'ককাইয়া' তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করা দুর্ঘট, তাহার প্রধান কারণটি এইমাত্র বলিলাম। দ্বিতীয় কাবণ, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে শিক্ষার জন্য ন্যায্য টাকা প্রয়োজনাতিরিক্ত সৈন্য ও পুলিস প্রতিপালনে ব্যয়িত হয়, তাহাত সকলেই জানেন।

* * * *

আমাদের দেশের যে মুষ্টিমেয় লোক স্বাস্থ্য ও অর্থের বিনিময়ে যে শিক্ষার সুযোগ পায়, তাহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে এবং যুগ ধর্ম্মানুযায়ী ও কার্য্যকরী নহে। বিদ্যাকে এখন অর্থনীতির দিক দিয়া অবলোকন করিতে হইবে; কারণ সে "গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে"র যুগ অতীতের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে; সে ত্যাগের মহিমাও নাই, তপোবলের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যও নাই, সে একান্ত আধ্যাত্মিকতার আদরও নাই। এটা "ধনাগম তৃষ্ণার" যুগ, এখন কেবল বস্তুতন্ত্রতার বিজয়-ভেরী আর অর্থ-সমস্যার পাঞ্চজন্য। এখন চাই অর্থকরী বিদ্যা; তার সঙ্গে অবশ্য সর্ব্বপ্রকার নৈতিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বাদ দিলে চলিবে না; কিন্তু আমাদের সকল চিন্তাকে—সকল কার্য্যকে এই অর্থ জিনিষটাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা না হইলে জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির নাগাল্ ধরা আমাদের পক্ষে সুদূর পরাহত হইয়া উঠিবে।

* * * *

অর্থকরী বিদ্যাকে বাদ্ দেওয়া যায়—যদি আবার সেই বেদ-পুরাণের যুগ ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যদি আমরা সেই সনাতন সভ্যতাকে ফিরিয়া পাই! কিন্তু সে আশা যে "নিশার স্বপন সম।" সুতরাং বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার দিক্ হইতে বিবেচনা ও জাতিগত সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্বতোভাবে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদিগকে নিঃসন্দিহান্ হইতে হয়। যাঁহার আহার পরিচ্ছদের জন্য ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, তিনি স্বচ্ছন্দে অর্থকরী বিদ্যাকে একেবারে বাদ দিয়া তাঁহার জ্ঞানপিপাসাকে ভরপুর চরিতার্থ করিতে পারেন আপত্তি নাই, এবং সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকুক্ তাহাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু দেশের সার্ব্বজনীন্ অভাব—এই অর্থ-নীতিবিধায়ক বিদ্যার দিকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অর্থকরী বিদ্যার পার্শ্বেই স্বাস্থ্য-নৈতিক বিদ্যাকে স্থান দেওয়া চাই। স্বাস্থ্য থাকিলে অর্থার্জ্জনের শক্তি ও প্রেরণা আসে, আবার অর্থাভাবেও স্বাস্থ্যকে অটুট্ রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; সুতরাং স্বাস্থ্য ও অর্থ পরস্পরের হাত ধরা-ধরি করিয়া না চলিলে জাতির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। শিক্ষার ধারাকে এইদিকে প্রবাহিত না করিলে আমাদের জাতিগত মুক্তি নাই—সমাজগত উন্নতি নাই—ব্যক্তিগত সুখ নাই! তাহা হইলে আমাদিগের মৃত্যুর হারও কমিবে না, ব্যাধির বিরাট বাজারও ভাঙ্গিবে না, কেরাণীর পাঁজর-ভাঙা দীর্ঘ-নিশ্বাসও থামিবে না। আমরা যে গরীব—জগতের মাঝে সকল জাতির নীচে—আমাদের প্রতিজনের গড়ে বার্ষিক আয় ২৪৲ মাত্র—এখন এই নগ্ন সত্যটুকুই আমাদের প্রত্যেকের চক্ষের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠার প্রয়োজন। বুভুক্ষিত যেমন রসনাতৃপ্তিকর আহার দেখিলে ব্যকুল অগ্রহে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ছুটিয়া যায়, আমাদিগকেও সেইরূপ—যে বিদ্যা দরিদ্রতার পথে হাত ধরিয়া, অস্বাস্থ্যতার অন্ধকারে আলো দেখাইয়া আমাদিগকে সফলতার কিনারায় পঁহুছাইয়া দিতে চায়—এখন সেই বিদ্যারই পূজারতি করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ঃ।

* * * *

স্বাস্থ্য চর্চ্চা ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি এতটা বিশ্বাস ছিল বলিয়াই মুর্খ অসভ্য নগণ্য জাপান আজ জগতের সর্ব্বজাতির সভার মধ্যস্থলে জাগ্রত কেশরীর মত বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানী গভর্মেণ্ট্ কলাবিদ্যার

...৭০০ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়াই, আর ...মাদের দেশে তাহার একান্ত অভাব বলিয়াই আজ ...রতীয় পণ্যশালা জাপানী খদ্দর হইতে জাপানী ...টি পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যটিতেই ছাইয়া ...ড়িয়াছে। প্রজা-সাধারণের মধ্যে conscrip-...tion প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল বলিয়াই এবং ...র্থকরী শিল্প-বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করিয়াছিল বলিয়াই ...ার্ম্মাণী আজ পরাজয়েও বিজয়ের গরীমা মাখিয়া ...াছে, তাই আজ দশ দুঃশাসনেও তাহার বস্ত্র হরণ ...রিয়া উলঙ্গ করিতে পারিতেছে না। এই শিল্প ...াণিজ্যকে উপলক্ষ্য করিয়াই অদম্য তেজা ইংরাজ-...াতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে ...াসিয়াছিল; এই শিল্প বাণিজ্যের কৃপাতেই আজ ...ক তৃতীয়াংশ জগৎ তাহার শাসন-দণ্ডের তলে ...াথা অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর আমরা? ...ামাদের—

নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে।
তবু রয়েছি উপেসী মোরা ঘরে শুয়ে!

* * * * * *

বোম্বাই সরকার প্রকাশ করিয়াছেন যে বোম্বাই ...দেশে আবগারি বিভাগেব আয় প্রায় সিকি ...রিমাণ কম হইয়াছে। যদি অবৈধ ভাবে ...রকারকে শুল্ক ফাঁকি দিয়া গোপনে মাদকদ্রব্য ...্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে, সরকারের এই ...ার আয় কমিবার সংবাদে আমরা সুখী বই ...সুখী হইব না।

—

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় জলের কল ...লেও বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না। ...রত্ন' বলিতেছেন, স্থানীয় হেল্থ্ অফিসার জল ...রীক্ষা করিয়া উহা বিশুদ্ধ নয় বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ ...রিয়াছেন। সেই কড়ি ক্ষয়, তবুবৌ সুন্দর নয়।

—

একটা কথা আছে, যুদ্ধ জয় করা তত কঠিন ...; কিন্তু জিত রাজ্য রক্ষা করাই কঠিন! ঠিক ...ই রকম,—কোন সদনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা ...টা আয়াসসাধ্য, সেটাকে স্থায়ী ভাবে জনসাধারণের ...িতার্থে নিযুক্ত রাখা ততোধিক কষ্টসাধ্য। ...রিদপুর—পাংশার "কাঙ্গাল" কহিতেছেন যে, ...উদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচন কল্পে ...জেলা ও লোক্যাল বোর্ড পল্লীসমূহে যে সমস্ত ...ুর খনন করাইয়া দিতেছেন, মাঘ মাসের প্রারম্ভেই ঐ সমস্ত পুকুরে গ্রামবাসীরা নৌকা ডুবানো ও বাঁশ বাঁখারি পচান আরম্ভ করিয়া জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিবে। সুতরাং জলের অভাব মিটাইয়া দিয়াই নিস্তার নাই, সে জল রক্ষার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত রাখিতে হইবে। নচেৎ কিছু দিন পরে গ্রামবাসীদের নিজেদের দোষেই পুকুরের জল পচিয়া গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিলে, তাহারাই রোগে মরিবে, এবং জলাভাব বলিয়া হাহাকার আরম্ভ করিবে। শিক্ষার বিস্তার না হইলে ইহার প্রতিকারের আশা করা বিড়ম্বনা।

—

ত্রিপুরা জেলায় ম্যালেরিয়া ও নানাবিধ রোগের বিস্তারের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "ত্রিপুরা হিতৈষী" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ষার জল-নিকাশের বন্দোবস্ত না থাকাতেই এই জেলাটি এত রোগপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। জল নিকাশের ব্যবস্থা করা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যত ব্যয়সাধ্যই হউক, মানুষের জীবনের মূল্য তাহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক অধিক। তবে এই জলনিকাশের ব্যবস্থা করা একা গবর্ণমেণ্ট কিম্বা একা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে। সেক্ষেত্রে সুযুক্তি এই যে, গবর্ণমেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এবং ত্রিপুরাবাসীরা একসঙ্গে মিলিত হইয়া এই কাজটি করুন। দশে মিলে কাজ করিলে উহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে। ত্রিপুরা জেলার অধিবাসীদের জীবন-মরণ লইয়া যখন কথা, তখন গবর্ণমেণ্ট বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ত্রিপুরাবাসীর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে।

—

খেজুরা থানার এলাকার কয়েক খানি গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে, অথচ, "নীহার" সংবাদ দিতেছেন, জনকা দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার নাই। একখানি গ্রামে ২৫।৩০ জন লোক কলেরা রোগে মারা গিয়াছে। রোগ হইলে লোকে ডাক্তার পায় না। ইহা কি কম বিড়ম্বনা? বলি, গ্রামের সকল লোক ওলাউঠায় মরিয়া গিয়া গ্রামগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িবার পর কি চিকিৎসক-শূন্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার আমদানী করা হইবে?

—

কলিকাতার বেরিবেরি বাহাদুরী দেখাইতে এখন ঢাকায় গিয়া উদয় হইয়াছে। "ঢাকা প্রকাশ" বলিতেছেন, বেরিবেরিতে লোকও অনেক মরিতেছে। প্রতিকারের কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে, "ঢাকা প্রকাশ" কোন সংবাদ দেন নাই।

ফরিদপুরের "সঞ্জয়" এক নিশ্বাসে ফরিদপুরে জলাশয়ের অভাবের দরুণ জলাভাবের অভিযোগ করিয়াছেন, অপর দিকে ট্যাক্স দিবার দায় এড়াইবার জন্য জলের কল স্থাপনেও আপত্তি করিতেছেন। সঞ্জয় সহরে কয়েকটি ফিল্টার স্থাপন করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু শুধু ফিল্টার বসাইয়া কি হইবে? জল কৈ? ফিল্টারে কি শোধন করা হইবে? জলই যখন নাই, তখন জলের কলের ন্যায় ফিল্টার স্থাপনও নিষ্ফল হইবে না কি? বরং গোটা কয়েক জলাশয় খনন করাইবার প্রস্তাব করিলে শোভন হইত। কিন্তু তাহাতে খরচ আছে। যেদিক দিয়াই হউক, জল পাইতে হইলে জলকর এড়াইবার যো নাই।

পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জলসরবরাহের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে নলকূপই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নলকূপ স্থাপন বিষয়ে রাজসাহী জেলা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে এখনও পরীক্ষা চলিতেছে, এবং "হিন্দু রঞ্জিকা" সংবাদ দিতেছেন যে পরীক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গবমেণ্ট দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। শুনিয়া সুখী হইলাম।

এখন কিছুদিন ধরিয়া মফস্বলে কলেরার সংবাদ শুনিতে হইবে। "নীহার" কাঁথি অঞ্চলে কলেরার সংবাদ দিয়াছেন; "বরিশাল হিতৈষী" বরিশাল জেলার কলেরার সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছেন।

মফস্বলের সংবাদপত্র খুলিলেই এখন জলকষ্টের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইবে। এদিকে কষ্টেস্বষ্টে চেষ্টা চরিত্র করিয়া দুই একটা পুকুর কাটানো হইলেই গ্রামের লোকেরা অপব্যবহারে তাহার জল নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এমন অবস্থায় গ্রাম্য লোকের জলাভাব কে দূর করিতে পারে? বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থায় যতদূর সম্ভব গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, মেদিনীপুর, টাঙ্গাইল, সিউড়ি, রাণীগঞ্জ, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, নোয়াখালি, কৃষ্ণনগর, চট্টগ্রামে জল সরবরাহের জন্য উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ১৯২১ সাল হইতে জল সরবরাহ কল্পে কিছু টাকা দান করিয়াছেন, এবং কিছু টাকা ঋণ স্বরূপ দিয়াছেন। এই সকল টাকার সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক।

সহযোগী "যশোহর" যশোহরে টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করিয়া তত্রত্য কলের জলকেই ইহার জন্য দায়ী করিতেছেন। মজা মন্দ নয়। এত টাকা খরচ করিয়া জলের কল স্থাপন করা হইল, আর সেই কলের জলই কি না টাইফয়েডের কারণ হইল? কিছুকাল পূর্ব্বে অধুনালুপ্ত "দর্শক" নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন, চন্দননগরে জলের কলও প্রতিষ্ঠিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াও আসিয়া জুটিল। তাহা হইলে বহু অর্থব্যয়ে জলের কল করিয়া লাভ? এখনও নানাস্থানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জলের কল বসাইবার কল্পনা চলিতেছে। কলের জলে যদি লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা না হয়, তবে বুঝিয়া সুজিয়া জলের কল স্থাপনের জন্য অর্থব্যয় করা উচিত। সেইজন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গভীর করিয়া নলকূপ খনন করিলে বিশুদ্ধ (bacteriologically pure) জল পাওয়া যাইতে পারে। তাহাতে খরচও কম। বর্ত্তমান অর্থকষ্টের দিনে সেটাও বিবেচনার কথা।

কাঁথির অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] শাসমল কাঁথির দাতব্য চিকিৎসালয়ে [illegible] ৭২৫৷৹ টাকা মূল্যের যন্ত্রাদি কিনিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বেও তিনি এই উদ্দেশ্যে ৫০০৲ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জয় হউক।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } মাঘ, ১৩২৯ সাল { ১০ম সংখ্যা

গর্ভিণী-আক্ষেপ

বা

"পুয়েরপেরাল্ এক্ল্যাম্পসিয়া।"

(Puerperal Eclampsia.)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্।

এই দারুণ ব্যাধির কারণ। চিকিৎসাতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, উহার নিদান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক। যকৃত (Liver), বৃক্কগ্রন্থি (kidneys), ও মস্তিষ্ক (Brain) এই তিনটি যন্ত্রেই এই রোগের বেশীর ভাগ চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এবং প্রায় সকলে দেহ-যন্ত্রেই একই রকমের চিহ্ন পাওয়া যায়।

(১) যকৃতের উপরি অংশে, ক্ষুদ্রাকারে অসংখ্য রক্তস্রাব দেখা যায়; পোর্টাল শিরার (Portal vein) প্রবেশের মুখেও তাহাই দৃষ্ট হয়। যকৃতের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হয়। স্থানিক কোষগুলির ধ্বংসই (destruction of liver cells) ঐ গহ্বর সৃষ্টির হেতু। (২) বৃক্কযন্ত্রের রক্তহীনতা (anaemia of kidneys) একটি প্রধান লক্ষণ। এই গ্রন্থির কোষগুলির, বিশেষ করিয়া কন্ভোলিউটেড্ অংশের (convoluted tubules) কোষগুলির মেদাপকর্ষ (fatty in-filtration) ঘটিয়া থাকে। (৩) প্লীহা—বিবৃদ্ধ, নরম হয় এবং উহার উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকারে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। (৪) প্যাঙ্ক্রিয়াস—নিরক্ত ও ক্ষুদ্র গহ্বরযুক্ত। (৫) মস্তিষ্ক—স্ফীত

(oedema) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তস্রাবযুক্ত হয়। (৬) ফুসফুসে—টার্ডিউজ স্পট (Tardieus spots) পরিলক্ষিত হয়। (৭) ফুলে শ্বেত infarction হয়। রোগিনীর আক্ষেপ হউক আর না হউক, যে যে রোগিনীরই একল্যাম্পসিয়া হয়, তাহারই মৃতদেহে এই সকল লক্ষণাবলী পরিদৃষ্ট হয়।

কারণতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও স্থিরতা নাই। এ যাবত কত রকমের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির তালিকা এই :—

(১) রক্তে ইউরিয়া বা এমোনিয়া কার্ব্বনেটের আধিক্য হওয়া। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ইউরিমিয়া হওয়ার ফলে একল্যাম্পসিয়া হয়। এইটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক।

(২) এসিটোনিমিয়া—অর্থাৎ নাইট্রোজেন বর্জ্জিত এক জাতীয় বিষ (এসিটোন) রক্তে সঞ্চারিত হওয়ার ফল।

(৩) প্রস্রাবের যাবতীয় বিষাক্ত উপাদান রক্তে মিশ্রিত হওয়ার ফল—অর্থাৎ প্রকৃত ইউরিমিয়া।

(৪) সুধু প্রস্রাবের যাবতীয় বিষাক্ত দ্রব্য নহে, তৎসঙ্গে যকৃতস্থ যাবতীয় বিষাক্ত দ্রব্য কর্ত্তৃক রক্তের দোষ ঘটিলে একল্যাম্পসিয়া হয়, ইহাও এক শ্রেণীর চিকিৎসকের ভ্রান্ত মত।

(৫) কোনও প্রকারের জীবাণুজ ব্যাধি।

(৬) গর্ভিণীর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (instability) বশতঃ কষ্টকর প্রসবের ফলেই একল্যাম্পসিয়া হয়।

অনেকে এমন আছেন যাঁহাদের সামান্য উত্তেজনাতেই স্নায়বিক বিকার উপস্থিত হয়, যে মানসিক কষ্টের ফলে হয়ত অপরের কিছুই হয় না। সেই মানসিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের আক্ষেপ চৈতন্যলোপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেইরূপ দৌর্ব্বল্যগ্রস্তা গর্ভিণীর কোনরূপ কষ্ট উপস্থিত হইলেই একল্যাম্পসিয়া হইবার কথা।

(৭) থাইরয়েড্ গ্রন্থির অসম্যক কর্ম্মক্ষমতা (Thyroid insufficiency)। দেহস্থ যাবতীয় গ্রন্থির স্ব স্ব রস (secretion) উৎপাদিকা শক্তি আছে। সেই সকল রস (secretions) আমরা কখনো চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু সেই সকল রস উৎপাদিত হইয়াই "গায়ে গায়ে বসিয়া" যায়। (absorbed into the system)। এই সকল রসকে এই কারণে internal secretions কহে। এবং ইহাদের সত্তার প্রমাণ এই যে, কোনও গ্রন্থি বিশেষের সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অভাব হইলে তৎকর্ত্তৃক নিঃসৃত রসের অভাবে দেহে নানা প্রকারের লক্ষণ উপস্থিত হয়। একল্যাম্পসিয়া ব্যাধিতে, থাইরয়েড্ গ্রন্থির অসম্যক কর্ম্মক্ষমতা ঘটিয়া থাকে বলিয়া কাহারো কাহারো বিশ্বাস আছে।

(৮) থাইরয়েড্ গ্রন্থির অসম্যক কর্ম্মক্ষমতা না হইয়া, প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির ঐরূপ দোষই একল্যাম্পসিয়া ব্যাধির হেতু বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

(৯) ফুল (placenta) হইতে উদ্ভূত কোনও বিষ।

(১০) ভিলাই (villi) হইতে কোনও কোনও অংশ ছিন্ন হইয়া মাতৃরক্তে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে একল্যাম্পসিয়া ঘটিয়া থাকে (syncyriotoxine)।

চিকিৎসার ব্যবস্থা।

যেমন কারণতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দৃষ্ট হয়, তেমনি চিকিৎসা সম্বন্ধেও মতের বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু যে মতেই চিকিৎসা করা হউক না কেন, ফল প্রায় একই রকমের হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন মাতার ও ৫০ জন সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমরা একে একে সেই সকল চিকিৎসা পন্থাগুলির বর্ণনা দিব :—

প্রথম পন্থা।

একল্যাম্পসিয়াকে রক্তদুষ্টির ফল ধারণা করিয়া এই মতে চিকিৎসার অবতারণা করা হয়। পরে এইগুলি করিতে হয় :—

(১) রোগিনীকে পাইবামাত্রই ½ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক উপায়ে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে কাজ না করিলে আরও ২।৪ বার "কিটের" পরে ½ গ্রেণ মাত্রায় আবার দিবে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টায় ২ গ্রেণের বেশী মর্ফিয়া যেন না পড়ে।

(২) যদি সহজেই দেওয়া যায় ত ভালই; নতুবা ১০।১৫ মিনিম্ ক্লোরোফরম আঘ্রাণ করাইবার পরে, ষ্টমাক টিউব চালাইয়া দিবে। ঐ নলের সাহায্যে ১ পাইণ্ট গরম জলে ১ ড্রাম বাইকার্ব্বনেট অফ সোডার দ্রব দ্বারা পাকস্থলী ধৌত করিয়া দিবে। পাকস্থলীর ধৌতি সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, ঐ নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে তিন আউন্স ক্যাষ্টর-অয়েলের সহিত ২ মিনিম্ ক্রোটন অয়েল ঢালিয়া দিয়া ঐ টিউব বাহির করিয়া লইবে। [ক্রোটন ও ক্যাষ্টরঅয়েল দ্বয়ের পরিবর্ত্তে তিন আউন্স ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট ও তিন আউন্স সোডা সালফেট্ একত্রে ৬ আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া ঐরূপে ঢালিয়া দিতে পারা যায়।]

(৩) লম্বা একটি নল গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করাইবে—যতদূর তাহা সহজে যায়। ঐ নলের ভিতরে দেড় পাইণ্ট গরম্ জল দিবে। সে সব জলটাকে বাহির হইয়া আসিতে দিবে। পুনরায় ঐরূপ করিবে—আবশ্যক হইলে, ২।৪ ঘড়া জল খরচ করিয়া বসিবে; উপর্য্যুপরি ঐরূপ করার ফলে রাশি রাশি মল বাহির হইতে থাকে। মল নির্গত হইয়া গেলে দেড় পাইণ্ট ঐ উষ্ণজলে দেড় ড্রাম বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা দ্রব করিয়া গুহ্যদ্বারে দিয়া দিবে। ঐ জলটি ভিতরে থাকিয়া যাইবে।

(৪) রোগিনীর চৈতন্যাবস্থায় ঘটি ঘটি উষ্ণ জল পান করাইয়া লইবে। গর্ভিণীর অচৈতন্যাবস্থায় ঐ সোডা দ্রবের ২ পাইণ্ট দুইটি স্তনের নিম্নে অধস্ত্বাচিক বিধানে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে।

(৫) ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব করাইবে। যদি প্রস্রাবের বর্ণ ঘোর এবং পরিমাণ অল্প হয়—তবে অতি অবশ্যই স্তনের নিম্নে অধস্ত্বাচিক বিধানে লবণাক্ত জল (Saline injection) দিবে।

(৬) বৃক্কক গ্রন্থিদ্বয়ের উপরে উষ্ণ সেঁক দিবে (hot fomentation over loins)।

(৭) গর্ভিণীকে দক্ষিণ দিকে কাইৎ করাইয়া শোয়াইবে এবং মধ্যে মধ্যে মুখের লালা মুছাইয়া দিবে। প্রত্যেক আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রভূত পরিমাণে লালার সঞ্চার হয়। সেই লালা শ্বাসনলীর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, এবং aspiration নিউমোনিয়ার সৃষ্টি করিয়া বসে।

(৮) জরায়ুর মুখ বা "অস্" (os) যদি পূর্ণরূপে প্রসারিত হয়, তবেই ফর্সেপ্স্ সাহায্যে প্রসব করাইবে। নতুবা কোনওরূপ জোর প্রয়োগ করিবে না।

দ্বিতীয় পন্থা।

(১) রোগিনীকে পাইবামাত্রই ½ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক বিধানে (Subcutaneous Injection) দিবে। আবশ্যক হইলে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ½ গ্রেণ মাত্রায় তিনবার ও তৎপরে ২ ঘণ্টা অন্তর ঐ মাত্রায় দিতে থাকিবে—যাবৎ পূর্ণ ২ গ্রেণ না দেওয়া হয়।

(২) আক্ষেপ হইলেই উচিত মত ক্লোরোফরমের আঘ্রাণ দিয়া আক্ষেপকে জব্দ রাখিবে।

(৩) গুহ্যদ্বারে ক্লোরাল হাইড্রেট (৩০ গ্রেণ) ও পটাশ ব্রোমাইড্ (১ ড্রাম) একত্রে দিবে। ২৪ ঘণ্টায় ৩½ ড্রাম ক্লোরাল দেওয়া যায়।

(৪) প্রসব করাইবে—যেন তেন প্রকারেন (accouchementforce)।

(৫) জোলাপ দিবে—ক্যাষ্টর অয়েল ও ক্রোটন অয়েল।

তৃতীয় পন্থা।

(১) আবশ্যক মত ½ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক বিধানে দিবে।

(২) কড়া জোলাপ দিবে।

(৩) এক সঙ্গে ১৭ আউন্স পর্য্যন্ত শৈরিক রক্তমোক্ষণ ও তৎক্ষণাৎ ২।৩ পাইন্ট লাবণিক দ্রব (normal saline) শিরার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইবে।

(৪) গরম জলে রোগিনীকে স্নান করাইবে। গরম কম্বলে আবৃত রাখিবে এবং বৃক্কের উপরে গরম স্বেদ দিবে।

(৫). যেন—তেন—প্রকারেণ প্রসব করাইবে।

চতুর্থ পন্থা।

(১) জোলাপ, মর্ফিয়া ও প্রসব করান—তৃতীয় পন্থানুযায়ী প্রযোজ্য।

(২) অধস্ত্বাচিক উপায়ে Liquor Thyroidei (৩০ গ্রেণ) মাত্রায় দিবে। সারাদিনে ১৫০ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। কেহ কেহ উহার পরিবর্ত্তে Paraganglin দিতে আদেশ করেন।

চিকিৎসা প্রণালীর ও ঔষধগুলির সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাবশ্যক মন্তব্য লিপি বদ্ধ করিয়া এতদ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) চিকিৎসার মূল সূত্র কি কি?—অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে কি কি দোষের প্রতিকার করিতে চাই? তাহার উত্তরে আমাদের বলিতে হইবে যে, আমরা প্রতিকার করিতে চাই—

প্রত্যক্ষে আক্ষেপের, যে হেতু আক্ষেপ যত বেশী বার বা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে, গর্ভিণীর জীবনের আশা তত কম হইবে।

পরোক্ষে—বিষাক্ততার (যাহার ফল আক্ষেপ ইত্যাদি)। আক্ষেপের জবরদস্তি চিকিৎসা আছে, কিন্তু জীবদেহের বিষাক্ততা দূর করিবার কোনও প্রকৃষ্ট একটি পন্থা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বোধ হয় অবস্থা বুঝিয়া সকল রকমের পন্থার একটু একটু লইয়া চিকিৎসা করাই প্রশস্ত।

(২) আক্ষেপ নিবারক যে যে ঔষধগুলি সদাই ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে কোন্ ঔষধটীর কি দোষ তাহা জানা আবশ্যক :—

(ক) মর্ফিয়া।—ইহার দ্বারা আক্ষেপের প্রশমন হয় বটে, কিন্তু মর্ফিয়া কিয়ৎপরিমাণে হৃৎপিণ্ডের অবসাদক এবং বৃক্কের ক্রিয়ার প্রতিরোধক। ইহা অবসাদক হইলেও সে অবসাদন এত সামান্য যে, মর্ফিয়া দ্বারা যে উপকার সাধিত হয়, তৎতুলনায় সে অপকারকে গণনার মধ্যে না আনিলেও চলে। আর যদিও কোনও কুফল ফলে, তবে অক্সিজেন আঘ্রাণ করাইলে এবং এট্রোপিন বা স্কোপোল্যামীন প্রয়োগ করাইলে বা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস করাইলে সকল গোলই চুকিয়া যায়। এবং যদিও সাধারণতঃ মর্ফিয়ার ক্রিয়া বৃক্কের উপরে তাদৃশ সুবিধাজনক নহে, তথাপি একল্যাম্পসিয়া পীড়ায় উহার ঐ কুফল তেমন দেখা যায় নাই। অতএব সর্ব্ব বিধায়ে মর্ফিয়া প্রয়োগ নিরাপদ এবং আশাপ্রদ।

(২) ক্লোরোফরম।—শরীরে যে কোনও বিষ প্রবিষ্ট হইলেই তাহার অধিকাংশই যকৃতে যাইয়া জমিয়া থাকে। একল্যাম্পসিয়াতে যে কোনও এক প্রকারের বিষ শরীরে সঞ্চারিত হয়। তদবস্থায় ক্লোরোফরম দ্বারা যকৃতকে আরো বিষাক্ত করা অবিবেচনার কার্য্য বিধায়ে, অনেকেই ক্লোরোফরম আঘ্রাণ করাইতে পরামর্শ দেন না। কিন্তু ১০।১৫ মিনিট ঐ ঔষধ Junker's Inhaler দ্বারা ব্যবহার করাইলে কোনও বিশেষ অনিষ্ট হইবার তাদৃশ আশঙ্কা নাই। ফল কথা, ক্লোরোফরম বেশী দেওয়া অযৌক্তিক হইলেও, বিপদে পড়িয়া কিছু কিছু দিতে তাদৃশ বাধা নাই।

(৩) ক্লোরাল হাইড্রেট।—ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদক এবং অতি সহজেই রক্তচাপ কমাইতে পারে। সুখের বিষয় এই যে, একল্যাম্পসিয়া ব্যাধিতে সাধারণতঃ রক্তচাপ খুব বেশী থাকে। এ কারণে ঐ ঔষধের ব্যবহার করা প্রায় সকল অবস্থাতেই নিরাপদ। ক্লোরাল প্রয়োগ করিয়া উপকারের আশা করিতে হইলে, অন্ততঃ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় উহাকে

প্রয়োগ করিয়া ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ ৩½ ড্রাম মাত্রা প্রয়োগ করাই বিধি।

(৪) Renal Decapsulation—অর্থাৎ বৃক্কযন্ত্রের আবরণীর উন্মোচনরূপ অস্ত্রোপচার। সম্পূর্ণরূপে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যাইলে, এই অস্ত্রোপচার করা উচিত—নতুবা অবিবেচনার বশে সকল রোগিনীর প্রতি এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োগ হওয়া অনুচিত।

(৫) Lumbar Puncture—অর্থাৎ কোমরেস্থিত কশেরুকার অন্তর্ব্বর্ত্তীস্থানে সূচি দ্বারা, মেরুদণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ Cerebro fluid এর কিয়দংশ বাহির করিয়া লওয়া। ইহার কোনও রূপ স্থায়ী ফল জানা নাই।

(৬) Vaginal Caesarean section—অর্থাৎ যোনিপথে অস্ত্রোপচার করিয়া শিশুকে জরায়ু হইতে নিষ্কাশন করা। এটি শুনিতে যত সহজ, কার্য্যে তাদৃশ নহে। এই অস্ত্রোপচারের সাহায্যে দশ মিনিটের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়; কিন্তু রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অপরের পক্ষে এই অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়া বিশেষ কঠিন বলিয়াই মনে হয়। যে স্থলে বসির প্রসারক যন্ত্র (Bossi's dilator) ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, সেই অবস্থার পক্ষে এই প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচার করিতে পারিলে বিশিষ্ট ফলপ্রদ হয়। স্থুলভাবে বলিতে গেলে, এই এই অবস্থার পক্ষে এই প্রক্রিয়ার অস্ত্রোপচার বিশিষ্টরূপে উপযোগী—গর্ভকাল ৫।৬ মাসের বেশী নয়। জরায়ু গ্রীবা প্রসারিত হয় নাই এবং জরায়ুর দেহের সহিত মিশিয়া যায় নাই (cervix has not been taken up by the body of the uterus.)

(৭) Bossi's Dilator—ডাঃ বসি-কৃত জরায়ু-গ্রীবা প্রসারক যন্ত্র। ইহার ব্যবহারে অনেক কুফল ফলিবার আশঙ্কা আছে। যে স্থলে জরায়ুগ্রীবা কুঞ্চিত হইলেও বেশী মাত্রায় জরায়ুর দেহের সহিত মিলিত হইয়া গিয়া, মাত্র একটি গোলকে (ring) পরিণত হইয়াছে, সেই স্থলেই এই যন্ত্র নিরাপদে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৮) একল্যাম্পসিয়া আরম্ভ হইলে, পূর্ব্বোক্ত Vaginal caesarean section ও Bossi's Dilator যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে, সত্বর প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এবং যে স্থলে একল্যাম্পসিয়া আরম্ভ হয় নাই অথচ হইবার উপক্রম হইতেছে মাত্র, সে স্থলে অঙ্গুলি ও অন্যান্য মৃদু বলশালী প্রসারক যন্ত্রের সাহায্যে জরায়ুর গ্রীবা প্রসারিত করিয়া প্রসব ক্রিয়া সত্বর সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কেহ কেহ এমন কি জরায়ু গ্রীবাকে ছিন্ন করিয়া সত্বর প্রসব করাইবার পরামর্শও দেন। কিন্তু একটি কথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত; সেইটি এই—যে, যদিও সত্বর প্রসব করাইলে গর্ভিণীর বিপদ অনেক পরিমাণে কমিয়া আইসে, তথাপি একল্যাম্পসিয়াতে রক্ত-দুষ্টির (sepus) সম্ভাবনা অত্যধিক বিধায়ে হঠকারিতার বসে কোনও অস্ত্রোপচার করা অনুচিত। তবে, যেখানে গর্ভিণীর চৈতন্য একবারে লোপ পাইয়াছে, জ্বরের প্রাবল্য লক্ষিত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে যদি তাহার নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয়, তবে সকল রকমেরই বল প্রয়োগ যুক্ত অস্ত্রোপচার (accouchement force) করা যাইতে পারে। নতুবা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রসব হইতে দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। কিন্তু নাড়ীর মুখ প্রসারিত হইলে, ফরসেপ্সের ব্যবহার করিতে প্রত্যবায় নাই এবং শিশু মৃত হইলে, craniotomy করাও যাইতে পারে।

(৯) ভিরাট্রাম্ ভিরিডির—প্রয়োগ বিপজ্জনক। কর্পূর ও কেফাইনি সংযোগেও এই ঔষধ দিয়া লাভ নাই।

(১০) নাইট্রোগ্লিসারিণ—সেবন করাইলে অথবা অধস্ত্বাচিক প্রয়োগ করিলে, বিশেষ কিছু সুফল পাওয়া যায় না। মাঝে হইতে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ আসিয়া জুটে।

(১১) ঘর্ম্মকারক বিধিগুলি অকর্ম্মণ্য ও বিপজ্জনক। গরম কম্বলে গর্ভিণীকে আবৃত করিয়া রাখিলে অথবা গরম জলে গা মুছাইলে ঘর্ম্ম নিঃসারিত হয় বটে, কিন্তু ঘর্ম্মের সহিত এক বিন্দুও একল্যাম্পসিয়ার বিষ বহির্গত হয় না; বরং রক্ত হইতে কিয়ৎপরিমাণে জলীয়াংশ চলিয়া যাওয়ায়, রক্ত গাঢ় হইয়া পড়ে—এবং কাজে কাজেই বিষের মাত্রা রক্তের পরিমাণের অনুপাতে বেশী হইয়া অপকার ভিন্ন রোগিনীর কোনও উপকার করে না। এইজন্য ঘর্ম্মের জন্য চেষ্টা করা অনুচিত।

(১২) রক্তমোক্ষণ করা।—সত্য বটে, রক্তমোক্ষণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লবণাক্ত জল শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে রোগিনীর ক্ষণিক উপকার করে; কিন্তু রক্তপাতের জন্য পরে গর্ভিণীর নানা দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতে পারে।

(১৩) থাইরয়েড বা প্যারাগ্যাংগ্লিন।—মিক্সিডিমার লক্ষণ না থাকিলে ইহার প্রয়োগে তেমন কাজ পাওয়া যায় না।

মন্তব্য।—প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য—

(১) গর্ভিণীকে কতকগুলি বিপদ সূচক লক্ষণের বিষয়ে জ্ঞাত করান। একত্রে বা স্বতন্ত্রভাবে এই লক্ষণগুলি উপস্থিত হইলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া চাই :—

ক্রমাগত মাথা ধরিলে!
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৃত্য করিলে,
প্রস্রাব ক্রমশঃই কমিয়া আসিলে,
গাত্র বমন থাকিলে,
পা ও মুখ ফুলিলে,
মধ্যে মধ্যে চক্ষে অন্ধকার দেখিলে,

(২) উপরোক্ত এই লক্ষণগুলি একত্রে বা স্বতন্ত্র ভাবে হইলেই গর্ভিণীকে এই এই করিতে আদেশ করিবেন :—

(ক) গর্ভিণী শয্যা গ্রহণ করিবেন।

(খ) লবণ ও কঠিন খাদ্য মাত্রই ত্যাগ করিয়া দুধ ও জল এবং ফলাদির রস সেবন করিতে থাকিবেন। এবং

(গ) চিকিৎসককে সংবাদ দিতে ক্ষণ বিলম্ব করিবেন না।

(৩) ছয় মাসের সময় হইতে ১৫।২০ দিন অন্তর গর্ভিণীর প্রস্রাব পরীক্ষা করিবেন।

(৪) মাঝে মাঝে গর্ভিণীর রক্ত চাপ (blood pressure) কত তাহা নির্ণয় করা চাই।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী।

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-রত্ন।

"Screw not the cord too sharply,
lest "it snap."
(Tennyson)

"Mens sana in corpore sano."
(A sound mind in a sound body).
(Chavasse)

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর ফলে এ দেশের শিশু, বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণ চিররুগ্ন অকর্ম্মণ্য, জড় এবং অকালে নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুলির উল্লেখ করিব। ভরসা করি, বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক জনক জননী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ত্তা মহোদয়গণ আমাদের লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষগুলির উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, কি প্রণালীতে শিক্ষাপ্রদান করিলে তাহা শিশু ও বালক বালিকাগণের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী হইবে, তাহাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদ্বয়ের মতামতও সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল।

খ্যাতনামা ডাক্তার চাভাসি লিখিয়াছেন :—"আমি (চাভাসি) শিশু-পাঠশালা পছন্দ করি, যদি তাহাতে শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। শিশুগণকে ৩।৪ ঘণ্টাকাল পাঠশালায় রাখিবে এবং সামান্যভাবে অল্প পরিমাণে শিক্ষা দিবে; কিন্তু ঐ শিক্ষা পরিশ্রমের সঙ্গে না হইয়া আমোদচ্ছলে হওয়া আবশ্যক।" (1)

তিনি অন্য স্থলে লিখিয়াছেন :—"পাঠশালায় শিক্ষা না দিয়া বাটীতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ, বাটীতে শিশু সর্ব্বদা মাতার বক্ষের উপর থাকে। স্কুলের মন্দ বালক বালিকাদের সহিত মিশিয়া সেও মন্দ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অত্যধিক মস্তিষ্ক-চালনা করিতে হয় না। এ ভিন্ন, পাঠশালায় বদ্ধ থাকিলে বালক বালিকারা অঙ্গচালনা করিতে পারে না ও ক্ষুধার সময় আহার করিতে পায় না।"

বিখ্যাত ডাক্তার টেনার মহোদয় তাঁহার "বালচিকিৎসা" গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পিতা মাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন। শিশুগণ যাহাতে নীরোগ ও বলিষ্ঠ হইয়া সুস্থচিত্তে বিদ্যাভ্যাস করে, এমত প্রণালী অবলম্বন করিবেন। শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতা অতি ধীরভাবে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইবেন। শিশুশিক্ষায় যেন কোন কঠিন বিষয় না থাকে।"

চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদ ডাক্তার লিন্‌কন্ বক্ তাঁহার "স্বাস্থ্যরক্ষার" ২য় খণ্ডের ৬১৫ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন :—"যে শিক্ষাপ্রণালী শিশুদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ হওয়ার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে পাঠাভ্যাস করিতে বাধ্য করে, সে শিক্ষাপ্রণালী অতিশয় দূষণীয়; এ ভিন্ন, শিশুদিগকে বিষয় না বুঝাইয়া কেবল কণ্ঠস্থ করিতে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়।"

মহামান্য স্পেন্‌সার মহোদয় বলিয়াছেন :—সন্তানগণ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতা মাতা মনে করেন, ইহা দৈব ঘটনা, ভগবানের অভিশাপ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলির প্রতি অবজ্ঞার ফলেই যে সন্তানগণ ঐরূপ দুর্ব্বল, জড়, রুগ্ন ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

উক্ত খ্যাতনামা ডাক্তার চাভাসি মহোদয় আর এক স্থলে লিখিয়াছেন :—"বর্ত্তমান সময়ে বালক বালিকাগণ অতি উচ্চ বা দুরূহ বিষয় শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাহাদের মস্তিষ্ক অত্যধিক পরিমাণে পরিশ্রান্ত ও দুর্ব্বল করা হয়। ইহার ফলে তাহারা যৌবনকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় দুর্ব্বল বা বিকৃত হইয়া যায়। পূর্ব্বে যুবক ও যুবতীগণ যাহা শিখিতেন, এক্ষণে বালক বালিকারা তাহাই শিক্ষা করিতেছে। এই অতিশিক্ষা বশতঃ অনেক বালক বালিকার জীবনরজ্জু ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।" (2)

(1) "I do, if the arrangements be such that health is preferred before learning. Let children be only confined for three or four hours a day and let what little they learn be taught as an amusement rather than as a labour. (See Chavasse's Advice to a Mother. P. 196)

(2) "Children at the present day are too highly educated—their brains are over-taxed, and thus weakened. The consequence is, that as

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বালক ও যুবকগণের কি কি কারণে গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, তাহাই নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। স্কুলের সময়।—আমাদের দেশের বালক বালিকাগণ পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এ ভিন্ন আমাদের মধ্যাহ্ন-আহারই প্রধান আহার। আমাদের বালক বালিকাগণ ১০টা কি ১০॥ টার সময় তাড়াতাড়ি গরম গরম ভাত, দাল, তরকারী ইত্যাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া স্কুলে গমন করে। একদিকে বালক বালিকাগণের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে থাকে, অন্যদিকে তাহারা দুরূহ বিষয়গুলি চিন্তা করে। শরীরও মস্তিষ্কের দুইটী বিভিন্ন ক্রিয়া এক সময়ে সমভাবে কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। বালক বালিকাগণ পিতা মাতা ও শিক্ষকের তাড়নায় মানসিক চিন্তা বা পরিশ্রম হইতে এক মিনিট্‌কালও অবকাশ পায় না, সুতরাং তাহাদের পরিপাকশক্তি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, এসিডিটি, উদরাময় প্রভৃতি নানা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এ দেশের বালক ও যুবকগণ প্রাতে ও বৈকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। মধ্যাহ্নকালে অর্থাৎ প্রখর সূর্য্যোত্তাপের সময় তাঁহারা বিশ্রাম করিতেন। আমাদের মানসিক অবস্থাও সকল সময়ে সমান থাকে না। পূর্ব্বাহ্ণে মানসিক অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ থাকে। অতএব ঐ সময়েই আমাদের দেশের বালকগণের কঠোর মানসিক পরিশ্রম করা উচিত। বিদ্যাভ্যাসের সময় মানসিক শক্তি কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় হয়; এ ভিন্ন মনের সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মন ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইলে সঙ্গে সঙ্গে শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে দুইপ্রহরের সময় আমাদের শিশু ও বালক বালিকাগণ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করাতে তাহাদের গুরুতর ভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে। আমরা এ দেশের প্রত্যেক জনক জননীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সমীপে এই বিষয়ে বিশেষ কৃপাদৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

২। বিদ্যালয়।—এ দেশের অধিকাংশ পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ এবং কোন বিষয়েই স্বাস্থ্যকর নহে। যে গৃহে অসংখ্য ছাত্র প্রখর সূর্য্যোত্তাপের সময় আবদ্ধ থাকে, সেই গৃহে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক প্রবাহিত হইতে পারে, এইরূপ বন্দোবস্ত থাকা উচিত। এ ভিন্ন, ঐ গৃহের মেজে শুষ্ক ও উচ্চ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশে ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যোপযোগী একটী স্কুল-গৃহও আছে কি না সন্দেহ। বহুসংখ্যক ছাত্রের প্রশ্বাস-পরিত্যক্ত বায়ুতে গৃহের বা কুঠরীর বায়ু অতি শীঘ্রই দূষিত হইয়া যায়। অনেক বালক বালিকা ঐ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া হাই তুলিতে থাকে এবং নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়ে। শিক্ষকেরা মনে করেন যে, বালক বালিকারা পাঠে নিতান্ত অমনোযোগী; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক সময়েই স্কুল-গৃহের ঐ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া বালকদের আলস্য ও শারীরিক অবসন্নতা উপস্থিত হয়। গ্রাম্য পাঠশালার গৃহের মেজে অত্যন্ত ভিজা, জানালার অভাবে গৃহে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। আবার কোন কোন পাঠশালায় গৃহের বেড়া নাই, রৌদ্র বৃষ্টি অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ঐরূপ পাঠশালার দোষেও শিশুগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে।

they grow up to manhood if they grow up at all, they become fools! Children are now taught what formerly youths were taught. The cord of a child's life is often snapped asunder in consequence of over education." (See ditto P. 197)

বোষ্টন নগরের বিখ্যাত ডাক্তার লিন্‌কনের মত এ স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। তিনি লিখিয়াছেন :—"যে গৃহে অধিক সংখ্যক বালক বাস করে, সে গৃহের বায়ু অতি শীঘ্রই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। বাসগৃহ অপেক্ষা বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক দ্বার ও বাতায়ন থাকা উচিত। স্কুলগৃহের চতুর্দ্দিকে ৫।৬ হাত বারান্দা থাকা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের মেজে উচ্চ ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট শূন্য স্থান থাকা উচিত। বালকদিগের ব্যায়ামের জন্য সুবিস্তীর্ণ স্থান থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ের বালকগণ যেস্থানেই উপবেশন করুক না কেন, সকল স্থানেই যেন তাহারা প্রচুর আলোক পায়, এমত জানালা থাকা আবশ্যক। জানালার উপরিভাগ ছাদের যত নিকটবর্ত্তী করা যাইতে পারে, ততই ভাল হয়। বালক বালিকাদের সম্মুখে কোন জানালা রাখা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, ঐ জানালা দিয়া যে আলো প্রবেশ করে, তাহাতে বালক বালিকাদের চক্ষুর পীড়া হইতে পারে। অতএব বামপার্শ্বে ও পশ্চাতে জানালা রাখিবে। সমস্ত জানালার পরিমাণ-ফল একত্র-যোগে গৃহের মেজের ছয় অংশের এক অংশ হওয়া উচিত।"

এরিস্‌মানের মতে "আদর্শ স্কুলগৃহ দৈর্ঘ্যে ১২ মিটার (এক মিটার ২ হাত ৪ অঙ্গুলী অর্থাৎ ৪২ অঙ্গুলী), প্রস্থে ৭ মিটার ও উর্দ্ধে ৪ মিটার হওয়া উচিত।"

আজকাল মফঃস্বলের অনেক স্কুলগৃহই (বিশেষতঃ পূর্ব্ব বাঙ্গালায়) টীন (করগেটেড্ আয়রন) দ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই টীনের গৃহগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। দুই প্রহরের সময় যখন প্রখর সূর্য্যোত্তাপে টীনগুলি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়, তখন তাহার নীচে এক তিলার্দ্ধ কালও দাঁড়ান কি বসা যায় না। অথচ আমাদের কচি কচি ছেলে মেয়েগুলি ঐ দুপুর বেলার প্রখর সূর্য্যোত্তাপের সময় ৪।৫ ঘণ্টা কাল অল্প-পরিসর স্থানে আবদ্ধ থাকে। ঐ সময় ছেলে মেয়েগুলি ঐ উত্তপ্ত টীনের গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া যে কি ভীষণ অসহ্য যাতনা অনুভব করে, তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য। ফলতঃ এই টীনের গৃহে শিশু ও বালক বালিকাগণকে দুপুর বেলা আবদ্ধ করিয়া রাখায়, অনেক শিশু ও বালকের চক্ষুরোগ, শিরঃপীড়া, বমন, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি নানা উৎকট রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মহাত্মারা যে কি মোহনিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। দেশের এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর প্রথা তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রচলন করিয়া সমাজের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন কেন? যাহা হউক, স্কুলগৃহ টীনের হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা দালান তৈয়ার করিতে পারেন না, তাঁহাদের স্কুলের জন্য খড়ের ঘর প্রস্তুত করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন, খড়ের ঘরে আগুনের ভয় আছে। কিন্তু কবে কোন্ দিন দৈব ঘটনায় আগুন লাগিবে, এই চিন্তা করিবার যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা প্রতিদিন কচি কচি ছেলে মেয়েগুলিকে অতি ভীষণ উত্তপ্ত টীনের উত্তাপে পুড়াইয়া মারিতেছেন, ইহা যে চিন্তাপথে আনিতে পারেন না, ইহা অতি আশ্চর্য্য ও লজ্জার বিষয় নহে কি? যাহা হউক, এ দেশের প্রত্যেক পিতা মাতার সমীপে আমরা এই গুরুতর বিষয়টী উপস্থিত করিতেছি; তাঁহারা কখনও টীনের স্কুল-ঘরে ছেলে মেয়েকে পাঠাইবেন না। তাঁহারা ছেলে মেয়ে না পাঠাইলে, কর্ত্তৃপক্ষগণের আপনা হইতেই চৈতন্য হইবে ও তাঁহারা প্রতিকারের পন্থা দেখিতে বাধ্য হইবেন।

৩। পরীক্ষাপ্রণালী (Competitive system)।—পাশ্চাত্য দেশের প্রথা এ দেশে যতই প্রচলিত হইতেছে, ততই আমরা নানা প্রকারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছি। ম্যালেরিয়া, অতিচিকিৎসা ইত্যাদি যে প্রকারে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে,

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীও ক্রমশঃ আমাদিগকে সেই প্রকার স্বাস্থ্যবিহীন করিয়া ফেলিতেছে। এই আড়াআড়ি পরীক্ষার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রথাতেও আমাদের অসংখ্য বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, বাৎসরিক পরীক্ষা, তৎপরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, আই-এ, বি-এ, এম-এ, বি-এল প্রভৃতি পরীক্ষার ত্রাস, উৎসাহ, অনুৎসাহ, দুশ্চিন্তা, অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অল্পাহার, অনিয়মিত আহার, অতি হর্ষ, অতি বিষাদ, অপমান প্রভৃতি কারণে বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের শরীর ও মনে বিশাল বিপ্লব জন্মাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য এই সকল কারণেও এ দেশের অধিকাংশ বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের শরীর ও মন, চিরকালের জন্য রুগ্ন হইয়া যায়।

প্রাচীন কালে এ দেশে এ সকল ত্রাসোৎপাদক পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। ছাত্র সদ্বিদ্যাশালী হইলে গুরু তাহাকে উপযুক্ত উপাধি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিতেন। পরে ছাত্র সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া নিজের প্রতিভা দেখাইয়া ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেন। ষোল বৎসর কাল যে ব্যক্তি টোলে অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তিনি বিদ্বান্ হইতেন; বিশেষতঃ সুস্থ শরীর ও মন লইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন; আর কাজকাল যাঁহারা ষোল বৎসর কাল বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের শরীর ও মন উভয়ই একেবারে রুগ্ন ও বিকৃত হইয়া যায়। তাঁহারা এক দিকে বিদ্বান হন্ কি না বলা যায় না; কিন্তু বাকী সকল দিকেই যথেষ্ট মূর্খতার পরিচয় দেন। (3)

বর্ত্তমান "বিশ্ববিদ্যালয়ের" কর্ত্তৃপক্ষগণের সমীপে আমরা উপরিউক্ত বিষয়গুলি উপস্থিত করিতেছি।

(3)—"They become fools" (Chavasse)

৪। ছাত্রাবাস (Student's mess)।—এ সম্বন্ধে আজকাল সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এ দেশের ছাত্রাবাসগুলির একটীও স্বাস্থ্যকর নয়। অল্প-পরিসর কুঠরীতে বহু ছাত্র বা ছাত্রীর একত্র বাস, বড় বড় সহরে বাস, অপুষ্টিকর খাদ্য আহার, সংযম শিক্ষার অভাব, ধর্ম্মনীতিহীন শিক্ষার প্রভাব ইত্যাদি নানা কারণে এ দেশের বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের গুরুতর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

৫। পাঠ্যপুস্তক-বিভ্রাট।—নিম্ন প্রাইমারী হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পাঠ্যপুস্তক-বিভ্রাট দেখা যায়। এই পাঠ্য-পুস্তক-বিভ্রাটেও আমাদের দেশের বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। কচি কচি ছেলে মেয়েগুলিকে ৫।৭ বৎসর হইতেই রাশি রাশি পুস্তক বা বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে হয় এবং অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হেতু তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, আজকাল আমাদের দেশের বালক বালিকাগণকে বাধ্য হইয়া বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে হইতেছে। এই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে বালক বালিকাগণকে অত্যন্ত কঠোর মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। এই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হেতু বালক বালিকাগণের মন ও শরীর একেবারে দুর্ব্বল হইয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পাঠ্যপুস্তক-বিভ্রাট বিদূরিত করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

৬। পরীক্ষা-বিভ্রাট।—পরীক্ষা-বিভ্রাটের জন্যও আমাদের দেশের অনেক বালক বালিকার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। আজকাল নানা কারণে অনেক বালকই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার শোক অতুলনীয়; ইহাতে আহারে রুচি থাকে না, রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, দুঃস্বপ্নের আধিক্য হয়, লোকের নিকট মুখ দেখাইতে কষ্ট ও লজ্জা

বোধ হয়। এ ভিন্ন, বিদেশে পলায়ন, নির্জ্জন গৃহে ক্রন্দন, শরীরের রক্তশোষণ, আত্মহত্যা ইত্যাদি উপসর্গও আছে।

৭। শিক্ষনীয় বিষয়।—বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের বালক বালিকাগণের শিক্ষনীয় বিষয়গুলি স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। এ বিষয়ে অনেক কথাই পরে বলা হইবে।

৮। বিদ্যারম্ভের বয়স।—শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর হইলে তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়া অতি সামান্য ভাবে শিক্ষা দিবেন। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার ট্যানার্ মহোদয় তাঁহার "শৈশব ও বালচিকিৎসা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"বালক বালিকাগণকে অল্প বয়সে, বিশেষতঃ যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহাদিগকে শিক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শস্যক্ষেত্র যেমন বিলম্বে ফলিতে আরম্ভ হইলে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে, বালক বালিকাদিগকেও সেইরূপ বিলম্বে শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিলে তাহারা অল্প আয়াসেই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে।"

"বালকের বয়স ৬।৭ বৎসর হইলে তাহাকে বর্ণের আকার পরিচয় করিতে দিবে; কিন্তু তাহাতে যেন শিশু কোন প্রকার বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব না করে।"

বিখ্যাত ডাক্তার চাভাসি মহোদয় বলিয়াছেন :—

"বালকের বয়স ৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মস্তিষ্কের কার্য্য অতি সামান্য পরিমাণে করিতে দিবেন। পিতা মাতা এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। সন্তানকে তাড়াতাড়ি উপযুক্ত করার লোভ কখনও করিবেন না। সন্তানের মস্তিষ্ক যাহাতে সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে, তাহা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে; তাহা হইলেই যথাসময়ে মস্তিষ্ক নিয়মিত পরিশ্রম করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে।" (4)

(4) "The brain must have but very little work until the child be eight years old. Impress this advice upon your memory, and let no foolish ambition to make your child a clever child allow you, for one moment, to swerve from this advice.' "Build up a strong healthy body, and in due time the brain will bear a moderate amount of intellectual labour." (See Advice to a Mother, by Dr. Bull, P. 198)

এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সিভিল সার্জ্জন, শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মদাস বসু এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"অজ্ঞতা হেতু কত শত বঙ্গীয় পিতা মাতা পঞ্চমবর্ষীয় বালককে দুই তিন খানি পুস্তক পড়াইয়া, নামতা ও অঙ্ক শিক্ষা দিয়া, বন্ধুবর্গের সমক্ষে যখন প্রদর্শন করেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মনে আনন্দের আর সীমা থাকে না; কিন্তু ঐরূপ করাই যে তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারেন না।"

"অতএব সকলেই ৭।৮ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানগণকে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত পীড়ন করা অদূরদর্শিতা ও অমঙ্গলকর ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

ভগবান্ মনুও ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপনয়ন বা বিদ্যারম্ভের কাল গর্ভাষ্টমে (গর্ভের আরম্ভ সময় লইয়া অষ্টম বর্ষ হইলে গর্ভাষ্টম বলে) বিধান করিয়া গিয়াছেন; যথা :—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্।"

(মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৩৬ শ্লোক)

৯। বিদ্যাভ্যাসের সময়।—এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা ডাক্তার লিন্‌কন্ বক্ মহোদয় তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষা গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"শিশুদের পক্ষে ৩ ঘণ্টা কাল বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। কিন্তু ঐ তিন ঘণ্টা কাল পুস্তক না পড়াইয়া মুখে মুখে বা ছবি অথবা বাহ্য জগতের নানাবিধ পদার্থ দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ৪ ঘণ্টাই যথেষ্ট। পূর্ণবয়স্ক যুবকদিগের পক্ষে দিবা রাত্রিতে ৮।৯ ঘণ্টার অধিক কখনই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য নহে।"

বিখ্যাত সিবিল সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু, এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—"এ দেশের (আমাদের দেশের) বলিষ্ঠ ও নীরোগ ছাত্রদের দিবা রাত্রিতে ৮ ঘণ্টার অধিক কখনই পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নয়। দুর্ব্বল প্রকৃতির ছাত্রদের ৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত। ইহার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে নিশ্চয় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যাইবে।"

"জনক জননীগণ তাঁহাদের বালকগণকে পাঠের সময় মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বদা পাঠাভ্যাস করিতে দিবেন না। মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বদা পাঠ করিলে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয় ও ঐ রক্তের চাপ চক্ষু প্রভৃতি যন্ত্রের উপর পতিত হয় এবং এই কারণে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে।"

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া।

বঙ্গীয় গবর্মেণ্টর স্বাস্থ্য বিভাগ (Department of Public Health) বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া ও তাহার কারণ সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের ডাইরেক্টর ডাক্তার বেণ্টলি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ম্যালেরিয়ার প্রভাবে বাঙ্গালার অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে; আর ১৮৯২ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নিয়মিত ভাবে জন্মের হারের অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হইতেছে। ডাক্তার বেণ্টলি বিবেচনা করেন, বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার সহিত বাৎসরিক বারিপাতের পরিমাণ, ধান-চাউলের মূল্য, বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রভৃতি ব্যাপারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। বাঙ্গালার মন্ত্রী মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী জাতটা মরিতে বসিয়াছে। ডাক্তার বেণ্টলি হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, মন্ত্রী মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ডাক্তার বেণ্টলি বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার যে বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বাঙ্গালার কয়েকটি জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রভাব এত অধিক যে, ১৮৯২ সাল হইতে এমন একটী বৎসর যায় নাই, যে বৎসরে জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক ছিল। অথবা কোন জেলার সৌভাগ্য ক্রমে যদিই সে জেলায় কোন বৎসর জন্মের হার মৃত্যুর হারের অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই দুই হারের মধ্যে ব্যবধান অতি নগণ্য। সে সৌভাগ্য কালে ভদ্রে ঘটিয়া থাকে,—তাহা সাধারণ নিয়ম নয়,—নিয়মের ব্যতিক্রম। অপর সকল জেলার অবস্থা এতটা শোচনীয় নয় বটে, কিন্তু গত চারি বৎসর ধরিয়া এই সকল জেলার লক্ষণও ভাল দেখা যাইতেছে না।

এই ম্যালেরিয়া কোন কোন জেলা বিশেষে কিম্বা বাঙ্গালার কোন অংশ বিশেষে আবদ্ধ নয়—দেশের সর্ব্বত্রই সাধারণ অবস্থাই একই রকম—ম্যালেরিয়ার প্রভাব সকল স্থলেই প্রায় সমান। সেইজন্য অনুমান হয়, দেশব্যাপী সাধারণ কারণেই বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার প্রভাব এমন বহুবিস্তৃত। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বঙ্গে জন্মের হার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিবার পর হইতে জন্মের হার আরও অনেক বেশী কমিয়াছে।

সাধারণের বিশ্বাস ছিল, পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে মৃত্যুর পরিমাণ কম। কিন্তু ডাক্তার বেণ্টলি বলেন, সাধারণের এই ধারণা ভ্রান্ত। তিনি যে বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, কয়েক বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের জেলা গুলিতেও জন্মের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে আসিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিভাগে সর্ব্ব প্রথম মৃত্যু সংখ্যা জন্মের সংখ্যাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বেণ্টলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গও ক্রমশঃ ম্যালেরিয়ার প্রভাবে জনশূন্য হইয়া উঠিবে না কি?

ডাক্তার বেণ্টলি মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধির কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ এই—কৃষির অবনতি, ম্যালেরিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব, কৃষিজ দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস। আর, পক্ষান্তরে সুবৃষ্টি, প্রচুর শস্যোৎপাদন, কৃষিজ দ্রব্যাদির মূল্যাধিক্য প্রভৃতি কারণে লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মৃত্যু সংখ্যা কম হয়।

ডাক্তার বেণ্টলি স্থির করিয়াছেন, ৬০ কি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব প্রায় জ্ঞাত ছিল। যে যে বৎসর প্রচুর বারিপাতের ফলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, সেই সেই বৎসর ম্যালেরিয়াও কম থাকে। এ সময় মৃত্যুর হারের অপেক্ষা জন্মের হারও বৃদ্ধি পায়।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার বেণ্টলি কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কতকগুলি নূতন। আর কতকগুলি—তাঁহার পূর্ব্বধারণার সমর্থন মাত্র। সিদ্ধান্তগুলি এই—

(১) অতিবৃষ্টি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ নয়। বরং যে বৎসর বৃষ্টি বেশী হয়, সেই বৎসর স্বাস্থ্যও অনেকটা উন্নত থাকে।

(২) বাঙ্গালাদেশ ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। নদী গুলিতে আজকাল বেশী জল থাকে না। এই কারণে বাঙ্গালার কতকটা স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

(৩) বাঙ্গালার গঙ্গানদীর শাখাগুলিতে জল কম। এই সকল নদীর গর্ভ ভরাট হইয়া জলের পরিমাণ কমিতেছে, এ কথা কিয়ৎপরিমাণে ঠিক বটে, কিন্তু নদীতে জল কম হইবার আরও কারণ আছে। নানা স্থানে নানা রকম বাঁধ থাকার দরুনও জলের গতিরোধ হওয়ায়, দেশের ডাঙ্গা জমির উপর দিয়া স্বাভাবিক ভাবে আগেকার মত বৃষ্টির জল নদীতে গিয়া পড়িতে পারে না। এই বাঁধের দরুনই প্রধানতঃ খাল-বিলগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, এবং খাল, বিলের পথে নদীতে জল আসিতে পারে না। এবং এই কারণে নানা স্থানে জল আটকাইয়া থাকিয়া মশকের বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে।

(৪) স্বাভাবিক ভাবে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা না করিয়া এবং জল নিকাশের পথ খোলা না রাখিয়া বাঁধ তৈয়ার করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। ফলে, ১৯০৭ সালের ড্রেনেজ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বেণ্টলি বলেন, এ যাবৎ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা গিয়াছে, তদনুসারে ড্রেনেজের ব্যাপারটি আগাগোড়া পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতের অনেকটা অংশের বৃষ্টির জল বাঙ্গালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। তা ছাড়া, বর্ষা কালের চারিমাস নিজ বাঙ্গালা দেশেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেইজন্য নিম্ন ভূমিতে যে সকল শস্য জন্মে, যেমন চাউল ও পাট, বাঙ্গালার চাষীরা কেবল সেই সকল শস্যেরই চাষ করিতে পারে; ডাঙ্গা ভূমি—যাহাতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে পারে না,—বাঙ্গালা দেশের ভূমি সে রকম নয় বলিয়া এখানে তদুপযোগী শস্যের চাষ করাও সম্ভব নয়। কারণ, সেরূপ শস্যের চাষ করিলে,—বর্ষা কালে এখানে এত বেশী বৃষ্টি পড়ে যে,—সে সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, যেখানে ধান্যের চাষ হয়, ম্যালরিয়াও সেখানেই বাস করে। এ ধারণা ভুল; কারণ, পূর্ব্ববঙ্গ ও মান্দ্রাজের অনেকস্থলে যথেষ্ট ধান্যের চাষ আছে, অথচ তথায় ম্যালেরিয়া নাই।

ডাক্তার বেণ্টলি আরও বলেন, স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, বাঁধ নির্ম্মিত হইবার পর হইতে এদেশে ম্যালেরিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং সেই জন্যই পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়ার বিস্তার এত বেশী। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে রেলওয়ে ও রাজপথের বাঁধের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৫১ সালে সমগ্র বঙ্গে ১৮০০ মাইল রাজপথ ছিল, এবং একটীও রেলপথ ছিল না। এখন সেই বঙ্গে ১৮০০০ মাইল রাজপথ ও রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে।

ইহার ফলে দেশে জল সরবরাহের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে,—পূর্ব্বের মত খাল-বিল সকল স্বাভাবিক ভাবে জলে ভরিয়া উঠে না। অনুসন্ধানের ফলে স্থির হইয়াছে, বিশেষ সুবিধাজনক তাপ ও বায়ুর

আর্দ্রতার সাহায্য না পাইলে এনোফেল মশক ম্যালেরিয়ার বীজের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে না। স্বাভাবিক তাপ যদি খুব কম কিম্বা খুব বেশী হয়, অথবা বায়ু যদি বেশী শুষ্ক হয়, তাহা হইলে মশকের সংখ্যা খুব বেশী হইলেও আশঙ্কার কারণ নাই। অক্টোবর মাসের পর আবহাওয়ার অবস্থা ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতির পক্ষে অনুকূল নহে। জল খুব বেশী পরিমাণে জমা হইলেই বিপজ্জনক হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ষার সময় অগভীর ডোবা ও খানায় যে জল সঞ্চিত হয়, তাহাই স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে। এক যায়গায় অনেক জল জমিলে সেখানে ম্যালেরিয়াবাহী মশক তেমন জন্মিতে পারে না। কিন্তু ঐরূপ অগভীর ডোবা ও খানায় যে জল জমে তাহাতেই মশকের বংশ বৃদ্ধির খুব সুবিধা হয়। আর ছোট ছোট খানা-ডোবা বড় বড় জলাশয়ের অপেক্ষা শীতল। কারণ ছোট ছোট খানা ডোবার জল বেশী শীঘ্র বাষ্পে পরিণত হয়। বড় বড় জলাশয়ের জল অনেকটা পরিষ্কার; তাহাতে কর্দ্দম বা তত্তুল্য পদার্থ বেশী পরিমাণে মিশ্রিত থাকে না। তাহার ফল এই হয় যে, বড় বড় জলাশয়ের জল মশকের বংশ বৃদ্ধির উপযোগী তাপের অপেক্ষা বেশী তাপ রক্ষা করে। পক্ষান্তরে, ছোট ছোট খানা ডোবার জলের তাপ মশকের বংশ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। তাহাদের গঠনও এ পক্ষে বেশ সুবিধাজনক।

ডাক্তার বেণ্টলি এই সকল আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, যতদূর সম্ভব প্রাচীন পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, এবং মৃত নদীগুলির সংস্কার করিতে হইবে। কাজটা বড় সোজা নয়, কিন্তু তাই বলিয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে না। কৃত্রিম উপায়ে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতে হইবে। এখন সারি সারি লম্বা লম্বা বাঁধ নির্ম্মিত হওয়ায় বিল ও জলাশুলির জল যাতয়াতের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, —সে গুলির সংস্কার সাধন করিয়া, তাহাদের জল যাহাতে নদীতে গিয়া পড়িতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাক্তার বেণ্টলি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার স্বাভাবিক জল-পথগুলি পাকা রকমে খুলিয়া না দিলে ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না। বৎসর কতকের মধ্যেই বাঙ্গালার জন সংখ্যা এতই কমিয়া যাইবে যে, চাষ বাসের পরিমাণও কমিয়া আসিবে, এবং বাঙ্গালার কৃষি সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইবে। যে ভুল করা হইয়াছে, তাহার সংশোধন না হইলে, তাহা নিবারিত না হইলে, সেই ভুল পথে চলিতে থাকিলে, বাঙ্গালার জন সংখ্যার হ্রাস হওয়া কিছুতেই বন্ধ হইবে না, তাহার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইবে, গবর্মেণ্টের রাজস্ব হানিও হইবে।

গবর্মেণ্টও বুঝিয়াছেন যে, নদীগুলির সংস্কার সাধন করিতে হইবে এবং জল সরবরাহেরও সাধারণ ভাবে সুব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাঙ্গালার সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের সকল সৎকাজের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় অর্থাভাব এ ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে বিলক্ষণ বাধা জন্মাইতেছে। সুতরাং জল্পনা কল্পনা, মন্তব্য রিপোর্ট লইয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত হইতে হইবে, পুঁটিমাছের মত ম্যালেরিয়ার হাতে পট পট করিয়া মরিতে হইবে। মরা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই।

বাঙ্গালা কি প্রকৃতই স্বাস্থ্যকর?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীমহেন্দ্র নাথ সেন, বি-এল্।

শাস্ত্রমতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের তারতম্যের কারণ।

আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে জ্বরোৎপত্তির কারণ, প্রতিষেধক বিধি ও চিকিৎসার বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্বরে প্রথম সম্প্রদায়ের লোক খুব কম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোক খুব বেশী ভোগে কেন? প্রথম সম্প্রদায়ের লোক মশারি ব্যবহার করে না, কিংবা কুইনাইন সেবন করে না, অথচ তাহাদিগের জ্বর খুব কম; এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই মশারি ব্যবহার করেন, ও কুইনাইন সেবন করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জ্বর খুব বেশী। পাশ্চাত্য মত যদি ঠিক হইত, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত ফল দেখা যাইত না। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বাস্থ্য প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা কোনও ক্রমে হীন না হইয়া অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইত।

শাস্ত্রমতে ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, প্রথম সম্প্রদায় (মুচী প্রভৃতি) জীবনের প্রধান উপাদান বিশুদ্ধ বায়ু সাধারণতঃ যেরূপ উপভোগ করে, অন্য সম্প্রদায় সেরূপ করিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, ইহারা ঋতু পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। কৃত্রিম সভ্যতার অনুরোধে গ্রীষ্ম-কালে সর্ব্বশরীর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত বা উষ্ণদ্রব্য জলাহার করে না; শীতকালে মাত্র সাধ্যমত গরমকাপড় ব্যবহার করে এবং অগ্নিতাপ গ্রহণ করে। তৃতীয় কারণ, ইহারা জ্বর হইলে প্রধানতঃ উপবাস করে এবং শেফালিকা পত্রের রস প্রভৃতি সামান্য ঔষধ সেবন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রথম শ্রেণীর (কৃষকগণের) অনেকে প্রথম সম্প্রদায়ের মত বসবাস এবং আহার বিহারাদি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা প্রথম সম্প্রদায়ের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু উপভোগ করিতে পারে না; কারণ তাহারা বাটীর নিকটস্থ সার-পচানী কূয়ার দুর্গন্ধময় বায়ু প্রতিনিয়ত সেবন করে এবং পাটের চাষের জন্য অনেক সময় দুর্গন্ধময় বায়ু ও দূষিত জল ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের (খ) শ্রেণীর অর্থাৎ কৃষক ভিন্ন অন্য লোকের সহিত প্রথম সম্প্রদায়ের লোকের অনেক বিষয়ে সাধারণতঃ বিশেষ অনৈক্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই কয়েকটী প্রধান কারণ দেখা যাইতেছে। সহজ জ্ঞানে পূর্ব্বে যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, শাস্ত্রমতেও সেই সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এ কারণ (inductive) বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ সূত্র অবধারণ প্রণালী এবং (deductive) শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সূত্র হইতে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উৎপত্তির কারণ নির্দ্ধারণ প্রণালী অবলম্বনে উপরিলিখিত কারণাবলী স্বাস্থ্যের তারতম্যের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

উভয় শাস্ত্রের সমালোচনা।

পাশ্চাত্য মতে বলা হয় যে, মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর শরীর হইতে বিষাক্ত জীবাণু বহন করিয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করাইলে জ্বর হয়। এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, অন্য কোন কারণে যে জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে

না। আরও এই মত অনুসারে মশক জ্বরোৎপত্তির মুখ্য কারণ নহে,—ইহা গৌণ কারণই মাত্র, এবং জ্বরবীজের বাহক মাত্র। প্রথম ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির জ্বর কিরূপে উৎপন্ন হয়, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তাহার কিছুই বলিতে পারিতেছে না। জগদীশ্বর প্রথম জগৎসৃষ্টি কালে ম্যালেরিয়া রোগী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা কেহই বলিবে না; আর মশক যে প্রথম ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর কারণ, তাহাও পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বলে না। তাহা বলিবাব যো-ই নাই; কেন না, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ হইতে মশকেরা ম্যালেরিয়া-বীজ সংগ্রহ করিয়া সুস্থ দেহে সংক্রামিত করে মাত্র; প্রথম ম্যালেরিয়া রোগী না পাইলে তাহারা ম্যালেরিয়ার বীজও পায় না, কাজেই ম্যালেরিয়া সংক্রামিতও করিতে পারে না। তাহা হইলে প্রথম রোগীর অন্য কারণে জ্বর হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তির যে সব কারণে (যদিও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উহা নির্ণয়ে বর্ত্তমানে অক্ষম) জ্বর হইয়াছিল, অপরেরও সেই সব কারণে জ্বর হইতে পারে; এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অযুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব এই মতকে জ্বরোৎপত্তির মুখ্য কারণ বলা যাইতে পারে না, ইহাকে গৌণ কারণ বলিতে পারা যায়।

মশার কামড়ে জ্বর হয় কি না, ইহা পরীক্ষার জন্য আমি ও আমার কনিষ্ঠ পুত্র ১৩২৫ সালের আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত উপরে একটী কক্ষে বিনা মশারিতে বরাবর শয়ন করিয়াছিলাম। আমাদিগকে মশার কামড়ও সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আমার আদৌ জ্বর হয় নাই; আমার পুত্রের শ্লেষ্মার দরুণ একটু একটু গা গরম বোধ হইয়াছিল মাত্র। উপবাস ও পাচনাদি ব্যবহারে উহা সারিয়া যায়। উপরের ঘরে মশা কম, নীচের ঘরে মশা বেশী। এ কারণ ভাল করিয়া পরীক্ষার জন্য ১৩২৮ সালের আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত আমি নীচের ঘরে একাকী বিনা মশারিতে রাত্রে নিদ্রা যাইতাম। মশার কামড়ে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং ঘুমেরও ব্যাঘাত হইত; অথচ আমি মশারি খাটাইতাম না। আমার বালিশ বিছানা মশার কামড়ে রক্তাক্ত হইয়াছিল; তথাপি একদিনের জন্যও আমার জ্বর হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই সময়ে যশোহরে অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল এবং আমার বাসার পার্শ্বস্থ চারিদিকের পাকা ও কাঁচা বাড়ীতে লোক জ্বরের দরুণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিল; কিন্তু আমার মুহুরী, চাকর, ব্রাহ্মণ, পর্য্যন্ত কেহই জ্বরাক্রান্ত হয় নাই। লোকের প্রতীতির জন্য আমি রক্তাক্ত বিছানা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি।

আমি পূর্ব্বে আরও দেখাইয়াছি যে, যে গ্রামে লোকে জ্বরে বিব্রত, সেই গ্রামের মুচীরা—মশারি ব্যবহার যাহাদের ভাগ্যে জোটে না—তাহারাও বেশ সুস্থ। এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও মশার কামড়ই জ্বরোৎপত্তির প্রধান কারণ বলিয়া কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে? পাঠক নিজেই ইহার মীমাংসা করুন।

পাশ্চাত্য মতে যে প্রতিষেধক উপায় বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ করিতেছি না। মশারির মধ্যে শুইলেও জ্বর হইতে পারে, এবং না শুইলেও জ্বর হয় না, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় যে বৎসর কুইনাইন সেবন করিলে জ্বর হইতে পারে কি না ইহার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়, সেই বৎসর গভর্ণমেণ্ট হইতে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল তাহাতে লেখা হইয়াছিল যে, কুইনাইন সেবন দ্বারা জ্বর নিবারণ করিতে পারা যায় নাই।

পাশ্চাত্য মতে কুইনাইনকে জ্বরের একমাত্র ঔষধ বলা হয়। কিন্তু ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। কুইনাইন একটী তীব্র বীর্য্য জ্বরঘ্ন ঔষধ বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা সকল সময়ে জ্বর বন্ধ হয় না এবং অন্য ঔষধ দ্বারা জ্বর বন্ধ হইতে দেখা যায়। অধিকন্তু

ইহার অযথা ব্যবহারে প্লীহা ও যকৃতের দোষ, শিরোরোগ, দৃষ্টিহীনতা, বধিরতা ও পুনঃ পুনঃ জ্বর, আমরক্ত ও অন্যান্য ব্যাধি হইতে দেখা যাইতেছে। পাঠক প্রণিধানপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ লোকের কুইনাইন্ সেবনের পরিবর্ত্তী অবস্থা কিছুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিলেই এই উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। এই সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র অনেকদিন যাবৎ পীড়িত থাকে। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রভৃতি কয়েকজন চিকিৎসক জ্বর বন্ধের জন্য কুনাইন দিতেন, কিন্তু ইহাতে জ্বর স্থায়ীভাবে বন্ধ হইত না; অধিকন্তু কুইনাইন দেওয়ার পরে আমরক্ত হইত। জ্বর ও আমরক্ত সারিবার জন্য কয়েক বৎসর ইহাকে মধুপুর, দেওঘর, চাইবাসা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া কোন উপকারদর্শে নাই। পরে ইহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ি; এবং কুইনাইন ব্যবহার দরুণ ইহার আমরক্ত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন ইহাকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাই। তাহাতে ইহার জ্বর, আমরক্ত সারিয়া যায়। তখন হইতে ইহার জ্বর হইলে কুইনাইন সেবন করান একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

১৩২৫ সালের বর্ষাকালে আমার স্ত্রীর জ্বর ও মাথার দুইটী শিরায় অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়। একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ইঁহাকে চিকিৎসা করেন এবং জ্বর বন্ধ করার জন্য কুইনাইন দিতে থাকেন। ইহা জ্বর বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক, ভয়ানক শিরঃ-পীড়া উপস্থিত হয়। মাথার যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলে একজন বিচক্ষণ কবিরাজ ইঁহার শিরোরোগ ও জ্বর আরোগ্য করিয়াছেন।

যশোহর সহরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কালীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এক সময়ে প্রবল জ্বর হইয়াছিল। একজন বিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা করেন। তিনি অন্যান্য ঔষধ সহ অধিক পরিমাণে কুইনাইন দিয়াছিলেন। জ্বর সারিল বটে, কিন্তু তদবধি তাঁহার শ্রবণ-শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এখন তাঁহাকে বধির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বনগ্রাম মহকুমার বজরাপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চক্ষুর দীপ্তি কম বোধ হইলে মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার স্যাণ্ডারস সাহেবকে (Dr. Sandors) দেখাইয়াছিলেন। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তিনি বলেন যে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন হেতু চক্ষের মণির নিম্নে আঁশ আঁশ মত রেখা পড়ায় দৃষ্টির বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি তদবধি কুইনাইন সেবন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অবশ্য কুইনাই বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে যথেষ্ট ফললাভ করিতে দেখা যায়। উপবাসাদি দ্বারা শ্লেষ্মা পরিপাক হইয়া শরীর শুষ্ক হইলে অল্প পরিমাণ কুইনাইন খাইলে জ্বর বন্ধ হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় একবার জ্বর বন্ধ হইলে এবং বন্ধ হওয়ার পর কিছুদিন রাত্রে শুষ্ক ও লঘু আহার করিলে উহার পুনরাবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, শরীর হইতে শ্লেষ্মা দূরীভূত হইয়া শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে রোগীকে কুইনাইন দিতে দেখা যায়। এই অবস্থায় বেশী কুইনাইন ব্যবহার না করিলে জ্বর বন্ধ হয় না এবং জ্বর বন্ধ হইলে কিছুদিন পরে সামান্য অপচারেই উহা পুনরাবর্ত্তন করে। তখন পুনঃরায় কুইনাইন দ্বারা জ্বর থামান হয় এবং কিছুদিন পরেই উহা পুনরাগমন করে। তখন রোগীর ম্যালেরিয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হয়। কুইনাইন মহোপকারী ঔষধ বটে, কিন্তু ইহার অযথা প্রয়োগ দোষে ন.নাবিধ পীড়ার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এক্ষণে প্রাচ্যমতের সমালোচনা করা যাউক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে জ্বরোৎপত্তির কারণ পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে। এই মতানুসারে সাধারণতঃ পিত্ত ও শ্লেষ্মার দোষে জ্বর হইয়া থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে জ্বর বেশী হইতে দেখা যায়। বর্ষা হেতু শরীরে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি ও পিত্ত সঞ্চয় হইতে দেখা যায় ও পরিশেষে জ্বর উৎপন্ন হয়। পাঠক দেখিবেন, গ্রীষ্মকালে শরীর গরম থাকে; তখন প্রায়ই জ্বর হয়

না। আর বর্ষাকালে শরীর নরম হইতে থাকে ও হাত পা জ্বালা প্রভৃতি পিত্তদোষ ঘটিতে থাকে এবং জ্বরের প্রকোপ হয়। এ অবস্থায় সাধারণ জ্ঞানে শ্লেষ্মা ও পিত্ত দোষেই জ্বর উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদমতে জ্বরের প্রতিষেধক উপায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই উপায় অবলম্বন করিলে জ্বরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিনা, আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সুন্দর ফললাভ করিয়াছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি।

১৮৮৭ সালে একটী ভদ্রলোক কথোপকথন প্রসঙ্গে বলেন যে ধনে, পলতা ও হেতে পেঁপুলের জড় সিদ্ধ করিয়া খাইলে বর্ষাকালে জ্বর হয় না। আমি ইঁহার মতের উপর নির্ভর করিয়া ধনে ও পটলের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতে আরম্ভ করি এবং কেবলমাত্র আমারই জ্বর হয় নাই; বাসাস্থ অন্য সকলেরই জ্বর হইয়াছিল। এই ফললাভ করিয়া এযাবৎ আমি উহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং বর্ষা ও শরৎকালে জ্বরের হাত হইতে একরূপ অব্যাহতি পাইয়া থাকি। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সময় সময় জ্বর হইত। এই সময়ে আদা লবণ সহ প্রত্যহ খাইলে এবং মধ্যে মধ্যে শেফালিকা পত্রের রস লবণ সহ খাইলে জ্বর হয় না। এই কথা কয়েকটী ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া দেখি যে, প্রকৃতই এই নিয়ম পালন করিলে জ্বর হয় না। লোকমুখে শুনিয়া এই কার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম এবং বুঝিতে পারিলাম যে এই সকল ঋতুতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া জ্বর হয় এবং কথিত নিয়ম প্রতিপালন করিলে উহা বিকৃত হইতে পারে না। পেটের অগ্নি সতেজ থাকে ও সহজ বাহ্যে হয়; সুতরাং জ্বর হইতে পারে না। আমার এই অভিজ্ঞতার ফল প্রথমে নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলন করিয়া সুন্দর ফললাভ করিয়াছি। বিগত ১৩২৪ সালে আমি আমার তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র এবং একটী দৌহিত্রকে উপরোক্ত নিয়মে রাখিয়াছিলাম। তাহার ফলে তৃতীয় পুত্র ও দৌহিত্রটীর এক বৎসর মধ্যে আদৌ জ্বর হয় নাই! চতুর্থ পুত্রের দুই একবার জ্বর হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা অতি সামান্য।

বিগত ১৩২৫ সালে উহাদিগকে এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র এবং কনিষ্ঠা কন্যাকেও এই নিয়মে রাখিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে কনিষ্ঠ পুত্রটী জ্বর ও রক্ত আমাশয়ে প্রায়ই ভুগিত। কিন্তু এই নিয়মে রাখাতে সে এবং অন্যান্য সকলে বেশ ভাল ছিল। ১৩২৫ সালে চারিদিকে ওয়ারফিভার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি স্কুল কলেজাদি অনেকদিন যাবৎ বন্ধ ছিল, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এই নিয়ম প্রতিপালন করায় এবং একাদশী, আমাবস্যা, ও পূর্ণিমায় রাত্রে শুষ্ক আহার করায় পুত্র কন্যাদি সকলেই একরূপ সুস্থ ছিল। ইহার পর হইতে সকলেই এই নিয়মে চলিয়া আসিতেছি এবং জ্বর-জাড়ির হাত হইতে একরূপ অব্যাহতি পাইয়াছি। সময় সময় ছেলেদের একটু অসুখ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে চিন্তা বা বিশেষ কোন উদ্বেগের কারণ হয় না। এখানে একটী বিষয় বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। ১৩২৫ সালের ঋতুর বিষয় স্মরণ করিলে, পাঠক, কালের যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা করিতে পারিবেন। ১৩২৫ সালে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অনবরত এত বর্ষা হইয়াছিল যে এই কালকে গ্রীষ্মকাল না বলিয়া বর্ষাকাল বলা যাইতে পারিত। শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল; কিন্তু ইহার ২০।২১শে পর্য্যন্ত আদৌ জল হয় নাই, প্রখর সূর্য্যকিরণ ও গ্রীষ্ম হইয়াছিল; এই সময়কে গ্রীষ্মকাল বলা যাইতে পারিত। ইহার পর হইতে ভাদ্রের অনেকদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছিল। আশ্বিনের শেষাংশ হইতে শীত আরম্ভ হইয়াছিল এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত শীত হইয়াছিল; এমন কি এই কালকে শীতকাল বলিলেও অত্যুক্তি হইত না!

পৌষমাস শীতকাল, কিন্তু এই সময়ে শীত কম এবং গরম বেশী হইয়াছিল। পাঠক দেখিতেছেন যে, যে মাসে যে ঋতু হওয়া উচিত ছিল তাহা না হইয়া অন্য ঋতু হইয়াছিল। ইহাকে ঋতুর অযোগ বা মিথ্যাযোগ বলা যায়। আর যে মাসে ঋতু সাধারণ নিয়মের বেশী হইয়াছিল তাহাকে ঋতুর অতিযোগ বলা যায়। সেই বৎসর ওয়ার ফিভার বা সামরিক জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, শ্লেষ্মাধিক্য জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি অত্যধিক হইয়াছিল এবং লোকক্ষয়ও অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। প্রাচ্যমতে ঋতু বিপর্য্যয়ই এতাদৃশ পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

এইরূপ প্রাচ্যচিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনে সুন্দর ফললাভ করিয়া থাকি। কোন কোন সময় প্রতিষেধক নিয়ম প্রতিপালন করার ব্যাঘাত হওয়ায় সামান্য জ্বর হয়। বটে, কিন্তু তখন পূর্ব্বোল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনে সুফল দেখা যায়, উপবাস পালনদ্বারা ও জ্বরের কারণ পিত্ত ও শ্লেষ্মার দোষ দূরীভূত হইলে শরীর শুষ্ক ও মন প্রফুল্ল হয়। তখন জ্বরঘ্ন যে কোন ঔষধ দিলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়।

এখানে আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেন (M. Sc.—বঙ্গবাসী কলেজের কিমিতি শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক) যশোহরে আসিয়া জ্বরাক্রান্ত হয়। শীঘ্র শীঘ্র জ্বর বন্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য জ্বর কমিয়া আসিলেই কুইনাইন খাইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে জ্বর বন্ধ হইল না; চতুর্থ দিবসে পেট দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। তখন একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন দ্বারা চিকিৎসা করাই; ৮।৯ দিন পরে জ্বর বন্ধ হয়। ডাক্তার বাবু বলিয়াছিলেন যে অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনই রক্ত পড়ার একমাত্র কারণ। ঠিক এই সময়ই আমার আর একটী পুত্রের জ্বর হইয়াছিল; তাহাদিগকে আমি নিজে পূর্ব্বকথিত প্রাচ্যমতে চিকিৎসা করিয়াছিলাম; ৪।৫ দিন পরে ইহাদিগের জ্বর বিরাম হইয়াছিল। এইরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতে ব্যাধ্য হইয়াছিল যে, ঐরূপ অধিক পরিমাণে অনুপযুক্ত অবস্থায় কুইনাইন না খাইয়া তাহার ভ্রাতারা যে ঔষধ খাইয়াছিল তাহা খাইলে তাহার শীঘ্রই জ্বর বন্ধ হইত ও ওরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না।

এইরূপ ফললাভ করায় অনেককে প্রতিষেধক উপায় ও চিকিৎসা প্রণালীর বিষয় বলিয়া দিয়াছি এবং ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারাও সুন্দর ফললাভ করিয়াছেন জানিয়াছি। আমি পূর্ব্বে প্রবাদ বাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ পাঠে ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, প্রাচ্যমতে গাছ গাছড়ার টোট্‌কা চিকিৎসায় অধিকতর ও দৃঢ়তর ভাবে অস্থাবান হইয়াছি।

পাঠক, বর্ণিত অবস্থা প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখুন, কোন মত বিশুদ্ধ। এই সমুদায় ঘটনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি পাশ্চাত্যমত ভ্রমসঙ্কুল ও আমাদিগের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, এবং প্রাচ্য মতই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করি। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, যদি জল ও বায়ু বিশুদ্ধ হয় এবং লোক সাধ্যমত প্রাচ্য মতানুযায়ী প্রতিষেধক বিধি প্রতিপালন এবং চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা হইলে দেশে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য বিরাজ করিতে পারে। শরীরের ধাতু বিদেশী চিকিৎসা ও অভ্যাস-আচার-ব্যবহারাদি হেতু কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন বিবেচনা পূর্ব্বক চেষ্টা করিলে ইহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে। দুই তিন বার অকৃতকার্য্য হইলেও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

ম্যালেরিয়ার কথা।

লেখক—শ্রীহরিমোহন চৌধুরী।

বাঙ্গালী জাতি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ার কৃপায় ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, তাহা আর বেশী করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। আর বাঙ্গালা সরকার তাহা হইতে প্রজাদের বাঁচাইবার জন্য যে বিশেষ কোন চেষ্টা করেছেন, তাহাত কোথায়ও শোনা যায় না। তবে সম্প্রতি ২।৩ বৎসর যাবৎ ডাক্তার বেণ্টলী ও ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ য়্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটী নাম দিয়া যাহা একটু চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সমুদ্রে বারি বিন্দু তুল্য। আর তাঁহারা যে পথ অবলম্বনে কার্য্য আরম্ভ করেছেন, তাহাতে যে সফল হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে কেহই আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে খবরের কাগজে যতই আলোচনা হয়, ততই দেশের পক্ষে ভাল বলিয়া মনে হয়। তাহাতে দেশের লোকের মতামত জানিয়া সরকারের সেদিকে যেমন লক্ষ্য পড়ে, তেমনি তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ পক্ষেও সুবিধা হইতে পারে। এ জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ যদি খবরের কাগজের সাহায্যে আলোচনা করেন, তবে বোধ হয় ভবিষ্যতে দেশের লোকের একটু উপকার হইতে পারে।

এই ধারণায় আমি, আমার আজীবন পল্লীবাসে ম্যালেরিয়ায় ভুক্তভোগী হইয়া ইহার উৎপত্তির কারণ এবং নিবারণের সহজ উপায় সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধানে যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি, তাহাই সকলকে জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া ইহা লিখিতেছি। এই মত যে আমার একার, তাহা নয়। এখানকার কৃষক ও ভদ্র সকলেই যে এইরূপ মত পোষণ করেন, তাহাও বলা যাইতে পারে

বাঙ্গালার জেলাগুলির মধ্যে ২৪ পরগণা, খুলনা, যশোহর, হাবড়া, হুগলি এই কয়টী জেলায় ম্যালেরিয়ার যতখানি প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছে, এমন বোধ হয় অন্য জেলাগুলিতে দেখা যায় নাই। তন্মধ্যে আবার ২৪ পরগণা, খুলনা ও হাবড়াতেই খুব বেশী বলিয়া মনে হয়। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ যেমন প্রতি বৎসরে বন্যায় ভাসিয়া যায়, পশ্চিম বঙ্গের উপরি উক্ত জেলা কয়টী তেমন কোন বৎসরই প্রায় ভাসে না। এ জেলাগুলিতে বন্যা নাই বলিলেই হয়। এবং ১৩০৭ সালের বন্যা ছাড়া ২৪ পরগণা, নদীয়া প্রভৃতিতে কখন বন্যা হইয়াছে, এ কথা কোন বৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনা যায় না। আর এ সব জেলায় যে নদী ছাপাইয়া কখন বন্যা হইবে, তাহাও মনে হয় না। তবে অতিরিক্ত বর্ষায় যদি কখন ভাসে তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সে আশা খুব কম। এতদ্‌ভিন্ন পূর্ব্ব বঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে বাগান ও বন জঙ্গলের পরিমাণ খুব বেশী। অতএব পূর্ব্ব বঙ্গে যে কারণে ম্যালেরিয়া কম বা যে উপায় দ্বারা তাহা দূর করা যাইতে পারে, পশ্চিম বঙ্গে সে কারণগুলি নাই, বা সে উপায় দ্বারা ম্যালেরিয়া দূর করার কল্পনাও এ ক্ষেত্রে বাতুলতা। এখন দেখা যাক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই ম্যালেরিয়া-প্রধান-জেলা-গুলির পূর্ব্ব অবস্থা কিরূপ ছিল; যাহার জন্য পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না। আর কি জন্যই বা এমন সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এখানে চিরকালের জন্য মৌরশী পাট্টা করিয়া বসিয়াছে।

অন্য জেলার কথা ছাড়িয়া আমার যে জেলায় বাস সেই ২৪ পরগণা জেলার কথাই আলোচনা করিব। এই জেলার ভাগীরথীর ধার হইতে

পূর্ব্বদিকে টাকী যাইতে দেখা যায়, নদী বা খাল দিয়া নিকটবর্ত্তী বিলের বা গ্রামের ও মাঠের জল নিকাশ হইতে পারে, এমন নদী বা খাল মাত্র একটী দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ ও খুলনা লাইনের সোদপুর ও মধ্যমগ্রাম নামে ষ্টেশনের মধ্যে "নাউই" নামে যে খাল কাটা হইয়াছে, তাহা দিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের বা বিলের জল নিকাশের কোনই সুবিধা নাই। ইহার কারণ, খালের মাটী উহার দুই পার্শ্বে ফেলায় দুই পাহাড়ের উচ্চতা নিবন্ধন জল নামিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। উহার পার্শ্ববর্ত্তী বিল সকল হইতে ছোট ছোট খাল কাটিয়া উহার সহিত যোগ করিয়া না দিলে বিলের জল নিকাশের কোনই আশা নাই। মাত্র বারাশত-বসিরহাট লাইট রেলপথ বেলেঘাটার (নাম ফল্‌তি বেলেঘাটা) নিকট যে খালটী পার হইয়াছে, সেই খাল দিয়া উহার পার্শ্ববর্ত্তী মাঠের জল কতকটা বাহির হয়। কিন্তু ঐ খালটী ১২।১৪ ক্রোশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জল নিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বর্ষাকালে বর্ষার জল গড়াইয়া যাহা বাহির হয়, তাহাতে গ্রামকে গ্রাম সাফ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। গ্রামের মধ্যের পুষ্করিণী ও খানা ডোবাগুলি ভরিয়া যায় ও মোহনা দিয়া বা ছোটখাট নালা দিয়া অবশিষ্ট জল নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়েগুলিতে (নীচু ছোট মাঠ) যাইয়া সঞ্চিত হয়। যে বৎসর বর্ষা খুব বেশী হয়, সেই বৎসরই এই সব কুঁড়ের জল বিলে বা খালে যাইয়া পড়িতে পারে। এই হইতেছে ২৪ পরগণা জেলার কলিকাতার উত্তরের গ্রামগুলির জলনিকাশের অবস্থা ও ব্যবস্থা।

এখন দেখা যাক্ গ্রামগুলির পূর্ব্বকালীন অবস্থা কিরূপ ছিল। অন্য জেলার কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ২৪ পরগণা বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই জেলায় বহুকালপূর্ব্বে অর্থাৎ ১।১॥ শত বৎসরের পূর্ব্বে ও নদীর তীর-ভূমি ভিন্ন অধিকাংশ স্থানেই বৃক্ষশূন্য বিলসমূহের মধ্যে উচ্চ উচ্চ ভূমি ছিল, এখন যেমন ২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে দৃষ্ট হয়। আর সেই সকল স্থানে লোক সকল বসতি করিয়া গ্রামে পরিণত করিয়াছে। আমাদের গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের পূর্ব্ব অবস্থার ইতিহাস অতি বৃদ্ধ লোকদের নিকট যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখি এই সকল গ্রামে প্রথমে বড় গাছ যথা আম কাঁটালের বাগান, বাঁশ বাগান এ সব কিছুই ছিল না। ক্রমশঃ গ্রামের লোকেরা আম কাঁটাল খাইবার লোভেই বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ সব গাছ বসায়। ইহার সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে থাকে। আর দেখা যায় যে, মাঠে কেবল ধান, খড় বা ঘাস জন্মে, তাহা মারিবার চেষ্টায় একবার যদি আম কাঁটাল প্রভৃতি বড় বড় গাছ ঐ স্থলে রোপণ করা যায়, তবে মানুষের চেষ্টায় ও ঐ সব বৃক্ষাদির বৃদ্ধিতে সেখানকার ঘাস, খড় প্রভৃতি তেজ করিতে না পারিয়া উহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে, আর সেই সকল স্থানে নানা আগাছার উদ্ভব হয়। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যে ঐ সব আম কাঁটালের বাগানের মধ্যে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভীষণ বনে পরিণত হয়। কলিকাতা সহরে ঐ সমস্ত ফলের চাহিদা ক্রমশঃ বেশী হওয়ায়, আম কাঁটালের বাগান করা একটা চাষের মধ্যে গণ্য হইল। এই সমস্ত স্থানে ভূ-সম্পত্তিশালী যে সমস্ত লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদের ধান-জমি ভিন্ন যে সকল উচ্চ জমী ছিল, যাহাতে গ্রামের লোকের গরু সকল চরিয়া বলবান হইত ও যথেষ্ট দুগ্ধ দান করিত, সেই সমস্ত জমী তাঁহারা আম কাঁটালের বাগানে পরিণত করিলেন। অতি পুরাতন বাগান যাহা বর্ত্তমানে আছে তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, পূর্ব্বে লোকে আম কাঁটালের বাগান নিজ বাড়ী হইতে কিছু দূরেই করিত। পরে ঐ সমস্ত জিনিষের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায়, ঐ ফল সকল চুরি হইতে আরম্ভ

হইল। আর তাহা হইতেই লোকেরা ক্রমশঃ বাড়ীর নিকটেই ঐ সব গাছ পুতিয়া নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে মনস্থ করিয়া এখন এক একখানি গ্রাম বনালয় করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে কলিকাতায় বাঁশের মূল্য খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁশ বাগানের সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

এখন অনেকেরই ধারণা, জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামের মধ্যের খানা ডোবাগুলিতে জল জমিয়া থাকে। আর সেই সমস্ত খানা ডোবায় মশা জন্মিয়া থাকে। তাহারই কামড়ে ম্যালেরিয়া হইতেছে। যাঁহারা বিদেশী শিক্ষা পাইতেছেন ও বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া লইয়া ইহাকেই ধ্রুব মনে করিতেছেন। তাঁহারা ত, যে সমস্ত প্রবীণ লোকেরা গ্রামে আজীবন বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে কিছু জানিয়া এ বিষয়টা ভাবেন না! তাঁহারা সহরে থাকিয়া সহরের স্কুল কলেজে যে শিক্ষা লাভ করিলেন —মশাতে ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করিয়া লোককে কামড়াইয়া ম্যালেরিয়া জন্মাইয়া দেয়—সেই ধারণা মস্তকে লইয়া গ্রামের ম্যালেরিয়া দূর করিবার উপায় আলোচনা করেন। আমি কিন্তু গ্রামের বৃদ্ধ বিজ্ঞ চাষাদের পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই,—"তাহারা বলে মহাশয় গ্রামে যখন থেকে লোকে ঘর বাড়ী করেছে, তখন থেকেই ঐ সব খানা ডোবা আছে। আর তাতে সব বছরেই জল জমিয়া থাকে। মশাও আগে খুব ছিল। তবে পাটচাষের বাড়াবাড়ী থেকে যতটা হয়েছে এতটা ছিল না। আর এতটা গাছ পালা বন জঙ্গল ছিল না। এই যে এদিকে এত গাছ পালা বন জঙ্গল দেখা যাইতেছে, এ কেবল ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যেই বেশী হয়েছে। আগে গ্রাম খুব ফাঁকা ছিল। হাওয়া ঝড়ের মত ব'য়ে যেত, তাতেই সব মশা উড়ে যেত। তবে মশা যে একেবারেই কামড়াত না—তা নয় যথেষ্টই কামড়াত। কিন্তু এ রকম জ্বর হত না। মশাকে আমরা ভয়ও করতাম না। আমরা দেখ্‌ছি, যে কয় বৎসর পাট বেশী হয়েছে, সেই কয় বৎসর জ্বরটা খুব হচ্ছে। আর গরীব লোকে কোন কালেই ত মশারি খাটিয়ে শুত না।" এই সব কথা শুন্‌লে স্বতঃই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে, পাটই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। চাষাদের ঘরে দেখা যায়, কেহই মশারি ব্যবহার করে না। তা'দের মশা যথেষ্টই কামড়ায়; তবু তাহাদের জ্বরের প্রাদুর্ভাব সাধারণ ভদ্র ঘরের লোকেদের তুলনায় খুব কম। আবার দেখা যায়, এক বাড়ীতে হয়ত একই অবস্থায় থকিয়া ৫ জনের মধ্যে ২ জন জ্বরে পড়িল, তিনজন ভাল রহিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহাদের জ্বর হইল, তাহাদের শরীরের ম্যালেরিয়া বিষ বা জীবাণু তাড়াবার ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এমনও অনেক দেখা যায়, যাহার শরীর দুর্ব্বল, সে ভাল রহিল; আর যাহার শরীর বলবান, তাহার জ্বর হইল। বলা যাইতে পারে যে, শরীর বলবান হইলে কি হয়, তাহার ভিতরে রোগ নিবারণের শক্তি কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা ত অনুমানের উপর নির্ভর করা হয়। তার পর ডাক্তারেরা বলেন, মশারির ভিতর শুইয়া দিন রাত গায়ে জামা দিয়া মশার কামড় হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়া হইবে না। কিন্তু বহু ভদ্র ধনবান গৃহস্থের বাড়ীর লোকেরা এ ভাবে নিয়ত শরীরকে রক্ষা করিয়াও ত ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পান না। তাহাই মনে হয়, মশার কামড় ছাড়া ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির অন্য কোন কারণ আছে! আমাদের হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে কবিরাজরা বলেন "ম্যালেরিয়া বলিয়া যে জ্বর, তাহা কোন জীবাণু-সংঘটিত জ্বর নয়। তবে বর্ষার অন্তে শরতের শেষে ও হেমন্তে যে জ্বর হয়, তাহা বর্ষার পর বন জঙ্গল পচার দরুন এক বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয়। তবে সেই বাষ্পের প্রভাবে প্রকৃতির

নিয়মে জ্বরের সময়ে রক্তে যদি কোন জীবাণু উৎপন্ন হয়, তবে তাহা সম্ভব হইতে পারে। আর হেমন্তে পল্লীর প্রকৃতিও এমন বেশ ধারণ করে যে, স্বতঃই সে সময়ে বৈকালে যেন জ্বর ভাব আনিয়া দেয়। এটা অবশ্য উপরি উক্ত কারণকে সাহায্য করে মাত্র।" আর বাস্তবিক এনোফিলিস মশায় যদি ম্যালেরিয়ার বিষকে বহন করে, তবে শীতে গ্রীষ্মেও ত অনেক এনোফিলিস মশা দেখা যায়, তাহারা সে সময় ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করিয়া রোগোৎপাদন করে না কেন? কেবল ম্যালেরিয়ার বিষ হেমন্তেই বহন করে কেন? আর ম্যালেরিয়ার জীবাণু মানুষের রক্তে ও এনোফিলিসের মেয়ে মশার ভিতরেই দেখা যায় কেন? অন্য কোথায়ও দেখা যায় না কেন? যদি বলা যায়, ম্যালেরিয়ার জীবাণু মানুষের রক্তে ও এনোফিলিশ মশার ভিতরই বাঁচিতে পারে, অন্য কোথায়ও যাইলে মরিয়া যায়, তবে এমনও হইতে পারে, প্রকৃতির নিয়মে মনুষ্য শরীরে ও ঐ জাতীয় মশার শরীরেই ঐ জীবাণু স্বতঃই উৎপন্ন হয়। অন্য জন্তুর যেমন ম্যালেরিয়া হয় না, তেমনই অন্য মশার শরীরেও ঐ জীবাণু হয় না। তারপর আর এক কথা। যদি ধরা যায়, মশাতেই ঐ জীবাণু বহন করে, তবে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়, এই জীবাণু মনুষ্য শরীরে প্রথম হয়, কি মশার শরীরে প্রথম হয়। যদি ধরা যায়, মনুষ্য শরীরেই প্রথম হয়, তবে এখনও সেই কারণে স্বতঃ মানুষের শরীরে উৎপন্ন হইয়া মানুষের জ্বর হইতেছে ধরিতে হয়। আর যদি মশার শরীরে প্রথমে হয়েছিল ধরা হয়, তবে এখনও স্বতঃই উহাদের দেহে উৎপন্ন হইতেছে ধরিতে হয়। তাহা হইলে উহারাও মনুষ্যেরই শরীর হইতে অন্যের শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করিয়া ম্যালেরিয়া সংক্রামক করিয়া তোলে, তাহা আর বলা চলে না। যে সময় আমাদের দেশে এত ম্যালেরিয়া ছিল না—অবশ্য পর্য্যায় জ্বর ছিলই, তখন অন্য মশা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও এই এনোফিলিস মশা ছিল না কেন?

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া এবং পল্লীর গরীব বুড়োদের মুখের কথা শুনিয়া এই মনে হয়, আমাদের দেশে পাটের চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াছে। এবং পাট পচার পরেই ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়। পাট অধিক হইলে উহা খানা ডোবায় পচান হয়; আর তাহা হইতে যে দুর্গন্ধ-যুক্ত গ্যাস উঠে, তাহা গ্রামে গাছ পালা বন জঙ্গল বেশী হওয়ার দরুণ উপরে উঠিয়া যাইতে পারে না, বা বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না; উহা গ্রামের মধ্যেই আটকাইয়া থাকে। এ ছাড়া বর্ষার বৃষ্টিতে বন জঙ্গল পচিয়া ও বৃক্ষের নিম্নে পতিত পাতা সকল পচিয়া উহা হইতে যে গ্যাস উঠে, তাহা আবদ্ধ থাকিয়া লোকের নিশ্বাসের সহিত নিয়ত শরীরে ঢুকিয়া ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপাদন করে। সে সময় মশাও খুব উৎপন্ন হয়; আর তাহার কামড়ও জ্বর হওয়ার পক্ষে সাহায্য করে। পাট পচার জন্য ম্যালেরিয়াধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বৎসর মশাও অত্যধিক পরিমাণে জন্মিয়াছিল। মশা যে শুধু বন জঙ্গল পূর্ণ ডোবাতেই হয় তাহার কোন কারণ নাই। পাট পচানি ডোবাতে যেরূপ মশা জন্মে এমন আর কোথাও নয়। বন জঙ্গল পচা জল অপেক্ষা পাট পচা জলে মশা জন্মাবার বেশী সুবিধা আছে। এতদ্‌ভিন্ন মশা যে শুধু জলাশয়েই অর্থাৎ জলেই ডিম পাড়ে তাহা নয়। বর্ষার সময় অন্ধকার স্থানে যে কোন জায়গায় একটু আধটু জল থাকিলে এমন কি ভিজা মাটিতে পাতার বা বন জঙ্গলের তলায়ও ডিম পাড়ে এবং মশা জন্মায়। বড় বড় মাঠের মাঝে উচ্চ জমীতে অনেক বাগান আছে। বর্ষায় খোলা মাঠে ঘোলা জল জমিয়া মাঠ ভর্ত্তি হইয়া যাইলে, সেই জলে মশার ডিম পাড়ার সুবিধা থাকে না, কিন্তু মাঠ মধ্যস্থিত বাগানে যাইলে তহার ভিতর যথেষ্ট মশা দৃষ্ট হয়। তাহাতে মনে হয় সে মশা মাঠের জলে জন্মিয়া বাগানে যায় নাই; তাহা ঐ বাগানের গাছের তলায় পতিত জলে বা ভিজা মাটিতে জন্মিয়াছে। *

(ক্রমশঃ)

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত পরের মাসে প্রকাশ করিব।—সম্পাদক।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার দেউলিয়া হইয়া যাওয়ার উপক্রম করায় কি কি বাবদ কত টাকা খরচ কমাইলে উপস্থিত সঙ্কটে রক্ষা পাওয়া যায়—সে বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে একটি ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি বসিয়াছিল। সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই কমিটি শিক্ষা বিভাগ হইতে ২৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮ শত টাকার পরিমাণ খরচ কমাইয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন; স্বাস্থ্য বিভাগ হইতেও অনেক টাকার ব্যয়-সঙ্কোচ করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। স্যার রাজেন্দ্রনাথ শাসনযন্ত্রের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক অংশটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করিয়া তাঁহার নির্ম্মম কাঁচিটির যেভাবে পরিচালনা করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও কৃতিত্ব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগে তাঁহার প্রলুব্ধ কাঁচির ছেদন-স্পৃহাকে এতদূর বলবতী করা যে কতদূর অন্যায় হইয়াছে তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

* * * *

একে ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গলা ক্রমশঃ অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে গিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর এই দুইটি বিভাগ হইতে খরচ কমাইয়া দিলে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সেদিন রেড্ ক্রশ সোসাইটির বক্তৃতায় লর্ড লিটনের মুখ দিয়া বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ উজ্জ্বলভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আর শিক্ষার অবস্থাও যে কি গরিমাময়—তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে পাঠকগণকে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় যদি এই দুই প্রয়োজনীয় বিভাগ হইতে কমিটির সুপারিশমত ব্যয় কমান যায়, তবে তাহা "গোদস্য উপরি বিস্ফোটকঃ সংবৃত্ত" হইবে না কি?

* * * *

শিক্ষা বিভাগের দফগুলির মধ্যে ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি একটু ইতর বিশেষ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কমিটি ইঙ্গ ভারতীয় (Anglo Indian) বালকগণের শিক্ষার ব্যয় উঠাইয়া দিয়া, ইউরোপীয় বালকদিগের শিক্ষার ব্যয় পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাহ করা হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, পরন্তু সরকারী হাইস্কুল ও অন্যান্য সাহায্য-প্রাপ্ত মধ্য বিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় লোকের অর্থ ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপীয় বালকগণের প্রত্যেক অভিভাবকই বিত্তশালী; গভর্মেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য না পাইয়াও তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা করিয়াও নিজ নিজ পুত্র কন্যাদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় সহজেই বহন করিতে পারেন। অন্যদিকে ইঙ্গ-ভারতীয় বালকগণের অভিভাবকগণের মধ্যে কতকাংশ তাহাদের সম্পূর্ণ শিক্ষার খরচ পরিচালনে প্রকৃতই অসমর্থ; তাহাদিগের শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের কিছু ব্যয় করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

* * * *

অন্যদিকে বিস্তৃততরভাবে নিম্ন শিক্ষা প্রচারের অছিলায়, স্কুল-কলেজগুলির ব্যয় নির্ব্বাহ ও পরিচালনা ব্যাপারের দায়িত্বের বোঝা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহন না করা, বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিনে সরকারের পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশে নিম্ন-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের খুব বেশী রকমের আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া সরকারী ও বেসরকারী সকল স্কুল কলেজগুলি স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলির হাতে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, অনেক কলেজ ত উঠিয়া যাইবেই, তাহার উপর দেশের যুবকদিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষার স্পৃহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে।

* * * *

ইহার আর একটি প্রধান কারণের প্রতি ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—বাঙ্গলার সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-বেতন শতকরা ৫০ বৃদ্ধি টাকা করিয়া দেওয়া। এই পরামর্শ যদি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে বাংলার উচ্চশিক্ষার সুযোগ কেবলমাত্র অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়েরই ঘটিবে। গত কয় বৎসরের মধ্যে স্কুল কলেজের বেতনের হার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমানেই দরিদ্র অভিভাবকগণের শিক্ষার ব্যয় বহন করা একান্ত কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; ইহার উপর দেড়া মাশুল বাড়িয়া গেল, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেদের বর্ণপরিচয় তৃতীয় ভাগ ও ফার্ষ্টবুক পড়িয়াই মা সরস্বতীর পদপ্রান্তে জন্মের মত 'সেলাম ঠুকিয়া' আসিতে হইবে। অবশ্য শিক্ষা বিভাগে অনেক অবান্তর ব্যয় হয়, তাহা কমাইয়া দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন; প্রাথমিক স্কুলের সব্ ইন্‌স্পেক্টর ও এসিষ্ট্যাণ্ট্ ইন্‌সপেক্টর, কলেজ সমূহের এডিসন্যাল্ ইন্‌স্পেক্টর ও সহকারী পরিদর্শিকার পদগুলি ও নর্ম্মাল স্কুলগুলি উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে আমরা কমিটির সুবিবেচনার পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু এই সকল নিরর্থক ব্যয়গুলি বাঁচাইয়া কমিটি যদি অন্ততঃ উহার অর্দ্ধেক টাকা দেশের মধ্যে প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী স্কুলের পরিচালন বাবদ খরচ করিতে ও ছাত্রগণের বৃত্তি সংখ্যা বাড়াইয়া ঐ টাকায় তাহার সঙ্কুলান্ করিতে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে শিক্ষার পথকে এরূপভাবে ব্যাহত করা হইত না, তাহা হইলে কমিটির অধিকতর সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করা হইত। আমাদের মতে, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক সরকারী বৃত্তি আরও এক লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারিত। শিক্ষা বিষয়ে দেশের লোকের কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনেকটা সজাগ হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দেশের শতকরা প্রায় ৯৫ জন শিক্ষা জিনিষের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছে। শিক্ষা বাবদ পূর্ব্বে যেরূপ অর্থব্যয় হইত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় হওয়া প্রত্যেক উন্নতিকামী বাঙ্গালী মাত্রেরই একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ দেখিয়া আমাদিগকে অধিকতর হতাশ্বাস হইতে হইল।

* * * *

শিক্ষা সম্বন্ধীয় আর একটি মজার খবর কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকেই হয় ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকার, মিঃ ইভ্যান্ বিষ্‌কে বঙ্গে প্রাইমারী শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সাধনের উপায় নির্ণয় কল্পে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার অনুসন্ধানের ফল ও ব্যক্তিগত পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। এক কিস্তি তদন্ত শেষ করিয়া তিনি তাঁহার রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টে পেশ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাহার মর্ম্ম সাধারণ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। রিপোর্টের প্রথমে তিনি দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা মোট ৪৭ হাজারেরও কিছু উপর; সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষালয়ে যদি অন্ততঃ একজন করিয়া শিক্ষকও প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় এককোটি বার লক্ষ আশী হাজার টাকা খরচ পড়ে। এ খরচ নিরর্থক ও গভর্ণমেণ্টের এই দারুণ দুর্দ্দিনে এ ভাবে সাহায্য দান অসম্ভব। সুতরাং তিনি এই সকল প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন্ বোর্ড, বা লোক্যাল বোর্ড ও জন-সাধারণের সহানুভূতির উপর চাপাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিয়াছেন। বিষের বুদ্ধিকে বিশ হাজার তারিফ্ দিই; উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সরকার এ বিষয়ে তদন্তের ভার দিয়াছিলেন।

* * * *

বিষের বিরাট বুদ্ধির দৌড়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে আর একটি হাস্যজনক সুপারিশে। তিনি তাঁহার রিপোর্টে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার ফলে সুকুমার-মতি বালকগণের বাংলা বর্ণপরিচয় আয়ত্ত করিতে অনেক সময় অপব্যয়িত হয় এবং উহাতে এক-দিকে যেমন বৃথা সময় নষ্ট করা হয়, তেমনি বালকের

উন্মেষোন্মুখ বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই রীতিমত বাধা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং বাংলা হরফ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ২৬টি রোমান হরফে বর্ণ ও বানান্ শিক্ষা দেওয়া হউক।

* * * *

প্রাথমিক শিক্ষালয়ে এইরূপ বর্ণমালা প্রচলিত হইতে চলিলে, বালকদিগকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ সুরু করিবার সময় পুনরায় বাংলা বর্ণাক্ষর আয়ত্ত করিতে হইবে; নহে ত বিষের ন্যায় অন্য কোন দিশেহারা মহাত্মার প্রচেষ্টায় ঐ সকল বিদ্যালয়ে ও কলেজে—তথা সকল প্রকার শিক্ষালয়েই বাংলা বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান্ হরফের প্রচলন হইবে; এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে, যে সংস্কৃত অক্ষর যাবতীয় বর্ণমালা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া সভ্য জগতে সুপরিচিত, তাহারই রূপান্তর—এই সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা অক্ষর পৃথিবীর বক্ষ হইতে চিরাপসারিত হইবে। ভাষা জাতির প্রাণ, অক্ষর আবার ভাষার প্রাণ; আজ যদি বাংলা ভাষা রোমান্ বর্ণমালা ও বানানের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, কাল বাঙ্গালীর ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজের স্বাতন্ত্র্যটুকু ঘুচিয়া যাইবে; তারপর বাঙ্গালী সকল বিষয়ে পরের মুখে ঝাল্ খাইতে শিখিবে—পরের চোখে দেখিতে শিখিবে—পরের কাণে শুনিতে শিখিবে—পঙ্গুর মত পরের কাঁধে ভর দিয়া চলিবার আশায় বুক বাঁধিতে শিখিবে। যেটুকু বাকী ছিল, সেটুকুও আর থাকিবে না; বাংলা ভাষা ও বাংলা হরফ কাহার পাকা ধানে মই দিয়াছিল জানি না—যাহাতে ইহা মহামতি বিষের এতদূর রিষের কারণ হইয়া উঠিল! বাংলা দেশ সুইজ্যারল্যাণ্ড নহে, ইহার ভাষাও সাঁওতালি বা পালি নহে, তাহা কি বিষ সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন? বিষ সাহেব কি একবার নিজের দেশের বর্ণমালার প্রতি তাকাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কত গলদ আছে—তাহা দেখিয়াছেন কি? যদি সে বিষয়ে তিনি অন্ধ থাকেন—তাহা হইলে আমরা তাঁহার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া সেগুলি দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। BUT 'বাট' হয়, PUT 'পাট্' হইবে না কেন, HER 'হার্' হয় কেন আর LET 'লেট্' হয় কেন, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ তিনি দেখাইতে পারিবেন কি? ইংরাজী ভাষার মধ্যে Small letters, Capital letters ও Hand-writing (Roman) lettersএর সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে পারিবেন কি? 'লজিক' বানান LOGIC হইল কেন এবং 'ফিজিক্' বানান PHYSIQUE হইল কেন, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইতে পারিবেন কি? Hard and soft sound, Silent word, Dipthong, এবং Syllable ভেদে ও শব্দ বিশেষে উচ্চারণের তারতম্যের বিভীষিকা হইতে নবীন শিক্ষার্থীদিগকে বাঁচাইতে পারিবেন কি? রামা শ্যামার দেশ বলিয়া বিষের বর্ণবিভ্রাট্‌কারী বুদ্ধিকে লোকে বিশ হাত দূর হইতে কেবলমাত্র সেলাম ঠুকিয়াই—বিষে বিষক্ষয় করিয়া দিল বটে, কিন্তু homeএ যদি তিনি এরূপ বিধ্বংসিনী বুদ্ধির পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহাকে নিশ্চয়ই Bedlamএর পথনির্দ্দেশ করিয়া দিত সন্দেহ নাই। তার পর রিপোর্টের শেষাংশে তিনি যখন পল্লীগ্রামের ছোট বড় দোকানদারদিগের উপর অতিরিক্ত কর চাপাইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনের খরচ উঠাইয়া লইতে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন বাস্তবিকই বিষের খোস্‌খেয়ালী যুক্তিবাদ ও প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধিকে বলিহারী না দিয়া থাকিতে পারি না। তখন সত্যই গাহিতে ইচ্ছা করে—"Tomar bhalo tomate thak amaye tar ar bhag diona. Je jalate jalchhe re pran bujheo tumi tao bojha na!"

* * * *

শ্রীপঞ্চমীর পর হইতে শীত একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, একটু একটু করিয়া গ্রীষ্মও অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে মফস্বল হইতে জলকষ্টের সংবাদও আসিতে থাকে। মফস্বলে জলের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। সেই চিরন্তন অভিযোগ—ডোবা, পুকুরগুলি

আবর্জ্জনায় পূর্ণ, তাহাদের জল অব্যবহার্য্য! বলি, পুকুর ডোবার জল আবর্জ্জনায় পূর্ণ করে কে? সে ত গ্রামবাসীদের দোষেই ঘটিয়া থাকে! জলাশয়গুলিকে আবর্জ্জনামুক্ত করিয়া সুপেয় জলে পূর্ণ করিয়া রাখা কাহার কাজ? সে ত গ্রামবাসীদেরই—যাহারা তাহাদের জল ব্যবহার করিবে তাহাদেরই—কাজ। এ বিষয়ের প্রতিকারের জন্য চিরকাল পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে কেন? নিজেরা উদ্যোগী হইয়া জেলাবোর্ডকে ধরিলে তবেই কাজের মত কাজ হইবে। নচেৎ জলাভাবে পিপাসায় শুকাইয়া মরা, বিষাক্ত জল পান করিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া মরা ছাড়া অন্য গতি নাই।

সহযোগিনী "হিন্দুরঞ্জিকা" সংবাদ দিতেছেন যে, গত ১৯২১ সালের এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে বাংলায় ৫৯৬১৮২১ টাকার বিলাতী মদ আমদানী হইয়াছিল। ১৯২২ সালের এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসে ৫৪৩৯৮৭৮ টাকার মদ আমদানী হইয়াছিল। এত আন্দোলন, এত আস্ফালন, এত নন্-কোঅপারেশনের পরও মাত্র এই ফল ফলিয়াছে! পর্ব্বত শেষে সত্য সত্যই মূষিক প্রসব করিল দেখিতেছি।

বনগ্রামের সহযোগী "পল্লীবার্ত্তা" বলিতেছেন, এবার এ অঞ্চলের স্থানীয় স্বাস্থ্য অতি উত্তম। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। তবে স্থানে স্থানে কলেরা হইতেছে। মফস্বলের সংবাদ পত্রে এ রকম আনন্দজনক সংবাদ ত অল্পই পাওয়া যায়। বনগ্রাম মহকুমা কিরূপে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল, সহযোগী তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হয়।

মৈমনসিংহের জেলাবোর্ড জেলার স্থানে স্থানে জলকষ্ট নিবারণ কল্পে এ বৎসর ৭০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা সুবিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিলে এবং স্থানীয় লোকেরা নিজেরা যথাসাধ্য সাহায্য করিলে অনেকটা জলকষ্ট নিবারিত হইতে পারিবে। কিন্তু ইন্দারা প্রভৃতি খনন ও সংস্কার করিবার পর গ্রামবাসীরা নিজেরাই যদি তাহাদের জল আবার দূষিত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জলের দুঃখ কোন কালেই ঘুচিবে না।

বনগ্রামে ম্যালেরিয়া নাই বটে, কিন্তু ময়মনসিং জেলায় টাঙ্গাইল ও জামালপুরের অধিকাংশ স্থানেই ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ঢাকা প্রকাশ বলিতেছেন, এই জেলায় বহুলোক আসাম হইতে কালাজ্বর লইয়া আসিয়া গ্রামে গ্রামে জ্বরের বিষ ছড়াইতেছে। ইহা নিবারণের উপায় গ্রামবাসীদের নিজেদের হাতে। তাঁহারা আসামের ফেরত লোকদের segregate করিবার ব্যবস্থা করুন। ইহাতে রোগীদেরও মঙ্গল, গ্রামবাসীদেরও মঙ্গল।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর একটী বৈঠকে মিঃ এল, কে, এল মহারষ্ট না কি বলিয়াছেন, গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাই তাহারা ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং লাখে লাখে মরে। তিনি আরও বলিয়াছেন, কৃষির উন্নতি হইলেই লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে; তখন তাহাদের গায়ের জোর বাড়িবে, এবং তাহারা ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করিয়া কেল্লা ফতে করিতে পারিবে। কিন্তু কৃষির উন্নতি হইলেই কি গ্রামবাসীরা সত্য সত্যই পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে? খাদ্য শস্যের বিদেশে রপ্তানীও কি কি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িবে না? সুতরাং তাহারা কি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে না? তাহাদের হা-ভাতে অবস্থা কোন কালে ঘুচিবে কি?

এবার মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। মেদিনীপুর জেলাবোর্ড গত বৎসরের

ন্যায় এবারও যাহাতে বিনা মূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা কয়েন সহযোগী "নীহার" এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। আশা করি, এ প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না।

সহযোগী "যশোহর" কয়েকটী থানা ও কয়েকখানি গ্রামের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন এতদঞ্চলে গত ২০ বৎসর ধরিয়া চিকিৎসক নাই; গ্রামবাসীরা চিকিৎসক চাহিয়াও পান না। এখন সেখানে কলেরার মড়ক উপস্থিত; অতএব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দরকার। যে স্থানের অধিবাসীরা বিনা চিকিৎসকে ২০ বৎসরকাল কাটাইতে পারিয়াছে, তাহাদের চিকিৎসক পাইবার উপযুক্ত সময়ই বটে! টাকার অভাবে গভর্ণমেণ্ট একে অচল হইয়া উঠিয়াছে—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় লাখো লাখো টাকা কমাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, আর এই দুঃসময়েই কি না চিকিৎসকের দাবী! ওদিকে নদীর জল একে শুকাইয়া আসিতেছে, তাহার উপর গ্রামবাসীরা নদীর ধারে কলেরা রোগীর মৃতদেহ পুতিয়া ও অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া জল বিষাক্ত করিতেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা বটে! যে সব লোক নদীতীরে কলেরা রোগীর মৃতদেহ পুতিবে তাহাদের কঠোর রাজদণ্ড ও সামাজিক দণ্ড না দিলে তাহারা শোধরাইবে না, অন্য লোকেরও চৈতন্য সঞ্চার হইবে না। কিন্তু এ দুইটাই এ দেশে সম্ভব কি?

সহযোগিনী 'আনন্দবাজার' পত্রিকা বলিতেছেন—

"ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র সেদিন একটা বড় মজার খবর আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৮৪ সাল হইতে ভারতগবর্ণমেণ্টের হুকুম আছে যে, সমস্ত সরকারী কেরাণীরা নিজেদের জন্য বিনামূল্যে ডাক্তারী চিকিৎসা এবং ঔষধ পাইতে পারিবে। যেখানে কোন ঔষধের দোকান নাই, সেখানে সরকারী ঔষধালয় হইতেই তাহাদিগকে ঔষধ যোগানো হইবে। আমরা কিন্তু সকলেই জানি যে, গরীব সরকারী কেরাণীরা কস্মিন কালেও বিনামূল্যে চিকিৎসা বা ঔষধ পায় না! তবে এ হুকুমটা কাহাদের জন্য? মোটা মাহিনার গোরা কর্ম্মচারীদের জন্য না কি? দেশী কেরাণী বাবুদের একটা সমিতি বা সঙ্ঘ না কি আছে; তাঁহারা এই রহস্যের মূল আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করুন না!"

আমরাও তাহাই বলি। কিন্তু এযাবৎ কাল অনেক জিনিষেরই মূল আবিষ্কার করা হইল, কিন্তু ভুল সারা হয় কি?

আমাদের এখন অভাব বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অভাব মিটাইবার উপকরণগুলির মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ সেগুলি সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই ধরুন, পল্লীগ্রামে একেই ত ডাক্তার কবিরাজ দুর্ল্লভ, তাহার উপর নিত্য নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি। এরূপ অবস্থায় বহুদর্শী ডাক্তার কবিরাজের অভাব কিরূপ মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। রোগ একটু কঠিন কিম্বা জটিল হইলে, হয় জেলার প্রধান নগরে না হয় কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়। কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করানো সকল লোকের ক্ষমতায় কুলায় না। এমন অবস্থায় কেহ যদি খুব বড় ডাক্তারের নিজ বাটীতে তাঁহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই খুব সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। আনন্দের বিষয়, এরূপ সৌভাগ্য লাভ করা এখন প্রায় সকলেরই সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুবিখ্যাত ডাক্তার ডি, এন, মৈত্র মহাশয় ৩ নং বিডন ষ্ট্রীটে "নার্সিং হোম ও আই সার্জ্জারি" স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সেখানে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং শুশ্রূষা-নিপুণ নার্স নিযুক্ত থাকায় রোগীর সেবা যত্ন ও উত্তম রূপে হইয়া থাকে। এখন আর কাহাকেও রোগের চিকিৎসা করাইবার জন্য, অনেক টাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া, প্রচুর দর্শনী দিয়া ডাক্তার আনাইয়া সর্ব্বস্বান্ত বা ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে না। অল্প খরচে, অল্প সময়ের মধ্যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকের উপদেশে আরোগ্য লাভ করিবার এরূপ মাহেন্দ্র সুযোগ বোধ হয় আর কোথাও কেহ পাইবার আশা করিতে পারেন না।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল | ১১শ সংখ্যা

ক্রিমি-চিকিৎসা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

(ক) "কেঁচো ক্রিমি" (round worm, Ascaris Lumbricoides).

ক্রিমির পরিচয়। ইহারা আকারে গোল ও দুই প্রান্ত সূচল, রং লাল ও কৃষ্ণ মিশ্রিত। লম্বা দিকে, ইহাদের দেহে চারটি রেখা ও চওড়া দিকে অসংখ্য রেখা আছে। ইহাদের মধ্যে মদ্দা (পুরুষ) গুলির দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি এবং মাদীগুলি ১৬ ইঞ্চি। ইহাদের পেটে এক কালীন অসংখ্য ডিম থাকে। প্রত্যেক ডিমের উপরে দুইটি খোলা বা আবরণ আছে এবং তাহাদের উপরে অণ্ড-লালা (albumen) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে ঐ ডিম মানুষের উদরস্থ হইলে, ২৷৷০ হইতে ৩ মাসের মধ্যে ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা ক্রিমি জন্মে।

নরদেহে আস্তানা—ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রে।

মানুষের দেহে ক্রিমির লক্ষণ।—প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের ক্রিমি হইলে কোনও লক্ষণ না হইতে পারে। কিন্তু শিশুর ক্রিমি হইলে এই এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়:—(ক) পেটের পীড়া—পেট-কামড়ান, গা বমি, বদ হজম, যখন তখন পেটের অসুখ বা উদরাময়; হয় ত এই উদরাময় মাসাধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে। (খ) জ্বর; নাকখোঁটা, মুখে অনবরত জল উঠা বা মুখের লালা বৃদ্ধি হওয়া; মুখে দুর্গন্ধ হওয়া; দাঁত কড়মড় করা; অজ্ঞানাবস্থা; মৃগীর মত খেঁচনি; মাথা ধরা; "শির-টেনে ধরা", উন্মাদ বা বিকার অবস্থা। (গ) শ্বাসরোধ মলরোধ (intestinal obstruction); কামলা বা ন্যাবা।

চিকিৎসা।—(ক) স্যানটোনীন (Santonin)। এই

ঔষধে এই ক্রিমি সারে; কিন্তু অসাবধান হইলে অনেক সময় রোগীও মরে। এই জাতীয় কেঁচো ক্রিমি যতদিন মানুষের পেটের মধ্যে থাকে, ততদিন পেটের মধ্যে lactic acid বা দধি জাতীয় অম্ল উৎপাদন করে; ঐ অম্লে, এবং ক্যাষ্টর অয়েল প্রভৃতি তৈলে, স্যাণ্টোনীন দ্রবনীয়। দ্রব অবস্থায় স্যাণ্টোনীন সহজেই মানুষের রক্তে ঢুকিয়া পড়ে এবং প্রাণ লইয়া টানাটানি করে। এই জন্য, স্যাণ্টোনীন দিতে হইলে,—প্রথমে রোগীকে জোলাপ দিবে; তাহার পর, ২৪-৩৬ ঘণ্টাকাল তাহাকে উপবাসী রাখিয়া তবে স্যাণ্টোনীন দিবে;—কারণ, খাবারের সঙ্গে মিশিলে, স্যাণ্টোনীন রোগীর রক্তের সঙ্গে মিশিতে সুবিধা পায়, অথচ ক্রিমির পক্ষে অকেজো হইয়া পড়ে। স্যাণ্টোনীন ক্রিমিকে মারে না, ক্ষণিকের জন্য মৃতপ্রায় করিয়া দেয়;—কাজেই স্যাণ্টোনীনের সঙ্গে সঙ্গে জোলাপ না দিলে, একদিকে যেমন স্যাণ্টোনীনের "গায়ে বসিয়া" যাইবার ভয় থাকে, পক্ষান্তরে তেমনি ক্রিমিগুলির পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। এত দিক সামলাইয়া স্যাণ্টোনিন দিতে হয়। স্যাণ্টোনীন-ঘটিত কয়েকখানা প্রেস্কৃপসান দিলাম ঃ—

[স্যাণ্টোনীনের মাত্রা ঃ—১ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে, এক কালীন ১-১½ গ্রেণ, এবং উপর্য্যুপরি দিতে হইলে, ½-¾ গ্রেণ; পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে,—২—৪ গ্রেণ]

Re.

স্যাণ্টোনীন—½ গ্রেণ
ক্যালোমেল—¾ গ্রেণ
সোডা বাইকার্ব্ব—৩ গ্রেণ
} ১-৪ বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্য।

উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি ধরিয়া প্রত্যহ শয়নকালে একটি পুরিয়া দেয়।

Re.

স্যাণ্টোনীন—৪ গ্রেণ এবং
ক্যালোমেল—৪ গ্রেণ (একত্রে বা স্বতন্ত্র ভাবে)

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি উপর্য্যুপরি দুই দিন প্রাতে শূন্যোদরে খাইবেন।

(খ) স্যাণ্টোনীন সহজে দ্রবনীয় বলিয়া স্যাণ্টোনীনক্সিম (Santoninoxim) ব্যবহার করা অনেকটা নিরাপদ। ইহার ব্যবহার ঠিক স্যাণ্টোনীনেরই মত; কেবল মাত্রা স্যাণ্টোনীনের ২।৩ গুণ।

(গ) ন্যাফথ্যালীন (naphthalin). উপর্য্যুপরি তিন দিন, ৪ বার করিয়া ½—১½ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

(ঘ) চেনো পোডিয়ামের তৈল। ইহা স্যাণ্টোনীন অপেক্ষা বেশী কায করে; কিন্তু ইহা সেবনে সময়ে সময়ে উদরাময়, বমন, হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ঘটিতে পারে। ইহার গন্ধও বিশ্রী। সেবন বিধি ঃ—

Re.

ওলিয়াম্ চিনোপোডিয়াই অ্যান্ থেল্ মিন্টিসি ১৬ মিঃমেন্থল ৩ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ছয়টি বটিকা কর। (পূর্ণ বয়স্কের জন্য) উপর্য্যুপরি দুইদিন প্রাতঃকালে শূন্যোদরে, দুই ঘণ্টা অন্তর মাত্র তিনটি বটিকা সেবন করিয়া, তাহার দুই ঘণ্টা পরে ২ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল সেবনীয়। দশ বৎসরের বালকের জন্য সেবন বিধি ঐ, তবে মাত্রা এইরূপ ঃ—

Re.

ওলিয়াম্ চেনোপোডিয়াই—১০ মিঃ
মেন্থল ১½ গ্রেণ—ছয়টি বটিকায় বিভক্ত কর।

(খ) "কুচো" বা সূতা-ক্রিমি (thread worm, seat worm, pin-worm, Ascaris বা Oxyuris Vermicularis.

ক্রিমির পরিচয়।—সূতার মত সরু সাদা রং, মদ্দারা ১½ ইঞ্চি লম্বা ও মাদীরা ৩ ইঞ্চি। ইহারা অসংখ্য ডিম পাড়ে। খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে উদরস্থ হইলে, পনের দিনের মধ্যে বাচ্ছা প্রসূত হয়।

নরদেহে আস্তানা।—মলদ্বার (rectum)।

লক্ষণ। (১) মলদ্বার সুড়সুড় করা—বিশেষ করিয়া রাত্রিকালে। তজ্জন্য কোঁথানি, মলদ্বারে

জ্বালাবোধ, ঘন ঘন প্রসাবের ইচ্ছা, হারিশ বাহির হওয়া (prolapse of rectum)। (২) গা বমি, ক্লান্ততা, অস্বস্তি। (৩) মুদ্রাদোষ বা খেঁচুনি, প্রবল হস্তমৈথুনেচ্ছা। (৪) অপরিচ্ছন্ন বালিকাদিগের পক্ষে—যোনি কণ্ডু, প্রদর। (৫) পেটের যেখানে vermiform appendix আছে, বহুকাল ধরিয়া সেই জায়গায় সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা বোধ।

চিকিৎসা। (১) আহার বা পানীয়ের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া শাক পাতার সঙ্গে এই ক্রিমির ডিম উদরস্থ হয় বলিয়া, শাক পাতা খাওয়া দিন কতকের জন্য বন্ধ করা ভাল। তদভাবে, উহাদিগকে ভাল জলে বেশ করিয়া ধুইয়া সুসিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত। হাতে মাটি করিবার সময়ে ও অপর সময়ে ও নখের নিচে যে মাটি বা ময়লা ঢোকে, তাহাতেও ঐ ক্রিমির ডিম থাকিতে পারে বলিয়া, বেশ করিয়া নখ কাটা ও মাঝ মাঝে কার্ব্বলিক বা অপর কোনও লোসানে নখ ধোয়া উচিত। দাঁতে করিয়া নখ কাটিতে নাই এবং ছেলেরা যাহাতে আঙ্গুল না চোষে, বা মলদ্বারে আঙ্গুল দিয়া ক্রিমি না তাড়ায় তাহাও করিতে হয়। (২) প্রত্যহ শৌচান্তে সোহাগা ফোটান জলে জলশৌচ করা কর্ত্তব্য। সোহাগার জল ব্যতীত, কার্ব্বলিক লোসান (৪০ ভাগ জলে ১ ভাগ কার্ব্বলিক অ্যাসিড), পারক্লোরাইড্ অফ মার্কারি লোসন (১ পাইণ্ট জলে ৪½ গ্রেণ)। ইউক্যালিপ্টাস্ বা টার্পিণ তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। (২) উপর্য্যুপরি ২।৪ দিন জোলাপ খাওয়া ও সেই সঙ্গে মলধৌতি করা চাই। মল ধৌতি করিতে হইলে, একটি ১২ নম্বরের রবারের ক্যাথিটারকে অন্ততঃ ৬ ইঞ্চি ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া সোহাগা দ্রব (১ পাইণ্ট জলে ১ ড্রাম) ১ পাইণ্ট বা পারক্লোরাইড্ অফ মার্কারি দ্রব (১ পাইণ্টে ½ গ্রেণ) আধ পাইণ্ট অথবা কোয়াসিয়ার জল ১ পাইণ্ট অথবা গন্ধকের জল ১ পাইণ্ট ব্যবহার করা উচিত। এই ধৌতির বদলে, প্রত্যহ শয়নকালে, ১ আউন্স জলে যথাসম্ভব (saturated solution) সফট্রিন্ এলোজ দ্রব করিয়া, তাহার পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে দিয়া শুইয়া থাকিবে। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ইহা ব্যবহার করা চাই। (৩) উপর্য্যুপরি পাঁচ দিন ধরিয়া প্রত্যহ ২০ গ্রেণ মিথাইলীন ব্লু খাওয়াইতে পারা যায়। দশ দিন পরে আবার পাঁচ দিন খাওয়াইবে। এইরূপে দশ দিন অন্তর পাঁচ দিন তিন দফা খাওয়াইবে। কেহ কেহ ২ ড্রাম বিটা ন্যাফথল্ খাওয়াইতে বলেন। শিশুদিগকে রুবার্ব, কার্বনেট্ অফ্ ম্যাগনেসিয়া ও শুঁঠ খাওয়ান যাইতে পারে। চুলকানি নিবারণের জন্য মার্কুরিয়াল মলম মাখান বা টিংচার ওপিয়াই ৫ ফোঁটা ও মিউসিলেজ ১ আউন্স পিচকারীর দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) হুকওয়ার্ম বা বক্রকীট। Hook-worm ankylostoma (Stronpylus quadridentatus Dochmius anchgylostomum) [আমেরিকায় Necator Americanus]

ক্রিমির পরিচয়।—ইহারা কেঁচোর মত গোল; ইহাদের মাথার দিকটা সূচল ও বক্র; এবং মদ্দাদিগের পিছনের অংশ পাখার মত, মাদীদের পিছনের অংশ সূচল। রং শ্বেত রক্তাভ। দেহের লম্বা দিকে, ৪—৮ফিতায় মত দাগ দেখা যায় এবং চওড়া দিকে সরু সরু গোল রেখা আছে। নরদেহে বাসকালীন ইহাদের ডিম প্রসব হয়। মলের সঙ্গে সেই ডিমগুলি কাদায় বা কর্দ্দমাক্ত জলে পড়ে। সেই জল বা জলে ধৌত শাক পাতা খাইলে ডিমগুলি উদরস্থ হয় এবং মানুষের পেটে ছানা বাহির হয়। ফল কথা, দুই দফা মানুষের পেটের মধ্যে যাইতে না পাইলে ইহাদের জীবলীলা সাঙ্গ হয় না।

নরদেহে আস্তানা।—ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরার্দ্ধে।

নরদেহে প্রবেশ।—যে লোকের পেটের মধ্যে পাড়ী ক্রিমির যুগল থাকে, তাহার পেটে মাদী

ক্রিমিরা ডিম পাড়ে। মানুষটির মলত্যাগের সময়ে অসংখ্য ডিম মাটিতে পড়ে। হাওয়া পাইলেই শীঘ্রই ডিম ফুটিয়া বাচ্ছাক্রিমি বাহির হয়। বাচ্ছাগুলির ক্রমাগত চেষ্টা হয় মানুষের দেহে প্রবেশ করিবার জন্য। যেখানে ঐ ক্রিমির শাবকগুলি জমি বা ঘাসে লাগিয়া থাকে, খালি পায়ে সেখানে যাইলেই, বাচ্ছাগুলি পায়ের তলায় আটকাইয়া যায় এবং সেখানে ফুঁড়িয়া গায়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। সেখান দিয়া ক্রিমির বাচ্ছাগুলি পায়ের তলায় ঢুকে। সেখানে "হাজা", "পাঁকুই" প্রভৃতি হইয়াছে বলিয়া লোকে বর্ণনা করিয়া থাকে। পায়ের তলায় একটি একটি ছিদ্র করিয়া দেহের মধ্যে ঢুকিয়া রক্ত স্রোতে যাইয়া পড়ে। রক্ত স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে হৃৎপিণ্ডে এবং সেখান হইতে ফুসফুসে তাহারা পৌঁছায়। ফুস ফুস হইতে কাশি বা গায়ের সঙ্গে তাহারা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে; সেখান হইতে উদরস্থ হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া পৌঁছায়। পাকাশয়ের রস, উত্তাপ প্রভৃতি কিছুতেই ক্রিমির ডিম বা বাচ্ছা মরে না। অন্ত্রে আসিয়া পৌঁছানর ১॥০ হইতে ২ মাসের মধ্যে এই বাচ্ছারাই ধাড়ী হইয়া ডিম পাড়ে।

লক্ষণ।—[মানুষের দেহে যে ক্রিমিই থাকুক না কেন, সকলেই স্ব স্ব দেহাশ্রিত বিষ (toxin) মানুষের রক্তে ছাড়িয়া দেয়। এই বিষগুলি কোনও কোনও স্থলে সেই ক্রিমির দেহের ক্লেদ বা মল অথবা সেগুলি সেই ক্রিমির আত্মরক্ষার অস্ত্র বিশেষ। ক্রিমির যে যে লক্ষণ ঘটিয়া থাকে তাহা এই বিষ-ক্রিয়ারই ফল; অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলে ত বটেই। কাযেই ক্রিমিরা সংখ্যায় যত বেশী হইবে, ক্রিমির লক্ষণগুলি ততই সুস্পষ্ট হইবে। অপরাপর ক্রিমিরা মানুষের পেটের মধ্যে বাস করে এবং মানুষের খাবারের অংশ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু বক্র ক্রিমিরা মানুষের খুব বেশী ক্ষতি করে—ইহারা অত্যন্ত বে-ইমান। ইহারা যেখানে থাকে সেখানকার আঁতের গায়ের ছাল (যাহা খাদ্যের দরুণ হজম হয়) কুরিয়া কুরিয়া খায় এবং সেইজন্য ক্রমশঃ সেই সেই যায়গা থেকে রক্ত পড়িতে থাকে। একেবারে অনেকটা রক্ত পড়ে না বলিয়া, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এই অজ্ঞাতসারে রোজ রোজ, অনবরত রক্তস্রাবের ফলে চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া পড়ে; আর আঁতের গায়ের হজমকারী ছাল খাইয়া ফেলার দরুণ, পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়।] দীর্ঘকালব্যাপী পেটে ব্যথা, বদহজম, রক্তাল্পতা; কাজেই দেহের বৃদ্ধি ও মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, মানুষ অত্যন্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পেট ফাঁপা, মাথাধরা, গা বমি, বুক ধড়ফড়ানি, অখাদ্য ভোজনের ইচ্ছা। রক্তাল্পতার জন্য পা ও সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া পড়ে, চক্ষের দৃষ্টি ঝাপসা হয়, কাশি, সর্দ্দি, ঘুষঘুষে জ্বর, উঠিতে বসিতে হাঁপ ধরে।

চিকিৎসা।—(ক) যাহাদের পেটে ঐ ক্রিমি আছে, তাহাদের কোনও লক্ষণ থাকুক আর না থাকুক, তাহাদের মল বরাবর পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য—যতদিন তাহাদের মলে ঐ ক্রিমির ডিম আর না পাওয়া যায়। যতদিন পাওয়া যাইবে, ততদিন তাহাদিগের চিকিৎসা করা ও তাহাদিগকে আলাদা রাখা উচিত। মাঠে ঘাটে মলত্যাগ করিতে দিতে নাই। মলত্যাগ হইলেই সেই মল ঢাকিয়া বহুদূরে লইয়া গিয়া তাহাতে কাঠগুঁড়া বা নেকড়া সংযোগে পোড়ান উচিত; অথবা তৎক্ষণাৎ তাহাতে কড়া বিষ নাশক ঔষধ ঢালিয়া দেওয়া চাই—যেমন কার্ব্বলিক অ্যাসিড দ্রব (১:২০), পারক্লোরাইড অফ মার্কারি (১ পাইণ্টে ৮২ গ্রেণ), অথবা লাইসল বা আইজ্যাল (১ : ২০০)। সুধু পায়ে পথ হাঁটা নিষেধ করা চাই। আঙ্গুলের নখ খুব ছোট করিয়া কাটিয়া রাখা এবং প্রত্যেকবার আহারের সময়ে খুব ভাল করিয়া হাত ধুইয়া খাওয়ার অভ্যাস করা চাই। খাবার ক্রিমি

কর্দ্দমাক্ত জলে ধোয়া বা ধূলিময় যায়গায় খুলিয়া রাখা অনুচিত—যে হেতু মল শুকাইয়া গেলে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া যায় এবং হাওয়ায় উড়িয়া খাবারে পড়িলে সেই মলে যত ক্রিমির ডিম থাকে, তাহাও খাবারে মিশিয়া যাইতে পারে। থুথু, গয়ার, বমি কখনও যেন গিলিয়া ফেলা না হয় এবং পায়ে "হাজা" বা "পাঁকুই" বা ব্রণ হইলেই তাহাকে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করান উচিত।

(খ) রোগীকে জোলাপ দিবে—সোণামুখী, ক্যালমেল, ম্যাগসালফ্ প্রভৃতি। পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে বেশ তীল করিয়া গুঁড়ান থাইমল ১০—১৫০ গ্রেণ ঠোঙা (capsule) এর মধ্যে করিয়া খাওয়াইবে। থাইমল খাওয়ানর ৪।৫ ঘণ্টা পরে একটা জোলাপ দিবে—সাবধান কখনো তৈলঘটিত কোনও জোলাপ বা অপর ঔষধ দিবে না! যতক্ষণ ২।৩টা দাস্ত না হয় ততক্ষণ কোনও খাবার দিবে না। কেহ কেহ গোড়ায় ম্যাগ্‌সাল্‌ফ খাওয়াইয়া ৩০ গ্রেণ থাইমল ঠোঙার মধ্যে করিয়া খাওয়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে ৬॥০ ড্রাম ব্রাণ্ডি খাওয়ান। ঠিক দুই ঘণ্টা পরে আবার ঐ মাত্রায় থাইমল ও ব্রাণ্ডি দিয়া তাহার দুই ঘণ্টা পরে জোলাপ দেন এবং বেশ দাস্ত হওয়ার পরে, সে দিন শুধু দুধ খাওয়াইয়া রাখেন। আবার এক সপ্তাহকাল পরে ঐ রূপ ব্যবস্থা করা হয়। [থাইমলের পরিবর্ত্তে ৩০ গ্রেণ বীটা-ন্যাফ্‌থল্ দেওয়া যায়, কিন্তু এই ঔষধে বৃক্ককের উত্তেজনা বেশী হয়] ২০ ফোঁটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ তৈল, ক্লোরোফরম ও ক্যাষ্টর অয়েলের সঙ্গে একত্রে দিলেও বেশ কাজ হয়।

(ঘ) বাতশিরার ক্রিমি। Filaria (Sanguinis hominis nocturna vel diurna vel perstans).

ক্রিমির পরিচয়।—মদ্দারা ৩ ইঞ্চি ও মাদীরা ৩ইঞ্চি লম্বা। ইহাদের গায়ে একটা খোলসের মত থাকে। যে মানুষের দেহে এই ক্রিমিরা ডিম পাড়ে, সেই, মানুষের রক্তপান করিয়া যদি কোনও মশকী একটি সুস্থ লোককে কামড়ায়, তবে ঐ সুস্থ লোকের দেহে এই ক্রিমির বাচ্ছা যাইয়া পড়ে। মানুষের দেহ হইতে এই ক্রিমির ডিম রক্তের সঙ্গে পান করিবার পরে, মশকীর দেহে ঐ ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা প্রসব হয়। পরে মশকী যখন কোনও সুস্থ লোককে কামড়ায়, তখন তাহার দেহে ঐ ক্রিমির বাচ্ছাগুলিকে ছাড়িয়া দেয়।

নরদেহে আস্তানা।—বাচ্ছারা রক্ত স্রোতে ভাসিতে থাকে এবং ধাড়ীগুলি লসিকা শিরা বা গ্রন্থির (lymphatic vessels or glands) মধ্যে থাকে।

লক্ষণ।—যতক্ষণ ধাড়ী ক্রিমির দল কোনও লসিকা শিরার মধ্যে যাইয়া লসিকা স্রোত চলাচলের পথ বন্ধ না করে, ততক্ষণ কোনও লক্ষণ হয় না। যাহা কিছু লক্ষণ হয় তাহা এই লসিকা শিরা বন্ধ করার ফল। যথা—কাইল্যুরিয়া অর্থাৎ দুধের মত প্রস্রাব; এলিফ্যাণ্টাইসিস্ (অর্থাৎ গোদ, কুরণ্ড); বাতশিরার জ্বর (ঠিক ম্যালেরিয়ার মত শীত করিয়া জ্বর আসে ও ঘাম হইয়া ছাড়ে—ঠিক অমাবস্যা বা পূর্ণিমার "কোটালে কোটালে" এই জ্বর হয় এবং জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকি বা কুরণ্ড বা গোদের যায়গা ফুলে ও ব্যথা হয়)।

চিকিৎসা।—(১) মশক কুল ধ্বংস ও মশকী দংশন নিবারণ করা চাই। (২) শুনা গিয়াছে রীতিমত বেশী বেশী হিং খাইলে ঐ ক্রিমি মরিয়া যায়। অথবা, কয়েকদিন ধরিয়া ২ ড্রাম সোরা, মাঠাতোলা ঘোল ও মিশ্রী খাইয়া থাকিলেও ঐ ক্রিমি মরে। স্ফীতস্থান (গোদ, কুরণ্ড) কাটিয়া বাদ দেওয়াই উচিত। সোয়ামিন্ ইন্‌জেক্‌সন্ (সপ্তাহে ১ বার করিয়া ৩—৫ গ্রেণ), রীতিমত প্রত্যহ ইক্‌থিয়ল ১ গ্রেণ, কুইনিন ২ গ্রেণ, আর্সেনিয়াম অ্যাসিড ১।১০০ গ্রেণ বটিকা করিয়া ও লোধ বৃক্ষের ত্বক চূর্ণ ১০ গ্রেণ অ্যাঞ্জিয়ার্স পেট্রোলিয়াম ইমাল্‌সনের সঙ্গে খাইলে উপকার হইতে পারে।

অপরাপর ক্রিমি রোগ বহু প্রকারের আছে

তবে সেগুলি নিতান্ত বিরল বিধায়ে এখানে উক্ত হইল না।

পল্লীগ্রামের চিকিৎসকগণ বেশ যত্ন করিয়া স্মরণ রাখিবেন যে, (১) ক্রিমি রোগ কখনো মারাত্মক হয় না; (২) কোনও লোককে একেবারে ষোল আনা ক্রিমি শূন্য করা যায় না; (৩) ক্রিমিঘ্ন ঔষধ মাত্রেই অধিকাংশ স্থলে মনুষ্যঘ্নও বটে—অতএব অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

এক কথায়—যতদিন দেশের লোকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে না শিখিবে ততদিন ক্রিমি হইবেই এবং ক্রিমি থাকিবেই।

হিন্দু ডুবিল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—ডাক্তার শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-রত্ন।

বিদেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার।

শিশুদের শয্যা ও বস্ত্রাদি সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উল্লেখ আছে—

"শয়নাস্তরণ প্রবরাণানি কুমারস্য মৃদু লঘু শুচি সুগন্ধি নিস্যুঃ।" শরীর স্থান, ৮ম অধ্যায়।

অর্থাৎ কুমারের শয্যা ও বস্ত্রাদি কোমল, লঘু, শুচি ও সুগন্ধি হওয়া আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশের শিশু, বালক, বালিকা ও যুবক, যুবতীগণ বিদেশী নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ফলেও আমাদের শিশু ও বালক বালিকাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। আজকাল এদেশের বহু হিন্দু সন্তান তাঁহাদের সন্তানদিগকে বিদেশী পোষাক পরিচ্ছদ, খেলনা, ছবি, ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করাইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ইহাতে বড়ই আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন। এই অনুকরণ প্রথার ফলে এদেশের শিশুগণের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। ফলতঃ পাশ্চাত্য দেশের পোষাক পরিচ্ছদ, খেলনা, ছবি, সুগন্ধি কোন দ্রব্যই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। যাহাদের অনুকরণ করিয়া আমরা আমাদের শিশুদের পাশ্চাত্য দেশের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করাইয়া থাকি, সেই পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদ, খেলনা, ছবি ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কি অভিমত প্রদান করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হইল। এদেশের শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ এসকল তত্ত্ব একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবেন, এই বিনীত প্রার্থনা।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য দেশের জননীগণ শিশু ও বালক বালিকাদিগকে অত্যন্ত ভারি ও লম্বা পরিচ্ছদ এবং কসা জামা, টুপি, জ্যাকেট, করসেট ইত্যাদি ব্যবহার করায়। ফলে, তাহাদের বুকের ও উদরের যন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া যায়। কোমরবন্ধ, মোজা, গার্টার ইত্যাদি ব্যবহারে নিম্ন উদরের ও পদের রক্ত চলাচলের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ ঐ সকল পোষাক পরিচ্ছদের ফলে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।" (1)

(1) "A baby's clothing ought to be light, warm, loose and free from pins. Many infant's clothes are both too long and too cumbersome How absured, too, the practice of making them wear long cloths! (See Advice to a mother, by Dr. Chavasse, Page 19)

"শিশুদের মাথায় টুপি ব্যবহার করা অন্যায়। ইহাতে তাহাদের মাথা গরম হয়, ঘর্ম্ম হইয়া থাকে এবং তাহাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরা ইত্যাদি নানা পীড়া জন্মে। (2)

"শক্ত কোমরবন্ধ (বেল্ট) মাজায় বান্ধার দরুণ উদরের যন্ত্রগুলির ক্রিয়া ভালরূপে হইতে পারে না। মেয়েরা জ্যাকেট, করসেট ইত্যাদি ব্যবহার করায়, তাহাদের বুকের ও উদরের যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বিকৃত হয়। পায়ে মোজা, গার্টার ব্যবহারে পায়ের অঙ্গুলীগুলি সঙ্কুচিত ও পায়ের রক্ত চলাচলের গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে।" (3)

"বালক বালিকদিগকে কখনও গার্টার ব্যবহার করিতে দিও না। ইহাতে পদের রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রম ঘটে এবং মাংসপেশী ক্ষয় হয়। কসা জুতা, জামা মোজা, জ্যাকেট ইত্যাদি কখনও কাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয়।" (4)

বিখ্যাতনামা ডাক্তার রডক এম্-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—"বালিকা ও যুবতীদের পরিচ্ছদ খুব ঢিলা হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে কোন প্রকার কসা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দিবেন না। কসা জুতা ব্যবহারে যুবতীদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে।" (5)

উক্ত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় পাশ্চাত্য দেশের বালক বালিকাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিচ্ছদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্য রমণীগণ ফ্যাসানের দায়ে পড়িয়া স্বাস্থ্য হানি করিয়া থাকে। যে সকল স্থান সর্ব্বদা গরম রাখা উচিত, সে সকল স্থান খোলা রাখা হয়। বল নাচ ইত্যাদি নানা কারণে যে সকল পোষাক ব্যবহার করা হয় তাহা, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিজনক। ফলতঃ শরীরের যে সকল স্থান বা যে সকল যন্ত্র স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য পাশ্চাত্য রমণীরা সেই সকল স্থান বা যন্ত্র কসা পোষাক ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিকৃত করিয়া ফেলে। কাযেই কোন, শরীরের যন্ত্রাদি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। ধিক এই সভ্যতাকে!! (6)

"The dress should be loose, so as to prevent any pressure upon the blood-vessels, * * * It ought to be loose everywhere, for nature delights in freedom from restraint * * * oh! that a mother would take common sense and not custom as her gide !!" (See Dittp)

(2) "The head ought to be kept cool; Caps, therefore, are un-necessary. * * that a child is better without caps; they only heat his head cause undue perspiration, and thus make him more liable' to catch cold." (See Ditto p. 22)

(3) "Tight bands or tight belts around the waist of a child are very injurious to health; they crib the chest, and thus interfere with the rising and falling of the ribs so essential to breathing. Tight hats ought never to be worn; by interfering with the circulation they cause headaches. Nature delights in freedom, and resents interference !" (See Ditto p. 141)

(4) "Garters ought not to be worn, as they impede the circulation, waste the muscles." (See Ditto)

(5) "Do not allow your child to wear tight shoes. They cripple the feet, causing the joints of the toes, which ought to have free play, * * they produce corns and beenions, and interfere with the circulation of the foot." (See Ditto, p. 144)

"Wearing thin-soled shoes is the fruitful source of decay of female beauty, and the decline of female health." (See Lady's manual by Dr. Ruddock, M. D., p. 38)

"A girl's dress should be well-fitting and loose; girls should not wear stay." (See Advice to a mother by Dr. Chavasse, p. 144)

(6) "There is perfect disregard of health in everything appertaining to fashion. Parts that ought to be kept warm, remain unclothed. Parts that should have full play are cramped and hampered, the chest is cribbed in with stays, the feet with light shoes—hence causing deformity, and preventing a free circulation of blood. The

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য দেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির শতমুখে—সহস্রবার নিন্দা করিতেছেন, আর আমরা সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশ্চাত্য রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া ধন্য বোধ করিতেছি! ধিক আমাদিগকে !!

পাশ্চাত্য দেশের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে সে দেশের ও আমাদের দেশের পুরুষ ও রমণীদিগের কিরূপ গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, সে সম্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ, সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস মহোদয় লিখিয়াছেন :—

যে সকল বাঙ্গালী সাহেবীয়ানার অনুসরণ করেন, তাঁহারা সাহেবদিগের দেখাদেখি জামাজোড়া পরিধান করিয়া থাকেন। এই অনুকরণটী যেমন হাস্যকর, তেমনই অনিষ্টকর। সাহেবরা যে দেশে বাস করেন সে দেশ শীতপ্রবণ, কাজেই তাঁহাদিগকে সারাদিন আবৃত থাকিতে হয়। এইরূপ থাকার কালে তাঁহাদের চর্ম্ম একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। তাঁহাদের বৃক্ক (কিড্‌নি) নামক যন্ত্রই একসঙ্গে ঘর্ম্ম ও মূত্র এতদুভয়ের কার্য্যভার নির্ব্বাহ করে। এই জন্যই তাঁহাদের সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই "বৃক্ক প্রদাহ" (Bright's disease) হইয়া প্রাণনাশ করে। এই জন্যই সাহেবদের মধ্যে হাম, বসন্ত ও অপরাপর চর্ম্মরোগ সহজে মারাত্মক হয়। কিন্তু যে দেশের পূর্ব্বপুরুষেরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সহজে দেহ আবৃত করেন নাই, যে দেশের লোকের চর্ম্ম দ্বারাই শরীরের অধিকাংশ ক্লেদ দূরীভূত হয়, যে দেশে প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া করিয়া চর্ম্মকে মসৃণ, দেহকে বলিষ্ঠ ও স্নায়ুমণ্ডল সুস্থ রাখাই বিধি ছিল, সে দেশে অকস্মাৎ জামা জোড়ার বাহুল্য করিয়া যে বাত, বৃক্কপ্রদাহ, অকাল বার্দ্ধক্য, চর্ম্মরোগ বাহুল্য ঘটিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?"

শিশুরা নগ্ন থাকিতে ভালবাসে। আমাদের দেশে অন্ততঃ ৮ মাস কাল গ্রীষ্ম। চারিমাস শীত। সে শীতও পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রবল নহে। আজ কাল শিক্ষিত ও ধনবান হিন্দু জনক জননীগণ প্রায় সকল ঋতুতে নানা প্রকারের জামা কাপড় শিশুগণকে পরাইয়া থাকেন। কখন ফ্লানেল বা পশমি কাপড় দ্বারা এবং জুতা মোজা টুপী দ্বারা শিশুর সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া দেন, তাহার ফলে শিশুর চর্ম্মের উগ্রতা সাধান করিয়া থাকেন এবং রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত জন্মান। আবার সাবান ব্যবহার করিয়া শিশুর কোমল ত্বককে কর্কশ করেন। এভিন্ন কেহ কেহ শিশুকে রীতিমত স্নান না করাইয়া তাহা স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ফলতঃ শিশুদিগকে শত ভূষায় ভারাক্রান্ত করা অতীব অন্যায়। কসা জামা, জুতা, টুপি, গার্টার, জ্যাকেট ইত্যাদি ব্যবহার করাইয়া বালক বালিকাদের স্বাস্থ্যহানি করিয়া ফেলিতেছেন।

বিদেশী খেলনা, ছবি ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার।

শিশুদের খেলনা ইত্যাদি সম্বন্ধে চরকসংহিতা লিখিয়াছেন :—

"ক্রীড়নকানি খল্যস্তু বিচিত্রানি—।" শরীরস্থান ৮ম অধ্যায়।

অর্থাৎ কুমারের ক্রীড়নার্থ বিচিত্র শব্দবিশিষ্ট, মনোরম, লঘু, অতীক্ষ্ণাগ্র খেলানা ব্যবহার করিবে এবং প্রাণনাশ ও ভয়োৎপাদনের অনুপযোগী ক্রীড়নকের ব্যবস্থা করিবে।

প্রাচীন কালে এদেশের শিল্পীরা অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা খেলানার রং প্রস্তুত করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চত্য দেশের ব্যবসায়ীরা অতি ভীষণ পদার্থ দ্বারা (বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা) নানাবিধ খেলানা, বাক্স ছবি

mind, that ought to be calm and unruffled, is kept in a constant state of excitement by balls and concerts, and plays. Mind and body sympathise with each other and disease is the consequence. Oh! that a mother should be so blinded and so infatuated !!" (See Ditto p. 355.)

ইত্যাদির রং করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা রং করা ছবি, বাক্স ও খেলনা ইত্যাদি শিশুদিগকে ব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। (7) এভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ সুগন্ধি পমেটম ও তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করিতেও নিষেধ করিয়া থাকেন। (8) আমাদের দেশের বাজারেও আজকাল যে সকল সুগন্ধি তৈল বিক্রয় হয়, সেগুলি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ ঐগুলির মধ্যে এমন অনেক উত্তেজক পদার্থ আছে, যাহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকৃত হয়।

রমণীদের একমাত্র বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল বা কাপড় কাচা সোডা মাথায় ব্যবহার করা উচিত। এগুলি ব্যবহারে চুল ভাল ও মাথা ঠাণ্ডা থাকে। (9)

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে "শিশুর (বয়স্থ লোকেরও) গৃহে বিদেশী অতি সুন্দর ও রঙ্গীন ছবি কখনও টাঙাইয়া রাখিবে না। (10) এই সকল সুন্দর সুন্দর ছবি আর্শেনিক (অতি ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ) দ্বারা রং করা হয় এবং সেই আর্শেনিক বিষ অণু অণু পরিমাণে গৃহের বায়ুর সহিত মিশিয়া শিশুর শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার গুরুতর স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে।"

আমাদের দেশের শিশুদিগকে টাট্‌কা সরিষার তৈল মালিশ করান উচিত। এ সম্বন্ধে বিলাতের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কি বলিয়াছেন দেখুন :—

বিগত ১৯ ভাদ্রের (১৩২৯) নায়ক পত্র লিখিয়াছেন—"রবিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শিপলে মহাশয় লিখিয়াছেন—"ম্যালেরিয়ার মশক দংশনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, সর্ব্বাঙ্গে তৈল ব্যবহার করা উচিত। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে গ্রীষ্মের আধিক্য ঘটিলেই খালি গায়ে বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিতে হয়। অতএব তৈল ব্যবহার দ্বারা চর্ম্মকে এমন ভাবে মজবুত (Tan) ও মোটা করিয়া লইতে হয়, যাহাতে চর্ম্মই দেহের আবরণ হইতে পারে। এইরূপ মজবুত চামড়ার উপরে কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গাদি দংশন করিলেও সহসা শরীরের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না।"

আমাদের দেশে মেয়েরা চিরকাল সদ্যপ্রসূত শিশুদের গায়ে সরিষার তৈল ও হলুদ দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন। এই প্রথাটি অতি উৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞান-সম্মত। হলুদি সর্ব্বপ্রকার কীটাণু বিনষ্ট করিয়া থাকে। সর্ব্বদা তৈল ও হলুদ বা নিম-হলুদ মাখিলে, বসন্ত, হাম, প্লেগ, খোস্, পাঁচড়া, চুলকণা ইত্যাদি পীড়া প্রায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(7) * Painted toys are, many of them, highly dangerous especially those painted green."
"Children's painted-boxes, are dangerous toys."

(8) "He ought not to be allowed to have poison-painted boxes or poison-painted toys." (See Advice to a mother p. 35)

(9) "Cocoanut oil is an excellent application for the falling off of the hair, and can never do harm which is more than can be said of many vaunted remedies for the hair." (See Ditto p 353)

(10) "The injurious effects of arsenical wall papers appear to be due to the dissemination of the vapour of arseniaratted Hydrogen or of solid particles of arsenic, as dust, into the air of the apartment"

"The long continued inhalation into lungs or swallowing of the arsenical dust and vapours derived from wall paper tends to produce a chronic form of poisoning." (See Hygiene and Public Health, by L. C. Parkes, M. D. D. P. H., p. 241)

অজীর্ণতা।

লেখক—ডাক্তার শ্রীবসন্ত কুমার চৌধুরী।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে "নাই-নাই যাই-যাই" একটা রব উঠে গিয়েছে। অন্ন-সমস্যা হয়েছে বলে সমস্ত দেশের লোক হাহাকার করছে। লোকে অভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত থাকছে বলে চীৎকার শোনা যাচ্ছে। খাদ্য দ্রব্যের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে বলে সকলের মুখেই একটা চিন্তার রেখা পড়েছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটেও এজন্য আবেদন নিবেদন চল্‌ছে। কিন্তু হিসাব করলে দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৯০ জন লোক অজীর্ণ রোগে ভুগছে। ডাক্তার কবিরাজদিগের এই রোগীর সংখ্যাই বেশী হচ্ছে। এই রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপনও বেশী দেখা যাচ্ছে। সুতরাং লোকে না খেয়েই যে অজীর্ণ রোগে ভুগছে, তা কিরূপে বলা যায়। শাস্ত্রে বলেছে :—

"অজীর্ণং ভোজনং বিষম্।"

বিষম ভোজন যদি লোকের না হবে, তবে এত অজীর্ণ রোগ হচ্ছে কেন? আজ আমরা তাই এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করবো।

মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রধানতঃ তিন প্রকার সারবান দ্রব্য আহার করে। যদিও সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে সেগুলি দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে তাতে এই তিনটীই ভিন্ন আকারে ধরা যায়। প্রথমতঃ "শ্বেতসার" বলে একটা জিনিস আমরা খাই, তা, শাগু, বার্লি, ময়দা, ভাত, আলু, যব ইত্যাদি খাদ্যে বেশী থাকে। এগুলি দেখ্‌তে সাদা। খেতে কোন বিশেষ স্বাদ নাই। এবং সিদ্ধ করলে আঠার মত বা ভাতের মাড়ের মত হয়। দ্বিতীয় খাদ্যটী "প্রোটীড্" বা আমিষ জাতীয়। ইহা মাংস, ডিম্ব, মৎস্য প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বেশী থাকে। এবং ঐগুলি বিশ্লেষণ করলে তাতে "প্রোটীড্" নামক পদার্থটী ধরা যায়। তা ছাড়া জীব ও উদ্ভিজ্জের জীবন্ত অংশে এই পদার্থটী বেশী থাকে। দাইল, তরি-তরকারী প্রভৃতি খাদ্যেও এইটী কতকটা পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। এই দুইটী খাদ্যের উপাদান ছাড়া তৃতীয়টী স্নেহ বা তৈলাক্ত পদার্থ। তৈল, ঘি, চর্ব্বিতে এই পদার্থ অধিক। তা ছাড়া দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংস, দাইল এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থেও এইটী অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। এই তিনটী দ্রব্য ছাড়া জলও আমাদের একটী প্রধান খাদ্য বা পানীয়।

এই কয়টী দ্রব্যের শুধু কোন-একটী খেয়ে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না। যেমন শুধু যদি ভাত কিম্বা তৈল খাই, তবে আমাদের শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয় ও শরীরের ওজন কমে গিয়ে আমরা শুকিয়ে যাই। সে জন্য এই তিনটী দ্রব্যই আমাদের জীবন ধারণের জন্য খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অথবা যে জিনিসের ভিতর এই তিন প্রকার পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, তাই খেলে শরীর ভাল থাকে। এই জন্যই মানুষ ভাত, রুটী, দাইল, দুগ্ধ, তরকারী, তৈল, ঘি, মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি দ্রব্য প্রতি দিন আহার করে। অথবা এই সকল দ্রব্যের সংমিশ্রণে সুমিষ্ট মুখ-রোচক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়ে আহার করে। সেইজন্যই অবস্থা বিশেষে কেহ বা শুধু ভাত-মাছ, কেহ বা দাইল-রুটী, কেহ বা পলান্ন, কেহ বা পায়সান্ন খায়। ফল কথা, ভারতের লোক যে যা খায়, তার ভিতরেই ঐ তিন প্রকার পদার্থ অল্প-বিস্তর বর্ত্তমান থাকে।

উপরিউক্ত তিন প্রকার খাদ্য দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন করতে হলে সেগুলিকে পরিপাকোপযোগী করে ভিন্ন ভিন্ন আকারে তাদের যার যার স্থানে বা কার্য্যে পাঠান হয়। নতুবা শরীরের পুষ্টিসাধন হ'তে পারে না। আমরা কতকগুলি চাউল বা কাঁচা মাংস কি তরকারী যদি খেয়ে ফেলি, তা অমনি যথা স্থানে গিয়ে কার্য

করতে সক্ষম হয় না, বরং অপকার করে। আমাদের দেহের ভিতর সেইগুলিকে পরিপাক করতে বা যার যার কাজে তাদের প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠানোর জন্য কল-কৌশলও বর্ত্তমান আছে। তা ছাড়া আমরাও রন্ধন করে, চূর্ণ করে বা তরল করে সেগুলিকে পরিপাকোপযোগী করে দেহের ভিতর পাঠিয়ে দেই। সেখানে এই তিন প্রকার পদার্থকে বিশ্লেষণ করবার জন্য প্রধানতঃ তিন প্রকার রস আছে। তার একটী থাকে মুখে। মুখের রস বা লালার কার্য্য হচ্চে শ্বেতসার নামক পদার্থকে চিনিতে পরিবর্ত্তিত করে দেওয়া। চিনি যেমন সহজেই গলে যায় বা সামান্য জল সংযোগেই তার ভাব থাকে না, শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য সেইরূপ মুখের রসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে চিনিতে পরিবর্ত্তিত হলেই গলে যায়। প্রথমতঃ আমরা যখন কোন শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ যেমন মুড়ি, চিড়ে, খই, বিস্কুট, রুটী মুখে দেই, তখনই তার মিষ্ট আস্বাদ অনুভব করতে পারি না। কিন্তু কিছুক্ষণ চিবালেই তার মিষ্টস্বাদ অনুভূত হয়, ইহার কারণই হচ্চে ঐ সকল পদার্থের শ্বেতসারযুক্ত দ্রব্য কিছুক্ষণ মুখ মধ্যে দন্ত দ্বারা পিষ্ট ও জিহ্বা দ্বারা আলোড়িত হওয়ায় মুখগহ্বর হ'তে প্রচুর পরিমাণে লালারস নির্গত হয়ে ঐ সকল খাদ্যের শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ-গুলিকে চিনিতে পরিবর্ত্তন করে; তখন আমরা মিষ্টস্বাদ অনুভব করতে পারি। এবং তৎপর তাহা মুখগহ্বরেই কতক আশোষিত হইয়া শরীর পুষ্টির কার্য্য করে।

দ্বিতীয় রসটী থাকে পাকাশয়ে। যখন মুখ হ'তে খাদ্যদ্রব্যগুলি চূর্ণীকৃত ও কোমল হ'য়ে সরু ছিদ্রপথে গল-নালি দ্বারা পাকাশয়ে উপস্থিত হয়, তখনই পাচক রস সে খাদ্যগুলিকে তার সঙ্গে মিশিয়ে লয়। খাদ্য দ্রব্য মুখ-গহ্বরে এলে দন্ত দ্বারা পেষণ ও জিহ্বা দ্বারা আলোড়ন হ'য়ে সরু নলের মধ্য দিয়ে পাকাশয়ে পাঠানোর উপযোগী হ'য়ে দেয়। পাকাশয়ে এলে তাদের সেইরূপ করে অন্ত্রে পাঠানোর উপযোগী করতে হয়। পাকাশয় ভিস্তির মশকের মত একটা ছোট থলি। তার উপরের দিকে গলনালি এবং নিম্নের দিকে অন্ত্রনালি। পাকাশয়ের গায়ে কতকগুলি সরু সরু পেশী, লম্বা এড়ো এবং কোণাকুণি ভাবে বিছান থাকে। যখন খাদ্য দ্রব্য পাকাশয়ে এসে পড়ে, তখন এই পেশীগুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে, পাচক রস নিঃসৃত হ'য়ে খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে যায়; এবং সকল রকম খাদ্য, বেশ মিশে, নরম, গরম ও কোমল হয়। এইস্থানে পাচক রস দ্বারা "প্রোটীড্" খাদ্যগুলি আশোষিত হ'য়ে যায় এবং অবশিষ্ট খাদ্যগুলি অন্ত্রের সরুপথে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। এই হলো সহজ ভাবের কথা। কিন্তু পাকাশয়ে যদি বার বার অধিক পরিমাণে খাদ্য পড়ে, তবে পাকাশয়ের পেশী সকল ও পাকাশয়িক রস সেগুলিকে, তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত ব'লে, হজম করতে পারে না। অথবা আমরা যদি এমন খাদ্য খাই যা পাচক রসে ও পাকাশয়ের আলোড়নেও নরম হয় না, তাহ'লে সেগুলি পাকাশয়ে অনেকক্ষণ থেকে যায়। এবং পাকাশয়ের পেশী সকল সেগুলিকে নরম করবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। এবং পাচক রস সেগুলিকে পরিপাক করবার জন্য অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হ'য়ে পরিমাণে বেশী হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ঠিক ঠিক খাদ্য পাকাশয়ে পহুঁছিলেও যদি কোন পীড়া বশতঃ পাকাশয়িক রসের কোনরূপ বিকৃতি জন্মে, তাহ'লেও খাদ্যগুলি অনেক সময় পাকাশয়ে থেকে বিকৃত হয়। তখন বমি করতে ইচ্ছা হয় বা অনেক সময় বমি হয়ে সেগুলি বেরিয়ে যায়। সহজে পাকাশয়ে "প্রোটীড্" খাদ্য পরিপাক হলে, অবশিষ্ট অজীর্ণ পদার্থ ও তৈলাক্ত পদার্থ অন্ত্রমধ্যে নেমে যায়।

পাকাশয়ের ন্যায় অন্ত্রের গায়েও ছোটবড় পেশী সকল লম্বা ও এড়োভাবে বিছান থাকে। সেখানে খাদ্য গেলেই অন্ত্র হ'তে রস নিঃসৃত হয়ে, ঐ সকল অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। এবং অন্ত্রের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রভাবেই খাদ্যদ্রব্য আলোড়িত হয়ে নিম্নদিকে সরতে থাকে। এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যগুলি জলবৎ তরল হয় ও অন্ত্রের অসংখ্য ক্যাপিলারি (Capillary) বা সূক্ষ্ম নালি দ্বারা আশোষিত

ও রক্তে পরিণত হ'য়ে দেহ-পুষ্টির কার্য্য করে। তৈল জাতীয় খাদ্যগুলি একেবারে দ্রব হয় না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিত হয় মাত্র। এগুলি আলাদা পথ দিয়ে রক্তে মিশে যায়; এবং তথা হ'তে দেহের পুষ্টি সাধন করে।

এইরূপে মুখে, পাকাশয়ে, ও অন্ত্রে ঐ তিন প্রকার খাদ্যের উপাদানগুলি পরিপাক হয়েও কতকগুলি জিনিষ অবশিষ্ট থাকে। এগুলি খাদ্যের আবর্জ্জনা বা অপরিপক্ক দ্রব্য। এগুলি কিছুতেই পরিপাক হয় না। সকল খাদ্য পরিপাক হবার পরেও অন্ত্র এগুলিকে ঠেলে নিয়ে মলদ্বারে পহুঁছে দেয়। পথে তা থেকে জলীয় অংশ রক্ত শোষণ করে লয়, সুতরাং মলগুলি কঠিন হয়। অন্ত্রের শেষ অংশে বা মল ভাণ্ডে ঐসব আবর্জ্জনা-গুলি যখন এসে পহুঁছে, তখন সেগুলি বের করে দিবার জন্য আমাদের তাড়না বা ইচ্ছা হয়। এগুলিই মল। এইরূপে খাদ্যদ্রব্যের সার্থকতা জন্মে।

কোন প্রকারে এই কার্য্যের ব্যাঘাত হ'লেই অজীর্ণ রোগ জন্মে। এক্ষণে কি প্রকারে অজীর্ণ রোগ জন্মে ও অজীর্ণতার ফল কি, তা বলা যাচ্চে।

মুখ গহ্বর, পাকাশয় এবং অন্ত্র এই তিন স্থানই হচ্চে, আমাদের খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের প্রধান স্থান বা এই তিনটাই প্রধান যন্ত্র। কোন কারণে মুখগহ্বরে কোন পীড়া হ'লে, যেমন ঘা কিম্বা দন্তের পীড়া বা দাঁত পচিয়া যাওয়া ইত্যাদি দ্বারা মুখ গহ্বর অসুস্থ থাক্‌লে, মুখগহ্বরে খাদ্যদ্রব্য পেষিত, আলোড়িত ও লালা দ্বারা মিশ্রিত হয়ে, কোমল হতে পারে না; এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য চিনিতে পরিণত হয় না। সুতরাং ঐ জাতীয় খাদ্য প্রথমেই মুখগহ্বরে পরিপাক হতে পারে না। এবং তা ঐ অবস্থায় পাকাশয়ে এসে জমা হয়। দ্বিতীয়তঃ পাকাশয়ে যদি বার বার অধিক পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য পড়ে, তা হ'লে পাকাশয়ের পেশী সকলের নড়ন-চড়ন ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি হয়। ক্রমে তারা ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং শেষে আর তাদের নড়ার ক্ষমতা থাকে না। যে পরিমাণ পাকাশয়িক রস নিঃসৃত হ'য়ে, যে পরিমাণ খাদ্যকে পরিপাক কর্‌তে পারে, খাদ্য দ্রব্য তার চেয়ে বেশী হ'লে, পাচকরস তার উপর কার্য্য কর্‌তে পারে না। এবং তাকে পরিপাক কর্‌বার জন্য বার বার অধিক রস বের কর্‌বার চেষ্টা করে সে যন্ত্রটীও খারাপ হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত কোন প্রকার গুরুতর আঘাত জন্য পাকাশয়ের পেশী সকল পীড়িত হ'লে, কিম্বা পাচক রসগুলি যদি বিকৃত হয়ে যায়, তবে তা দ্বারাও পরিপাক হওয়া সম্ভব নয়। খাওয়ার সময় বা খাওয়ার পরেই যদি অধিক পরিমাণে জল পান করা যায়, তবে পাকাশয়িক রস অত্যন্ত পাতলা হওয়ায়, তার ক্রিয়া কম হয়ে যায়। উগ্র নাইট্রিক এসিডের ভিতর একটা পয়সা দিলে বা খানিক নেবুর রসের ভিতর একটা কড়ি দিলে, তা ক্রমে গলে যায়; কিন্তু যদি নাইট্রিক এসিড বা লেবুর রসে অধিক পরিমাণে জল মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পয়সা বা কড়ি গলে না। আমরা যখন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি, তখনই আমাদের মুখ হতে লালা ও পাকাশয় হ'তে পাকাশয়িক রস নিঃসৃত হতে আরম্ভ হয়। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে, আহার করি বা না করি, ঐ সকল রস নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই সময় ঐ রসের সহিত অধিক পরিমাণে জল মিশ্রিত হলে, তার শক্তি কমে যায়; এজন্য খাদ্য দ্রব্য হজম কর্‌তে পারে না। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যগুলি পাকাশয়ে জমে যায়। এবং পাকাশয়ের পেশীর আলোড়ন অভাবে অন্ত্রে যেতে পারে না। ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য যদি পাকাশয়ে গিয়ে পরিপাক না হয়ে তা জমে যায়, তাহলে কিছুক্ষণ পরে তা পচে উঠে। বাইরে খাদ্য দ্রব্য রেখে দিলে যেমন তা পচে, তা থেকে গাঁজলা উঠতে থাকে, পেটের ভিতরেও সেইরূপ সেগুলি পচে টক হয়। তাতে কতকগুলি গ্যাস তৈরী হ'য়ে পেটের ভিতর ডাক হয়, পেট গড় গড়, ভুটভাট করে, ঢেঁকুর উঠে, এবং পেট ফেঁপে যায়। যে ঢেঁকুর উঠে তাতে সময় সময় পচা জিনিষের ন্যায় দুর্গন্ধ থাকে। তা ছাড়া অম্বল হয়, এবং বুক অত্যন্ত জ্বালা করে। কোন প্রকার অম্বল নাকে চোখে লাগ্‌লে যেমন জ্বালা করে

ও তা হতে জল পড়তে থাকে, পেটের ভিতরেও ঐ প্রকার অত্যধিক অম্বল হওয়ায় পেটে জ্বালা করে এবং পেটে অসহ্য বেদনা হয় ও পেটের মাংসপেশী সকল ঠেসে ধরে। ইহাকেই অম্লশূল বলে। ইহা ক্রমে এত বেশী হয় যে, এই বেদনায় লোকে অজ্ঞান পর্য্যন্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থা হ'লে পাকাশয়ে জল এবং কফ (বা আমের মত এক প্রকার পদার্থ) জমে, ঐ প্রদাহ নষ্ট করবার চেষ্টা হয়। এবং বারবার বমির ভাব হয়ে সেগুলি বের করবার চেষ্টা হয়। কখন কখন বমি হয়েও যায়। যদি সহজে বমি হয়ে সে পচা দ্রব্যগুলি বেরিয়ে না যায়, তা হ'লে জল ও আমের সংযোগে সে গুলিও রস হয়ে, অন্ত্রে এসে পড়ে এবং তলপেটে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা হয়। পাকাশয়ের ন্যায় অন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু ভুক্ত দ্রব্য অন্ত্রেও পচ্‌তে পারে। এবং পচ্‌লে সেখানেও অম্ল গ্যাস জন্মে। পাকাশয়ের গ্যাস যেমন ঢেঁকুর উঠে বেরয়, অন্ত্রের গ্যাস তেমন গুহ্য দিয়ে অপান বায়ুরূপে নিঃসরণ হয়ে যায়। সে গ্যাস অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পাকাশয়ের পচা রস ও আম যখন অন্ত্রে এসে পড়ে বা অন্ত্রে এসে সেরূপ জন্মে, সেগুলি তখন তরল মলরূপে বা আমাশয়রূপে মলদ্বার দিয়ে বাহির হতে থাকে বা অন্ত্র সেগুলি বের করে দিবার চেষ্টা করে। সেজন্য বেশী কুন্থন জন্মে। এই দূষিত মল, মলভাণ্ডে থাকায় ও তাহা বের করবার জন্য বার বার চেষ্টা হওয়ায় পরে সেস্থানে ঘা হ'য়ে রক্ত পড়ে। কখন কখন হালিস বা গুহ্য বের হয়ে পড়ে। এবং ক্ষুধামান্দ্য জ্বর ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাধিও তার সঙ্গে এসে জোটে। এইরূপ বার বার তরল মল বা আম বেরুলেই তাকে উদরাময় ও আমাশয় বলে। এ ছাড়া অনেক সময় মলভাণ্ডে মল জম্‌লেও বদ্‌হজম হতে পারে। মলভাণ্ডে কতকটা মল জম্‌লেই, তা বের করে দিবার জন্য আমাদের চেষ্টা হয়। পেট বেদনা করে। যদি আলস্য বশতঃ বা লজ্জা বশতঃ বা কাজের বাধ্যতায় বা পায়খানার অসুবিধায় সে সময় সেগুলি বের করে না দেই, তা হলে ক্রমে মলভাণ্ডে মল জমে মলভাণ্ড অসাড় হয়ে পড়ে। মল বের করবার চেষ্টা তার নষ্ট হয়ে যায়।

এ ছাড়া যদি প্রতিদিন লঘুপাক দ্রব্য বা আবশ্যকীয় খাদ্য অপেক্ষা কম খাই, তা হ'লে মল কম হয় এবং ক্রমে ঐ অল্প মল মলভাণ্ডে জম্‌তে থাকে। কারণ মলভাণ্ড পূর্ণ না হলে মল বের কর্‌বার স্বাভাবিক চেষ্টা হয় না। এইরূপেও কোষ্ঠবদ্ধতা হতে পারে। অনেক সময় মলদ্বারে অর্শ, ক্ষত, ফোড়া প্রভৃতি কারণেও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা হলে ক্ষুধামান্দ্য, মাথাধরা, জ্বর ইত্যাদি রোগ জন্মে যায়।

দুর্ভিক্ষের সময় না খেতে পেয়ে বা অল্প খেয়ে অথবা অখাদ্য খেয়ে একরূপ অজীর্ণ বা উদরাময় জন্মে। খাদ্যের অভাবে পেটের পাচক রস সকল নিঃসৃত হয় এবং সেগুলি পাকাশয়ে ও অন্ত্রে জমে ক্রমে পচে যায়, তা থেকে গ্যাস ও অম্বল হয়। সুতরাং সেগুলি উদরাময় রূপে বের হতে থাকে। পেটে অত্যন্ত জ্বালা হয় বলে যা পায় তাই খায়। সুতরাং পরিপাক ক্রিয়া ভালরূপ না হতে পেরে অজীর্ণ রোগ জন্মে। ভারতে এখন নিত্য দুর্ভিক্ষ; সুতরাং এখন অজীর্ণ পীড়া লোকের নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুখগহ্বর, পাকাশয় ও অন্ত্রের এতটা ব্যতিক্রম ঘট্‌লেও যদি মূর্খতা বশতঃ বারবার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে বা অখাদ্য খায় বা দুর্ভিক্ষের সময় হঠাৎ বেশী খাদ্য পেয়ে যদি অত্যধিক খেয়ে ফেলে, তা হ'লেই অজীর্ণ রোগ স্থায়ী হয়ে যায়, আহার করা মাত্রেই অম্বল হয়। পরিপাক আদবেই হয় না। উদরাময় আমাশয় লেগেই থাকে। ক্রমে পাচকরস বিকৃত হয়ে যায়। পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়ার লোপ হয়। এইরূপে খাদ্য দ্রব্যের সারাংশ শরীর গ্রহণ কর্‌তে না পারায় দেহ ক্রমে ক্ষয় হয়। শেষে নানারূপ ঔষধেও উপকার হতে চায় না। অন্ততঃ আমাদের দেশে উল্লিখিত প্রকারে ক্রমে অজীর্ণ রোগের আধিক্য হয়ে পড়ছে।

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা হেতু, লোকে অসময়ে, অনুপযোগী, অসার খাদ্য অধিক পরিমাণে খাচ্চে। অজ্ঞতাবশতঃ খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার না জেনে, অসম্মিলিত খাদ্য অপরিপক্ক গুরুপাক খাদ্য খাচ্চে, দেশভেদে ঋতুভেদে খাদ্যের বিচার কর্‌ছে না। বিলাসিতার অভিমানে, অনভিজ্ঞ, অপরিষ্কৃত, কাণ্ড-জ্ঞানহীন পাচকের হস্তে পাচক রসের ক্রিয়ার ভার পড়েছে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধিতে পাকযন্ত্রগুলি ক্রমে বিকৃত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শতকরা ৯০ জন লোক অজীর্ণরোগে ভুগ্‌ছে।

এই সময় এই পীড়ার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কারণ জেনে উপায় নির্দ্ধারণ কর্‌লে তা যেমন সহজে সেরে যায়, আর না বুঝে সুঝে কেবল জীর্ণকারক অম্ল-নিবারক অসুধ খেলেই তা আরোগ্য হওয়া কঠিন হয়। নিম্নলিখিত উপায়গুলি জেনে রাখ্‌লে অজীর্ণ পীড়া সহজে আরাম হ'তে পারে।

১। পরিমিত আহার করা উচিত। আমাদের শরীর রক্ষণের জন্য যে তিন প্রকার প্রধান দ্রব্যের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে. বেছে বেছে সেইরূপ খাদ্য প্রতিদিন খাওয়া উচিত। সেরূপ খাওয়া গরীবেও পারে, ধনাঢ্যও পারে। কখনই অত্যধিক গুরুপাক দ্রব্য আহার করা উচিত নয়। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পরিমিতরূপে আহার করা উচিত। একবার খাদ্য গ্রহণের পর তাহা পরিপাক না হ'লে পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য পাকাশয়ে পরিপাক না হ'লে পচন জনিত অম্লের জন্য পেট জ্বালা করে। তখন মনে হয়, কিছু খেলেই জ্বালা দূর হবে। তাই ভেবে অনেকে খায়, কিন্তু তাতে উপকার না হয়ে অপকারই হয়। পরের খাদ্যগুলিও পূর্ব্বের খাদ্যের ন্যায় পচে যায়। তাতে অম্ল ও গ্যাস জন্মে। এরূপ হলে সোডাওয়াটার, বাইকার্ব্বনেট অব সোডা প্রভৃতি খেলে আশু উপকার হয় বটে, কিন্তু পীড়ার স্থায়ী উপশম হয় না। পাকাশয়ে অত্যধিক অম্ল ও গ্যাস হ'লে সে গুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব বমন করে বের করে দিলেই ভাল হয়। সহজে বমন না হ'লে, খানিক গরম জল বা লবণ মিশ্রিত গরম জল খেলেই বমন হয়ে পেট খালি হয়ে যায়। অথবা ষ্টমাক পাম্প দ্বারা গরমজল পেটে পুরে পেট ধুয়ে ফেলিলেও উপকার হয়। পীড়া সেরূপ বেশী না হলে সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় এক গ্লাস করে গরম জল খেলে পাকাশয় ধুয়ে অন্নপথে বেরিয়ে উপকার হয়। প্রাতে আদা নুন ও জল খেলে এবং খাওয়ার আধ ঘণ্টা পর জোয়ান বাটা খেয়ে জল খেলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২। ক্ষুধা না হলে আহার করা কর্ত্তব্য নহে। রসনার তৃপ্তি সাধন বা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে বা বাজি রেখে কোন দ্রব্য আহার করা উচিত নয়। হাতে পয়সা নাই, ইচ্ছা সত্ত্বেও ভাল জিনিস খেতে পারি না; হঠাৎ একদিন পয়সা জুট্‌ল, অমনি কতকগুলি রসগোল্লা, সন্দেশ বা তেলে ভাজা জিলেপি খেয়ে ফেল্লুম। তাতে অজীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কোন মেলা বা উৎসব উপলক্ষে বা গান বাজনার স্থানে তেলে ভাজা, পচা মিষ্ট দ্রব্যের আমদানী হয়। দোকানদারগণ অত্যধিক লাভের আশায় কতকগুলি অখাদ্য, সুখাদ্যরূপে সাজিয়ে লোভ ও বাজি রাখবার সুবিধা করিয়ে দিয়ে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এরূপ কোন উৎসবের পরেই অজীর্ণ উদরাময় রোগীর সংখ্যাধিক্য হয়। এ সময় এরূপে অনেকে মরেও। মেলার কর্ত্তৃপক্ষের মেলায় এরূপ অখাদ্য আমদানী হ'তে দেওয়া উচিত নয়। এবং দেশ-হিতৈষী স্বেচ্ছাসেবকগণের সাধারণ লোককে উপদেশ দিয়ে এরূপ খাদ্য গ্রহণে নিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। এরূপ অখাদ্য খেয়ে অজীর্ণ হলে শীঘ্র তাহা বমন করা কর্ত্তব্য ও চিকিৎসা করানো উচিত।

৩। খাদ্য দ্রব্য বেশ করে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। পরমেশ্বর সেজন্য আমাদের মুখ গহ্বরে দৃঢ়মূল দন্তরাজি দিয়াছেন। যে জিনিষগুলি দাঁতে ভাঙ্গা না যায়, এরূপ জিনিষ খাওয়া উচিত নয়। তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করলেই জানবে অজীর্ণ রোগ হবে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, পাকাশয় কঠিন খাদ্য-দ্রব্য দ্রবীভূত কর্‌তে পারে না। কাজের ভিড়ে বা চাকুরীর খাতিরে, বা থিয়েটার গান বা কোন আমোদ প্রমোদে যাবার সময়ই এরূপ তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করা প্রয়োজন হয়। স্কুল কলেজের বেলা হলেও গলাধঃকরণ বা তাড়াতাড়ি আহার করা ছাত্রদের অভ্যাস। সেই সব লোকেরই বা ছেলেদেরই অজীর্ণ পীড়া হয়ে থাকে। এরূপ অজীর্ণ রোগে, চাকুরের ছুটী লওয়া কর্ত্তব্য ও ছাত্রদের স্কুল বা কলেজ বন্ধ করা উচিত।

৪। খাবার সময় বা খাবার পরে দুঘণ্টার মধ্যে জল বা কোন জলীয় পদার্থ খাওয়া উচিত নয়। এবং যতদূর সম্ভব শুকনো জিনিষ খাওয়া ভাল। খাবার সময় বা খাবার পরে জল বা জলীয় খাদ্য খেলে পাচকরস জল সংযোগে দ্রব হয়ে যায়। সুতরাং ঐ রস খাদ্য দ্রব্যের উপর ভাল কাজ করতে পারে না। সেজন্য অজীর্ণ জন্মে। এরূপে অজীর্ণ জন্মিলে, আহারের সহিত জল খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবে। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা বা গরম জল পরিমিতরূপে পান করা অভ্যাস কর্‌লে সহজে পরিপাক হয়।

৫। পেট ভ'রে খাওয়া উচিত নয়। পেটের তিন ভাগ পূর্ণ করে একভাগ খালি রাখা উচিত। খুব ঠেঁসে গুঁজে খেলে,—পাকাশয়িক রস যে পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তার চেয়ে বেশী খাদ্য খেলে, ঐ খাদ্য গুলি সম্যকরূপে ঐ রসে মিশে যেতে পারে না। তা ছাড়া পাকাশয়ের পেশীগুলির ক্ষমতার অধিক কার্য্য কর্‌তে হ'লে, সেগুলি ক্লান্ত হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়। রবারের নল যেমন অত্যধিক বলে টান্‌লে তার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়, পাকাশয়ের পেশী সকলেরও সেইরূপ হয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য পাকাশয়ে জমে অজীর্ণ হয়। এরূপ হলে খুব অল্প পরিমাণ সহজ-পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা বা একবেলা আহার করা বা মধ্যে মধ্যে উপবাস দেওয়া ভাল।

৬। খাওয়ার পর বিশ্রাম করা উচিত। কিন্তু খেয়ে উঠেই ঘুমান ভাল না। নিদ্রাবস্থায় সকল যন্ত্রই নিশ্চেষ্ট থাকে। খাওয়ার পর ঘুমাইলেই পাকরস ভাল নিঃসৃত হয় না এবং পাকাশয় ও অন্ত্রের নড়নচড়ন কম হয় বলে ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্র হজম হয় না। সেজন্য দিন অপেক্ষা রাত্রের আহার কম হজম হয়, এবং হতে অনেক সময় লাগে। এজন্য রাত্রের আহার লঘুপাক ও কম হওয়া উচিত।

৭। প্রতিদিন রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম কর্‌লে খাদ্যদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। শরীরাভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্যের অভাবই ক্ষুধা। খাদ্যদ্রব্য দ্বারা শরীরের ক্ষয়িত অংশ পূর্ণ হয়। পরিশ্রম দ্বারা শরীর পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম হয়। যারা বেশী পরিশ্রমী তারা খায়ও বেশী, তাদের শরীরে শক্তিও বেশী। শিক্ষিত ভদ্রলোক ও বড়লোক এত তেল, ঘি, মিঠাই মোণ্ডা খায়; কিন্তু তার শরীরে যে শক্তি, গরীব লোকের শাক-ভাত খেয়েও তদপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি। তার অর্থ হচ্চে তারা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে। বড় লোকের অজীর্ণ রোগ বেশী। সহজে সারেও না। গরীবের মধ্যে প্রায় এই রোগ নাই বল্‌লেই চলে। যদি কোন কারণে তাদের শারীরিক পরিশ্রম কম কর্‌তে হয় তবে কখন কখন এরূপ পীড়ার কথা শুনা যায়। কিন্তু আদা নুন বা জোয়ান খেলেই তাদের তা সেরে যায়। আর ভদ্রলোকের এ রোগ হলে, ডাক্তার কবিরাজের মোটা সেলামি দিয়ে, পেটেণ্ট ঔষধ খেয়ে বা বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য স্থানান্তরে থেকেও তা সারতে চায় না। এরূপ হ'লে একটু কঠিন পরিশ্রম কর্‌তে অভ্যাস কর্‌লেই নিশ্চয় এরূপ রোগ সেরে যায়।

৮। যাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, এরূপ উপায় অবলম্বন কর্‌লে বদ্‌হজম হতেই পারে না। দাস্তের বেগ হলেই আলস্য, লজ্জা বা শত কার্য্য পরিত্যাগ করেও পায়খানায় যেয়ে মলত্যাগ করা উচিত। দাস্ত হউক বা না হউক্ প্রতিদিন সকালে সময়মত পায়খানায়

খাওয়া অভ্যাস রাখলে ক্রমে রোক্ত মলশেষী দাস্ত হয়ই। সকালে উঠে ঠাণ্ডা বায়ু সেবন করলে দাস্তের বেগ হয়। যারা বেছে বেছে ভয়ে ভয়ে লঘুপথ্য খায়, তাদের মল কম হয়। এবং ঐ সামান্য মল মলভাণ্ডে জম্‌তে থাকে ও ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ রোগ জন্মে। তাদের ফল মূল, তরকারী, শাক বেশী খাওয়া ভাল। জাঁতা ভাঙ্গা ময়দা ও ভাজাভুজি খেলেও সহজে কোষ্ঠপরিষ্কার হয়। অনেক সময় মল এত কঠিন হয় যে, সহজে বেরুতে চায় না। সেজন্য বার বার জোরে কুন্থন দিতে হয়। অনেক সময় পিচাকরি বা ডুস দিয়ে পেটে জল দিলেও কঠিন মলের একধার দিয়ে জলগুলি বেরিয়ে যায়, তবু মল বের হয় না। জোলাপের ওষুধ খেলেও মল বেরোয় না, বরং অন্ত্র ও মলদ্বারের নড়নচড়ন ক্ষমতাকে বাড়াতে যেয়ে পেটে বেদনা হয়ে পড়ে। এরূপ কোষ্ঠবদ্ধতায় প্রতিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করা ভাল এবং পেটে তেল মালিশ ও ঠাণ্ডা জলের ধারানি বা গরম জল ভরা বোতল তলপেটে গড়ালে সহজে দাস্ত পরিষ্কার হয়। অনেক সময় সঞ্চিত মল, মলভাণ্ডে পচে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস তৈরী হয় এবং বার বার দুর্গন্ধযুক্ত বাই সরে, পেটের মধ্যে ভুটভাট্ করে। ক্ষুধামান্দ্য হয়, মাথা ধরে; শেষে উদরাময় ও আমাশয় জন্মে। এরূপ স্থলে বুঝ্‌তে হবে পেটে অনেক দূষিত মল জমে এই কাণ্ড ঘটাচ্চে। এরূপ উদরাময় বা আমাশয় বন্ধ করবার চেষ্টা করা উচিত নয় বরং পেটের দূষিত মল বের করবার উপায় কর্‌তে হয়। এবং পেটে যাতে আর মল জম্‌তে না পারে, এরূপ পথ্য খেতে হয়। এরূপ রোগ কঠিন বুঝলে চিকিৎসকের অধীন হতে হয়।

৯। বিষম খাদ্য, বা অসম্মিলিত খাদ্য বা বিষাক্ত খাদ্য অথবা পচা খাদ্য খেলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিতে পারে। বেড়াল, কুকুর, মাছি প্রভৃতির দ্বারা স্পৃষ্ট খাদ্য খেয়ে অনেকের অজীর্ণ পীড়ার কথা শুনা যায়। এ সকল খাদ্য হ'তে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। উপোস করে থাকলেও সেরূপ খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এবং খাদ্যদ্রব্য বিশেষ সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

১০। শীত কাল অপেক্ষা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে লোকের অজীর্ণ পীড়া বেশী জন্মে। এই সময় জল বায়ুর পরিবর্ত্তন ও খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বায়ু ও তাপ প্রভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় বলে এরূপ হইয়া থাকে। এ সময় পানীয় জল ও আহার্য্য পদার্থ যাহাতে নির্ম্মল টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ হয়, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

১১। ছেলেদের পেটে ক্রিমি জন্মিলে, অনেক সময় অজীর্ণ পীড়া জন্মে থাকে। কিছু খেলেই পেট ফাঁপে, বার বার দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা অজীর্ণ খাদ্য দ্রব্য দাস্ত হয়, ক্ষুধামান্দ্য হয়, মুখে দুর্গন্ধ ও ক্ষত হয়, লাল পড়ে। এরূপ হ'লে পেটের ছোটবড় ক্রিমি বের করবার উপায় কর্‌তে হয় ও চূণের জল, তেতো জিনিষ খেতে দিতে হয়।

১২। শিশুদের—যারা শুধু দুধ খেয়ে থাকে—তাদের পেটে মল জমে বাসি দূষিত দুগ্ধ পানে, মাতার অজ্ঞতা হেতু অত্যধিক আহারে বা বিকৃত মাতৃদুগ্ধ পানে, দুগ্ধের অভাবে বেশী বার্লি খেলে পেটের অসুখ ও অজীর্ণ রোগ জন্মে, তা সহজে সার্‌তে চায় না ও অনেক শিশু মারাও যায়। এরূপ হলে তাদের বিশুদ্ধ দুগ্ধ জল মিশিয়ে কম করে পান করাতে হয়, ছানার জল, টানা দুগ্ধ বা শুধু স্তনের দুগ্ধ দেওয়া উচিত। বিলাতী জমান দুগ্ধ বা কোন বিলাতী পথ্য এদেশের শিশুদের পক্ষে উপযোগী বলে আমাদের মনে হয় না।

১৩। শিশুদের দাঁত উঠবার সময় একরূপ অজীর্ণ পীড়া ও উদরাময় হয়ে থাকে। সে সময় দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত আহারের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। শ্বেতসারময় খাদ্য ও শক্ত খাদ্য এ সময় শিশুদের পেটে মোটেই যাওয়া উচিত নয়।

উভয় সঙ্কট।

[ব্লকখানি "বেপরোয়ার" সৌজন্যে প্রাপ্ত]

বাপ-মা মাঝারে মতের মিলন কভু নাহি দেখা যায়।
দুজনে দুয়ের মনের মতন শিশুরে গড়িতে চায়।
বাপ যদি চায় শিশুরে পড়াতে,
মা তারে চাহিবে আঁচলে ঢাকিতে,
একজন চাহে নগ্ন রাখিতে, অন্যে চাহে জামা গায়।
একজনে টানে—"এ আমার ধন",
"আমি জন্মদাতা"—বলে অন্যজন,
দোটানার মাঝে পড়ি শিশু মন ভেঙেচুরে পড়ে হায়।
মাতা বলে, "ওঁর কথা শুনো না ক,"
পিতা কহে "বাছা মোর মতে থাক ;"
শিশু কেঁদে বলে, "টানা-পোড়েনেতে প্রাণ মোর বাহিরায় !"

ম্যালেরিয়ার কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীহরিমোহন চৌধুরী।

বর্ত্তমানে ডাক্তার বেণ্টলী সাহেব ও ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা যে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটী গঠন করিয়া বাঙ্গালা হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাতে যে ভবিষ্যতে সরকারের অর্থব্যয় ভিন্ন বিশেষ কিছু কাজ হইবে, এমন বিশ্বাস আমরা করিতে পারিতেছি না। কারণ তাঁহাদের পন্থা দেশের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়াই মনে হয়। তবে সাধারণের ডাক্তার প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু সুবিধা হইতে পারে। পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, ভবিষ্যতে যদি প্রাকৃতিক নিয়মে বা অন্য কারণে দেশে ম্যালেরিয়া কমিয়া যায়, তবে ঐ সকল ডাক্তাররা ঐরূপ অল্প বেতনে ও অল্প আয়ে সোসাইটীতে থাকিতে পারিবেন না। আর সরকারও যে বৃথা অতিরিক্ত বেতনে সমস্ত বাঙ্গালায় ঐ প্রকার পদের সৃষ্টি করিয়া বেতন জোগাইতে অগ্রসর হইবেন, তাহাও মনে হয় না। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, আরও বিশেষ ভাবে সমস্ত পল্লী গ্রামগুলি ঘুরিয়া বর্ষা ও হেমন্তকালে ঐ সকল স্থানের অবস্থা পর্য্যালোচনা ও প্রত্যক্ষ করিয়া এবং প্রত্যেক গ্রামের কৃষক ও ভদ্র উভয় বিধ লোকের এ বিষয়ে কি ধারণা তাহা জানিয়া, পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ও দেশীয় কবিরাজগণের এ সম্বন্ধে কি মত তাহা শুনিয়া ম্যালেরিয়ার নিদান স্থির ও ইহা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা উচিত। ইংরাজি শিক্ষার উপর যেমন আমাদের আস্থা নাই, তেমনই ইংরাজী ডাক্তারী মতের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে না। উহা নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। আর যাঁহারা সহরে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া ছেলে বেলা হইতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, দেশের কোন কিছুতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না; যাঁহাদের ছেলে বেলা হইতে মস্তিষ্কে একটী মস্ত ধারণা ঢুকিয়া আছে যে ম্যালেরিয়া এক রকম জীবাণু ও, উহা মশা দ্বারা সংক্রামিত হয়, সেই মস্তিষ্কের দ্বারা যে তাঁহারা সেই সহরে বসিয়া মাত্র ২।১ দিন ২।১টী গ্রাম এক আধ ঘণ্টার জন্য ঘুরিয়া শেষে সহরে বসিয়া ইংরাজি মতে এ দেশের রোগের কারণ স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ণয় করিয়া ফেলিবেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস নাই। বর্ত্তমান অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটী ই, বি, রেলের সোদপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পানিহাটী, আগড়পাড়া, সুখচর ও ঘোলা এই চারিখানি গ্রাম লইয়া যে ভাবে ৩।৪ বৎসর কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমি আমার গ্রামের সন্নিকটস্থ ঘোলা গ্রামের অবস্থা দেখিয়া এই বুঝিতেছি, ঐ সমস্ত গ্রামের বন কাটিতে ও খানা ডোবায় কেরোসিন তৈল ছড়াইতে যে খরচ হইতেছে তাহা ঐ সোসাইটীর অনর্থক অর্থব্যয় মাত্র।

এই দুই বৎসর পাট না হওয়ায় দেখা যাইতেছে, প্রথম বর্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধেক কম ম্যালেরিয়া হয়। বর্ত্তমান বর্ষে বার আনা কম বলিলে বেশী বলা হয় না। সে জন্য সোসাইটীর অধীন ঘোলা গ্রামের কথাই বলিতেছি। কারণ এই গ্রামখানিই চাষা পল্লীর সন্নিকটে,—একরূপ কৃষকপল্লী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সোসাইটীর অধীন অন্য গ্রামগুলি ভাগীরথীর তীরে; আর ঐ সব গ্রাম কেবল মাত্র ভদ্র পল্লী বলা চলে, কারণ এ সমস্ত গ্রামের শতকরা ৫ জন লোকও চাষ করেন না। সকলেই চাকুরী-জীবী বলিলেও হয়। এতদ্‌ভিন্ন এই গ্রামগুলি কৃষকপল্লীর নিকট সহর বলিয়াই অবধারিত। যদি সোসাইটী তাঁহাদের কার্য্য বিবরণীতে দেখান

যে, ৩।৪ বৎসর কার্য্য করার ফলেই ঘোলা ও তাঁহাদের অধীনস্থ অন্য গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া অর্দ্ধেক বা বার আনা রকম কম হইয়াছে, তবে আমরা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর লোকেরা তাহার প্রতিবাদ করি। আমরা বলি, যে কারণে উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে ম্যালেরিয়া এই দুই বৎসর কম হইতেছে, উহাতেও সেই কারণ খাটিবে। যদি সোসাইটীর কোন লোক ঘোলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে যথা—তেঘরা, মুড়াগাছা, চাঁদপুর, যোগবেড়িয়া, তালুরান্ধা, তালবেড়িয়া, পানিহাড়া, সহরপুর, কোদালিয়, ফিঙ্গা, ফতেউল্লাপুর, নিমতা প্রভৃতি কৃষিপল্লী প্রধান গ্রামে যাইয়া মাত্র এই কথাটী জিজ্ঞাসা করেন যে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর ও বর্ত্তমান বৎসরে ম্যালেরিয়া কি পরিমাণে কম হইয়াছে, তবেই আমার কথার সত্যতা নিরূপিত হইবে।

এই সমস্ত দেখাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী যে ভাবে তৈল দিতেছেন ও বন কাটাইতেছেন তাহাতে এক একটী গ্রামে সোসাইটীকে অনেক টাকা খরচ করিতে হইতেছে। তাহাতে মশা যৎসামান্যই মরিবে বলিয়া মনে হয়। আর ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কারণ এক মাত্র মশা—এ কথায় যখন বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতেছে না, তখন এত খরচ করিয়া মারিলেই বা কি! কারণ উল্লিখিত গ্রাম সকলে মশা না মারিয়াও ত ম্যালেরিয়া কমিয়া গিয়াছে! তার পর গ্রামের মধ্যে বাগান সকল রাখিয়া পার্শ্বের বনগুলি যদি কাটা হয়, তবে গ্রামে বাতাসও রৌদ্র খেলিবার যে সুবিধা হইবে তাহা বলা যায় না। প্রত্যেকের বাড়ী সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ আম কাঁটালের বাগান হাওয়া ও আলো আসার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বনগুলি কাটিলেই উহা আবার এক বর্ষাতেই যেমন তেমনই হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ প্রথম উদ্যমে সোসাইটীর মেম্বররা সোসাইটীর সাহায্যে ও নিজেরা খরচ করিয়া যে ভাবে কার্য্য করিতেছেন, ভবিষ্যতেও কি এ উদ্যম উৎসাহ পূর্ণ মাত্রায় থাকিবে? আর সাসাইটী কি বরাবর এ ভাবে খরচ চালাইতে পারিবেন? গ্রামগুলি যদি ভবিষ্যতে সাহায্য না লইয়া স্বাধীন ভাবে কাজ চালাইতে যান তবে প্রত্যেক গৃহস্থকে মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান ট্যাক্সের উপর কেরোচিন তৈল খরচ বাদ দিয়া শুধু বন কাটার জন্য অনুমান বৎসরে ৫।৬ টাকা বেশী খরচ করিতে হইবে। যে সমস্ত জমী বন কাটিয়া ফাঁকা করা হইবে, তাহাতে যে কেহ বরাবরের জন্য চাষ আবাদ করিবেন, সে আশা খুব কম। কারণ, বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানদের সেরূপ শিক্ষা ইংরাজি আমলে কখন দেওয়া হয় নাই; আর কখন হইবেও না। বর্ত্তমানে যাঁহারা সংসার খরচের জন্য যৎসামান্য বাগান করা আবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে তাহা করিতেছেন। লোকসান দিয়া আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চাষ বাড়াইতে চাহিবেন না। এটা খুব সত্য যে লোক ধরিয়া ভদ্র-লোকদের চাষ করা আর টাকা জলে ফেলিয়া দেওয়া এক কথা! তাই মনে হয় লোকে যখন দেখিবে প্রত্যেক বৎসর বন কাটিতে যথেষ্ট খরচ করিতে হইতেছে অথচ তাহা হইতে কোন আয় নাই, তখন ঐ সকল স্থানে আম কাঁটালের গাছ বা বাঁশ গাছ বসাইয়া এককালে বনের ও খরচের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে সকলেই চেষ্টা করিবে।

সোসাইটী যে পন্থাবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কার্য্য মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যেই কিছু চলিতে পারে; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীন বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অন্তর্গত লোকাল বোর্ডের অধীন পল্লীগ্রামসমূহে একেবারেই চলিতে পারিবে না। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া দূর করা যদি সোসাইটীর উদ্দেশ্য হয়, তবে এ পন্থা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বাঙ্গালা দেশে মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন গ্রামের সংখ্যা কয়টী? সে কারণ ইহা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দিক দিয়াও প্রতিবাদনীয়। সোসাইটী যদি

দেশের লোকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে যে কোন পন্থা লইয়া কাজ করা হউক না কেন, উহা দেশে কখনই প্রসারলাভ করিতে পারিবে না। আর উহা যদি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে এমন ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে সরকারকে টাকা খরচ করিতে না হয় বা, কম খরচ করিতে হয়; এবং দেশের গরীব কৃষকরা যে পরিমাণ টাকা খরচ করিতে কষ্ট বোধ না করে। বর্ত্তমানে লোকে যে ট্যাক্স দেয়—উহা যে বাবদেই হউক—তাহাই দেওয়া লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর উপর অর্থ-সাপেক্ষ কোন কাজ করিতে যাইয়া সরকার যদি হাত গুটান, আর গরীব প্রজাদের উপর কলেকৌশলে সে খরচ চালান হয়, তবে দেশের পক্ষে যেমন অন্যায় হইবে, তেমনই নূতন শাসন প্রণালীর দিক দিয়া তাহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। সরকারের টাকা যাহা এই গরীব দেশের প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া সংগৃহীত হয়, তাহা যাহাতে ২।১ জন খেয়ালী লোকের খেয়ালী ইচ্ছা পূরণ করিতে অপব্যয় না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা সরকারের ও বর্ত্তমান সরকারের মন্ত্রী মহাশয়দের উচিত। আর স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে আমরা দেশের লোক জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এই কয় বৎসর অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী কত টাকা খরচ করিয়াছেন ও কি কাজ দেখাইয়াছেন? আর তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন তাহার সবই কি যথার্থ তাঁহাদের কৃত? আর স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যদি এই সোসাইটী গঠনে পরামর্শ দিয়া থাকেন তবে তাহা কি কতকগুলি ইংরেজ ডাক্তারের ও ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় ডাক্তারের কথায়—না দেশের লোকের ও দেশীয় কবিরাজ, দেশী বিদেশী অধিক সংখ্যক চিকিৎসকের মতানুযায়ী? যাহা হউক বাঙ্গালা হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা সম্বন্ধে,—দেশের শুভাদৃষ্ট বশতঃ ম্যালেরিয়া কিসে দূর হইতে পারে তাহা বুঝিবার সুবিধা যখন আসিয়াছে, তখন তাহা উপেক্ষা না করিয়া, এই দুই বৎসর ম্যালেরিয়া কম হইবার কারণ আলোচনা করিয়া এবং দেশের কবিরাজদের ও দেশের ভুক্তভোগী অভিজ্ঞ লোকদের এ সম্বন্ধে কি মত তাহা জানিয়া, অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটীর কার্য্য-পদ্ধতি যাহাতে ঠিক করা হয় তজ্জন্য আমরা স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়কে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। আর তিনি যদি ইহাতে নূতন করিয়া মাথা ঘামান অনাবশ্যক বোধ করেন এবং জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোন সদুত্তর না দেন তবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাস্থ আমাদের প্রতিনিধিগণকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে উল্লিখিত জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির সদুত্তর সাধারণে যাহাতে জানিতে পারে তাঁহারা যেন তাহার ব্যবস্থা করেন এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের টাকা ও শক্তি যাহাতে বৃথা ব্যয় না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখেন, তবে আমরা,—দেশের লোক বাধিত হইব।

দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা দেশের লোকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তবে সরকারকে এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে লোকের মন সেদিকে যায়। পাটের চাষ বন্ধ ও গ্রামকে মাঠের ন্যায় ফাঁকা করাই ম্যালেরিয়া বন্ধের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন, যে কারণেই হউক, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই পয়সাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা হইয়াছে। জগতে ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যই যে শ্রেষ্ঠ এ কথা মুখে বলিলেও প্রাণে প্রাণে আমরা তাহা একেবারেই অনুভব করি না। ইহা ইংরাজী শিক্ষার ফল কি না বলিতে পারি না। সরকার যদি দেশের লোককে বাঁচাইতে চাহেন ও অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটি যদি যথার্থই দেশের লোকের উপকার করিতে চাহেন, তবে পূর্ব্বোক্ত কথামত যে কোন প্রকারেই হউক পাটের চাষ বন্ধ ও গ্রামগুলি যাহাতে একেবারে ফাঁকা হয় তজ্জন্য চেষ্টা করেন। পাট চাষ বন্ধে দেশের দুই পক্ষ লোকের ক্ষতি হইবে,—এক পক্ষ পাটের কলওয়ালা, অন্য পক্ষ দেশের গরীব চাষা। কিন্তু এদিককার চাষাদের মনের ভাব দেখিয়া বোঝা যায়,

যাহারা ইতিপূর্ব্বে নিয়ত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া এত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছিল যে, এই দুই বৎসর পাটের চাষ কম হওয়ায় ম্যালেরিয়া কম হইয়াছে বুঝিয়া, এই অর্থ ক্ষতিতে দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইয়াছে ও ব্যায়রামের হাত হইতে একটু মুক্তি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। অতএব এখন যদি কোন প্রকারে পাটের কলগুলিকে প্রজার মঙ্গলের জন্য নীলকরদের মত করিয়া উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবেই দেশের ম্যালেরিয়া বন্ধ হয়। দেশের চাষারা এজন্য বিশেষ দুঃখিত হইবে না, যত দুঃখিত হইবে ইংরাজ পাটের ব্যবসায়ীরা। তবে পূর্ব্ববঙ্গে যেমন পাট চাষ আছে অথচ ম্যালেরিয়া নাই, সেইরূপ ব্যবস্থা যদি এদিককার জেলাগুলিতে করা যায় অর্থাৎ এদিককার জেলাগুলির গ্রামসকলকে ফাঁকা করা যায় ও দেশে বৎসর বৎসর বন্যা আসিয়া বা অন্য প্রকারে যায় দেশকে ধুইয়া জল বাহির করিবার সুবিধা করা যায়, তবে আবার পাটের চাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে পাটের চাষ আরম্ভ হইলেও ঐ পাট যাহাতে গ্রামের নিকট কোন জলাশয়ে পচান না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। পাট পচানি গ্যাস গ্রামে ঢুকিলেই ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি হইবে। ভবিষ্যতে যদি পাটের চাষ আরম্ভ হয়, তবে তাহাতে এই বিপদ হইতে পারে যে, যদি কোন কারণে গ্রামসকলে বন জঙ্গল হয়ায় ও পাটের চাষ আধিক্য হেতু চাষারা গ্রামের মধ্যে বা নিকটে পাট পচায়, তবেই আবার ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা পাটের চাষ আদৌ তুলিয়া দেওয়া। চাষাদের ইহাতে ক্ষতি হইবে; কিন্তু কলওয়ালারা কয়েক বৎসর পাটের দর বেশী দিয়া তারপর এরূপ কমাইয়া দিয়াছে যে, তাহাতে বর্ত্তমানে চাষে খরচ বেশী হওয়ায় চাষাদের লাভ না হইয়া আজ তিন চারি বৎসর লোকসান হইতেছে। তবে সরকার যদি কৃষকদের প্রতি কৃপাবান হইয়া, কৃষি উৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্য, যাহা বিদেশীরা বিদেশে রপ্তানি করিয়া লইয়া যাইয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে, তাহার মূল্য অধিক করিয়া দিবার উপায় করিয়া দেন, তবে কৃষকদের এ ক্ষতি পোষাইয়া যাইবে। অন্যদিকে যে সমস্ত ভদ্র সন্তান ২০।২৫ টাকার কেরাণীগিরির জন্য অফিসের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা যদি দেখেন চাষে যথেষ্ট আয়, তবে তাঁহারাও ঐ কাজে নিশ্চয়ই লাগিয়া যাইবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র সন্তানদের শিক্ষার কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা করা দরকার, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইতে পারে, ও চাকুরী করা অপেক্ষা চাষ করা যে সম্মানের কাজ এ আত্ম-সম্মান জ্ঞান তাহাদের জন্মায়। দেশে কেরাণী তৈয়ারীর আর আবশ্যক নাই,—ইহাতেই আমাদের জাতি, ধর্ম্ম, সম্মান সব যাইতে বসিয়াছে। আমরা এক মহা শূদ্রজাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি।

গ্রামকে ফাঁকা করিতে হইলে বন জঙ্গলগুলি যেমন কাটিতে হইবে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামমধ্যস্থিত আম কাঁটাল ও বাঁশ বাগানগুলিও তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বাগান তুলিতে অনেকের যথেষ্ট টাকা লোকসান হইবে; আর সেই লোকসান করিয়া বাগান তুলিতে কেহ সম্মত হইবে না। গ্রামের শিক্ষিত অশিক্ষিতদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা প্রাণে প্রাণে যেন অনুভব করিতে পারে, স্বাস্থ্যটা আগে দরকার—পরে অর্থ। এ যদি দেশের লোক বুঝিতে পারে, তবে গ্রামের বাগান তুলিতে সরকারকে কোন বেগ পাইতে হইবে না। প্রতি গ্রামে, গ্রামের মধ্যে যে যে ব্যক্তির বাগান আছে, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষাগুণে যদি অর্দ্ধেকের অধিক লোকের বাগান তুলিয়া দেওয়া মত হয়, বা অর্দ্ধেকের অধিক গ্রামবাসীদের যদি এই মতে আনিতে পারা যায় তবে সরকার আইন-বলে গ্রামের বাগানগুলি তুলিয়া দিতে বাগানের মালিকদের বাধ্য করিতে পারেন। আর এই আইন সরকার নিজে না প্রয়োগ করিয়া যদি প্রতি গ্রামে অ্যান্টিম্যালেরিয়া সোসাইটি গঠন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদেরই হিতের জন্য এই আইন ব্যবহার করান, তবে কেহই সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবে না। লোকদের ইহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বাগান উঠিয়া যাওয়ায় যেমন ক্ষতি হইবে, তেমন বাগানের স্থানে যে গোচরণ ভূমি বাহির হইবে, তাহাতে লোকে অধিকতর সংখ্যায় গাভী পোষণ করিয়া ঐ ভূমিতে চরাইয়া যথেষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিতে পারিবে। গরু চরার কারণে গোচারণ ভূমিতে কখন আগাছাও জন্মাইতে পারে না। এ বিষয়ে আলোচনা করা ও ইহা কার্য্যে পরিণত করা বর্ত্তমান মন্ত্রী মহাশয়দেরই ইচ্ছা ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। তাই বলিতেছি, যাঁহারা প্রজাদের প্রতিনিধি হইয়া বৎসরে ৬৪ হাজার টাকা পকেটস্থ করিতেছেন, তাঁহাদের কেহ কি এবিষয়ে একটু দয়া করিয়া মাথা ঘামাইবেন? এখন আমাদের সবই ভগবানের উপর নির্ভর হইয়াছে। তাই বলি, দেখি ভগবান যদি তাঁহাদের সুমতি দেন।*

* প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের ও অপরের বহু মতভেদ আছে; তদ্বিষয়ে চৈত্র সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচিত হইবে।—সম্পাদক।

তাম্রকুট-দর্শন।

ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেরই প্রায় একটী করিয়া দর্শনাঙ্গ আছে। কিন্তু আপনারা তাম্রকুট-দর্শনের কথা শুনিয়াছেন কি? তাম্রকুট যদিও কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় নয়, কিন্তু উহাকে অধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিলে বোধ হয় দোষের হয় না। এবং সেই জন্যই বোধ হয় কাশ্মীর ষ্টেট হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীরাম উহাকে "দর্শন" পর্য্যায় ভুক্ত করিয়া আমাদিগের Health & Happiness নামক ইংরাজী মাসিকে "The Philosophy of Smoking" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ স্বাস্থ্য সমাচারের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

১। ভারতবর্ষে এক বৎসরে যতগুলি চুরুটের ধূম লোকে পান করে, সেগুলিকে যদি লম্বালম্বি ভাবে অর্থাৎ একটীর এক প্রান্তের সঙ্গে অপরটির এক প্রান্ত স্পর্শ করাইয়া পর পর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে সেই চুরুটগুলির দ্বারা আমাদের এই বিশাল পৃথিবীকে কয়েকবার বেষ্টন করা যায়।

২। যত সিগারেটের ধূম পান করা হয়, সেগুলিকে যদি ঐরূপ লম্বালম্বিভাবে একটী তারে বিঁধিয়া টেলিগ্রাফের তারের মত তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে ঐ তার চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলে অনেকখানি উদ্বৃত্ত হইবে।

৩। সিগারেট খুব পাকা গণিতজ্ঞ। ইহা মানবের সুস্থদেহে স্নায়বিক পীড়া যোগ করিতে পারে; ইহা মানুষের শারীরিক তেজ বিয়োগ করিতে পারে; ইহা তাহার যন্ত্রণা ও বেদনা অনেক গুণ বৃদ্ধি করিতে পারে; ইহা তাহার মানসিক একাগ্রতা ও শক্তিকে নানাদিকে ভাগ করিয়া দেয়; তামাক মানুষের কর্ম্ম হইতে প্রফুল্লতারূপ সুদ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়; এবং ইহা তাহার জীবনের সফলতার মূল্য হ্রাস (discount) করিতে পারে। তামাক আর কি করিতে পারে? না, মানুষের শবাধারের জন্য একটি একটী করিয়া পেরেক সঞ্চয় (stock) করিতে পারে।

৪। তামাকুর পত্নীর নাম নিকোটিন বিবি। সেই মুসম্মত নিকোটিন বিবির চরিত্রের পরিচয় এইরূপ—সে চোর, সে গাঁটকাটা, সে খুনী মেয়ে মানুষ, আর সে যাদুকরী।

এই নিকোটিন বিবি মানুষের

ক—দেহের ভার কমাইয়া দেয়।

খ—পুষ্টি লাভে ব্যাঘাত ঘটায়।

গ—হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বিধান করে।

ঘ—মূত্রনালী জখম করে।

ঙ—সুপ্রারেনাল গ্ল্যাণ্ডগুলিকে ক্ষয় করে।

চ—ফুস ফুস রোগগ্রস্ত করে ও গলা খুস খুস করায়।

ছ—লিভারের কার্য্য হানি করে।

জ—মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে, দাঁত আল্গা করিয়া দেয়।

ঝ—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে, ফলে চক্ষুর স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হয়।

ঞ—উদরের পরিপাক কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় ও উদরের অন্যান্য রোগের সৃষ্টি করে।

ট—লাল রক্তকণিকার সংখ্যা ৫৮০০০০০ হইতে কমাইয়া ২৪০০০০০ এ পরিণত করে।

বিবি নিকোটিনের চরিত্র-মহিমা এমনই অপূর্ব্ব! তাহার গুণের সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। এমন বিবির ক'জন ভক্ত হইতে চান্?

[ধূম পায়ীর শেষ দশা !]

স্বাস্থ্য-সন্দেশ রকমারী।

লেখক—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

সেনর বার্সান্তি নামে ইটালীর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বহু পরীক্ষার পর সম্প্রতি স্থির করেছেন যে আসল মুক্তার প্রাণ আছে। এমন কি হার গেঁথে যখন গলায় পরা যায়, তখনও তাদের জীবনের স্পন্দন মানুষের সঙ্গে তালে তালে চলে। তিনি আরও প্রমাণ করেছেন যে তারা সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা বড় শীঘ্র শীঘ্র আক্রান্ত হয় ও যাঁর গলায় মুক্তার হার শোভা পায়, তিনি যদি কোন মারাত্মক বা ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন্, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাগুলিও সেই রোগে ম্রিয়মান্ হ'য়ে প'ড়ে। যখন ব্যাধি জীবাণু মুক্তাগুলি ভেদ ক'রে তাদের ঠিক অন্তস্তলে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই তারা সত্য সত্য মরণের কোলে ঢ'লে পড়ে। এই সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের জৌলস পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমে গিয়েছে এবং ভিতর হ'তে যেন কেমন একটা ক্ষীণ নীল বা কাল রঙের আভাষ বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

* * * *

বিলাতের একজন ডাক্তার মত প্রকাশ ক'রেছেন যে পুরাতন মদ্যপরা যদি আহারের সময় বা পরে কিছুদিন ধ'রে প্রচুর পরিমাণে আপেল ভক্ষণ করে, তা'হলে তাদের মদ্য পানের ইচ্ছা নিশ্চয়ই প্রতিহত হয়।

* * * *

"ফিজিক্যাল্ কালচার" নামক আমেরিকার বিখ্যাত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পত্রিকার প্রথিতযশা সম্পাদক মিঃ বার্ণার ম্যাক্‌ফ্যাডেন্ সম্প্রতি তাঁর পত্রিকায় এক ইস্তাহার জারী করেছেন যে যিনি নিউ ইয়র্ক থেকে চিকাগো সহর পর্য্যন্ত হাজার মাইল পথ অনাহারে (অবশ্য জল পান কর্‌তে পার্‌বেন) পদব্রজে চলে শেষ কর্‌তে পার্‌বেন, তিনি তাঁকে একহাজার ডলার (প্রায় ৩২০০ টাকা) পুরস্কার দেবেন। তাঁরই প্ররোচনায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন ইংরাজ যুবক এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। তিনি সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাতেন, রাত্রে পথ চল্‌তেন। পথি মধ্যে তিনি কোন আহার্য্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করেন কি না দেখ্‌বার জন্য ম্যাক্‌ফ্যাডেন সাহেবের নিযুক্ত এক একজন লোক এক সহর হ'তে অন্য সহর পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে যেত। কিন্তু ভদ্রলোক পাহারাওয়ালা আর কুকুর—এই দুই অপরিহার্য্য শত্রুর জ্বালাতনে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তাঁর পদব্রজের প্রতিযোগিতায় জলাঞ্জলি দিয়ে ইণ্ডিয়ানা নামক স্থানে হ'তে রেলে চ'ড়ে বাকী পথটুকু পাড়ী মার্‌লেন। কিন্তু তিনি প্রতিদিন গড়ে ২০ মাইল করে পথ চ'লে প্রায় ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত অনাহারে ভ্রমণ ক'রেছিলেন। অজীর্ণ, ডায়েবেটিস্ আর ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙ্গালী ভায়াদের মধ্যে ক'জন ম্যাক্‌ফ্যাডেনের এই বাজী জেতবার আশা রাখেন?

* * * *

কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার জে, ভি, মিনিগেন্ "ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে" একটি মজার ঘটনার উল্লেখ ক'রেছেন। একদিন তাঁর দাওয়াইখানায় এক পঁচাত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ কৃষক এসে উপস্থিত হ'ল—তার এক কাণ না কি কালা—আরাম ক'রে দিতে হবে। কালা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে যে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন সে মাঠে কাজ কচ্ছে, এমন সময় কাণের পাশে হঠাৎ একটা ভোঁ ভোঁ ধ্বনি শুনা গেল; পরক্ষণেই কাণের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হ'ল—কিন্তু দু'চার মিনিটের জন্য। তার কয়েকদিন পর থেকে ক্রমশঃ সে ঐ কাণটির শ্রবণ শক্তি হারাতে লাগ্‌ল, শেষে সে একেবারে এক-কাণ-কালা হ'য়ে গেল। ডাক্তার, বর্ণার মত

একটা যন্ত্র বুড়ো চাষার কাণের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে একটি প্রকাণ্ড বোলতা টেনে বার করলেন। ত্রিশ বছর পূর্ব্বে বোল্‌তাটা হঠাৎ তার কাণের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আট্‌কে গিয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বোল্‌তাটি কাণের থইলের মধ্যে ইজিপ্টের ম্যমীর মত বেশ তাজা ছিল।

* * * *

মানুষের মাথায় সর্ব্বসমেত সাতাত্তরটি মাংস-পেশী আছে; সর্ব্ব শরীরে প্রায় পাঁচশত পেশী বর্ত্তমান্। আমাদের এক একটি মস্তিষ্ক প্রায় ষাট্ লক্ষ নানা আকারের অণুকোষ দ্বারা গঠিত। এই অণুকোষ কি জানেন? মৌচাকের কুঠুরীর মত এক একটি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট বস্তু বিশেষ (cells)—ইহারা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর; এক একটি অণুকোষের দৈর্ঘ্য হইতে ৬০০০ ইঞ্চি বা তদূর্দ্ধ ভাগ আয়তন। এই অণুকোষের দ্বারাই মানব দেহের আগাগোড়া সংগঠিত; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের শরীর এক একটি জীবন্ত স্পঞ্জ বা মৌচাক্!

* * * *

ডাক্তার হ্যারল্ড বারো—যিনি যুদ্ধের সময় একদল বৃটিশ বাহিনীর স্বাস্থ্য-কর্ত্তা ছিলেন, তিনি তাঁর একখানি পুস্তকে অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে একটি অপরূপ মজার ভ্রান্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। লণ্ডনের একজন বিখ্যাত সার্জ্জেন একটি রোগীর একখানি ক্ষতদুষ্ট পায়ের অর্দ্ধেকটা কাট্‌তে গিয়ে, তাকে ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে অজ্ঞান ক'রে ভ্রমক্রমে তার সুস্থ পাখানিতে অস্ত্রোপচার করে ফেলেন। বেচারী জ্ঞান লাভ ক'রে এই ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক সংঘটন দেখে কেঁদেই অস্থির! ডাক্তারও তখন তাঁর ভুল বুঝ্‌তে পেরে সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্ষত দুষ্ট পাখানি পুনরায় কাট্‌বার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লেন, কিন্তু, রোগী বেচারী আর কিছুতেই রাজী হ'ল না, সে ভাব্‌লে—এবার ডাক্তার তার পাখানা কাট্‌তে গিয়ে ভ্রান্তিবশতঃ হয় ত বা ডান হাতখানাই দেড়ে মুষে কেটে বসেম্। যাহোক্, মাস দুই পরে বেচারীর ক্ষত-দুষ্ট পা খানি আরাম হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু এই আরামের বিনিময়ে তার ভাল পা খানিকে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌তে হ'ল। এ কতকটা সেই ঠাকুরমার গল্পের "নাকের বদলে নরূণ পাওয়ার" মত নয় কি?

* * * *

আমেরিকার একটি ছোট ছেলে আল্‌পিন্ নিয়ে সমবয়সীদের নিকট বাজী দেখাতে গিয়ে হঠাৎ সেটি গিলে ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে আল্‌পিন্‌টি পেটের মধ্যে না গিয়ে তার গলার পাতলা ঝিল্লীর ভিতর অর্দ্ধ তির্য্যকভাবে বিঁধে যায়। ঘটনার দিন রাত্রে তার গলায় একটু ব্যথা হয় বটে, কিন্তু তার পরদিন সকালে আর কোন যন্ত্রণা থাকে না; তা' ছাড়া দুচার দিনের মধ্যে বালকটি আল্‌পিনের কথা একেবারে ভুলে যায়। এই ভাবে ষোল বৎসর কেটে গেল। একদিন বালকটির (এখন যুবায় পরিণত) খুব সর্দ্দি কাশি হ'য়েছে; হঠাৎ একটা দম্‌কা কাশির সঙ্গে সঙ্গে সেই আল্‌পিন্‌টা গলার ভিতর থেকে বাহিরে এসে ঠিক্‌রে পড়্‌ল। যুবক তখন সেটি হাতে নিয়ে দেখে—ষোল বৎসর পূর্ব্বে আল্‌পিন্‌টি যেমন ঝক্‌ঝকে রগ্‌রগে ছিল, ঠিক তেমনই আছে!

* * * *

প্রায় মাস তিন পূর্ব্বে বিলাতের "টাইমস্" পত্রের সংবাদদাতা এখানকার "ইংলিসম্যান" পত্রে আর একটি অসাধারণ অস্ত্রোপচার প্রমাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন। গত বৎসরের জুলাই মাসে লিভারপুলের নিকট পেন্সনস্ হাঁসপাতালের একজন ডাক্তার, জর্জ্জ নিকোলাস্ নামক এক ভূতপূর্ব্ব সৈনিকের পেট চিরে তার মধ্যে অস্ত্রোপচার করেন। তারপর নিকোলাসের পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। ডিসেম্বর মাসে বেচারীর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়। তার মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের (Post Mortem Examination) ফলে দেখা গেল—তার পাকস্থলীর উপরে রক্ত পুঁজ মোছার জন্য ব্যবহৃত প্রায় এক হাত লম্বা আধ হাত চওড়া একখানি ন্যাক্‌ড়া বিকৃত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে; ডাক্তার যখন তার পেট্ চিরেন, তখন তাঁর কোন সহকারী ঐ ন্যাক্‌ড়াখানি তাড়াতাড়িতে ভ্রম ক্রমে তার পেটের মধ্যেই ফেলে রেখেছিলেন, তার পর সেইখানি সমেত তার পেট সেলাই ক'রে দেওয়া হয়। তার ফলেই বেচারীর মৃত্যু হ'য়েছে।

* * * *

প্রসব বৈচিত্র্যের দুই একটি খবর আমরা প্রায়ই স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠকবর্গকে উপহার দিয়ে থাকি। আজও দুই একটি দিচ্ছি। গত ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে বিক্রমপুরের অন্তর্গত পুরাগ্রামে শ্রীযুত্ পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্ত্রীর গর্ভে একটি সন্তান জন্মে। সন্তানটির শরীরের মধ্যপাতে মাথাটা ঈষৎ বড় ও দুইপার্শ্বে চেপ্টা, ৪টি কাণ, ৪টি হাত ও ৪ খানি পা, এবং ২টি লিঙ্গ। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইয়া ১০।১৫ মিনিট মাত্র জীবিত ছিল।

কয়েকজন উৎসাহী গ্রাম্যযুবক শিশুর মৃতদেহটি তার পিতার নিকট হ'তে ১০৲ মূল্যে ক্রয় ক'রে কাচাধারে স্পিরিটের মধ্যে জিয়িয়ে রাখ্‌বে ব'লে ঢাকায় নিয়ে আসে। কিন্তু ঢাকা হাঁসপাতালের গুণধর কর্ত্তৃপক্ষগণ স্পিরিটের মূল্য ৮৫৲ চাওয়ায়, অসমর্থ যুবকগণ শিশুদেহ জলে ফেলে দিয়ে নিরাশ হৃদয়ে বাটী ফিরে আসে।

ঢাকা সহরের আগা নবাব দেউড়ী নামক জনপদের জনৈকা মুসলমান রমণী প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বে একটি অদ্ভুত শিশু প্রসব ক'রেছে। শিশুর মাথায় বেশ লম্বা লম্বা চুল ও কপালে দুইপার্শ্বে ছোট ছোট দুটি শিং ও উপর পাটির দংশন দন্তের (Incisors) দুইপার্শ্বে অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা লম্বা দুইটি দাঁত ছিল। জন্মের অল্পক্ষণ পরেই শিশুটি ভব-সমুদ্রের পরপারে চ'লে গিয়েছে।

শিশু পালন।

আজ কাল দেশের সর্ব্বত্র একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গ্যাছে। হাটে, ঘাটে, স্কুলে, কলেজে; আফিসে, বাজারে; কোর্টে, কোর্টে; সকলেই যেন কোন এক রাজরাণীর অভিনন্দনের জন্য ব্যস্ত ব্যগ্র সচেষ্ট, এবং উৎসাহী। ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা আজ পূর্ব্বগগনের দিকে নিশ্চল ভক্তি পূর্ণ নেত্রে ভাগ্য-রবির সুধামাখা হাস্যলহরী সেবন করিবার জন্য চাহিয়া আছে। তাই এই আনন্দের দিনে শিশু পালন সম্বন্ধে ভারতের নর নারীকে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

বড় দুঃখের বিষয় যে অনেক বড়লোকের বাটীতে ধাত্রী, ঝি এবং দাসদাসীদের উপরের শিশুর লালন পালনের দায়িত্বটা ন্যস্ত করা উচিত বিবেচিত হয়। কিন্তু ইহার বিষময় ফল আমরা কথাঞ্চৎ উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছি। মধ্যবিত্ত এবং গরীবের ঘরের শিশুরাও অনেকস্থলে স্ব স্ব জননীর ক্রোড়ে লালিত হইতে পায় না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এবিষয়ে খুব কম লোকেরই দৃষ্টি পড়ে।

শিশুর দীক্ষা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উপরেই দেশের ভাবী বিপদ এবং কল্যাণ নির্ভর করে। শিশুর রক্ষা হইলেই সমাজ এবং জাতির রক্ষা হয়। আহার নিদ্রা ভয় এবং সন্তানোৎপাদন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জীব মাত্রেই করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মের বশবর্ত্তী থাকিয়া শিশুর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা কেবল নর নারীরই সৌভাগ্যে ঘটা সম্ভব।

বলি! নব্য সভ্য শিক্ষিত উন্নতমন্য স্বাধীনচেতা ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের কি মনে পড়ে যে, একদিন তোমরাও তোমাদের ছোট ছোট সন্তানের ন্যায় অসহায় এবং ক্ষুদ্র শরীর বিশিষ্ট ছিলে? তোমাদের উপর তোমাদের দাসদাসীরা কি কখনও অমানুষিক অত্যাচার

করে নাই? তোমরা কি সকলেই পিতামাতার যত্নে স্নেহে শিশুজীবন অতিবাহিত করিয়াছ?

তবে কেন আজ ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল যৌবনসুলভ সুখের ইঙ্গিতে, পবিত্র মনুষ্য-জন্মের কঠিন দায়িত্বের গণ্ডী পার হয়ে, সস্ত্রীক শিশু পালন ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ক্ষণভঙ্গুর ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দুরন্ত নরকের দিকে ধাবমান হইতেছ? তোমাদের দিকে ভারতমাতা সজল নেত্রে চাহিয়া আছেন। শিশুর রক্ষা হইলেই আবার ঘরে ঘরে শিবাজী, রামদাস, যীশু, মহম্মদ, ভীষ্ম, ভীম এবং বুদ্ধ ও নানকের হাসি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। আমার জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য সৌন্দর্য্য এবং শোভায় দিগ দিগন্ত প্লাবিত হইবে। দেশমাতৃকার অমল কমল চরণে ঋদ্ধি সিদ্ধি লুটিয়া পড়িবে, তোমরা ধন্য হইবে তোমাদের দেশবাসী কৃতার্থ হইবে ভগবান সুপ্রসন্ন হইবেন। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ত্যাগ করিও না। আপন আপন পুত্র কন্যাগুলিকে শৈশবকাল হইতেই নিজের তত্ত্বাবধানে রাখ। যতদিন তোমার সন্তান পাঁচ বৎসরের না হয় ততদিন বর্ব্বর-সুলভ ক্রোধবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কখনও তাহাকে তাড়না করিও না। না, একটী চড় কিম্বা কানমলাও দিও না এবং তোমার গৃহিণীকেও এ বিষয়ে সতর্ক রাখিও। আমরা অনেক গবেষণা এবং কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মনীষিগণের বহুবিধ মতের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স অবধি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম না করা যেরূপ অমানুষিক এবং অস্বাভাবিক সেইরূপ শিশুগুলিকে শারীরিক পীড়া দেওয়া—চড়মারা, বেত্রাঘাত করা অথবা পুনঃ পুনঃ অযথা তিরস্কার করা নিতান্ত ক্ষতি কারক এবং নিতান্ত অমঙ্গল কারক।

যদি তাড়না করিবার বিশেষ দরকার হয় তাহা হইলে পাঁচ হইতে দশ বৎসরের বালক বালিকাকে করা উচিত কিন্তু কখনও তাহাদের শারীরিক পীড়া দেওয়া উচিত নহে। যাহারা যৌবন এবং ঐশ্বর্য্যের ছলনায় কিংবা দারিদ্র্য এবং ক্রোধের তাড়নায় নিজের শিশুসন্তানগণকে আঘাত করেন তাঁহারা জানেন না যে সৃষ্টিকর্ত্তার কোপবহ্নি একদিন তাঁহাদের মরমে মরমে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতঃ হৃদয়ের সকল সুখ শান্তি নিমেষে ভস্মীভূত করিবে।

আমি জানি যে অনেক বঙ্গ-মহিলা মনে করেন যে পুত্র কন্যাকে বশে রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাদের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রান্তি অপনোদন করিতে হইলে শুধু মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিলেই বিশেষ কোন ফল হইবে না। ঘরে ঘরে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দিবার জন্য শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র স্ত্রী ও পুরুষের নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত।

আজ আমাদের হৃদয় আড়াই হাজার বৎসরের কঠিন তমিস্রা ভেদ করিয়া পবিত্র, শান্ত, দান্ত, বীর্য্যবান, জ্যোতির্ম্ময় বুদ্ধদেবের পবিত্র মুখখানির ধ্যান করিতেছে এবং তাহার ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণের উৎস স্মরণ করিতেছে। ঐ পুণ্যময় দেবতাবাঞ্ছিত স্মৃতিটুকু আজ আমাদের বুদ্ধদেবের উপদেশমালা গলায় ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে উৎসাহ দিতেছে।

আজ আমাদের চঞ্চল এবং কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় চিত্ত পরম দয়াল পরম কারুণিক দীনবন্ধু আশ্রিতবৎসল যীশুখৃষ্টের শিশু-প্রেম হৃদয়পুটে অঙ্কিত করিয়া আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছে।

আজ আমাদের মনঃ প্রাণ রাম, বশিষ্ঠ বাল্মীকি এবং কন্বের শিশু পালন, শিশু-রক্ষার পবিত্র এবং হৃদয়গ্রাহী ইতিহাস সুবর্ণাক্ষরে মানস-গগনে অঙ্কিত, রঞ্জিত, এবং শোভিত করিয়া আশায় এবং তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে।

আজ মনে হইতেছে যে এই নবজাগরণের দিনে বঙ্গ-ললনা—নাটক, নভেল, ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা এবং বিলাস লালসা ত্যাগ করিয়া ঘরে ঘরে বুদ্ধ, যীশু মহম্মদ, শঙ্কর, ব্যাস, গান্ধী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, গান্ধারী, বশিষ্ঠ এবং শিবাজীর মুখশশী নির্নিমেষে প্রত্যক্ষ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

প্রশ্নোত্তর-পৃষ্ঠা।

প্রঃ ১। (ক) আভিঘাতিক ক্ষত হইবামাত্র টেটেনাস না হইতেই এণ্টি-টেটেনিক সিরাম ইন্‌জেক্‌সন্ করায় দোষ আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহা কি? (খ) এড্রিনালিন্ ক্লোরাইড্ সল্যুসন্ ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগ করা হয় কি না? (গ) ফিলারিয়া স্যাঙ্গুইনিম (অর্থাৎ গোদ) রোগে রক্তে ফিলেরিয়া জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সোয়ামিন্ ইণ্ট্রাভেনাস্ ইঞ্জেক্‌সন্ করিলে বেশী ফল হয় কি সাব্‌কিউটেনাস্ ইঞ্জেক্‌সুন্ করিলে বেশী ফল হয়? (ডাঃ অঃ চ্ঃ ভট্টাচার্য্য, পাইকর)।

উঃ ১। (ক) "আভিঘাতিক ক্ষত" কথার অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইল না। কোন পুরাতন অস্ত্রে কাটিয়া গেলে বাগানে কাজ করিতে করিতে হাতে পায়ে কাঁচ ফুটিলে বা অন্য অস্ত্রে কাটিয়া গেলে, আস্তাবলে পেরেক ফুটিলে বা ঘোড়ায় চাট্ মারিয়া ক্ষত করিয়া দিলে বা অন্য কোন উঁচু স্থান হইতে মাটিতে পড়িয়া কাটিয়া বা ছড়িয়া গেলে টেটেনাস দেখা দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার জন্য অল্পমাত্রায় এণ্টি-টেটেনিক সিরাম ইঞ্জেক্‌সন্ করা চলে। (খ) মলমের সহিত হয়। (গ) অধঃত্বাচিক (সব্‌কিউটেনিয়াস্) ইঞ্জেক্‌সনে সমধিক ফল দর্শে।

প্রঃ ২। (ক) শ্মশানের নিকট যারা বাস করে তাদের মড়ার ধোঁয়া লাগে। লোকে বলে তাহা ভাল নয়। কেহ যদি বেশীক্ষণ শ্মশানে বসিয়া থাকে—খুব ধোঁয়া লাগে, গন্ধ লাগে, তাহার কি স্বাস্থ্যের হানি হয়? যদি হয় ত কি হানি হইতে পারে? অনেকে ত শ্মশানে থাকে প্রায়ই। (খ যদি কোন লোক ঘুমাইতে ঘুমাইতে পায়ের চেটো নাড়ে মাঝে মাঝে (যেন মাছি বসিয়াছে), তাহা কিসের লক্ষণ? (গ) যদি কোন শিশুর (বা বয়স্কের) চোখে লঙ্কা প্রভৃতির হাত লেগে খুব জ্বালা করে, শিশুরা খুব জোরে কাঁদিতে থাকে অনেকক্ষণ,—সে সময়কার আশু প্রতিবিধানের উপায় কি? (ঘ মানুষকে এক একদিন ঈষৎ ফরসা দেখায় এবং অন্য দিন তদপেক্ষা কালো দেখায়, ইহার তাৎপর্য্য কি? বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইলে কেহ কেহ মোটা হয় ও কালো হয়, তাতে লোকে বলে রক্ত গাঢ় হ'য়েছে তাই, এবং কেহ কেহ মোটা হ'য়ে আরও ফর্সা হয়। ইহার মানে কি? যাদের বারমাস অসুখ, ক্রমশঃ রোগা হ'য়ে যায়, কেহ কেহ ফ্যাকাসে হ'য়ে যায়, কেহ কেহ পূর্ব্বাপেক্ষা কাল হ'তে থাকে, মানে কি জানাইবেন? (স, বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাম্‌গুদা)।

উঃ ২। (ক) শ্মশানের নিকট বাস করিলেই শরীর খারাপ হয় এমন কিছু কথা নাই; কিম্বা অনবরত শ্মশানের হাওয়া শুঁকিলেই শরীর রোগগ্রস্ত হইবে—এমন আশঙ্কা নাই। কারণ শ্মশান প্রায় খোলা জায়গায় অবস্থিত। তবে অনবরত মড়াপোড়া গন্ধ শোঁকা যুক্তিযুক্ত নহে। যে সকল উদাসীন বা শোকার্ত্ত লোকে সর্ব্বদা শ্মশানে থাকে, তাহারা যে মড়ার গন্ধ শুঁকিতেছে এরূপ কোন জ্ঞান তখন তাহাদের থাকে না. সেইজন্য তাহাদের শরীর বিশেষ খারাপ হয় না। (খ) জাগ্রত অবস্থায় যদি ঐ আঙুল নাড়ান অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে ঘুমন্ত অবস্থায়ও ওরূপ হয়; উহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা পাত্‌লা ঘুমের লক্ষণ। (গ) ঠাণ্ডা জলের ছাট দিয়া এক ফোঁটা রেড়ীর তেল বা ঘি (ঠাণ্ডা) চোখে দেওয়া। (ঘ) মনের দুশ্চিন্তা, স্নানের অভাব, শরীরের অবসাদ—ঐরূপ কালো দেখার কতকগুলি হেতু। আমাদের উপরের চামড়ার অব্যবহিত নীচে (Epidermis) অণুকোষের মধ্যে এক প্রকার বর্ণজনক পদার্থের কণা (Pigment granules) বিদ্যমান্; ইহার গুণ দেশ-কাল-স্থান-পাত্র ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। আমাদের আহার্য্যের তারতম্যে ও মানসিক গতি পরিবর্ত্তনেও এই বর্ণজনক পদার্থ শরীরের রঙ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে। রৌদ্র প্রধান দেশে সাধারণতঃ লোক কাল হয়, শীতপ্রধান দেশের লোক সাদা হয়; কিন্তু কাল হইলেই রক্ত বেশী হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; তখন বুঝিতে হইবে, স্থান ও আহার্য্যের পরিবর্ত্তনে চর্ম্ম নিম্নস্থ Pigment গুলি রূপান্তরিত হইয়াছে। চর্ম্ম বেশী রকম গুটাইয়া গেলেও কালো দেখায়। যাহারা রোগা হইয়া ফ্যাকাসে হয়, তাহাদিগের শরীরে রক্তাল্পতা ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রঃ ৩। (ক) মাথায় খুস্কী হয় কেন? তাহা

নিবারণের সাধারণ উপায় কি? (খ) অধিক স্বপ্ন দেখা যায় কেন? যাহা কোন কালে চিন্তা করা হয় না তাহাই স্বপ্নাকারে দৃষ্ট হয়। স্বপ্ন দেখা নিবারণ অথবা কম মাত্রায় দেখার কোন উপায় আছে কি? (সেক্রেটারী, পাব্‌লিক লাইব্রেরী, পাঙ্গাসী)।

উঃ ৩।—(ক) মাথায় আদৌ তেল না মাখিলে বা ঘষিয়া না মাখিলে, ময়লা টুপী বা পাগ্‌ড়ী পরিধান করিলে, (অনেকের মতে) ক্রমাগত বৈদ্যুতিক বাতির নীচে কাজ করিলে বা যথাতিরিক্ত পরিমাণে মাংস খাইলেও খুস্কী ও মরামাস জন্মে। প্রতিকারের উপায়—দুই তিনবার উপর্য্যুপরি মাথা কামান, প্রত্যহ স্নান ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া গরম জল সোডা (বা ভাল সাবান) দিয়া মাথা ধুইয়া ফেলা, বেশ করিয়া ঘষিয়া তেল মাখা ও পরিষ্কার চিরুণী ও বুরুষ দিয়া প্রত্যহ মাথা আঁচড়ান। যদি মাথা কামাইতে লজ্জা বা অসুবিধা হয়, তাহা হইলে এক ছটাক দধির সহিত খানিকটা সুপরিষ্কৃত মিহি শর্করা মিশাইয়া চুলের মধ্যে ভাল করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলা উচিত। (খ) দুশ্চিন্তা, পেটগরম, অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, গুরুভোজন বা অধিক রাত্রে ভোজন, চিৎ হইয়া শয়ন, অতীব কোমল শয্যা—এই সকল কারণে লোকে স্বপ্ন দেখে; সময়ে সময়ে অত্যধিক কৃমির জন্যও স্বপ্ন দেখিতে পারে। মানুষের দুইটি মন—একটি ইন্দ্রিয়গত (Conscious), অন্যটি অতীন্দ্রিয়গত (Sub conscious); মানুষের অজ্ঞাতসারে এই অতীন্দ্রিয় মন সময় সময় কাজ করে, ইহারাই মানুষের স্বপ্নের স্রষ্টা ও নিয়ামক। ইন্দ্রিয়গত মনের সাহায্য ব্যতিরেকে বহির্জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয়গত মন যে সকল জ্ঞান লাভ করে, অথবা বহুদিন পূর্ব্বে বা সদ্য সদ্য ইন্দ্রিয়গত মন তাহাকে যে সকল অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে নিদ্রার সময় যখন ইন্দ্রিয়গত মন নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, সেই সময় সেইগুলিকে সে আপনার ইচ্ছামত বাড়াইয়া কমাইয়া ও শাখা-প্রশাখা দান করিয়া এক অভিনব ছায়া-দৃশ্যের পরিকল্পনা করে, সেইগুলিই স্বপ্ন। উপরোক্ত কারণগুলির অবর্ত্তমানে স্বপ্ন থাকে না। নিদ্রার পূর্ব্বে মনে কোনরূপ চিন্তাকে স্থান দেওয়া উচিত নহে এবং পা, বগল, উরুসন্ধি কপাল ও মস্তকের নিম্নদেশ ভাল করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলা উচিত।

প্রঃ ৪।—(ক) রক্তকাশ (Hæmoptysis) অনেক সময় রক্তপিত্ত (Hæmatemisis) এবং; (খ) যক্ষ্মা (Phthisis) অনেক সময় Tuberculosis রোগ বলিয়া ভ্রম হয়। এই চারিটি রোগের ভিতর পার্থক্য কি? অবশ্য লক্ষণ বিশেষে এই সকল রোগ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু এই কয়েকটা রোগের বিস্তারিত বিভিন্ন লক্ষণ, ভাবী ফল ও স্থায়ী ফল কি? (এস্, এন্, ভৌমিক, চন্দনীমহল)।

উঃ ৪।—(ক) রক্তকাশ ও রক্তপিত্তে গোলমাল হইয়া যাইবার কোন কারণ নাই। রক্তকাশ প্রত্যেক বারে কাশির সঙ্গে অল্প অল্প উঠে, এই রক্ত বুক হইতে আসে, রক্ত তাজা—আবির গোলার মত উজ্জ্বল রঙ্—পাত্‌লা ও ঈষৎ ফেণাময়। রক্তপিত্ত বমনেচ্ছার পর পেটের ভিতর হইতে উঠিয়া আসে। পাকস্থলীর রক্ত-পেটিকা (Blood vessels) কোনক্রমে ফাটিয়া গেলেই প্রায় রক্তপিত্ত উপস্থিত হয়। রক্তকাশ অপেক্ষা রক্তপিত্তে অধিক পরিমাণে রক্ত উঠে; প্রতিবারে এক চামচ হইতে বমনের সহিত এক ছটাক পরিমাণ রক্তও উঠিতে পারে। এই রক্ত কৃষ্ণাভ ও ঘন, কখনও কখনও পেটের শ্লেষ্মা ও খাদ্যদ্রব্যের কণিকা মিশ্রিত থাকে। রক্তকাশ—শতকরা ৯০ জনের বেলায় ক্ষয়কাশেরই পূর্ব্বাভাষ, (স্মরণ রাখিবেন—বাকী ১০ জনের বেলায় ইহার মারাত্মকতা প্রযোজ্য নহে)। রক্তপিত্ত পাকস্থলীর বা বা যকৃতের ব্যারামের লক্ষণ—পেটে ulcer or cancer এর সূচনা। (খ) যক্ষ্মা (Tuberculosis) সাধারণ নাম, ক্ষয়ক শ—ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার (Pulmonary Tuberculosis, Phthisis, Tuberculosis of the lungs) নাম। শরীরের যে কোন স্থানে Tubercle bacilli প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিবাদে ক্ষয় আরম্ভ করিলে, সেই স্থানের tuberculosis হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপে শ্বাসনালীর (Tubercular laryngitis), হাড়ের (tuberculosis of the bone) বা পাকস্থলীর Intestinal tuberculosis) ক্ষয় হইতে পারে। বিভিন্ন স্থানের ক্ষয়ে বিভিন্ন রকমের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সকল রকমের ক্ষয়ে প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা করিলে শতকরা আশীজন, মধ্যাবস্থায় শতকরা দশ জন ও শেষাবস্থায় শতকরা দুইজন বাঁচিতে পারে।

বর্ষ শেষে
আমাদের নিবেদন।

বৈশাখ হইতে "স্বাস্থ্য-সমাচার" দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষ কাল দেশের লোকের মধ্যে স্বাস্থ্যবাণী প্রচার করিয়া আমরা একটি যুগের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সময়ের মধ্যে আমাদিগকে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছে, অনেক উপহাস—বিদ্রূপ মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হইয়াছে! আজ ভাবিতেছি—এতদিন কি করিয়া আমরা জগতের বুকে বাঁচিয়া আছি। আমরা যেরূপ দেশবাসীদিগকে বাঁচিবার বহু পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, তেমনি আমাদিগের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ আমাদিগের পত্রখানির জীবন-পথে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন; তাহা না হইলে বোধ হয় একাদশ বৎসরের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে আজ হাসিমুখে জগতের আলোয় এই নব বরষের শোভা সম্পদ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইত না। সর্ব্বোপরি কৃপা সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বলোকপাতা সচ্চিদানন্দের! আজ পুরাতন বর্ষের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া নূতন বর্ষকে অভিনন্দন করিবার পূর্ব্বে উচ্চ নীচ সকলকে আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছি!

স্বাস্থ্যহীন বঙ্গদেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তক ও পত্রের আদর নাই। লঘু সাহিত্য, স্বপ্নময় কবিতা, অশ্লীল্ আর্টের মোহজালে পড়িয়া বঙ্গবাসী শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি চিন্তাশক্তি সর্ব্বতোভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছে; মানসিক স্বাস্থ্য—চরিত্র যাহার প্রধান অবলম্বন, তাহারও সে যথেষ্ট অপব্যবহার করিতেছে। তাই এমনই দুর্ভাগ্য এদেশের ও আমাদের যে, একত্রিশ লক্ষ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে এই দীন পত্রিকাখানির দীনতম মাসিক প্রচার এ পর্য্যন্ত পাঁচ সহস্রের অধিক উঠিল না।

যাহা হউক আমাদের ব্রত আমরা যথাসাধ্য পালন করিয়া যাইতেছি ও যাইব; "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,"—কর্ম্মে মানুষের অধিকার, ফলাফলের হিসাব নিকাশ করিবার ত ক্ষমতা তাহার নাই! কিন্তু প্রত্যেক লোকহিতকর সার্ব্বভৌমিক কর্ম্মে সমাজের সহায়তা চাই। আমরা সমাজকে সাধ্যমত সেবা দিতে প্রস্তুত, সমাজ—আমাদিগকে তাহার সামান্য কোনরূপ বিনিময় না দিলে চলিবে কেন? কাগজের সামান্য ২৲ মাত্র বাৎসরিক চাঁদা অনেকের নিকট বহু অনুনয়-বিনয় তাগিদ করিয়াও পাওয়া যায় না; কেহ বা ভিঃ পিতে কাগজ পাঠাইতে আদেশ করিয়া পরে তাহা নিতান্ত অভদ্রোচিতভাবে ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করেন। যাঁহারা স্বাস্থ্য-সমাচারের ন্যায় মাসিক পত্রিকার সাহায্যের বিনিময়ে প্রতিদিন একটি পাই পয়সাও প্রতিদান দিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন—যেন তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে আমাদিগকে পত্র বা লোক মারফৎ জানান্। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ ক্ষতি সম্পাদক শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু মহাশয়কে ব্যক্তিগত ভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ঐরূপ ভাবে এ তাবৎকাল তাঁহাকে প্রায় সতের হাজার টাকার লোকসান্ অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য-সমাচার প্রতিমাসে ৭০০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত ছাপা হইত। অন্যূন ৫০০০ কপি অর্থসাহায্যকারী গ্রাহকগণকে পাঠান হইত, প্রায় ৫০০ শত ভবিষ্যত ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকিত এবং বাদ বাকী সমস্তই হাতে বা ডাকে (অনুরুদ্ধ হইয়া বা অযাচিত ভাবে) বাঙ্গালী অধ্যুষিত পৃথিবীর যে-কোন স্থানে বিনামূল্যে প্রেরণ করা হইত। এরূপভাবে এতাবৎকাল প্রায় দেড়লক্ষ স্বাস্থ্য-সমাচার আমরা সর্ব্ব শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছি; কিন্তু তাহার আশানুরূপ কিছুমাত্র ফললাভ হয় নাই; নাটক নভেল পরিপ্লাবিত পোড়া বাঙালায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব শুনাইবার লোক যদি বা মিলে কিন্তু শুনিবার মত লোক আদৌ পাওয়া যায় না।

আর এভাবে স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা পরিপোষণ করিলে, দেহ-মনের উপর অবিচার করিলে আমাদিগের জাতিগত ধ্বংস অচিরে অনিবার্য্য। "স্বাস্থ্য-সমাচারের" মত ক্ষুদ্র একখানি পত্রিকায় দেশের কয়টা লোকের অন্তরাত্মাকে শক্তিচর্চ্চা ও স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি সচেতন করিয়া তুলিবে? কেবলমাত্র মুখের কথা ও কাগজে লেখা দ্বারা একটা মৃতকল্প প্রকাণ্ড দেশের জাগরণ আনয়ন করা যায় না, জগতের ইতিহাসে এরূপ কোথাও যায় নাই। এখন ব্যষ্টিগত ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে কেবল কাজ চাই, দেশের লোকের চক্ষুর সম্মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—জীবন্ত আদর্শ তুলিয়া ধরা চাই। এই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 'স্বাস্থ্য-সমাচার'-সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুত কার্ত্তিক বসু মহাশয় সম্প্রতি "স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ" নামক একটি 'মিশন্' গঠন করিয়া তাঁহার বহুমূল্য ছাপাখানা, "স্বাস্থ্য সমাচার" ও ইংরাজী "হেল্থ্ এণ্ড হ্যাপিনেস্" পত্রিকা দুইটির সমস্ত স্বত্ব স্বামীত্ব খোস কোবালায় বিনা সর্ত্তে ঐ সঙ্ঘকে দান করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ সম্বন্ধে যদি সবিশেষ কিছু জানিতে চান, তাহা হইলে পত্র লিখিলে উহার অনুষ্ঠান-পত্র ও নিয়মাবলী আমরা সানন্দে পাঠাইয়া দিব।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি এক্ষণে পত্রিকা দুইখানি পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আমাদিগের পত্রিকার প্রতি কেহ সহানুভূতি প্রকাশ বা সাহায্য করিলে, ভ্রান্তিবশতঃ—তাহা একমাত্র সম্পাদক মহাশয়েরই উদর পূরণের ব্যবস্থা করা হইল বা তিনি একমাত্র লাভবান্ হইলেন—এরূপ মনে করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না; পরন্তু মনে হইবে যে, তাহা যৎসামান্য হইলেও দেশবাসী সাধারণের হিতার্থে ব্যয়িত হইতেছে; অন্যদিকে আবার কেহ পত্রিকার কোনরূপ ক্ষতি করিলে যেন মনে ভাবেন যে, তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সঙ্ঘকে ও পরোক্ষভাবে সমস্ত দেশবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইতেছে। সুতরাং আমাদিগের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক এই সত্যটি মনে রাখিয়া, ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য-সমাচারের প্রতি করুণা, কার্পণ্য বা তদধিক কিছু প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইবেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত "স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘের"—প্রথম প্রচেষ্টা বর্ত্তমান বৎসরের "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা" নামক অভিনব ধরণের সুবৃহৎ সচিত্র পঞ্জিকা প্রকাশ। উহা ছাপাইবার জন্যই চৈত্র সংখ্যা স্বাস্থ্য-সমাচার বাহির করিতে এরূপ অপ্রত্যাশিত বিলম্ব হইয়া গেল। আমাদিগের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ বর্ত্তমান বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দিবামাত্রই প্রত্যেককে উক্ত পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে। সঙ্ঘ এবার হইতে স্বাস্থ্য সমাচারের আকৃতি প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন; ছাপা কাগজ, ছবি, প্রবন্ধ, কলেবর, লেখক,—সকলই পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও সমুন্নত হইতেছে। তা'ছাড়া পত্রিকা প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশ করিবার প্রতি সঙ্ঘ বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বৈশাখ সংখ্যা [illegible] এই লাগাৎ ও জৈষ্ঠ সংখ্যা ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে যথানিয়মে বাহির হইবে। উক্ত তারিখের মধ্যে ২৲ চাঁদা পাঠাইয়া দিলে বিনামূল্যে পঞ্জিকা ও অন্যান্য বিশেষ উপহার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নর নারায়ণ উভয়ে আমাদিগের সাধনা সফল করুন—ইহাই আমাদের একান্ত অভিপ্রায় ও আশা! কিমধিকমিতি—

"স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সঙ্ঘ"
৫ই বৈশাখ ১৩৩০ সাল

শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।
সহঃ সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য-সমাচার।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১১শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩২৯ সাল { ১২শ সংখ্যা

স্বাস্থ্যধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কি?—যে শক্তি সমস্ত জীব। জগৎকে ধরিয়া থাকে বা যে শক্তিকে ধারণ করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে ও মনুষ্য-পদবাচ্য হয়—তাহাই ধর্ম্ম। "স এব শ্রেয়স্কর স এব ধর্ম্ম-শব্দেনোচ্যতে",—যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে জাগতিক স্ত্রী-পুরুষের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়—তাহার নাম ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের স্বরূপ।

মঙ্গল কথাটির অর্থ বড় ব্যাপক; মোটামুটি ধরিতে গেলে মানুষের দুই প্রকার মঙ্গল আছে; শারীরিক ও মানসিক। এই মঙ্গলের ভিন্নার্থ—আনন্দ বা সুখ। এই সুখের জন্যই আবহমান কাল হইতে মানুষের সকল প্রকার প্রচেষ্টা সাধিত হইতেছে এবং যাহাতে এই সুখ যথাসম্ভব স্থায়ী হয়—এই জন্য আমাদিগের বেদ, বেদান্ত, দর্শন, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণকারগণ নানারূপ গভীর গবেষণা ও পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মের বা শাশ্বত সুখ লাভের অসংখ্য স্বতন্ত্র পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।"

[বেদ ও স্মৃতি সকল বিভিন্ন; এরূপ মুনি নাই যাহার মত অন্য প্রকার নহে।]

তাই শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবধারণে অভিন্ন-মতাবলম্বী হইতে না পারিয়া, আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন:—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

[ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রহিয়াছে, অতএব মহাজন-সকল যে পথে গমন করেন তাহাই প্রকৃত পন্থা।]

প্রকৃতই 'ধর্ম্ম' বলিতে আমরা যাহা বুঝি—তাহার তত্ত্বসমূহের মীমাংসা হয় না। ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, কেহ "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" বলিতেছেন, কেহ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" (ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে) বলিতেছেন, কেহ "ধৃতিঃ ক্ষমাদমো" প্রভৃতির সাধন করিতে

বিভিন্ন মত ও পথ।

বলিতেছেন, কেহ বা "পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে" —এই উপদেশ দিতেছেন। দীপিকা মতে,—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া সাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম; পুরাণ মতে,—যাহার দ্বারা লোক স্থিতি বিহিত হয় তাহাই ধর্ম্ম; ভারত মতে,—যে গুণের দ্বারা মানুষের কায়মনোবাক্যে অহিংসা-বৃত্তি পরিস্ফুট হয় তাহাই ধর্ম্ম; যুক্তিবাদী মতে—মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনই ধর্ম্ম; জ্ঞানবাদী মতে,—মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব বিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম;—ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলকথা আনন্দ জিনিষটি মূলতঃ অক্ষুণ্ণ ও অদ্বিতীয় থাকিলেও, শাস্ত্রকারের হাতে আসিয়া তাহাকে অসংখ্য রূপান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমুখ প্রায় সকল শাস্ত্রকারগণই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, যাহা মনুষ্য জীবনে কর্ত্তব্য ও আচরণীয় তাহাই ধর্ম্ম। মনু আর একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহার সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্মের মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাগদ্বেষপরিশূন্য বিদ্বান্ ও সাধু-লোক যে সমস্ত নিয়ম সমাজে পালন করেন, তাহাই ধর্ম্ম। পুরাণশাস্ত্রের কুত্রাপি ধর্ম্মের একার্থ দেখা যায় না; ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক প্রয়োগ করা হইয়াছে; সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা ধর্ম্ম বলিতে সাধরণতঃ বুঝি,—যাহা দেশ বা জাতিভেদে সমাজগত, ব্যবহারগত, বা পারলৌকিক বিশ্বাসগত একটা পার্থক্য ও বিশেষত্ব জন্মায় এবং যাহার অনুষ্ঠানে মানুষের স্বর্গ বা নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। পুরাণের মতও কতকটা এইরূপ, কিন্তু তাঁহারা দেশ ও জাতি হিসাবে, পারলৌকিক বিশ্বাস ভেদে, ধর্ম্মকে বিভিন্ন করেন নাই, কিম্বা কেবল মাত্র কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে স্বর্গ প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মের সামিল করেন নাই; তাঁহারা নানারূপ উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন—যাহা লোকস্থিতিকর কর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম। এই লোকস্থিতি কিসে হয়?—"অভ্যুদয়" দ্বারা। ঋষি

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অভ্যুদয়।

কণাদ তাঁহার বৈশেষিক মীমাংসায় বলিতেছেন—"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"। (যাহা হইতে অভ্যুদয় ও মুক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম) অভ্যুদয় বলিতে আমরা বুঝি—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি (Material and spiritual prosperity)। বিবাহ ও পুত্র জন্মাদিরূপ ইষ্টলাভ দ্বারা ভৌতিক অভ্যুদয়ের বিকাশ হয় (অভ্যুদয়ঃ ইষ্টলাভঃ পুত্রজন্ম বিবাহাদিরূপঃ।—স্মার্ত্তঃ); ইহাকেই সবিশেষ-ভাবে শারীর-ধর্ম্ম এবং আহার-বিহার-মৈথুনাদি প্রবৃত্তি সকলকে জীব-ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের জন্য আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধি-শ্রদ্ধা নামক যে ছয়টি চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, এগুলি সদাচার ধর্ম্ম। কিন্তু উপরোক্ত দুই প্রকার অভ্যুদয়ই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কারণ শরীরকে বাদ দিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অসম্ভব; আবার মনকে বাদ দিয়া শারীরিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। এতদ্ব্যতীত সাংখ্য দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মত মানিয়া লইতে গেলে, মনকেও শরীরের মধ্যে গণ্য করিতে হয়। কারণ তাঁহার মতে শরীর দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম; আমাদিগের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে লইয়া যে রক্তমাংসময় ভৌতিক দেহ—তাহাই স্থূল, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র যোগে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত করিয়াছে। সুতরাং যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, শারীরিক উন্নতি বিধানই মানুষের শ্রেষ্ঠ

ধর্ম্ম। শরীর বলিতে সংসারী মাত্রেই সাধারণতঃ স্থূল শরীরকে বুঝে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই অর্থেই শরীর বা দেহ কথাটির প্রয়োগ করিব। অপিচ পার-লৌকিক পরিত্রাণ লাভার্থে উপাসনা-পদ্ধতি ও যাগযজ্ঞা-নুষ্ঠানাদিকেই যদি একমাত্র ধর্ম্মপদ-বাচ্য করিতে হয়,

স্বাস্থ্য ব্যতীত অভ্যুদয় অসম্ভব।

তাহা হইলেও শরীরের উন্নতি ব্যতীত তাহা সাধন করা সম্ভবপর কি? যেহেতু, শ্রুতিঃ শুচিস্তৎ কর্ম্মজীবী কর্ম্মকুর্য্যাৎ ইতি—তপজপ দান ধ্যান, পরোপকার বা যে কোন সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মই করিতে যাই না কেন —বিনা দৈহিক সুস্থতায় তাহা করা একান্ত অসাধ্য। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় সুখের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও স্বাস্থ্য ব্যতীত সুলভ নহে। রোগী ব্যক্তি, ঐহিক কি পারত্রিক কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। রোগযুক্ত সর্ব্ব-সম্পৎসম্পন্ন রাজাধিরাজ অপেক্ষা পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুকও সমধিক সুখী। ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য! তাই আমাদের শাস্ত্রকারগণ গাহিয়া গিয়াছেন—"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং আরোগ্যমূলমুত্তমম্।" (ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়ই আরোগ্য।) সেই জন্যই, পার্ব্বতী যখন স্বামী লাভাকাঙ্ক্ষায় অনশনে, শীতাতপ গ্রীষ্ম বর্ষায় দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা রক্ষা করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা ছিলেন, তখন দেবাদিদেব মহাদেব ছদ্মবেশে সেখানে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্ততে,
শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্!"

অর্থাৎ তুমি নিজশক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ কি?—ক্ষমতার অতিরিক্ত তপশ্চরণ করিও না, কেননা শরীরই ধর্ম্ম সাধনের মূল, অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকিলেই তবে ধর্ম্মাচরণ হয়।

সেইজন্যই আমাদের বেদ বেদাঙ্গ পুরাণ উপনিষৎ সমস্ত শাস্ত্রই অন্যান্য সামাজিক, নৈতিক ও পারলৌকিক আচারবিধির সহিত শারীরচর্য্যাকে বিভিন্ন ধারায় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যোগশাস্ত্রকার পাতঞ্জল যোগবিধিকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নামে দুই মুখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়া, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চবিধ শারীরিক সাধনার সাফল্য লাভের জন্য যোগপন্থীকে সর্ব্বপ্রথমে সচেষ্ট হইতে উপদেশ দিয়া এবং সপ্ত সাধন প্রকরণে শরীরকে সুস্থ ও কষ্টসহ করিবার বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনেরা জানিতেন, জ্ঞান-মার্গ, কর্ম্মমার্গ বা ভক্তিমার্গ—যে পথেরই পথিক হই না কেন, শরীরকে বাদ দিয়া কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না; আমাদের ষাটকৌষিক দেহ সকলের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শরীর পালন ও সদাচারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিম্বা ধর্ম্ম সাধনের প্রথম সোপান। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কেন তাহা পরে বলিতেছি। শরীর পালন ও সদাচার জাতি দেশ, কাল, পাত্র, কার্য্যাদি ভেদে ও ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হয়;

শরীর পালন ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

সেই জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম)-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল ও সেই জন্যই যুগধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কৌলিক, লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্মের উদ্ভব। পূর্ব্বকালের সেই চতুরাশ্রম ধর্ম্মের আদ্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার প্রত্যেক স্তরটিতে শরীর ও মনের সুস্থতা রক্ষা ও তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি সুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপন ও কি অমানুষিক চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন? সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ হইতে গুরুগৃহে প্রবেশ, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্রচর্চ্চা, সবিতা-স্যন্দনাগ্রগামী বালখিল্য ঋষিদের অগ্রে প্রাতরুত্থান, অন্তর্ধৌতি, বহির্ধৌতি, প্রভাতের সুশীতল সুমন্দ সমীরণ ও চতুঃপার্শ্বস্থ নবরাগারুণোদ্ভাসিত শ্যাম স্নিগ্ধ হাস্যময়ী প্রকৃতির বুকে শিহরণ জাগাইয়া অযুত

বিহঙ্গের কলকাকলীর সুধানির্ঝরকে স্তম্ভিত করিয়া, মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সমবেত কণ্ঠে সামগীতি—সেই "ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোদ্ধি"...। তার পর পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় অমিততেজা শুদ্ধ জ্ঞানী ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ, বিবাহ, প্রজনন ও সুকর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ, গৃহধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা; —এখানেও শরীরের প্রতি সেই সমান যত্ন—মনের প্রতি সেই সমান অনুরাগ। তারপর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অহী-নির্ম্মোকের মত স্বজন-পরিজন পরিত্যাগ ও বস্তুতন্ত্রতার প্রসারকে সংহত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন,—এখানেও সেই শরীর ধারণের জন্য শারীরিক নিয়ম পালন, নিয়মিত আহার, নিদ্রা ও অবসরমত একান্তে নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরোপসনা। তারপর ৭৫ বৎসরের পর দেহের অথর্ব্বতার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস বা ভিক্ষুধর্ম্মাবলম্বন ও পরকাল চিন্তায় সকল তনুমনের বিনিয়োগ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থূল শরীরের প্রতি অতি যত্ন ও সূক্ষ্ম শরীর বা মনের প্রতি সামান্য যত্ন; পরে গৃহস্থাশ্রমে দুয়ের প্রতি সমান যত্ন; বানপ্রস্থে স্থূলের প্রতি অল্প যত্ন, সূক্ষ্মের প্রতি অধিক যত্ন, তারপর ভিক্ষু আশ্রমে সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি একান্ত সমর্পিত-প্রাণ হওয়া। কারণ স্থূল শরীরের প্রতি সকল যত্নই তখন বৃথা; কালের করাল খড়্গ মাথার উপরে ঝুলিতেছে; তখন জীবকে পরজীবনের জন্য স্বভাবতঃ প্রস্তুত হইতে হয়, তখন মনে কেবল মাত্র উদয় হয় যে—

"যদি কৃষ্ণপদে চিত্তং ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে,
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥"

[যদি কৃষ্ণপদে চিত্ত এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে বিষম দুর্গমে, মরণে বা রণে ভয় কি?]

স্থূল হোক্ সূক্ষ্ম হোক্—চতুর্বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানুষটির শরীরের প্রতি কি সুশৃঙ্খল ও সুমধুর পরিচর্য্যার আয়োজনই না ছিল! কেন?—কারণ সকলেই বুঝিত, এই শরীর সেই ভগবানেরই একাংশ, তাহারই বিরাট জ্যোতির একটি স্ফুলিঙ্গ এই জৈব শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। সেই সংগোপন

দেহ অন্তবিগ্রহের মন্দির।

স্ফুলিঙ্গটিই আমাদের জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—আমাদের নিহিত অব্যয় শক্তি—আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা—জীবনযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র—আমাদের অনন্ত পথের পরম পাথেয়! মন্দিরের পুরোহিত দেব-মন্দিরটিকে সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুসংস্কৃত ও সুদৃঢ় রাখেন; কারণ তিনি জানেন যে, সেরূপ না রাখিলে তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ হয় ত কষ্ট পাইবেন বা রুষ্ট হইবেন,—হয়ত বা পূজার্থিগণ বাহিরের সৌন্দর্য্যাভাব দেখিয়া ভিতরে না আসিয়া হেলা-ভরে চলিয়া যাইবে। ভিতর বাহির উভয়েত পরস্পর ঘন আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া আছে, বাহির ত ভিতরেরই প্রকাশক। বাহির না থাকিলে ভিতর থাকিত কোথায়? তাই তখন বৈদিক সিংহ সকলেরই প্রাণে অহরহ গর্জ্জন তুলিত—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম), তাই সকলে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (এই আত্মাব্রহ্ম) এবং "সোঽহং" (আমি সেই ব্রহ্ম), মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ও মাটির মূর্ত্তি ভুলিয়া, নিজ নিজ শরীর ও আত্মার পূজাতেই আত্মসমর্পণ করিত। তখন সর্ব্বভূতই দেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ছিল, জৈব ও বাহ্য প্রকৃতির প্রত্যেক অণুপরমাণুটির মধ্যে দেব-শক্তির (latent energy ?) লীলা বিকশিত হইয়া উঠিত, নিরুক্তের সেই সমস্ত বাণী সকলের প্রাণের কাছে ডাকিয়া ডাকিয়া বুঝাইয়া দিত,—"দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানে ভবতি বা!" সেই জন্যই তখন হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতিচ্ছবি আপনার প্রাণের মধ্যে এবং প্রত্যেক জড় ও জীবের মধ্যে দেখিতে পাইত। তখন বৈশ্বানর প্রতিবিশ্বের প্রাণের মধ্যে প্রোজ্জ্বল ছিল। তার পর পুরাণের যুগে ভিতরের দেবতা যেন মাটির পুতুলের মধ্যে আপনার অধিকাংশ বিলাইয়া দিলেন; তন্ত্রের সময় প্রাণের মুখরতা তের পার্ব্বণের শঙ্খ-ঘণ্টা-আরতি

-প্রদীপের সমারোহের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তবুও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বজ্রনির্ঘোষে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতে লাগিল—

বাল ক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্ম নিষ্ঠোয়ং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।

[বালকের খেলার মত ব্রহ্মের রূপ ও নামাদি কল্পনা করা হয়। যে এইরূপ নামাদি ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ হইয়া ব্রহ্ম চিন্তা-পরায়ণ, মুক্ত সে,—ইহাতে সংশয় নাই।]

যাহা হউক, তাই বলিয়া শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে কেহ ভুল করিল না; কারণ মাটির

মূর্ত্তিপূজা ও শক্তিসাধনা

মধ্যে জীবন্তরূপের কল্পনা করা কতটা শক্তির প্রয়োজন! তার উপর অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলি হইল শক্তিময়ীর বিভিন্ন শক্তিদ্যোতক। গৌরবর্ণ, সুপুষ্ট, অবিকলাঙ্গ, অক্ষত, শুদ্ধাচারী, নির্লোভী ব্রাহ্মণ ব্যতীত দেবীর বোধনের জন্য কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেওয়া হইত না। প্রতিমার সম্মুখে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া, একাদিক্রমে দুই তিনঘণ্টা বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিবিধ প্রক্রিয়ায় নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনে পূজারতি করায় কম মানসিক ও দৈহিক বলের প্রয়োজন হইত না। বাদ্যকারও সমানে একাগ্র উৎসাহে তাহার ঢাকে কাটি মারিত, দর্শকগণও ছেলে বুড় মিলিয়া সমানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া সানন্দ চিত্তে আকুল উন্মত্ততায় নৃত্য করিত ও ভক্তি গদগদ কণ্ঠ নিঃসৃত "মা মা" ধ্বনিতে গগন মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিত। ভিতরে বাহিরে শক্তির সমাদর প্রাচীন ভারতে চিরকালই ছিল। শরীর ও মন সুস্থ সবল ছিল বলিয়াই আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা বেদ বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদের মধ্যে এরূপ অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহারা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কর্ণার্জ্জুন, ভীম, রাম, লক্ষ্মণ, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, শ্রীহর্ষ, সমুদ্র গুপ্ত ও যশো-ধর্ম্ম বর্ম্মণের মত প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্ম-ও কর্ম্মবীরের জন্মদান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তখন আমাদের সামাজিক জীবনে সুখ, স্বচ্ছলতা ও শান্তি ছিল।

কিন্তু তেহি নো দিবসা গতা; সে সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ আমরা তাঁহাদেরই ত বংশধর—আমাদের অবস্থা আজ কি হইয়াছে! আজ আমরা—ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া, কর্ম্মের চিরানুসৃতপন্থা হারাইয়া ফেলিয়া জড় ভরতের ন্যায় কাল যাপন করিতেছি।

শক্তিহীনতাই আমাদের অধঃপতনের মূল

কেন?—কালের সঙ্গে কি এতই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল? কাল যে মহাকাল—অনাদি, অনন্ত, অপার, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত; সে তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। মানুষ তাহার এক এক অংশকে আপনার প্রবৃত্তি ও প্রবণতার আগুণে গলাইয়া পিটিয়া নিজের সুবিধা ও মনোমত এক এক মূর্ত্তি (দণ্ড প্রহর মাস বৎসর যুগাদি) দান করিতেছে। তবে এ অধঃপতন কেন? এ 'কেন'র উত্তর একমাত্র আমরাই দিতে পারি, কারণ ইহার একমাত্র দায়ী আমরা। এক কথায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়। শক্তির চির সেবক—শক্তিময়ীর চির আদরের সন্তান আমরা, আমরা আজ শক্তির যথাতিরিক্ত অপব্যবহার করিয়াছি,—শক্তিকে মাটির ঢেলা বলিয়া আত্মম্ভরিতার পঙ্কপল্বলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আজ আমরা আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবনকে সর্ব্বতোভাবে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছি; আজ না আছে আমাদের দৈহিক শক্তি, না আছে আমাদের মানসিক শক্তি, না আছে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি। আজ আমরা নির্জ্জীব নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ হইয়া বিশ্বের বুকে জীবন্ত বিদ্রূপের মত—গজভুক্ত কপিত্থের মত—পরিত্যক্ত পাদুকার মত—একদিকে পড়িয়া আছি। সেই হিন্দু আমরা—যাহারা মহামানবের সাগর তীরে দাঁড়াইয়া সর্ব্ব প্রথম সভ্যতার সঙ্কল্প পাঠ করিয়াছিল, যাহার পণ্যের বোঝা বক্ষে লইয়া অসংখ্য অর্ণবপোত একদিন সপ্ত সমুদ্র মথিত করিয়া প্রতি দেশের তীরভূমি স্পর্শ করিয়া সমগ্র জগতের জীবন রক্ষা করিত, যাহার "গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে" দূর বিমান কাঁপাইয়া গোলোকে

প্রকৃতই 'ধর্ম্ম' বলিতে আমরা যাহা বুঝি—তাহার তত্ত্বসমূহের মীমাংসা হয় না। ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, কেহ "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" বলিতেছেন, কেহ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" (ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে) বলিতেছেন, কেহ "ধৃতিঃ ক্ষমাদমো" প্রভৃতির সাধন করিতে

বিভিন্ন মত ও পথ।

বলিতেছেন, কেহ বা "পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে" —এই উপদেশ দিতেছেন। দীপিকা মতে,—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া সাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম; পুরাণ মতে,—যাহার দ্বারা লোক স্থিতি বিহিত হয় তাহাই ধর্ম্ম; ভারত মতে,—যে গুণের দ্বারা মানুষের কায়মনোবাক্যে অহিংসা-বৃত্তি পরিস্ফুট হয় তাহাই ধর্ম্ম; যুক্তিবাদী মতে—মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনই ধর্ম্ম; জ্ঞানবাদী মতে,—মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ব বিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম;—ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলকথা আনন্দ জিনিষটি মূলতঃ অক্ষুণ্ণ ও অদ্বিতীয় থাকিলেও, শাস্ত্রকারের হাতে আসিয়া তাহাকে অসংখ্য রূপান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমুখ প্রায় সকল শাস্ত্রকারগণই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, যাহা মনুষ্য জীবনে কর্ত্তব্য ও আচরণীয় তাহাই ধর্ম্ম। মনু আর একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহার সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্মের মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাগদ্বেষপরিশূন্য বিদ্বান্ ও সাধু-লোক যে সমস্ত নিয়ম সমাজে পালন করেন, তাহাই ধর্ম্ম। পুরাণশাস্ত্রের কুত্রাপি ধর্ম্মের একার্থ দেখা যায় না; ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক প্রয়োগ করা হইয়াছে; সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে বর্ত্তমান সময়ে আমরা ধর্ম্ম বলিতে সাধরণতঃ বুঝি,—যাহা দেশ বা জাতিভেদে সমাজগত, ব্যবহারগত, বা পারলৌকিক বিশ্বাসগত একটা পার্থক্য ও বিশেষত্ব জন্মায় এবং যাহার অনুষ্ঠানে মানুষের স্বর্গ বা নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম। পুরাণের মতও কতকটা এইরূপ, কিন্তু তাঁহারা দেশ ও জাতি হিসাবে, পারলৌকিক বিশ্বাস ভেদে, ধর্ম্মকে বিভিন্ন করেন নাই, কিম্বা কেবল মাত্র কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে স্বর্গ প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মের সামিল করেন নাই; তাঁহারা নানারূপ উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন—যাহা লোকস্থিতিকর কর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম। এই লোকস্থিতি কিসে হয়?—"অভ্যুদয়" দ্বারা। ঋষি

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অভ্যুদয়।

কণাদ তাঁহার বৈশেষিক মীমাংসায় বলিতেছেন—"যতোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"। (যাহা হইতে অভ্যুদয় ও মুক্তি লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম) অভ্যুদয় বলিতে আমরা বুঝি—ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি (Material and spiritual prosperity)। বিবাহ ও পুত্র জন্মাদিরূপ ইষ্টলাভ দ্বারা ভৌতিক অভ্যুদয়ের বিকাশ হয় (অভ্যুদয়ঃ ইষ্টলাভঃ পুত্রজন্ম বিবাহাদিরূপঃ।—স্মার্ত্তঃ); ইহাকেই সবিশেষ-ভাবে শারীর-ধর্ম্ম এবং আহার-বিহার-মৈথুনাদি প্রবৃত্তি সকলকে জীব-ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকি। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়ের জন্য আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধি-শ্রদ্ধা নামক যে ছয়টি চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, এগুলি সদাচার ধর্ম্ম। কিন্তু উপরোক্ত দুই প্রকার অভ্যুদয়ই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কারণ শরীরকে বাদ দিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অসম্ভব; আবার মনকে বাদ দিয়া শারীরিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। এতদ্ব্যতীত সাংখ্য দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মত মানিয়া লইতে গেলে, মনকেও শরীরের মধ্যে গণ্য করিতে হয়। কারণ তাঁহার মতে শরীর দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম; আমাদিগের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে লইয়া যে রক্তমাংসময় ভৌতিক দেহ—তাহাই স্থূল, এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র যোগে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত করিয়াছে। সুতরাং যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, শারীরিক উন্নতি বিধানই মানুষের শ্রেষ্ঠ

ধর্ম্ম। শরীর বলিতে সংসারী মাত্রেই সাধারণতঃ স্থূল শরীরকে বুঝে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই অর্থেই শরীর বা দেহ কথাটির প্রয়োগ করিব। অপিচ পার-লৌকিক পরিত্রাণ লাভার্থে উপাসনা-পদ্ধতি ও যাগযজ্ঞা-দ্যনাদিকেই যদি একমাত্র ধর্ম্মপদ-বাচ্য করিতে হয়,

স্বাস্থ্য ব্যতীত অভ্যুদয় অসম্ভব।

তাহা হইলেও শরীরের উন্নতি ব্যতীত তাহা সাধন করা সম্ভবপর কি? যেহেতু, শ্রুতিঃ শুচিস্তৎ কর্ম্মজীবী কর্ম্মকুর্য্যাৎ ইতি—তপজপ দান ধ্যান, পরোপকার বা যে কোন সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মই করিতে যাই না কেন —বিনা দৈহিক সুস্থতায় তাহা করা একান্ত অসাধ্য। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় সুখের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও স্বাস্থ্য ব্যতীত সুলভ নহে। রোগী ব্যক্তি, ঐহিক কি, পারত্রিক কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। রোগযুক্ত সর্ব্ব-সম্পৎসম্পন্ন রাজাধিরাজ অপেক্ষা পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুকও সমধিক সুখী। ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য! তাই আমাদের শাস্ত্রকারগণ গাহিয়া গিয়াছেন—"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং আরোগ্যমূলমুত্তমম্।" (ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়ই আরোগ্য।) সেই জন্যই, পার্ব্বতী যখন স্বামী লাভাকাঙ্ক্ষায় অনশনে, শীতাতপ গ্রীষ্ম বর্ষায় দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা রক্ষা করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্তা ছিলেন, তখন দেবাদিদেব মহাদেব ছদ্মবেশে সেখানে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্ততে,
শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্!"

অর্থাৎ তুমি নিজশক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ কি?—ক্ষমতার অতিরিক্ত তপশ্চরণ করিও না, কেননা শরীরই ধর্ম্ম সাধনের মূল, অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকিলেই তবে ধর্ম্মাচরণ হয়।

সেইজন্যই আমাদের বেদ বেদাঙ্গ পুরাণ উপনিষৎ সমস্ত শাস্ত্রই অন্যান্য সামাজিক, নৈতিক ও পারলৌকিক আচারবিধির সহিত শারীরচর্য্যাকে বিভিন্ন ধারায় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যোগশাস্ত্রকার পাতঞ্জল যোগবিধিকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নামে দুই মুখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়া, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চবিধ শারীরিক সাধনার সাফল্য লাভের জন্য যোগপন্থীকে সর্ব্বপ্রথমে সচেষ্ট হইতে উপদেশ দিয়া এবং সপ্ত সাধন প্রকরণে শরীরকে সুস্থ ও কষ্টসহ করিবার বিবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনেরা জানিতেন, জ্ঞান-মার্গ, কর্ম্মমার্গ বা ভক্তিমার্গ—যে পথেরই পথিক হই না কেন, শরীরকে বাদ দিয়া কোন পথেই অগ্রসর হওয়া যায় না; আমাদের ষাটকৌষিক দেহ সকলের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শরীর পালন ও সদাচারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিম্বা ধর্ম্ম সাধনের প্রথম সোপান। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কেন তাহা পরে বলিতেছি। শরীর পালন ও সদাচার জাতি দেশ, কাল, পাত্র, কার্য্যাদি ভেদে ও ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হয়;

শরীর পালন ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

সেই জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম)-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল ও সেই জন্যই যুগধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কৌলিক, লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্মের উদ্ভব। পূর্ব্বকালের সেই চতুরাশ্রম ধর্ম্মের আদ্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার প্রত্যেক স্তরটিতে শরীর ও মনের সুস্থতা রক্ষা ও তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি সুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপন ও কি অমানুষিক চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন? সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ হইতে গুরুগৃহে প্রবেশ, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্রচর্চ্চা, সবিতা-স্যন্দনাগ্রগামী বালখিল্য ঋষিদের অগ্রে প্রাতরুত্থান, অন্তর্ধৌতি, বহির্ধৌতি, প্রভাতের সুশীতল সুমন্দ সমীরণ ও চতুঃপার্শ্বস্থ নবরাগারুণোদ্ভাসিত শ্যাম স্নিগ্ধ হাস্যময়ী প্রকৃতির বুকে শিহরণ জাগাইয়া অযুত

বিহঙ্গের কলকাকলীর সুধানির্ঝরকে স্তম্ভিত করিয়া, মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সমবেত কণ্ঠে সামগীতি—সেই "ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোদ্ধি"···। তার পর পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় অমিততেজা শুদ্ধ জ্ঞানী ব্রহ্মচারীর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ, বিবাহ, প্রজনন ও সুকর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ, গৃহধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা ;—এখানেও শরীরের প্রতি সেই সমান যত্ন—মনের প্রতি সেই সমান অনুরাগ। তারপর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অহী-নির্ম্মোকের মত স্বজন-পরিজন পরিত্যাগ ও বস্তুতন্ত্রতার প্রসারকে সংহত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন,—এখানেও সেই শরীর ধারণের জন্য শারীরিক নিয়ম পালন, নিয়মিত আহার, নিদ্রা ও অবসরমত একান্তে নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরোপসনা। তারপর ৭৫ বৎসরের পর দেহের অথর্ব্বতার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস বা ভিক্ষুধর্ম্মাবলম্বন ও পরকাল চিন্তায় সকল তনুমনের বিনিয়োগ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থূল শরীরের প্রতি অতি যত্ন ও সূক্ষ্ম শরীর বা মনের প্রতি সামান্য যত্ন ; পরে গৃহস্থাশ্রমে দুয়ের প্রতি সমান যত্ন ; বানপ্রস্থে স্থূলের প্রতি অল্প যত্ন, সূক্ষ্মের প্রতি অধিক যত্ন, তারপর ভিক্ষু আশ্রমে সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি একান্ত সমর্পিত-প্রাণ হওয়া। কারণ স্থূল শরীরের প্রতি সকল যত্নই তখন বৃথা ; কালের করাল খড়্গ মাথার উপরে ঝুলিতেছে ; তখন জীবকে পরজীবনের জন্য স্বভাবতঃ প্রস্তুত হইতে হয়, তখন মনে কেবল মাত্র উদয় হয় যে—

"যদি কৃষ্ণপদে চিত্তং ভক্তিশ্চোৎপদপঙ্কজে,
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥"

[যদি কৃষ্ণপদে চিত্ত এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে বিষম দুর্গমে, মরণে বা রণে ভয় কি ?]

স্থূল হোক্ সূক্ষ্ম হোক্—চতুর্ব্বর্ণাশ্রমের মধ্য দিয়া প্রত্যেক মানুষটির শরীরের প্রতি কি সুশৃঙ্খল ও সুমধুর পরিচর্য্যার আয়োজনই না ছিল ! কেন ?—কারণ সকলেই বুঝিত, এই শরীর সেই ভগবানেরই একাংশ, তাঁহারই

দেহ অন্তর্বিগ্রহের মন্দির।

বিরাট জ্যোতির একটি স্ফুলিঙ্গ এই জৈব শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। সেই সংগোপন স্ফুলিঙ্গটিই আমাদের জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—আমাদের নিহিত অব্যয় শক্তি—আমাদের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা—জীবনযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র—আমাদের অনন্ত পথের পরম পাথেয় ! মন্দিরের পুরোহিত দেব-মন্দিরটিকে সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুসংস্কৃত ও সুদৃঢ় রাখেন ; কারণ তিনি জানেন যে, সেরূপ না রাখিলে তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ হয় ত কষ্ট পাইবেন বা রুষ্ট হইবেন,—হয়ত বা পূজার্থিগণ বাহিরের সৌন্দর্য্যাভাব দেখিয়া ভিতরে না আসিয়া হেলা-ভরে চলিয়া যাইবে। ভিতর বাহির উভয়েত পরস্পর ঘন আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া আছে, বাহির ত ভিতরেরই প্রকাশক। বাহির না থাকিলে ভিতর থাকিত কোথায় ? তাই তখন বৈদিক সিংহ সকলেরই প্রাণে অহরহ গর্জ্জন তুলিত—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (নিশ্চয়ই এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম), তাই সকলে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (এই আত্মাব্রহ্ম) এবং "সোঽহং" (আমি সেই ব্রহ্ম), মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ও মাটির মূর্ত্তি ভুলিয়া, নিজ নিজ শরীর ও আত্মার পূজাতেই আত্মসমর্পণ করিত। তখন সর্ব্বভূতই দেবতার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ছিল, জৈব ও বাহ্য প্রকৃতির প্রত্যেক অণুপরমাণুটির মধ্যে দেব-শক্তির (latent energy ?) লীলা বিকশিত হইয়া উঠিত, নিরুক্তের সেই সমস্ত বাণী সকলের প্রাণের কাছে ডাকিয়া ডাকিয়া বুঝাইয়া দিত,—"দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানে ভবতি বা !" সেই জন্যই তখন হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতিচ্ছবি আপনার প্রাণের মধ্যে এবং প্রত্যেক জড় ও জীবের মধ্যে দেখিতে পাইত। তখন বৈশ্বানর প্রতিবিম্বের প্রাণের মধ্যে প্রোজ্জ্বল ছিল। তার পর পুরাণের যুগে ভিতরের দেবতা যেন মাটির পুতুলের মধ্যে আপনার অধিকাংশ বিলাইয়া দিলেন ; তন্ত্রের সময় প্রাণের মুখরতা তের পার্ব্বণের শঙ্খ-ঘণ্টা-আরতি

পঞ্চ-প্রদীপের সমারোহের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তবুও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বজ্রনির্ঘোষে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিতে লাগিল—

বাল ক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্ম নিষ্ঠোয়ং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।

[বালকের খেলার মত ব্রহ্মের রূপ ও নামাদি কল্পনা করা হয়। যে এইরূপ নামাদি ত্যাগ করিয়া আত্মস্থ হইয়া ব্রহ্ম চিন্তা-পরায়ণ, মুক্ত সে,—ইহাতে সংশয় নাই।]

যাহা হউক, তাই বলিয়া শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিতে কেহ ভুল করিল না; কারণ মাটির

মূর্ত্তিপূজা ও শক্তিসাধনা

মধ্যে জীবন্তরূপের কল্পনা করা কতটা শক্তির প্রয়োজন ! তার উপর অধিকাংশ মূর্ত্তিগুলি হইল শক্তিময়ীর বিভিন্ন শক্তিদ্যোতক। গৌরবর্ণ, সুপুষ্ট, অবিকলাঙ্গ, অক্ষত, শুদ্ধাচারী, নির্লোভী ব্রাহ্মণ ব্যতীত দেবীর বোধনের জন্য কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেওয়া হইত না। প্রতিমার সম্মুখে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া, একাদিক্রমে দুই তিনঘণ্টা বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিবিধ প্রক্রিয়ায় নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনে পূজারতি করায় কম মানসিক ও দৈহিক বলের প্রয়োজন হইত না। বাদ্যকারও সমানে একাগ্র উৎসাহে তাহার ঢাকে কাটি মারিত, দর্শকগণও ছেলে বুড় মিলিয়া সমানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া সানন্দ চিত্তে আকুল উন্মত্ততায় নৃত্য করিত ও ভক্তি গদগদ কণ্ঠ নিঃসৃত "মা মা" ধ্বনিতে গগন মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া তুলিত। ভিতরে বাহিরে শক্তির সমাদর প্রাচীন ভারতে চিরকালই ছিল। শরীর ও মন সুস্থ সবল ছিল বলিয়াই আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা বেদ বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদের মধ্যে এরূপ অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহারা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কর্ণার্জ্জুন, ভীম, রাম, লক্ষ্মণ, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, শ্রীহর্ষ, সমুদ্র গুপ্ত ও যশো-ধর্ম্ম বর্ম্মণের মত প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্ম-ও কর্ম্মবীরের জন্মদান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তখন আমাদের সামাজিক জীবনে সুখ, স্বচ্ছলতা ও শান্তি ছিল।

কিন্তু তেহি নো দিবসা গতা ; সে সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। আজ আমরা তাঁহাদেরই ত বংশধর—

শক্তিহীনতাই আমাদের অধঃপতনের মূল

আমাদের অবস্থা আজ কি হইয়াছে ! আজ আমরা—ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া, কর্ম্মের চিরানুসৃতপন্থা হারাইয়া ফেলিয়া জড় ভরতের ন্যায় কাল যাপন করিতেছি। কেন ?—কালের সঙ্গে কি এতই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গেল ? কাল যে মহাকাল—অনাদি, অনন্ত, অপার, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ; সে তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। মানুষ তাহার এক এক অংশকে আপনার প্রবৃত্তি ও প্রবণতার আগুণে গলাইয়া পিটিয়া নিজের সুবিধা ও মনোমত এক এক মূর্ত্তি (দণ্ড প্রহর মাস বৎসর যুগাদি) দান করিতেছে। তবে এ অধঃপতন কেন ? এ 'কেন'র উত্তর একমাত্র আমরাই দিতে পারি, কারণ ইহার একমাত্র দায়ী আমরা। এক কথায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়। শক্তির চির সেবক—শক্তিময়ীর চির আদরের সন্তান আমরা, আমরা আজ শক্তির যথাতিরিক্ত অপব্যবহার করিয়াছি,—শক্তিকে মাটির ঢেলা বলিয়া আত্মম্ভরিতার পঙ্কপল্বলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আজ আমরা আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জীবনকে সর্ব্বতোভাবে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছি ; আজ না আছে আমাদের দৈহিক শক্তি, না আছে আমাদের মানসিক শক্তি, না আছে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি। আজ আমরা নির্জ্জীব নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রাণ হইয়া বিশ্বের বুকে জীবন্ত বিদ্রূপের মত—গজভুক্ত কপিত্থের মত—পরিত্যক্ত পাদুকার মত—একদিকে পড়িয়া আছি। সেই হিন্দু আমরা—যাহারা মহামানবের সাগর তীরে দাঁড়াইয়া সর্ব্ব প্রথম সভ্যতার সঙ্কল্প পাঠ করিয়াছিল, যাহার পণ্যের বোঝা বক্ষে লইয়া অসংখ্য অর্ণবপোত একদিন সপ্ত সমুদ্র মথিত করিয়া প্রতি দেশের তীরভূমি স্পর্শ করিয়া সমগ্র জগতের জীবন রক্ষা করিত, যাহার "গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে" দূর বিমান কাঁপাইয়া গোলোকে

পঁহুছিয়া বিশ্বপতির আসন টলাইতে পারিত! কিন্তু হায়, আজ সে গৌরব মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ধূলায় খসিয়া পড়িয়াছে, আকাশের চাঁদ আজ আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া ম্লান মুখে খদ্যোতের ন্যায় দিন যাপন করিতেছে, আজ হিন্দু তাহার মূলাধারবাসিনী 'কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে দূর দুর্গম বিস্মৃতির বনবাসে প্রেরণ করিয়াছে!

পল্লীর দূরবস্থা

তাই আজ বাঙ্গালার পল্লী-প্রাণের সকল স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে; আজ সে মৃত্যুর শ্মশান ভূমি সাজিয়া একটা বিরাট হাহাকারের কীর্ত্তি বুকে ধরিয়া মৌন হতাশায় সাশ্রু নয়নে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রাঙ্গণে আর শিশুর সে অমিয়-সিঞ্চিত কল কাকলী নাই, রমণীর সে সরলতা—কর্ম্মকুশলতা—স্নেহ—প্রেম—প্রবণতা নাই; যুবকের সেই বিপুল উৎসাহ—অদম্য সাহস—অনবস্থ একতা-সম্মান-বাধ্যতা নাই; বৃদ্ধের সে বিরল চিন্তা—জ্ঞানের গরিমা—আদর্শ ধর্ম্ম-বিশ্বাস নাই। আছে কেবল ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিবাদ, পাড়ায় পাড়ায় বিসম্বাদ, গ্রামে গ্রামে দলাদলি, মামলা-মোকদ্দমা আর ঘরাঘরি! পল্লীর বারো আনা ভদ্র গৃহস্থ সহরে আসিয়া মাথা গুঁজিয়াছেন; অবশিষ্ট চার আনা, তিন শত চৌষট্টি দিন ব্যাধি ও দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিতেছে; —তাহাদের একদিকে "ম্যয় ভুঁখা হুঁ", অন্যদিকে "ওগো এক ফোঁটা ওষুধ"—যেন সমূর্ত্ত বিভষিকায় মুখ ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কি অপরূপ দৃশ্য! তারপর, পল্লীর চাষা, যাহারা বাংলার শতকরা ৮০ জন—জাতির মেরুদণ্ড—শস্যের ভাণ্ডারী, তাহারা একদিকে মহাজন ও জমিদারের সুদ ও খাজনা, অন্যদিকে রোগের খাজনা ও সুদ যোগাইতে যোগাইতে নিতান্ত নাতোয়ান্ হইয়া পড়িতেছে। বেচারা সারা রাত্র ম্যালেরিয়ার ভুজ-বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, ভোরে শীর্ণ বুভুক্ষিত বলদ জোড়া লাগলে জুতিয়া দুর্ব্বল হস্তে জমী চষিতেছে; অর্দ্ধেক জমি অকর্ষিত থাকিতেছে, বাকী অর্দ্ধেকে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সংসারের ভোগে আসিয়া হয়ত আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতেছে না। আবার যে বৎসর বান ডাকিল বা অজন্মা হইল, সে বৎসর চাষার মাথায় হাত দিয়া কেবল 'খোদার দোয়া' ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তারপর, "আল্লার মর্জ্জিতে যে মুষ্টিমেয় লোক সুস্থ ও স্বচ্ছল অবস্থায় থাকে, তাহারা ধান্য রোপণ ও কর্ত্তনের সময়টুকু ব্যতীত বৎসরের অবশিষ্ট কাল তাস খেলিয়া, মেলা দেখিয়া, ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া ও মাম্‌লা ফাঁদিয়া অলস উদ্যমে (Idle activity)—পরম আনন্দে দিন কাটাইয়া দেয়। দেশের দুঃখে তাহাদের প্রাণ কাঁদে না, দেশের সহানুভূতির তাহারা যেন প্রত্যাশা করে না, তাহারা কেবল নিজের সুখ দুঃখ লইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া মরে! মূলতঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের অভাবেই আজ পল্লীর এই দুরন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

এখন পল্লীর স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু বিশদভাবে বাখ্যা করিয়া পাঠকগণের চক্ষের সম্মুখে ধরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

নগর ও পল্লী-স্বাস্থ্য।

যেখানে আমাদের শতকরা প্রায় ৯০ জন বাস করে, সেখানকার অবস্থা যে কি শোচনীয় দুর্দ্দশাপন্ন, তাহা সকলেরই ভাবিয়া ও বুঝিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। পল্লীকে বাদ দিয়া এ যাবৎ কোন জাতিই উন্নতি লাভ করে নাই। পল্লীকে অবহেলা করিলে চলিবে কেন? জাতির প্রাণ ত সেই পল্লীমায়ের ধূলি ধূসরিত জীর্ণাঞ্চলের নীচে পড়িয়া আছে! সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্ম-কর্ত্তা এদেশের ১৯২১ সালের বাৎসরিক স্বাস্থ্য বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

সমগ্র বঙ্গ-পল্লীতে মোট মাট অধিবাসীর সংখ্যা (১৯২১) ৪,৩৪,৩১,৭৮৭

ঐ সালে কলেরায় মরিয়াছে	মোট	৭৩,৯৪৩
.. বসন্তে ..	..	৭,৮০৫
.. সর্ব্বপ্রকার জ্বরে	..	১০,৪৬,৬৬১
তন্মধ্যে কালাজ্বরে ..	..	৯২৬

তন্মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে,,	মোট	৭,৩৭,৩২৩
,, হামজ্বরে ,,	,,	১,১৯৮
.. অন্ত্রদোষ ঘটিত বাতশ্লেষ্ম জ্বরে ,,	,,	৫,০১৫
,, পালটা জ্বরে ,,	,,	৬,৩০৪
,, অন্যান্য জ্বরে ,,	,,	৩০৭,৯০৩
ঐ সালে পেটের অসুখে	,,	২,৯৪১
,, আমাশায় ,,	,,	১৩,৭৪৮
,, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ,,	,,	২,৮০৯
,, নিউমোনিয়ায় ,,	,,	৫,৭৬১
,, যক্ষ্মায় ,,	,,	১,৩৯৪
,, শ্বাস প্রশ্বাস ঘটিত অন্যান্য ব্যায়রামে	,,	৪,৬০৩
,, অন্যান্য ব্যাধিতে *	,,	১৩,২৩,২৭৩
,, আত্মহত্যা, সর্পদংশন, জীবজন্তুর আক্রমণ, জলাতঙ্ক প্রভৃতিতে	,,	১,৪৬,৮৪৮
,, সর্ব্বপ্রকার রোগভোগে	,,	১৩,২৩,২৬৬

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পল্লীতে প্রতি বৎসর হাজার করা ৩০½ জন শমন রাজ্যের প্রজা হইতেছে। কিন্তু চেষ্টা করিলে স্বচ্ছন্দে এই হার অর্দ্ধেকেরও কম করা যাইতে পারে; কারণ যে সকল ব্যাধির প্রকোপে পল্লীবাসীগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার অধিকাংশই নিবার্য্য ব্যাধি এবং অল্পবিস্তর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকিলে ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে, ঐ সকল নিবার্য্য ব্যাধির শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস করা যাইতে পারে। সংক্রামক ব্যাধির সময় দুর্ব্বল, ভীতু ও অপরিষ্কৃত ব্যক্তিরাই আগে আক্রান্ত হয়। পল্লীবাসীর মধ্যে এই তিনটি গুণের অভাব নাই; তাই যখন কোন সংক্রামক ব্যাধি আসে, তখন অল্প সময়ের মধ্যে এক একটি পল্লী উজাড় করিয়া চলিয়া যায়।

এই সঙ্গে সহরের মৃত্যুর হার দেখাইয়া, আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ পুনরায় আরম্ভ করিব।

বঙ্গের সমগ্র নগরগুলিতে মোটমাট অধিবাসী সংখ্যা (১৯২১) ৩,০৯০,৫০৬

ঐ সালে কলেরায় মরিয়াছে	মোট	৬,৬০৪
,, বসন্তে ,,	,,	৩৫২
,, প্লেগে ,,	,,	৫২
,, ম্যালেরিয়া ,,	,,	১১,৯০৮
,, অন্ত্রদোষ ঘটিত জ্বরে	,,	৬৭৮
,, হামে ,,	,,	৩৩৯
,, পাল্‌টা জ্বরে ,,	,,	৪৯৪
,, কালাজ্বরে ,,	,,	৬২৬
,, অন্যান্য জ্বরে ,,	,,	৯,৬৬২
,, আমাশয়ে ,,	,,	৫,৭৩৯
,, পেটের অসুখে ,,	,,	২,৮৩০
,, ইনফ্লুয়েঞ্জা ,,	,,	১,৯৪১
,, নিউমোনিয়া ,,	,,	৫,০৮০
,, যক্ষ্মা ,,	,,	২,৬৬১
,, শ্বাসযন্ত্র ঘটিত অন্যান্য ব্যাধিতে ,,		৭,৫৯২
,, অন্যান্য ব্যাধিতে †	,,	২১,২৭৩
,, আত্মহত্যা, সর্পদংশন জীবজন্তুর আক্রমণ দৈবদুর্ঘটনা প্রভৃতিতে	,,	১,৪০৬
,, সর্ব্বপ্রকার রোগভোগে	,,	৭৯,৭৬৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে নগরে প্রতি বৎসর হাজার করা ২৫ ৭/১০ জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই হারও চেষ্টা করিলে স্বচ্ছন্দে অর্দ্ধেক কমান যাইতে

* তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রসবকালে মৃত্যু হইয়াছে	মোট	১,৪৩২
ধনুষ্টঙ্কার, পেটের অসুখ, আমাশয় ও নিউমনিয়া প্রভৃতিতে এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক পুং শিশুর ..	,,	১,৩৫,১৬৫
,, ,, .. ঐ স্ত্রী ,, ..	,,	১,১৯,২৯৪

† তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রসবকালে মৃত্যু হইয়াছে		২২৪
ধনুষ্টঙ্কার, পেটের অসুখ, আমাশা, নিউমনিয়া প্রভৃতিতে এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক পুং শিশুর	,,	৭,৪৭২
,, স্ত্রী শিশুর ঐ ,, ,,	,,	৬,২৩৯

পারে। স্বীকার করি, নগরে মিউনিসিপ্যালটি ও বহু ধনী, কারবারী ও জ্ঞানী-মানী-বিদ্বানের অবস্থান এবং বিবিধ প্রকার ও বহু পরিমাণ কর আদায় নিবন্ধন, বহু রাজপথ, গ্যাসের আলো, পরিশ্রুত কলের জল, স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল ও অভিজ্ঞ ডাক্তার ও স্বাস্থ্যরক্ষার নানারূপ সুচারু বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যাইতেছে সহরের মৃত্যু-সংখ্যা পল্লী অপেক্ষা হাজারে মাত্র ৫½ কম। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সহর বাসীরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ে অমনোযোগী, উদাসীন ও অজ্ঞ, এবং পল্লীবাসী অপেক্ষা অধিকতর বিলাসী, কদভ্যাসী ও ব্যভিচারী। স্বীকার করি, মিউনিস্যাল্‌টি স্বাস্থ্যবিষয়ক বহু বিধি-ব্যবস্থা সহরে প্রচলিত রাখিয়াছেন, কিন্তু সহর বাসী সেগুলি পালনে যদি যত্নবান্ না হয়, তাহা হইলে মিউনিসিপ্যালটিও নাচার, এবং মৃত্যু-রাজও তাঁহার চৌথ আদায়ে পরাঙ্মুখ হন্ না। আরও একটা ভাবিবার বিষয়;—তাহা আমাদের দেশের অসম্ভাব্য শিশু-মৃত্যু। আমাদের দেশে প্রায় অর্দ্ধেক শিশুই ৮ বৎসর বয়ক্রমে উপনীত হইতে না হইতেই সমন-সদনে নীত হয়। তার উপর প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ হাজার জননী গর্ভবতী অবস্থায় প্রতি বৎসর প্রাণত্যাগ করে। স্কুল কলেজে—আমাদের ভবিষ্যত বংশীয়েরা যেখানে জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—সেখানে প্রতি ৩টি ছাত্রের মধ্যে ২টি ছাত্রই কোন-না-কোন ছোট বড় রোগে ভুগিতেছে এবং রীতিমত স্বাস্থ্যবান্ নহে। জাতির স্বাস্থ্যে কি শোচনীয় দুরবস্থা! তার উপর আরও দেখুন্। বাংলার প্রতি এক লক্ষ পুরুষের মধ্যে অল্পাধিক ৭১,৫০০ লোকের ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই সমন সদনে নীত হয়, ৮৫,০০০ লোক ৪০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মারা যায়, এবং ৯৩,০০০ লোক ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুর খড়্গের নীচে মাথা পাতিয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন যুগে যে বয়সে লোক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ উৎসাহে গৃহ-ধর্ম্ম পালনের জন্য অগ্রসর হইত, এখন সেই বয়সে শতকরা ৭৫এর বেশী লোক জরাগ্রস্ত হইয়া, শতকরা প্রায় ৬০ জন লোক মরণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে; পুরাকালে যে বয়সে লোকে গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিত, এখন সেই সময় লোকে ধর্ম্মরাজাকে আশ্রয় করিবার জন্য ভবসমুদ্রের পরপারে চলিয়া যাইতেছে। দেশের স্বাস্থ্যের ত এই সুন্দর অবস্থা। দেশ যতদিন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিসঙ্কুল থাকিবে ও দেশবাসী যতদিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া 'অবসাদ-হিমে' ডুবিয়া মরিবে, ততদিন সকল প্রকার উন্নতিই আমাদের সুদূর পরাহত। জাতি গঠন করিতে হইলে, প্রথমে জাতির স্বাস্থ্যের প্রতি, পরে দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

একমাত্র শারিরীক স্বাস্থ্যের উন্নতিই আমাদের লক্ষ্যস্থল নহে, পরন্তু মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আগে প্রয়োজন শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি। শরীর সুস্থ না থাকিলে মন সুস্থ থাকে না। রুগ্ন ব্যক্তির জগতে সুখ কোথায়? মনুষ্য জীবনের সকল প্রচেষ্টাই সুখের জন্য সাধিত হয়;—একথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সকল সুখের উদয় ও অনুভূতি—মনে; কিন্তু সকল সুখের প্রচেষ্টা ও সাধন—দেহে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে। যে প্রকারের সুখই হউক না কেন, সুখ অর্জ্জন করিবার ও সুখ উপভোগ করিবার একটা শক্তি থাকা চাই, এবং ঐ শক্তি স্ফুরিত হওয়া চাই দেহ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া। মনে করুন, আপনি একটা কমলা লেবু খাইয়া সুখানুভব করিতে চান্। কিন্তু হয়ত আপনার দক্ষিণ হস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা আপনার জিহ্বায় ও মুখে ঘা; উপরন্তু পেটের অবস্থায়ও শোচনীয়। যদি বা কোন কোন প্রকারে কমলালেবুর রসগুলি গলাধঃকরণ করিলেন, কিন্তু পাকাশয়ে পঁহুছিতে না পৌছিতেই,

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

তাহা বমন হইয়া নিঃসৃত হইয়া আসিল। তাহা হইলে দেখুন, আপনার উপরিউক্ত প্রকার সুখ অর্জ্জন করিবার ও উপভোগ করিবার শক্তি নাই, কারণ আপনার দেহ-যন্ত্রের বৈকল্য বিদ্যমান, অর্থাৎ আপনি অসুস্থ। মন যতক্ষণ দেহাশ্রয়ী, সে ততক্ষণ দেহের শাসন, স্বাধীনতা বা সম্বন্ধকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেনা। তাহার সহস্র শক্তি থাকিলেও সে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে অক্ষম, দেহের শক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাকে থাকিতেই হয়। এখন বোধ হয় আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি, সকল সুখের মূলে স্বাস্থ্য বিরাজমান্; সুতরাং শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জ্জন করাই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য।

এখন ইহা লাভ করিতে হইলে কি উপায় বা পন্থানুসরণ করা কর্ত্তব্য? অবশ্য এক কথায় ইহার একটি সুপরিস্ফুট সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া না গেলেও, এইটুকু মাত্র আভাষ দেওয়া যাইতে পারে যে,—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এখন স্বাস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা, অর্থাৎ 'ধর্ম্ম'-অর্থে-আমরা যে জিনিষকে সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করি, সেইটিকে স্থানচ্যুত করিয়া দিয়া, সেইস্থলে "স্বাস্থ্য" জিনিষটিকে অভিষিক্ত করা! হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে—"তাহা হইলে কি স্বাস্থ্যের জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রসাতলে পাঠাইতে হইবে?" আমরা তাহা বলিতেছি না। কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে আমরা এখন আমাদের সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রত্যেক অনুশাসনটি অবিকৃত রাখিয়াছি ও যথাযথ পালন করিতেছি কি না! চতুর্দ্দিক হইতে সিদ্ধান্ত হইবে—"নিশ্চয়ই নাই" কেন?—কারণ সেগুলি পালন করিবার আমাদের শক্তি নাই! কথাটা ঠিক গুছাইয়া বলা হইল না; এইরূপ বলা উচিত যে—আমরা এতদিন সেগুলি ঠিকমত পালন করিয়া চলি নাই বলিয়াই আজ আমরা শক্তিহীন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের শাস্ত্রের অধিকাংশ অনুশাসনগুলির মধ্যেই স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করার সঙ্কেত রহিয়াছে, ও সদাচার পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা পালন করি নাই ও করি না। তার উপর আর একটা কথা,—শাস্ত্রে অবিমিশ্র পারলৌকিক সুখের জন্য সে সকল দর্শন, যুক্তিবাদ ও আচার অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ আছে, তাহাই ক্রমশঃ পরবর্ত্তি লেখকগণের দ্বারা পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং নানাভাবে অনুবাদিত ও নানারূপে টিকাব্যাখ্যাকৃত হইয়া অধুনা এমন একটা জগা-খিচুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সংসারী মানুষ বর্ত্তমান সময়ে তাহার সকলগুলি পালন করা অসম্ভব দেখিতে পাইতেছে, অথচ চিরসংস্কারানুযায়ী পরলোকের সুখের আশাকে পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছে না। এইরূপভাবে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া যেমন একদিকে আমাদের সমাজ-বন্ধনকে উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে তেমনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া ভক্তিবিশ্বাসহীন শুষ্ক অন্তঃসারশূন্য আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে। তাই কেহ গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ ক্ষয় করিতেছে, কেহ তীর্থ দর্শন করিয়া পাপক্ষয় করিতেছে, কেহ বা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বর্গে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। কিন্তু পারলৌকিক মুক্তি লাভ করিবার জন্য কতটা আত্মত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধি—কতটা ক্লেশ স্বীকার—কতটা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন, তাহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। এইজন্য পরলোকের নিমিত্ত লোকে যত ব্যগ্র হউক বা না হউক, ধর্ম্মের নামে সমাজে পাপের প্রভাব প্রত্যহ অপ্রতিহত ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কেন না, লোকে জানে, অমুক পাপ করিয়া যখন অমুক দান করিলে তাহা খণ্ডন হইয়া যায়, তখন আর পাপ করিতে বাধা কি তাহা প্রক্ষালনেরই বা ভাবনা কি? এক্ষেত্রে সকলেই "গরু মারিয়া জুতা দান" মন্ত্র জপ করিতেছে। এই ভাবে আমাদিগের প্রাচীন

'স্বাস্থ্য-ধর্ম্মের' প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা ও নিরর্থক বাহ্যানুষ্ঠান।

প্রায়শ্চিত্তবিধির উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালের পণ্ডিতগণের হাতে পড়িয়া বিকৃতউদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব কালে কেহ কোন অপরাধ করিলে, রাজা তাহার যথাযোগ্য শাস্তি দিতেন। এখানে অপরাধ কথাটার সামান্য একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। সকল দেশের শাস্ত্র আলোচনা করিলেই অপরাধ কায়িক, মানসিক ও বাচসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত ও এই তিনটি আচার একযোগে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়;—

(১) তথাকথিত ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অপরাধ হয়—যাহাকে আমরা পাপ বলিয়া জানি। ইহাকেও আবার দুই শ্রেণীতে পুনর্বিভক্ত করা চলে।—যথা—(ক) পরলোক সম্বন্ধীয় পাপ, যাহাকে ইংরাজীতে sin বলিলে আমরা বুঝিতে পারি, (খ) ইহলোক সম্বন্ধীয় পাপ—যাহা নিজের সাংসারিক, আর্থিক, দৈহিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হয় এবং যাহাকে কদভ্যাস বা ব্যাভিচার বলিয়া অভিহিত করা যায়—ও যাহাকে ইংরাজীতে আমরা vice বলিয়া জানি। তারপর (২) যাহাতে দশ বা সমাজের ক্ষতি হয় ও যাহা রাজার আইন লঙ্ঘন করে—যাহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে সাধারণতঃ আমরা অপরাধ বলিয়া জানি। প্রাচীনকালে রাজা উপরিউক্ত দুই প্রকার শাস্তিরই দণ্ড-বিধাতা ছিলেন। কিন্তু রাজা যখন বিধর্ম্মী হইলেন ও প্রজার তথাকথিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, তখন প্রথম সংখ্যক অপরাধের শাস্তির ভার পড়িল সমাজ-কর্ত্তাদের হাতে, এবং কেবলমাত্র দ্বিতীয় সংখ্যক শাস্তির বিধান রাজা নিজের হাতে রাখিলেন। তখনই ব্যক্তিগতভাবে প্রায়শ্চিত্ত বিধির সৃষ্টি হইল। প্রায়শ্চিত্ত বিধি আর কিছুই নয়, কেবলমাত্র সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে পাপ স্বীকার, আন্তরিক অনুতাপ ও ভবিষ্যতে তাহার পুনরনুষ্ঠান না করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই ভবিষ্য পুরাণকার বলিলেন:—

অনুনঃকরণাৎ ত্যাগাৎ খ্যাপানাদনুচিন্তনাৎ।
ব্যপেতি মহদপ্যেনঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ণ কেবলম্॥

তারপর যখন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল ও জাতিভেদ "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" না হইয়া জন্মগত হইতে লাগিল, এবং প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল, যখন সমাজ দেখিলেন যে, sin বা vice কিছুরই উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকিতেছে না, তখন ব্যক্তি সাধারণকে ভুলাইবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অসংখ্য প্রকার চাকচিক্যময় চিত্ত-রঞ্জক বাহ্যানুষ্ঠানের সহজ বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করার প্রয়োজন অনুভব করিলেন; প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত মহদুদ্দেশ্য বাহ্যাচারের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। তখন ব্যবস্থা দেওয়া হইল যে, অমুক পাপ করিলে তাহাতে ধেনুদান করিতে হইবে, তাহাতেও অশক্ত হইলে কয়েকটি ব্রাহ্মণ ভোজন, তদভাবে অন্ততঃ তিন কড়া কড়ি দান, ইত্যাদি! এইরূপভাবে হিন্দু-শাস্ত্রের অনেক বিষয়ই বিকৃতার্থ, প্রক্ষিপ্ত, ও অভিপ্রায়দুষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রবন্ধের সূত্রপাতেই বলিয়াছি যে, আনন্দকে উপলব্ধি করা বা সুখকে উপভোগ করাই ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং তাহারই সন্ধান যে পুস্তক বলিয়া দেয় তাহাই ধর্ম্ম-শাস্ত্র। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, আনন্দ কথাটিকে শুধু পারলৌকিক অর্থেই আমরা ব্যবহার করিতেছি। যাহা হউক, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এমন অনেক পাপ কার্য্য আছে, যাহাতে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, তবে সেগুলি কি ধর্ম্ম-সঙ্গত? যখনই আমাদের মনে এই প্রশ্নটির উদয় হয়, তখনই আমাদের 'সৎ' ও 'চিৎ' এই দুটি শব্দের অবতারণা করিতে হয়: অর্থাৎ যে কার্য্য 'চিৎ' বা জ্ঞানের অনুপ্রেরণায় সাধিত হইবে, যাহাতে 'আনন্দ' আছে এবং এবং যে কার্য্যের ফল (আনন্দ) 'সৎ' বা বহুকাল অথবা চিরকাল স্থায়ী হইবে, সেই কার্য্যই ধর্ম্মসম্মত। এইরূপ কার্য্যই ভগবানের অভিলষিত, অনুমোদিত ও তাঁহার নিজ

শারীর পালন শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কেন?

অনুষ্ঠিত। সেইজন্যই শাস্ত্রকার তাঁহাকে 'সচ্চিদানন্দরূপং ব্রহ্ম' বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এখন মায়াবাদীগণ হয়ত বলিবেন—"তাহা হইলে ত শরীর পালন একটা ধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্য হইতে পারে না, কেন না 'ক্ষণ-বিধ্বংশিনী কায়া'—শরীর ত একটা মায়াবরণ—একটা একটা খোসা মাত্র, উহা ত আদৌ সৎ পদবাচ্য নহে, তাহা ছাড়া উহাতে 'চিৎ' শক্তি কোথায়?" তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, শরীর-পালন ধর্ম্ম হইতে আমরা ত অধ্যাত্ম মনকে বাদ দিতেছি না, কারণ মনও ত এক প্রকার শরীর বিশেষ এবং পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি যে মানসিক স্বাস্থ্যও জীবন-ধারণের সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ। তারপর তাঁহারা শরীরকে একটি অসার খোসা বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন; কিন্তু অন্যদিকে বৈদান্তিক কর্ণধারগণ একমাত্র এই দৃশ্যমান্ শরীরকেই 'খোসা' বা 'কোষ' বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না, তাঁহারা দেহাশ্রিত আত্মাকে—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ, এই পাঁচটি খোসা দ্বারা আবৃত কল্পনা করেন। কিন্তু এগুলি কি সত্যই একেবারে অসার ও অসত্য? তাহা হইলেত পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি সকলই মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন হইয়া যায়; কারণ, এগুলি ত উক্ত কোষ সমূহের আধেয় ব্যতীত ত আর-কিছু নয়! কিন্তু যদি তাহাই মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা'—এ জ্ঞান লাভ করেন কোথা হইতে, কি ভাবে, কাহাদের সাহায্যে? ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ-কোষগুলির সাহায্যে নয় কি? বহিঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ ইন্দ্রিয় ব্যতীত সম্ভবপর কি?

এই যে, করুণ ময়ী জননী তাঁহার শিশু সন্তানকে ভাল বাসেন; কিন্তু তিনি কি কেবলমাত্র শিশুটিকেই ভাল বাসিয়া পরিতৃপ্তা হন? তিনি ভাল বাসেন, শিশুর জমা-কাপড়-টুপীটিকে ভাল বাসেন, শিশুর ঘরটিকে তাহার দোল্না-খেল্না-বিছানা এবং এমন কি প্রতি নিয়ত যে তাঁহার খোকার সংস্পর্শে আসে—তাহাকেও তিনি ভালবাসেন, শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন—যত্ন করেন। যদিও তিনি মনে জানেন,—গৃহ-পরিবর্ত্তন করিলে খোকা সে ঘরখানি আর ব্যবহার করিবে না, জামা-কাপড়-টুপী হয়ত দু'দিন পরে ছিঁড়িয়া যাইবে, দোল্না-খেল্না-বিছানা একদিন-না-একদিন পুরাতন ও পরিত্যক্ত হইবে, আজ যে খোকাকে ভালবাসে—আদর করে, কাল হয়ত সে দূরান্তরে গিয়া খোকাকে ভুলিয়া যাইবে, তবু কি তিনি তাহাদের যত্ন করিতে ভুল করেন? তাঁহার হৃদয় যেমন খোকাকে ঘেরিয়া আছে, তেমনি এই সকল তথা-কথিত অসার জিনিষ বা ব্যক্তি যে খোকার হৃদয়কে ঘেরিয়া বাঁচে? সুতরাং ইহাদের কি উপেক্ষা করা যায়?

আমাদের মতে, উপরিউক্ত খোসাগুলি মানবাত্মা-দুধের সর বিশেষ। যেমন কড়ায় দুধ জাল দিতে দিতে প্রথমেই এক পর্দ্দা বেশ পুরু সর পড়ে তাহাকেই ধরুন অন্নময় কোষ—আমাদের এই স্থূল শরীর; তার পর সে সরখানি উঠাইয়া লইলে তাহার নীচে আর একখানি পাত্‌লা সর পড়ে, মনে করুন—সেটি প্রাণময় কোষ; তারপর সেখানি উঠাইয়া লইলে অপেক্ষাকৃত পাতলা আর একখানি সর পড়িবে, সেখানিকে ধরা গেল মনোময় কোষ। এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সর পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়া গেল—যখন দুধে আর সর পড়ে না; তখন তরল দুধের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া পড়িল—তখনই জীব উপাধিশূন্য হইয়া তথা-কথিত বন্ধন-মুক্ত হইল। দুধের সরকে কে অযত্ন করিতে চায়? স্বীকার করিলাম, দুধ হইতে তাহার উৎপত্তি, দুধেতেই তাহার স্থিতি, কিন্তু তাই বলিয়া সে কি আমাদের ঘৃণার জিনিষ? যতক্ষণ দুধের উপর সরটুকু ভাসে, ততক্ষণ দুধ অপেক্ষা সরটুকু আমাদের প্রিয়তর নয় কি? আবার প্রথম সরখানি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদরনীয় নয় কি?

সপক্ষে দৃষ্টান্ত ও যুক্তি

ব্যাপারটি আর একটু দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করি। এই যে গীতাকার বলিয়াছেন—

জর্ণানি বস্ত্রাণি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

শ্লোকটির ভাবার্থ হইতেছে যে, এই মানুষের দেহ একখানি কাপড় ব্যতীত আর কিছুই নয়। দেহী যখন জীর্ণ বস্ত্র ছাড়িয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তখনই লোক তাহাকে 'মৃত্যু' কহে। এখন সোজা কথায় জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষের দেহরূপ কাপড়খানি যাহাতে পুরাতন না হয়, সে চেষ্টা কি প্রত্যেক দেহীরই কর্ত্তব্য নয়? মানুষ একখানি কাপড় পরিলে, তাহাকে নিয়মিত কাচে, রজকগৃহে পাঠায়, ধোলাই ও ইস্ত্রী করায়, একটু ছিঁড়িলে অমনি সযত্নে সেলাই করে এবং যাহাতে না ছিঁড়ে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। দেহরূপ কাপড়খানির বেলায় সে নিয়ম খাটিবে না কি?—নিশ্চয়ই। এতক্ষণে বোধ হয়, বোঝা গেল শরীর আমাদের নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী নহে এবং ইহা হইতেই সকল আনন্দের উৎপত্তি; অতএব শরীর পালনই আমাদের প্রথম কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম হওয়া বিধেয়।

তারপর আর এককথা;—পুরাযুগে ভারতের অভাবের সংখ্যা যেরূপ পরিমিত ছিল, সেইরূপ তাহার ভাণ্ডারে অভাবের অতিরিক্ত উপকরণ সঞ্চিত থাকিত। সুতরাং ভারতবাসীদের কখনও খাদ্য-বাসের জন্য চিন্তা বা পরিশ্রম করিতে হয় নাই অথবা পরের প্রত্যাশায় উদগ্রীব কাতরতায় বসিয়া থাকিতে হয় নাই; তখন সাগর-মেখলা ভারত সত্য সত্যই "ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা···সকল দেশের সেরা" ছিল। সেইজন্যই তাহার সন্তানগণ পারলৌকিক গবেষণায় এতদূর একাগ্রভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা চতুর্ব্বেদ, একশত অষ্টাদশ উপনিষৎ, ষড়দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, আগমনিগমতন্ত্রাদি রচনা করিয়া জগতে এক অবিনশ্বর অলৌকিক কীর্ত্তি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু পরলোককে পাথেয় দিতে গিয়া তাঁহারা ইহলোককে অবহেলা করিতে পারেন নাই; সদাচার বা শারীর-পালনকে ধর্ম্ম সাধন বা পারলৌকিক মুক্তি লাভের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্ব প্রথম করণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, শরীরকে অটুট অক্ষয় রাখিবার ও জরা-ব্যাধিকে প্রতিহত করিবার জন্য ধন্বন্তরী, চরক, সুশ্রুত, হারীত, বাগভট্, মাধব প্রভৃতি ঋষিগণ লক্ষ পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; জনসাধারণের জন্য গৃহস্থাশ্রমকে পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা-সমাধির বাহিরে বাস্তবের ভূমিতে আনিয়া তাঁহারা একটি সুযোগ্য আসন দান করিয়াছিলেন; সেইজন্য ব্যাস সংহিতায় বলিয়া গিয়াছেন—

নাস্তি গৃহাশ্রমো ধর্ম্মাৎ নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্ব তীর্থং ফলং তস্য যথোক্তং বস্তুপালয়েৎ।

[গৃহাশ্রম ধর্ম্ম ব্যতীত ইহলোকে বড় কিছু নাই—(যদি কেহ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতে হয়); যে শাস্ত্রমত বস্তু পালন করে, তাহার সকল তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়।]

এখন এই বস্তু পালনের সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের চারিধার পূর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়তরভাবে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে; আজ আমাদিগের বাঁচিবার সমস্যাটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখন এই অতি বড় সমস্যাটাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদিগের জীবনের সকল গ্রহ উপগ্রহকে পরিচালিত করিয়া এক একটি সৌর জগতের সৃষ্টি করিতে হইবে। লোকে কথায় বলে—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম!" কথাটি খাঁটি সত্য। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি-কাহিনী বজায় রাখিতে গেলে

প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিক উন্নতির হেতু

এখন আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে

নিজেকে ত বাঁচিতেই হইবে, পরন্তু নিজের জাতির—নিজের বংশধরের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে গেলেও নিজের বাঁচিবার উপায় করা চাই। নচেৎ আমাদের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত—সমস্তই অতল তলে ডুবিয়া যাইবে।

মরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া আমাদিগকে বাঁচিবার সিদ্ধ মন্ত্রটিকে—অমৃত-লক্ষ্মীকে জয়লাভ করিয়া লইতে হইবে। এখন কেবল পরলোকে সুখের আশায় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া—শেষ সম্বলটুকু ব্যয় করিয়া তীর্থে তীর্থে 'ঠাকুর দেখিয়া,' লম্বোদর পাণ্ডা-পুরোহিতের পেট ভরাইলে চলিবে না, বিপ্র-দেবতার পায়ে চতুর্ব্বর্গ-ফল-লাভের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া শুষ্ক প্রণামে আর কাজ হইবে না, এপারের সুখ-আশা ওপারে সঞ্চিত রাখিয়া খেয়াঘাটে নিশ্চেষ্ট নির্ভরতায় বসিয়া চক্ষের জল ফেলিলে চলিবে না।

এখন শুদ্ধমাত্র বাঁচার উপায় দেখিতে হইবে। কিন্তু **বাঁচার মত বাঁচিতে** হইবে। অনেকে যে বাঁচিয়া মরিয়া থাকে; সে বাঁচার প্রয়োজন কি? হয় ভাল করিয়া বাঁচন, নহেত একেবারে রসাতলে নিমজ্জন। "অসার খলু সংসার" "জীবন ত কেবল মরণের জন্য আয়োজন"—উদাসীন ভাবুকের এসকল দার্শনিক বাণী আর মানিয়া লইবার সময় নাই; এখন বুঝিতে হইবে—"জীবন ত মরণকে প্রতিহত করিবার প্রাণপণ প্রয়াস!" এখন কেবল আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সরস শোভন নদী-গিরি-বনের সকল স্নেহ-মায়াটুকু নিংড়াইয়া বাহির করিতে হইবে, অমৃতময়ের অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, দৃষ্ট, অদৃষ্ট, ভিতর, বাহিরের সকল শত্রুকে পদানত করিয়া আমাদের শরীরের পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে হইবে ও তাহাকে সর্ব্ব কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে।

দেহ বৈদান্তিকের পিঞ্জর হইতে পারে বটে। কিন্তু সেই পিঞ্জরের মধ্যে যে বৈষ্ণবকবির প্রাণ-পাখীর বাসা! পিঞ্জর জীর্ণ থাকিলে—পিঞ্জর ভগ্ন হইলে তখন প্রাণ-পাখী থাকিবে কোথায়?—কে মধুর "রাধা কৃষ্ণ" নাম পড়িবে? তখন ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ—জ্ঞানযোগ যে 'মরণের বিয়োগের মধ্যে পড়িয়া মহা শূন্যে পরিণত হইবে। তখন সাধনা করিবে কাহাকে লইয়া—পরলোকের পাথেয় সঞ্চয় করিবে কাহাকে খাটাইয়া—দেহ ও প্রাণের যোগ ব্যতীত তোমার ইহলোক ও পরলোক কোথায়? "পঞ্চভূতের ফাঁদে" ব্রহ্ম পড়িয়া কেবল কাঁদিলে ত চলিবে না। তিনি যখন সর্ব্বভূতে সুখ-দুঃখের একমাত্র নিয়ন্তা, তখন তাহাকে হাঁসিতেই হইবে। তিনি যদি কাঁদিবেনই, তাহা হইলে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন কেন? এ তাঁহার কিরূপ লীলা? লীলা ত আনন্দানুভূতির জন্য! লীলার জন্যই যদি তিনি পঞ্চভূতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পঞ্চভূতের মধ্যেই তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ রূপ প্রকটিত করিতে হইবে। পিঞ্জরকে নিরর্গল রাখিয়া—ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া, পাখীকে পড়াইবে—পোষ মানাইবে—মনের মত গড়িবে কেমন করিয়া? এই পিঞ্জরকে অটুট রাখিবার কৌশল আজ আমাদের সকলের পূর্ব্বে ভাল করিয়া শিখিতে হইবে। এখন কেবল মাত্র চাই—বাঁচিবার ও বাঁচাইবার সমস্যা-নিরসনের ঐকান্তিক তপস্যা! চাই—ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে প্রাণের চাষ—শক্তির সাধনা—দেহের সংরক্ষণ। এক কথায় এখন ভারতবাসীর প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক শ্রেণী, প্রত্যেক উচ্চ নীচ ব্যক্তিকেই স্বাস্থ্য-রক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চ্চাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ স্বাস্থ্য-ধর্ম্মই আমাদের জাতির একমাত্র মূল মন্ত্র হওয়া চাই! নান্যপন্থাহয়নায়ঃ।

যখন বুঝি যে আমাদের দেশে জন্মের হার হাজারে ২৮.৫ এবং মৃত্যুর হার ৩০.১, (বিলাতে ১২.১, আমেরিকায় ১১.৮), যখন বুঝি আমাদের জাতি ৩০০ হইতে ৫০০ বৎসরের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যখন বুঝি আমাদের অর্দ্ধেক শিশু ৮ বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যখন বুঝি আমাদের নারীমৃত্যুর হার দিন দিন নর-মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, যখন বুঝি শারীরিক

শক্তিতে জগতের সমস্ত জাতি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, মানসিক শক্তিতেও আজ আমরা প্রতীচ্যের নিকট মাথা নীচু করিয়া একান্ত সঙ্কোচে দাঁড়াইয়া আছি,—তখন স্বাস্থ্যকে অবহেলার সামগ্রী বলিয়া উপেক্ষা করিতে আদৌ ইচ্ছা করে কি? তখন ইচ্ছা করে না কি, আমাদের সমস্ত জাড্য—সমস্ত নিষ্প্রাণতা—সমস্ত অবসাদ ধুইয়া মুছিয়া, মানুষের ভঙ্গীমায় বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, রোগ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় প্রতিরোধ করিতে? তখন মনে হয় না কি ধর্ম্মের এই মিথ্যা বহ্বাড়ম্বর বাহ্যিক আচারানুষ্ঠানরূপ খোলস পরিত্যাগ করিয়া, স্বাস্থ্যকে সর্ব্বধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান আসন প্রদান করিয়া, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি আহরণ করিয়া আনিয়া জগতকে দেখাই,—শক্তিময়ীর অংশোদ্ভূত আমরা, কোন শক্ত বাঁধনই আমাদের শক্তিকে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম নহে, শক্তির সাধনায়, শক্তির উন্মেষে, শক্তির অভিব্যঞ্জনায় আমরা কোন জাতির পশ্চাতে নহি; আর সেই সঙ্গে জগৎপাতাকে দেখাই—তাঁহার ভূর্লোক সৃজনের সার্থকতা কতখানি, বস্তু-পালন ও ইহলৌকিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে মানবের মুক্তির পথ আছে কি না?

স্বাস্থ্যের স্বরূপ কি? স্বাস্থ্য কিরূপে লাভ করা যায়? এ দুটী প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়—

স্বাস্থ্যের স্বরূপ

যাহা মুখ্যতঃ দেহের ও গৌণতঃ মনের সুস্থতা বা স্বাভাবিক ভাব আনয়ন করে—তাহাই স্বাস্থ্য।

স্বস্থবৃত্তং যথোদ্দিষ্টং যঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি।
সঃ সমাঃ শতমব্যাধি রায়ুষা ন বিযুজ্যতে।

অর্থাৎ যিনি আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধি সম্যকরূপে অনুষ্ঠান্ করেন, তিনিই নীরোগী হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকেন। যেরূপ আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মনের সমতা হয় এবং ইন্দ্রিয় মন সুপ্রসন্ন থাকে, সেইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিলে প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। তার উপর—

দিনচর্য্যাং নিশাচর্য্যাং ঋতুচর্য্যাং যথোদিতাম্।
আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নান্যথা।

মানুষ যদ্যপি শাস্ত্রমত নিয়মনিষ্ঠার সহিত দিবসের করণীয় ও রাত্রের করণীয়গুলি এবং ঋতু অনুযায়ী শরীর পালন করে, তাহা হইলে সুস্থ থাকিতে পারে।

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে স্বাস্থ্যই আমাদের ধর্ম্ম; ইহাকে অটুট্ ও অনবদ্য রাখিলে, আমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আমাদের সর্ব্বতোভাবে অভ্যুদয় হইবে; স্বাস্থ্যকে ধরিয়া থাকিলে, স্বাস্থ্য আমাদিগকে ধরিয়া থাকিবে। শাস্ত্রোক্ত স্বাস্থ্যবিধিগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আনিয়া তাহার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, যুক্তি, অনুসন্ধান ও তর্কের আগুনে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া,—যথা সম্ভব সেগুলিকে পালন করিয়া চলিতে পারিলেই আমরা আবার ব্যক্তিগতভাবে জাতিগত ভাবে স্থিতিশীল হইতে পারিব।

বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রকার-কথিত বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-উপদিষ্ট শারীর-পালন বা স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধানগুলির অধিকাংশ আমরা প্রতিপালন করিতে অক্ষম;

স্বাস্থ্য বিধির গুণ বিচার

তাহার প্রধান কারণ—আমাদিগের কদভ্যাস, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য; এ সম্বন্ধে এখনই একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি। অবশ্য স্বাস্থ্যধর্ম্মার্থক বিধানগুলির কতকগুলি বর্ত্তমান কালে স্বচ্ছন্দে পরিবর্জ্জন করা চলে কারণ তাহার মধ্যে দুই চারিটির মূল তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান এ নও পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে পারে নাই। তদ্ব্যতীত ঐ সকল বিধানগুলি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থাৎ পালন না করিলে আমাদের সুস্থ থাকিবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত হয় না; আবার কোনটি কদভ্যাস বা দারিদ্র্য জন্য আমরা অনুসরণ করিতে পারি না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথা টি একটু পরিস্ফুট হইবে;—(ক) "ভাব প্রকাশ" বলিতেছেন, "দধ্যাজ্যাদর্শ সিদ্ধার্থ বিল্ব গোরোচনাস্রজাম্"—ইত্যাদি, অর্থাৎ গাত্রোত্থানের পর দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেত সর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও পুষ্পমাল্য দর্শন ও স্পর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং ঘৃতে স্বীয় মুখচ্ছবি পরিদর্শন করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। (খ) স্নানের পর সুশ্রুত প্রভৃতি পুষ্পমাল্য, রত্নাদি ধারণ করিতে ও চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী প্রভৃতি বক্ষাদিতে লেপন করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। শাস্ত্রে আবার এমন কোন কোন বিধান আছে, তাহা আমাদিগের শরীর রক্ষণের পক্ষে উপকারী বটে; কিন্তু তাহা আমাদিগের অধিকাংশের পালন করা বর্ত্তমান যুগে, একপ্রকার অসম্ভব। যথা,—সুশ্রুত বলিতেছেন—

ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমং গতঃ।
ততঃ পদশতং গত্বা বাম পার্শ্বে তু সংবিশেৎ।

অর্থাৎ আহার করিয়া ভুক্ত বস্তু ক্লেদভাবাপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত রাজার ন্যায় (জোড়াসনে) কিয়ৎকাল উপবেশন; তদনন্তর একশত পদ ভ্রমণ পূর্ব্বক বামপার্শ্বে (অল্পক্ষণ) শয়ন করিবে। কিন্তু সহরবাসী অফিসারদিগের পক্ষে কি এখন এই নিয়ম প্রতিপালন করা সম্ভবপর? কোথায় নয়টার সময় মুখে অন্ন গুঁজিয়া চাদর কাঁধে ছাতা বগলে আফিসের দিকে দৌড়াইবে, না সুশ্রুতের এই সার উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিবে? ইংরাজ আয়ুর্বিদ্গণও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে উপদেশ দেন। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া ও ভোজনের পর অন্ততঃ আধঘণ্টা বিশ্রাম না করিয়া আফিস অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটার পরিনামেই যে চাকুরে বাবুগণ অজীর্ণ, অম্লশূল, উদরাময়, অকাল বার্দ্ধক্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে ভুগিয়া থাকেন, সে কথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক্ষেত্রে নিরোগ থাকিতে হইলে নয়টার স্থানে বরং সাড়ে আটটায় ভাত খাইতে বসিয়া খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ ও আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সময়মত আফিসে যাওয়া উচিত।

হিন্দুদিগের আয়ুর্বিজ্ঞানশাস্ত্রে দুই প্রকার বিধি আছে। যথা—সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণগুলি আপামর সাধারণ সকলকেই সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে পালন করিতে হইবে এবং বিশেষ বিধিগুলি ব্যক্তি বিশেষে ও ক্ষেত্র বিশেষে পালন করা চলিতে পারে এবং সেগুলি পালন না করিলেও আমাদের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ কোন আশঙ্কা নাই। এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য, এই সাধরণ বিধিগুলি আমাদিগের দৈনিক জীবনে যথাসাধ্য পালন করা এবং বিশেষগুলি পালনে সচেষ্ট হওয়া। প্রতীচ্য বিজ্ঞানও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রও অনেক অবশ্য পালনীয় নূতন বিধি-ব্যবস্থা স্বদেশে প্রচলিত করিয়াছেন, এবং এদেশেও ঐ সকল প্রচলনের যৎসামান্য চেষ্টা চলিতেছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অধিকাংশ বিধি-নিষেধ-তথ্যাদি তাঁহারা প্রথমে অসার অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও প্রকৃতই স্বাস্থ্য রক্ষণোপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। যাহা হউক, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় বহুবিধ নিত্য নূতন জ্ঞান আমরা পাশ্চাত্যের নিকট হইতে পাইতে পারি। অবশ্য তাঁহাদিগের দেশে এমন অনেক সমাজ-প্রচলিত আচার ব্যবহার আছে, যাহা তাঁহাদিগের দেশে বা সমাজেই শোভা পায় ও উপকার সাধন করে; কিন্তু আমাদের দেশে অনুকৃত হইলে তাহা বিষময় ফল প্রসব করে। সুতরাং সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আচার-ব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণ না করিয়া, যে সকল প্রত্যক্ষ স্বাস্থ্যোন্নতিকর সাধারণ বিধি আছে, তাহাই ন্যায্যমত অনুসৃত হওয়া উচিত। পরন্তু স্বাস্থ্যোন্নতিবিষয়ক এমন কতকগুলি বিশেষ প্রথা সেখানে থাকিতে পারে ও আছে, যাহা আমাদিগের অনুসরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কিম্বা যাহাতে উপকার না হইয়া বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা। যেমন সকল ঋতুতে, টুপী, কোট, গলবন্ধ বা মোজা পরিধান করার নিয়ম এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অনুকৃত হইলে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টেরই অধিক সম্ভাবনা। বিদেশীয় ও অস্মৎ দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত কোন্ কোন্ বিধি-ব্যবস্থা বর্ত্তমান্ যুগে পালন করিলে, আমরা স্বাস্থ্যবান্ হইতে ও সুস্থ থাকিতে পারি,

এবং রোগাক্রমণ হইতে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে পারি—সে বিষয় দেশের সকল শ্রেণীর চিকিৎসকগণের একমত হইয়া স্থির করা ও স্ব স্ব চিকিৎসাধীন রোগীগণকে বা এলাকাধীন জনসাধারণকে তত্তৎ বিষয় প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়ার জন্য সর্ব্বদা আদেশ, উপদেশ বা উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক ও চিকিৎসিতের কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসা নহে; ইহা প্রকৃতই **মানব জাতির প্রতি সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান।** "ভাবপ্রকাশ" বলিতেছেন—"নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসা পুণ্য-বিক্রয়ম্।" (চিকিৎসক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ-গ্রহণপূর্ব্বক চিকিৎসা করার পুণ্যফলটুকু যেন বিক্রয় না করেন)। মহামুনি চরকও বজ্রগম্ভীর স্বরে ভিষককুলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—

নাত্মার্থং নাপি কামার্থমথ ভূতদয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্বমতিবর্ত্ততে॥
কুর্বতে যে তু বৃত্তর্থং চিকিৎসা পণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥

অর্থাৎ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কোন কাম্য বস্তু লাভের জন্য চিকিৎসা করা উচিৎ নহে; যে কেবলমাত্র মানবজাতির হিতার্থে রোগারোগ্য করে, সে সকলকে অতিক্রম করে। যে পণ্যদ্রব্যের মত চিকিৎসা বিক্রয় করে, সে কাঞ্চন অবহেলা করিয়া ভস্মরাশির ভজনা করে মাত্র।

পুরাকালে কখনও কোন বৈদ্যেরই নির্দ্দিষ্ট 'ফি' ছিল না কিম্বা কোন বৈদ্য রোগ নিরাময়ের পূর্ব্বে রোগীর নিকট কোনরূপ প্রতিদান চাহিতে সাহসী হইতেন না; রোগীর সেবার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত থাকিত এবং কড়ি বা সীধায় (cash or kind) যে যাহা ইচ্ছা করিয়া দিত, তাহাই ভগবানের দান ও নিজ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ভাবিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন বিদেশীয় অনুকরণে ডাক্তার-গণ চিকিৎসাকে খাঁটি ব্যবসার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছেন এবং নিজ দর্শনীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; আবার এদেশীয় ডাক্তারদিগের অনুকরণে অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যগণও সেই মহদুদ্দেশ্যমূলক প্রাচীন পদ্ধতি বিস্মৃত হইয়া 'আত্মার্থ' ও 'কামার্থ'-সমুদ্রে ভাসমান হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ে মিলিয়া রোগীর দয়ার উপর নির্ভর না করিয়া রোগী যাহাতে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের দয়ার উপর নির্ভর করে—তাহার জন্য নিয়ত যথাতিরিক্ত কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। অবশ্য উদরের চিন্তা সকলেরই করিতে হয় এবং নিজের বাঁচিবার ভাবনা সকলেরই আছে। এযুগে নিজ পরিশ্রমের বিনিময় সকলই চাহে। কোন অপরাধ করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলে, দেশের রাজা অপরাধীর কারাক্লেশ বা অর্থদণ্ডের বিধান করেন; সেইরূপ প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া যাঁহারা রোগগ্রস্ত হন্, প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগকে রোগ যন্ত্রণা ত দেনই, তদ্ব্যতীত তিক্ত ঔষধের আস্বাদ গ্রহণ, নির্জ্জনতা, উপবাস, ঔষধের মূল্য, ডাক্তারের দর্শনী প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। ভাব প্রকাশ কহিতেছেন:—

সর্ব্বে দ্রব্য মপেক্ষন্তে রোগি প্রভৃতয়ো যতঃ।
বিনার্থবিত্তং ন ভৈষজ্যং চিকিৎসাঙ্গং ততো ধনম্॥

অর্থাৎ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেরই ঔষধের আবশ্যক এবং অর্থ ব্যতিরেকে ঔষধ প্রাপ্তি অসম্ভব! অতএব অর্থকে চিকিৎসার অঙ্গ বলিতে হইবে। কিন্তু চিকিৎসা গুণকে সমূর্ত্ত বলিয়া কল্পনা করিতে গেলে, তাহার মস্তক হইবে—'ভূতদয়া' এবং পদদ্বয় হইবে 'অর্থ'। চিকিৎসা—ব্যবসায় বলিয়া ধরিতে গেলে—অধিকতর পরার্থপ্রণোদক ও ইহাতে অর্থ অপেক্ষা আত্ম-প্রসাদ লাভই শ্রেয়স্কর উদ্দেশ্য। যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সঙ্কল্প করিতে হইবে—"আমি কায়মনোবাক্যে রোগ

জরা প্রশমিত করিয়া মানবের হিতার্থ প্রস্তুত হইতেছি। **মানবজাতির হিত-সাধনই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য,** অর্থোপার্জ্জন আমার গৌণ অভিপ্রায়।" আমেরিকা ও ইয়োরোপের অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় পরিচালন করিতেছেন এবং কি উপায়ে চিকিৎসা দ্বারা মানব জাতির প্রকৃত হিত হয়, তদর্থে নানা সহজসাধ্য পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন। রোগ আসিলে, তাহার যথাসাধ্য চিকিৎসা করিলেই ভিষকের কর্ত্তব্যের সমাধা হয় না; প্রত্যেক রোগী রোগমুক্ত হওয়ার পর, যাহাতে পুনরায় তাহার রোগাক্রমণ না হয়—সে বিষয়ে যত্ন লওয়া, ও সবল ব্যক্তি যাহাতে কোনক্রমে রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হন্ তাহার উপায় চিন্তা ও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা—তাঁহাদিগের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত বহুস্থলে আরোগ্যকর চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিষেধক (preventive) চিকিৎসারই আদর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে এবং যে বৈদ্য তাঁহার মক্কেলগণকে ঔষধ বা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বিধি-উপদেশ দ্বারা যত অধিককাল সুস্থ ও রোগ-মুক্ত রাখিতে পারিবেন, তিনি তত অধিক পারিশ্রমিক যাহাতে প্রাপ্ত হন, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। চিকিৎসকের সেবাধর্ম্ম অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে—ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে তাঁহাদিগের প্রতিষেধক বিধি-ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া। কিছুকাল পূর্ব্বে চিকাগোর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জে, এম্, ডড্‌সন্ "জর্ণল অফ্ দি আমেরিকান্ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন্" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

"It must be emphasized at all times and in all places that **the medical profession is above all a profession of service to mankind.** While in the interest of the physician of his family, his fellow physicians and his patients, it is his right and duty to exact a monetary return for his labours that is commensurate with the long, expensive period of preparation which has been required of him and the high degree of skill thus acquired he makes the most grievous and fatal mistake if he yields to the spirit of commercialism which is abroad seemingly in more intensive degree than ever before and makes money-getting his dominant thought. Imbued with that fine spirit of service, the wise physician of to-day cannot but realise that his largest avenue of usefulness lies in the field of prevention of disease."

ভাবার্থ:—"সকল স্থানে এবং সকল সময়ে জোরের সহিত বলিতে হইবে যে, **চিকিৎসা ব্যবসা সর্ব্বোপরি মানবজাতির প্রতি সেবাধর্ম্মের ব্যবসা।** অবশ্য তাঁহাকে ঐ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ হইতে যতখানি পরিশ্রম, সময় ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহার অনুপাতে ন্যায্যমত কিছু কিছু আর্থিক বিনিময় রোগীদের নিকট গ্রহণ করা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাঁহার নিজের পরিবারের, সহকর্ম্মীগণের ও মক্কেলগণের স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, এরূপ অর্থগ্রহণ যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু অর্থ শোষণের চিন্তাকে মনের মধ্যে প্রধান আসন প্রদান করিয়া, কোন বৈদ্য চিকিৎসাকে যদি রীতিমত ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইবেন। যে সকল সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করেন, তাঁহারা আজকাল রোগ-প্রতিষেধের ক্ষেত্রে কতখানি কার্য্যকারিতা ওতপ্রোত—তাহা উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন না।"

জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারগণের নিকট হইতে যতখানি খাঁটি নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত ব্যবহার আশা করে, ততটা ব্যবহারতঃ তাঁহাদিগের পক্ষে করা সম্ভবপর নহে; অন্যদিকে আজকাল ডাক্তারগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীদিগের সহিত ব্যবহারে যেরূপ 'ধনাগম তৃষ্ণা'র পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাও প্রায়শঃ হয় ত তাঁহাদিগের হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়, নহে ত

দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তাহা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে এই বস্তুতন্ত্রতার যুগে কেবল-মাত্র নিঃস্বার্থ পরোপকার-প্রণোদিত হইয়া কেহ সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিগত হইতে যায় না। প্রত্যেক শিক্ষারই একটা সম্মান আছে—উপকারের একটা প্রতিদান চাই। কিন্তু সে সম্মানের ভার—সে প্রতিদানের গুরুত্ব নিরূপণের ক্ষমতা চিকিৎসকের—অবস্থা বিশেষে রোগীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অপরপক্ষে রোগীরও ভাবিয়া দেখা উচিত—চিকিৎসক তাঁহার উপকারের অনুযায়ী প্রতিদান পাইতেছেন কি না, তিনি যে পরিমাণ অর্থ, সামর্থ্য ও সময় খরচ করেন ও যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তাহার ফল—সাধারণভাবে মানবজাতি ও বিশেষভাবে তাঁহার (ঐ রোগীর) হিতার্থে বিতরণ করিতেছেন, সে ক্লেশের—সে পুণ্যের যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে তিনি কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট কি না?

আমাদিগের আয়ুর্ব্বিজ্ঞান শাস্ত্র যেরূপ বৈদ্যের স্বরূপ লক্ষণাদি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ তুল্য পরিমাণে চিকিৎসিতেরও কর্ত্তব্য বিনির্ণয় করিতে বিস্মৃত হন্ নাই। "ভাব প্রকাশ" কহিতেছেন—

দূতো রোগী চ রিক্ত হস্তো ন পশ্যেৎ। তথাচ।
রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুমিতি॥

[রোগী বা রোগীর অসামর্থ্যের জন্য যিনি ডাকিতে যান্—ইহারা কখনও শূন্যহস্তে বৈদ্যকে দর্শন দিবেন না; কারণ পণ্ডিতেরা—রাজা, বৈদ্য ও গুরুকে কদাচ রিক্তহস্তে দর্শন দিতে নিষেধ করিয়াছেন।] অন্যত্র আরও বলিতেছেন ঃ—

চিকিৎসিতং শরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং সর্ব্বং তদ্ভিষগশ্নুতে॥

[যে দুর্ম্মতি বৈদ্যের চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া বৈদ্যকে পারিতোষিক দান করে না, তাহার সমস্ত সুকৃতি বৈদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।] সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিরকালই আমাদের দেশে বৈদ্যের যেরূপ চিকিৎসিতের প্রতি একটা কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেইরূপ চিকিৎসিতেরও চিকিৎসকের প্রতি একটি পালনীয় ধর্ম্মের সুস্পষ্ট আদেশ বিধিবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানকালে ডাক্তার ও রোগীকে পরস্পর পরস্পরের দূরত্ব বিধায়ক Status Quo ছাড়িয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রাণের নিকটতর করিয়া, একটি সাধারণ মিলনের ভূমিতে আসিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, যাহাতে জন সাধারণ রোগের পূর্ব্বে বা পরে—নীরোগ অবস্থায়ও নিঃশঙ্ক অসঙ্কোচে বন্ধুর মত চিকিৎসকের পার্শ্বে আসিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইতে পারে এবং চিকিৎসকও অর্থলিপ্সার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া "মানবো যেন বিধিনা স্বস্থস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা"—সে বিষয়ে বন্ধুর মত তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া তাহাদের মুখের হাসিটি স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

এইজন্য চিকিৎসকের বর্ত্তমান সময়ে প্রধান কর্ত্তব্য—শারীর তত্ত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে জ্ঞান দান ও চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচ্ছন্ন তথ্যগুলি সহজ সরল করিয়া তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া। পুরাকালে একমাত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যতীত আর কাহাকেও দৈহিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন তথ্য জানিতে দেওয়া হইত না। সেকালে ছাপাখানা বা সংবাদপত্র বলিয়া কোন জিনিষ না থাকাতে মুখোমুখী কথোপকথন ছাড়া জনসাধারণকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করা অসম্ভব ছিল। শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব ও তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধনির্ণায়ক জ্ঞানলাভ মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে ন্যস্ত ছিল। শাস্ত্রীয় বিধিগুলি এক একজন ব্রাহ্মণ এক এক ভাবে বুঝিয়া নিজ নিজ মতে তাহার টীকা-ব্যাখ্যা করিয়া আপন আপন শিষ্যানুচরদিগকে তত্তৎভাবে চলিতে আদেশ করিতেন, এবং চলিলে যে সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের বা লক্ষ গো-দানের ফল হইবে, স্বর্গে বাতি জ্বলিবে বা "পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—পাকে প্রকারে এই কথাই বুঝাইয়া দিতেন, এবং ইতর সাধারণ বিনা সংশয়ে তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া চলিত। প্রাচীন আয়ুর্ব্বিজ্ঞানবিৎগণও প্রত্যেকে এই ভাবে তাঁহাদিগের তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার ফল সাধারণের নিকট

হইতে সংগুপ্ত রাখিতেন; এমন কি কোন্ ভেষজের কিরূপ আরোগ্যকর গুণ, কোন্ ঔষধ কি প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা সাবধানে নিজ বংশাবলীর মধ্যে রক্ষা করিতেন—এক একজনের নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে অন্য সহকর্ম্মী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতেন। তখন সাধারণে শরীর পালনে যত্নবান্ থাকিত—কেবল শাস্ত্র-বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা এবং পরকালের মুক্তির পথ সুপরিষ্কার করিতে। ইহাতে জনসাধারণ প্রকৃত দেহ-তত্ত্ব ও শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিত এবং যুক্তি-তর্ক-বিচার ও স্বাধীন চিন্তা-শক্তিবিহীন হইয়া কেবল পরোক্ষ লইয়াই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিত; তাহাতে অনেক সময় তাহারা কুসংস্কারাপন্ন হইয়া পড়িত এবং জীবনের প্রত্যেক সমস্যার সমাধানের জন্য—মতোপদেশের আশায় তাহাদিগকে শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণের নিকট ছুটিতে হইত। কিন্তু শাস্ত্রই বলিয়া দিয়াছেন ঃ—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

এই যুক্তিহীন বিচার ও অন্ধ বিশ্বাসের দাস ও শাস্ত্র-বাক্যে একান্ত সমর্পিত-প্রাণ হইয়া আমাদের মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন উদরের ভাবনা কাহারও একেবারে ভাবিতে হইত না, কাহারও বা খুব সামান্যই ভাবিতে হইত; ভারতের প্রকৃতি দেবী যেন অন্নপূর্ণার মত স্বহস্তে সন্তানদিগের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন। তখন ত ক্ষুধার জ্বালা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত এরূপ বিরাট বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র কলসীর মধ্য হইতে আচম্বিতে বাহির হয় নাই। যখন বাঁচার সমস্যা ও ইহলৌকিক জীবন-যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল, তখন "হা অন্নের" রব নিনাদের মধ্যে সনাতন শাস্ত্রের বাণী ডুবিয়া গেল। কেন না, লোকের সেই সনাতন অন্ধ বিশ্বাস,—শাস্ত্র ত কেবল পরলোকের মুক্তির কথা কহে, ইহলোকের মুক্তির পথের ত কোন সন্ধানই দেয় না। তার পর যখন বিদেশী সভ্যতার ঢেউ ভারতের সমতল ভূমি প্লাবিত করিয়া সমস্ত একাকার করিয়া দিল, তখন লোকে শাস্ত্রের শাসন—সমাজের কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া, এমন কি কতক পরিমাণে আপন আপন ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া, চাকচিক্যময় অন্তঃসারশূন্য ঢেউয়ের ফেণাগুলি কুড়াইয়া ঘরে তুলিতে লাগিল; ইহকালের চিন্তা গেল—পরকালের চিন্তা গেল;—ভারতের বুকের উপর ব্যাধি, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা—এই তিন রূপসী রাক্ষসী লীলায়িত ভঙ্গিমায় তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিল।

এখন এই তিন রাক্ষসীর মৃত্যুবাণ রহিয়াছে আমাদের দেশের চিকিৎসকের হাতে,—একটা জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহাদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া করুণনেত্রে উদ্গ্রীব আশায় চাহিয়া আছে। কারণ এখন চাই—'জ্ঞানাঞ্জন শলাকা;'—ইহা দ্বারা জনসাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিতে হইবে এবং এই জ্ঞানাঞ্জন শলাকা আজ দেশের চিকিৎসকের হস্তে শোভা পাইলে মানাইবে; দেহের ক্ষতের নিরাময় করিতে যেমন তিনি নিঃসঙ্কোচে দৃঢ় হস্তে অস্ত্রোপচারের শল্য গ্রহণ করেন, তেমনি জাতি ও সমাজের দেহ হইতে অজ্ঞানতা ও অস্বাস্থ্যরূপ ক্ষতের চিকিৎসা করিবার জন্য তাঁহাকে আজ জ্ঞানাঞ্জন শলাকা লইয়া লোকের গৃহের দ্বারে—লোকের প্রাণের দ্বারে, সমূর্ত্ত সেবার মত, ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, শাস্ত্রের প্রায় সকল বিধি-নিষেধই আমাদিগের ইহলৌকিক "অভ্যুদয়ে"র জন্য; তাহাই পালন করিলে আমরা জগতে বাঁচিতে—"আত্মবিস্মৃত জাতি" এ দুর্নাম ঘুচাইতে পারিব, আবার রসাতল হইতে ভূতলে উঠিয়া মানুষের মত মানুষ হইয়া বিশ্বের সভায় বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারিব। তাহাদিগকে বিজ্ঞানের আলোকে বুঝাইতে হইবে, সদাচার পালন ও শারীরচর্য্যা এখন এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালন করিলে আমরা ব্যাধিকে যতদূর সম্ভব দূরীভূত করিতে পারিব, শক্তিমান হইয়া দারিদ্র্যকে দমন করিতে পারিব। ভাষার পশ্চাতে যেরূপ ভাব, কর্ম্মের পশ্চাতে যেরূপ চিন্তা ও

ইচ্ছা, অভিনেতার পশ্চাতে যেরূপ বাক্‌পূর্ত্তিকার (Prompter) বিদ্যমান্, সেইরূপ কি জীব—কি জড় সকলের পশ্চাতে শক্তি প্রচ্ছন্ন। জড়ের চৈতন্যসত্তা (Consciousness) নাই, তাই সে শক্তিকে স্ফূরিত করিতে পারে না; কিন্তু মানুষের অনুভূতি আছে—ইচ্ছা আছে—চেষ্টা আছে, শক্তিকে সে লীলাময়ী, জাগ্রত ও বিকসিত করিতে পারে; এই শক্তির স্ফূরণে সে বিশ্ব-প্রকৃতিকে অনায়াসে নিজের করায়ত্ত করিতে পারে। চিকিৎসকের কঠোরতর ও উচ্চতর কর্ত্তব্য এইখানে,—এই শক্তির সাধনায় ঘুমন্ত দেশের আপামর সাধারণের কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সজাগ করিয়া দেওয়া।

সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, চিকিৎসা মানব সাধারণের প্রতি সেবা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং আরও বলিয়াছি যে, সুস্থ ব্যক্তিকে কি ভাবে সুস্থতর রাখা ও রুগ্ন ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিয়া, কি করিয়া তাহাকে পুনরাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নিরূপণ চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য। কি ভাবে তাঁহারা এ পথে অগ্রসর হইতে পারেন তাহার অতি সংক্ষেপ উত্তর পূর্ব্বপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, সর্ব্ব-সাধারণকে স্বাস্থ্য—ধর্ম্মরূপে গ্রহণ ও সদাচারসমূহ পালন করিতে উপদেশ দেওয়া, এবং যাহাতে ঐ নিয়মগুলি পালিত হয় তাহার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করা। কিন্তু ঐ বিষয়ে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে কিছু বলা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে কেবলমাত্র চিকিৎসক কেন—দেশের উন্নতিকামী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পরিচালন করিতে পারেন; কিন্তু চিকিৎসকের সহযোগিতা ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বাঞ্ছনীয় এবং কতকগুলি নিঃস্বার্থ নীরব কর্ম্মী যুবকের ব্যক্তিগত কায়িক সাহায্য সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। নিঃস্বার্থ নীরব কর্ম্মী আককালকার দিনে পাওয়া দুর্ঘট; কিন্তু তৈয়ারী করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে।

স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম প্রচার কে করিবে

বলা বাহুল্য, প্রথমতঃ পল্লীতেই আমাদিগের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নির্ম্মাণ এবং স্বাস্থ্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য একদল কর্ম্মঠ মহাপ্রাণ যুবক সংগ্রহ ও সংগঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্পর্কে দেশের মধ্যে অসংখ্য সেবা সমিতির উত্থান হইয়াছিল এবং জল বুদ্-বুদের মত তাহার অধিকাংশ একে একে বিলীন হইয়াছে। অপ্রিয় সত্য বলিতে বাধা নাই, তাঁহারা দেশের হিতার্থে যত না কাজ করুন, নিঃসঙ্কোচে সাধারণের চাঁদা দ্বারা ততোধিক নিজেদের উদর পূরণ করিয়াছেন, এবং নেতাদের খামখেয়ালীতে বহুতর অর্থের অপব্যয় করা হইয়াছে; তা'ছাড়া বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন, অভিপ্রায়যুক্ত ব্যক্তিগণের আকস্মিক সম্মিলনে দেশের কাজ যতটা অগ্রসর করা হউক বা না হউক, নিজেদের মধ্যে সর্ব্বদা মতদ্বৈধ ও ঝগড়া-ঝাঁটির অপ্রতুল হয় নাই। অধিকাংশ সেবা-সমিতি, কর্ম্মীসঙ্ঘ (ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও আক্রমণ করিতেছি না) প্রভৃতি সাধারণ লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান্ কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া এক এক স্থলে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপ্রযুক্ত ও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া জলের মত নিরর্থক অর্থ ব্যয় করেন; লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য ভুলিয়া গিয়া কি উপায়ে—অতি সহজে তাঁহারা দেশবাসী সাধারণের নিকট বড় বলিয়া নাম কিনিতে পারিবেন—তাহারই নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠেন। সুতরাং আমরা এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষপাতিত্ব করিতে ইচ্ছুক নহি।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম প্রচার কি ভাবে হইবে

আমাদের মতে, স্থানীয় যুবক দলের দ্বারাই এক, দুই বা ততোধিক পল্লী লইয়া এক একটি সঙ্ঘ বা সমিতি গঠন করিয়া প্রত্যেকের এক একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগণ্ডী নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হইবে। যুবকগণ স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিবে ও লেখা পড়া শিখিবে বা নিজ নিজ জীবন-নির্ব্বাহক কার্য্য করিবে; এবং প্রতিদিন নিয়ম মত কিছু সময় করিয়া স্বাস্থ্যপ্রচার কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবে। প্রথমে নিজ গ্রামেই প্রচার কার্য্য সুরু

করা যাইতে পারে; রবিবারে বা অন্য কোন অবকাশের দিন গ্রামান্তরে গিয়াও কাজ চালান যায়। এই সকল স্বাস্থ্য-সেবকগণ নিজেরা যেন রীতিমত সুস্থ ও সদাচারী হন্ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এরূপ অভিজ্ঞ হন্ যে, গ্রামবাসীগণের স্বাস্থ্যবিষয়ক যে কোন প্রশ্ন বা সমস্যার যেন সন্তোষ-জনক মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু শুধু যুবক লইয়া কাজ করিলে চলিবে না; উহার সহিত গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকা চাই এবং গ্রামের মধ্যে এমন দুই একজন শিক্ষিত বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় থাকা চাই যাঁহারা স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম জিনিসটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন ও তাহার প্রচার জন্য সাধ্যমত কায়মনোবাক্যে কিছু না কিছু সাহায্য করিবেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই সকল স্বাস্থ্য-সেবক-গণকে শিক্ষাদান করিবে কে? ইহার উত্তর,—স্থানীয় শিক্ষিত অভিজ্ঞ এক বা ততোধিক ডাক্তার। এজন্য ডাক্তারগণ একটি স্কুলের মত গঠন করিয়া প্রত্যহ, বা সপ্তাহে এক কিম্বা দুইদিন আপনাদের ও সেবকদিগের সুবিধা মত স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা দিতে ও পুস্তক পাঠ করাইতে পারেন এবং নানারূপ রঙীন Chart, Human Skeleton ও শারীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাবলী অঙ্কিত মাটির মূর্ত্তির সাহায্যে ও ছোট খাট জীবজন্তু যথাশাস্ত্র ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশ একটি সুস্পষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান দিতে পারেন। সেবকগণ পারতপক্ষে কোন রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবে না, তবে ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত কি উপায় গ্রহণ করিলে রোগ বৃদ্ধি না পায়—তাহার উপায় করিতে পারে ও রোগীর গৃহপার্শ্ব, কক্ষ ও শয্যাদি সুপরিষ্কৃত রাখায় কি উপকার—তাহাও গৃহস্থকে বুঝাইয়া দিতে পারে, এবং প্রয়োজন হইলে রোগীর শুশ্রূষাদি করিতে যেন সদাই প্রস্তুত থাকে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ টোট্‌কা মুষ্টিযোগ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর জ্ঞান এবং আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা বা First aid ও গো-চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহাদিগের রীতিমত দখল থাকা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য-সেবকের শিক্ষা-প্রণালী

এই সকল সেবকগণ হুজুগ যতদূর সম্ভব কমাইয়া নীরবে কাজ করিতে শিখিবে এবং যে আদর্শ তাহারা অপরের নিকট ধরিবে, সেই আদর্শ যেন আপনাদের অন্তরের মধ্যে বিকসিত দেখিতে পায়। অপরের অভাব—অপরের দারিদ্র্য—অপরের অজ্ঞতা—নিজেরা প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি না করিলে, সত্যকার সহানুভূতি না জাগিলে, প্রকৃত সেবা করিবার ইচ্ছা বা শক্তি জন্মে না। তা'ছাড়া স্বাস্থ্য-সেবকদিগের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অন্যান্য তথাকথিত সেবকগণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

স্বাস্থ্যবাণী প্রথমে নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে শুনাইতে আরম্ভ করিতে হইবে। বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোকগণ প্রথমতঃ ইহা "ডেঁপোমি" বা "জ্যেঠামি" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তবুও তাহাদিগকে নির্ভীক হইয়া বুঝাইতে হইবে যে, দেহের সচেতনতা—পূর্ণ জাগরণ না হইলে মনের উৎকর্ষ সাধিত হইবে না। ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রিয়া কাণ্ড যাগযজ্ঞ পুণ্য অনুষ্ঠান—দেহ মনের সুস্থতা ব্যতীত কর্ম্মে পরিণত করা অসম্ভব; সকলের মূলে শক্তি, এবং স্বাস্থ্য ব্যতীত শক্তিলাভ করা যায় না। দেহ পুষ্ট, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্য সম্পন্ন না হইলে, প্রাণের স্পন্দন—জীবনের মধ্যে কর্ম্মের দ্যোতনা পাওয়া যায় না।...এই সকল স্বাস্থ্যের কথা বলিয়া তাঁহাদিগের আজন্ম পুষ্ট ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তন সাধন হইবে। প্রথমতঃ সাধারণ লোকের মধ্যে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দ্বারা শরীরতত্ত্ব সরল ভাবে বুঝাইয়া দিতে এবং যে পরিবারে শিক্ষিতা রমণী আছেন, তাঁহাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচিত্র পুস্তিকা বিতরণ করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে দুই একজন দেশ-হিতাকাঙ্খিনী স্বার্থশূন্যা বয়স্থা নারী—যাহারা সংসারের বন্ধনে আসক্তি হীনা ও পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত,—যোগাড় করিয়া স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম প্রচারের বিভিন্ন প্রণালী

আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে হইবে। তাঁহারা সময় মত প্রতি গৃহে গিয়া ও মাঝে মাঝে কোন বড় বাড়ীতে নারীদের সভা করিয়া গ্রাম্য ভগিনীদিগকে ব্যক্তিগত ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি এবং শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবেন। সম্ভব হইলে এক একখানি বড় গ্রাম বা তিন চারি খানি গ্রামে লইয়া তাহার মধ্যে একজন করিয়া শিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্তা থাকিবেন। প্রয়োজন ও সময়মত তিনিও নিজ এলাকাধীন স্ত্রীলোকগণকে ধাত্রী বিদ্যা ও সাধারণ শারীতত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারিবেন। হাটের দিন গ্রামের অনেক লোক হাটে জমা হয়; কোন পার্ব্বণে বা উৎসবের সময় মেলায়ও অনেক শ্রোতা মিলিতে পারে। এই হাটের জায়গায় বা মেলায় সাধারণ লোকের বুঝিবার উপযোগী সাদাসিধা ভাবে বড় বড় রঙীন্ ছবি বা চার্টের সাহায্যে বক্তৃতার আয়োজন করিতে হইবে। বক্তৃতা যাহাতে আরও মনোরম ও মন-ভুলানো হয়, তাহার জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সঙ্গীতও হইতে পারে। তাহা ছাড়া নিরক্ষর কৃষকদিগের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করা, গ্রামের মাতব্বর বৃদ্ধগণকে বুঝাইয়া সামাজিক কুপ্রথা দূর করিবার ন্যায়তঃ সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করা প্রভৃতি কার্য্য-গুলির ভার সেবকদিগের উপর থাকিবে। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ব্যায়ামাগার বা আখড়া স্থাপন করিতে হইবে; সেখানে স্বাস্থ্য-সেবকরা লাঠি খেলা সড়কী খেলা নকল তলোয়ার খেলা, গুল্‌তী ও তীর ছোড়া এবং অন্যান্য জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ও স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যায়াম শিক্ষা করিবে এবং অন্য সকলকে শিক্ষা দিবে এই ব্যায়ামশালায় অন্ততঃ বারো হইতে উনত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সকল লোক যাহাতে উপস্থিত থাকেন, সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর কোন পর্ব্ব উপলক্ষে গ্রাম বাসীর ছুটি থাকিলে সন্ধ্যার সময় ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়া ছবি দেখানো, কথকতার মত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গল্প বলা, ছেলেদের উপযোগী স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ছোট ছোট ছবির বই বিতরণ করা ও শক্তিযুক্ত ব্যায়াম কৌশলের জন্য তাহাদিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা,—এইরূপ নানা উপায়ে স্বাস্থ্য-ধর্ম্মের প্রচার করা যাইতে পারে। একই কথা প্রকারান্তরে দিনের পর দিন বার বার বলিলে ধীরে ধীরে সকলের মনে লাগিবে এবং Hypnotismএর মত বাক্যের প্রেরণা দ্বারা মোহাবিষ্ট হইয়া তাহারা বক্তার আজ্ঞাকারী হইয়া পড়িবে। গ্রামে যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানিয়া মরিতেছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে সচেতন করিতে হইবে। কেহ যদি না শোনে নিরাশ হইলে চলিবে না। বিদ্রূপ করে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। সময়ান্তরে আবার সেই লোককে পুনরায় বুঝাইয়া স্বমতে আনয়ন কবির চেষ্টা করিতে হইবে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া নিতাই জগাইয়ের কলসীর কানার আঘাত হাসিমুখে সহ্য করিয়াছিলেন; ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া দুর্দ্দান্ত বেদুইন্ ও পৌত্তলিক আরবদিগের হাতে মহম্মদকে নানা নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সেবকদিগকে এইরূপ কত বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা মাথা পাতিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই সকল সত্ত্বেও তাহারা যদি সহিষ্ণু হইয়া সত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, তাহা হইলে পরিশেষে সত্যের মহিমা তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবে।

কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। সকলে যাহাতে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিয়ম পালন করা না করার উপর জোর চলে না, রাজা আইন করিয়াও বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন না। আদেশ বা উপদেশরূপে বলিলে কিছু হইবে না; 'আচ্ছা, একবার এই প্রকারে জীবনটাকে একটু বদলাইয়া এই আচার গুলি ছাড়িয়া তৎপরিবর্ত্তে এইগুলি ধরিয়া কিছু দিন দেখুন না, কোন ফল পান কি না?—এইরূপ ভাবে অনুনয় বিনয় হাত জোড় করিয়া, পরখ করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

তার পর নিজেরা স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া, তাহার দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীর সম্মুখে ধরিয়া বলিতে হইবে, "এই দেখুন, আমি পূর্ব্বে এরূপ ছিলাম, এখন স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মগুলি পালন করিয়া এইরূপ হইয়াছি,"...ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর যাঁহারা স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি কিছুদিন পালন করিয়া ফল পাইবেন, তাঁহাদের সৎ দৃষ্টান্ত সমস্ত গ্রামবাসীর সম্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে।

আমাদের দেশে কৃষক সম্প্রদায় লেখা পড়া না জানিলেও বোকা নয়। মানুষের স্বভাবই—যাহা প্রথা বা বংশের পর বংশ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহজে বদলাইতে চায় না, কেন না তাহা সংস্কার বা জন্মার্জ্জিত অভ্যাসে (Instinct) পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার তাহারা সেবকগণকে তাহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্খী বলিয়া জানিতে পারে এবং বোঝে যে এই প্রথা ছাড়িয়া—ওই প্রথা ধরিলে তাহাদিগের ব্যক্তিগত ও গৃহগত সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রথা ছাড়িতে সে প্রথমতঃ একটু দ্বিধা বা অসুবিধা বোধ করিলেও একটু জোর করিলেই জন্মের মত ছাড়িয়া দিবে।

কথার চেয়ে কাজ করিয়া বোঝানই সহজ ও ফলপ্রদ। কোন গৃহস্থের বা কৃষকের গৃহে রোগ হইলে, সেখানে গিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করা; নিজ হাতে রোগীর সেবা করিয়া ও কিরূপে রোগীর সেবা করিতে হইবে গৃহস্থকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া; যখন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে, তখন প্রতি গৃহে গিয়া, কিরূপে সংক্রামক রোগের হাত এড়ান যায়, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া; যে বাড়ীতে সংক্রামক রোগ হইয়াছে, সেখান হইতে যাহাতে রোগ আর ছড়াইয়া পড়িতে না পারে তাহার রীতিমত ব্যবস্থা করা,—ইত্যাদি নানা উপায়ে, গ্রামের ভদ্রেতর সকল লোকদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদের অন্তরের প্রীতি ও বিশ্বাস লাভ করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যের পথ।

কোন সভা, সমিতি, সঙ্ঘ প্রবর্ত্তন বা পরিচালিত করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম অর্থের প্রয়োজন। শুধু একতা, একনিষ্ঠা, সহানুভূতি বা উদ্যমের উপরই যে কোন সাধু প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে—তাহা নহে, তাহার সাফল্য অনেক সময় বারো আনা পরিমাণ অর্থ ও পনের আনা পরিমাণ তাহার সদ্ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই অর্থ আসিবে কোথা হইতে? দরিদ্র পল্লীবাসীরা পেট ভরিয়া দুবেলা দুমুঠা ভাত পায় না, তাহারা অর্থের যোগাড় করিবে কেমন করিয়া? সমস্যার কথা বটে। কিন্তু একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে গেলে আমরা এই মীমাংসায় উপস্থিত হই যে, পল্লীর আট আনা ভাগ দারিদ্র্য অস্বাস্থ্যের জন্য, চারি আনা ভাগ আলস্যের জন্য, চারি আনা ভাগ অজ্ঞতার জন্য। অজ্ঞতা ও আলস্যের জন্য পল্লীর নৈতিক অবনতি ও বহু পরিমাণে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছে এবং এই জন্যই মামলা-মোকর্দ্দমা বাদ-বিসম্বাদ পল্লীবাসীর মধ্যে দাবানলের মত দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। আলস্য ও অজ্ঞতায় আরো এক কুফল ফলিতেছে যে, তাহাদিগের দারিদ্র্য চিরমজ্জাগত হইয়া পড়িতেছে, তবু দারিদ্র্য ঘুচাইবার কোন প্রণালী-বদ্ধ উদ্যম বা উদ্যোগ চলিতেছে না; আবার, দারিদ্র্য ঘুচাইবার উদ্যম বা উদ্যোগ করিবার মূলে আমাদিগের আলোচ্য সেই স্বাস্থ্যের প্রশ্নই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই, একটি পল্লী হইতে প্রত্যেক বৎসর গড়ে যে টাকা মোকর্দ্দমা, লাঠি-বাজী ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় খরচ হয়, তাহার দ্বারা অনায়াসে পাঁচটি বড় পরিবারের সম্বৎসরের সংসার খরচ সুন্দরভাবে চলিতে পারে, এবং অধিকতর প্রাসঙ্গিক ভাবে বলিতে গেলে, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রস্তাবিত একটি সেবক-সঙ্ঘ পরিচালনের মোটামুটি ব্যয় অনায়াসে সঙ্কুলান্ হয়। সুতরাং এইরূপ একটি সেবক-সঙ্ঘ গঠন করিয়া, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে গ্রামের সকল জাতির—সকল

স্তরের মুরুব্বিগণকে একত্রিত করা, তাঁহাদিগের সদ্ভাব সহানুভূতি আকর্ষণ করা এবং সংবহুলতার (vote) দ্বারা একটি স্থানীয় মীমাংসাধিকরণ (Arbitrary Board) স্থাপন করা। এইরূপে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিবার জন্য অবশ্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হইবে না। এইরূপ গ্রাম্য আপোষ-আদালতের প্রতিষ্ঠান সফল হইলে, কিছুদিনের মধ্যে সেবক-সঙ্ঘ গ্রামবাসীদের চ'খে আঙুল দিয়া দেখাইতে পারিবেন যে রাজকীয় বিচারালয়ের বাহিরে গ্রামস্থ সকলের অভিযোগ নিরাকরণের ফলে গ্রামের অর্থ কতখানি বাঁচিয়া যাইতেছে।

তার পর গ্রামের মধ্যে যে সকল হাতুড়ে, গোবৈদ্য, হঠাৎ-হকিম প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে বিরাজিত আছেন —যাঁহারা সামান্য পেটের অসুখকে "Royal" Asiatic Cholera বলিয়া বিশ বৎসরের পুরাতন Pulsitilla'র শিশি-ধোয়া-জল খাওয়াইয়া রোগী আরাম করিয়া বাহবা লন্, যাঁহারা বুকের সামান্য পৈশিক বেদনাকে "রাজযক্ষ্মা" বলিয়া পরিচয় দিয়া রোগী ও রোগীর সাত গোষ্টিকে ত্রিভুবন তমসাবৃত দেখাইয়া দেন্, যাঁহারা নীরোগীকে রোগগ্রস্ত করিতে—রোগ-গ্রস্তকে যমঘরে পাঠাইতে ভূভারতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" —সেই রোগের মহাজনদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজপট উড়াইতে হইবে, তাঁহাদিগকে সেই সুখের উচ্চাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া, তাঁহাদিগের ঘুঘুর বাসা পোড়াইয়া ফেলিয়া, গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, রোগের নিরাময় রোগীর প্রতি যতটা নির্ভরশীল হইয়া থাকে, (হাতুড়ে বা শিক্ষিত) ডাক্তারের প্রতি তাহার শতাংশের একাংশও নয়; আহার বিহারে সংযমী হইলে—নিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে ও কতকগুলি সামান্য সহজ স্বাস্থ্য-নীতি পালন করিয়া চলিলে, রোগ ত সাধারণতঃ আসেই না; যদি বা কখনও আসে তাহা নৈসর্গিক উপায়ে চলিয়া যায় কিম্বা যৎসামান্য মুষ্টিযোগ প্রয়োগে বিতাড়িত হয়। কিন্তু কোন অনিচ্ছাকৃত অসাবধানতা বা আকস্মিক সংক্রামণের ফলে যদি কোন সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি দেখা দেয়, তখন সুবৈদ্যের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরণ মঙ্গল, তবুও হাতুড়ের চিকিৎসাধীনে আসা কোনক্রমে নিরাপদ নহে। যাহা হউক, কিন্তু এখন এই হাতুড়ে বৈদ্যগণ যদি সেবক সঙ্ঘের দ্বারা আপন আপন আসন-চ্যুত হন্, তাহা হইলে তাঁহারা যাইবেন কোথায়? ইহার অতি সংক্ষেপ সহজ ও সুন্দর উত্তর— তাঁহাদিগকেও ঐ সকল স্বাস্থ্য-সেবকের দলে ভিড়িতে হইবে। এইরূপ সেবক সঙ্ঘ যদি কার্য্যতঃ গ্রামবাসীদের দেখাইতে পারেন যে তাঁহারা দুই তিন দফায় তাঁহাদিগের মোটা মোটা টাকা বাঁচাইয়া দিতেছেন, তাহার ফলে সংসারে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে, তখন যদি তাঁহাদিগের নিকট চাঁদা হিসাবে কিছু চাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় দিতে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চাৎপদ হইবেন না; ভদ্রলোকের মধ্যে যদি কেহ বা ইহার ব্যতিক্রম করেন, কিন্তু কৃষকেরা চাঁদা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না, কারণ তাহাদিগের কৃতজ্ঞতাবোধ ভদ্রলোক অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। প্রতি পরিবারের নিকট হইতে মাসে ৵০ আনা হইতে ।০ করিয়া লইলে এবং প্রতি রবিবারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিলে সঙ্ঘের খরচার জন্য খবরের কাগজে স্তম্ভে স্তম্ভে ভিক্ষার ঝুলি টানাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

বাস্তবিক পক্ষে বিচক্ষণতার সহিত পল্লীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়— বঙ্গপল্লী প্রকৃত পক্ষে অতি দরিদ্র নহে; পল্লীবাসীদিগের যদি একটু সাধারণ জ্ঞান ও অটুট স্বাস্থ্য থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন আজীবন নিশ্চিন্ত সুখে বসিয়া খাইতে পারে—গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাদিগকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না। সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে একটু প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে—যাহাতে তাহারা চিঠিপত্র মোটামুটি পড়িতে পারে, দরকার হইলে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড বা অন্য কোন স্থলে দরখাস্ত

লিখিতে পারে এবং নানাবিধ সুলভ সারের সাহায্যে জমির আশাতিরিক্ত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে এবং

পল্লী-দারিদ্র্যের কতকগুলি কারণ।

সর্ব্বোপরি রোগ ও মৃত্যুর স্বরূপ চিনিতে ও তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে। তার উপর পল্লীবাসীর মধ্যে দারিদ্র্য অপেক্ষা বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব বড় বেশী পরিমাণে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পল্লীবাসী ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে জানে না; তাহার সময় জোড়া ইলিশ খায়, দুঃসময়ে এক কাঁচ্চা লবণের জন্য পরের দ্বারে হাত পাতিতে দ্বিধা বোধ করে না। তার উপর সহরের হাওয়া ক্রমশঃ তাহাদিগের গায়ে লাগিতেছে। কোন মেলায় গেলে দেখা যায়, জুয়ার আড্ডাগুলি রীতিমত জমকালো হইয়া উঠিয়াছে; পল্লীর কৃষক তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ অকাতরে আড্ডাধারীর ক্ষুধিত গহ্বরে ঢালিয়া দিতেছে। তথাকথিত আতর, এসেন্স ও সুগন্ধ কেশ তৈলের জন্য ও তাহাদের হস্ত যথাসম্ভব মুক্ত হইতেছে; তা'ছাড়া মোকর্দ্দমার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অন্যদিকে পল্লীর ভদ্র গৃহস্থের ঘরে ঘরে নানা প্রকার বিলাতী টিনের দুগ্ধ, হলিক্স, মেলিন্স ফুড্ ইত্যাদি শিশুর একমাত্র খাদ্যরূপে পরিশোভিত রহিয়াছে; কারণ পল্লীবাসীরা গো-মাতার সেবা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং শিশুর মাতা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য আপনার স্তন-ক্ষীরধারা অকালে শুকাইয়া ফেলিয়াছেন। তবু শটি, সাগু, বার্লি, এরোরুট, কাঁচ-কলার মণ্ড, যবের মণ্ড, সুজী প্রভৃতি থাকিতে তাঁহারা বহুমূল্য বিলাতী খাদ্যের আস্বাদে শিশুকে পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। বাংলার শিশু যে বাল্যকালে বিদ্যালয় হইতে কেবল মাত্র বিদেশী ভাষা, হাব-ভাব ও আদর্শ শিক্ষা করে—তাহা নহে, মায়ের কোল হইতে বিদেশী খাদ্য পর্য্যন্ত তাহার পেটের মধ্যে গিয়া প্রতি রক্তকণিকার ভিতর বিদেশিয়ানার বীজ উপ্ত করিয়া দেয়। তারপর সেমিজ, জ্যাকেট, ব্লাউস, ষ্টকিং সাবান, গন্ধতেল, জর্দ্দা, দোক্তা, বিড়ি আয়না, চিরুণী, বুরুষ, প্রভৃতি অনর্থক বিলাসের ধূয়া আজ সহরের দেখাদেখি পল্লীগ্রামও ধরিতে শিখিয়াছে। ছেলেদের নানাবিধ বিদেশী রঙীন জামা পোষাক * কিনিয়া পরাইয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের শিরচ্ছেদ করিবার প্রথা পল্লীতে রীতিমত প্রচলিত হইয়াছে। জ্ঞানস্পৃহা ও কর্ম্মে আসক্তি না থাকাতে ও বিলাস লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে কি পল্লী—কি সহরবাসী সকলের মধ্যে দারিদ্র্য মূর্ত্তি অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছে। অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ যত বাড়িবে—দারিদ্র্যও জাতির মধ্যে তত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। সুতরাং পল্লী-বাসীকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার সহিত একটু অর্থনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভাবের জালকে গুটাইয়া আনিয়া (high thinking হউক বা না হউক) অন্ততঃ Plain living য়ের পথে দাঁড় করাইয়া দিতে হইবে।

শ্যামল বাংলা স্বর্ণপ্রসূ—এ কথা এখন কবির কল্পনায়ই সম্ভব মনে হয়, কিন্তু চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখা এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার সে অপরূপ রূপের মাধুরী অনুভব বা সে-সোনা উপভোগ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বাংলা দেশের মাতা পূর্ব্বেকার মত সমান পরিমাণ স্বর্ণ না দিউন, কিন্তু স্বর্ণ দেওয়া একেবারে বন্ধ করেন নাই; কিন্তু যে পরিমাণ স্বর্ণ তিনি প্রসব করিতেছেন তাহা ত আমাদের হাতে আসে না,—আমাদের বাহুতে শক্তি—বুকে আগ্রহ কই?—তাহা বস্তাবন্দী করিয়া ঘরে লইয়া যায় আমাদের ওই পরদেশী ভাইরা। মরুভূমির দেশে ত সোনা ফলে না; তবু সোনার সন্ধানে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই দেশবাসীরা পাকা জহুরী হয় এবং সোনার বাংলায়

* এই সকল জামা ও নানাবিধ রঙ্করা নয়নলোভন্ খেলনা প্রভৃতি যে শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতদূর হানিকর ও বিপজ্জনক, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যা বাবু ফাল্গুন সংখ্যার "হিন্দু ডুবিল" শীর্ষক প্রবন্ধাংশে যুক্তিতর্কের সহিত বিবৃত করিয়াছেন।

সোনার এত প্রাচুর্য্য দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে। নির্জ্জলার দেশ হইতে আসিয়া সম্মুখে সুশীতল জল দেখিয়া আকণ্ঠ ভরিয়া পান করে—পরের জন্য এক ফোঁটা রাখিতে তাহাদের প্রাণ সরে না; যাহাদের দেশের জল, তাহারা হাঁ করিয়া পরমুখস্পৃষ্ট জলের ঘটির দিকে চাহিয়া থাকে আর পিপাসায় বুক চাপড়ায়, কিন্তু বুঝিতে একবার চেষ্টা করে না যে, "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" যাহারা বাংলার ধূলায় সোনার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, তাহাদের কাঠা পরিমাণ মাটি খুঁড়িয়া দেখিতে বল—তাহাতে সোনা ফলে কি না? বিশ্বাস সে যদি না করে, তাহা হইলে কলিকাতার মাড়য়ারী, ভাটিয়া, নাখোদা দীল্লিওয়ালা মুসলমান ও পার্শীদিগের পঞ্চতলাবিশিষ্ট অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের বিরাট্ লোহার সিন্ধুকের ভিতর স্তরে স্তরে সাজান স্বর্ণমোহরের থলি দেখিয়া যাক্ আর বলুক—সে সোনা বাংলার মাটির দান নয়! বাংলার মাটির উপরে সোনা, নীচে সোনা। উপরের সোনা দেখিবার মত আমাদের চক্ষু নাই—ভিতরের সোনা খুঁড়িয়া তুলিবার মত শক্তি নাই। চাই জ্ঞান—চাই স্বাস্থ্য। দেশের লোক জ্ঞানবান্ হোক্—স্বাস্থ্যবান্ হোক—তাহাদের হৃদয়ে দেশাত্মবোধের শশাঙ্ক জ্যোৎস্না ঢালুক, দেখিবে তাহাদের দুঃখ নাই—দারিদ্র্য নাই—অভাব নাই—অভিযোগ নাই।

দেশের অনেক মনীষি ব্যক্তিকেও বলিতে শুনিয়াছি, "গরীব পরাধীন দেশের কখনও কিছু হয় না। যে দেশে লোকে দুবেলা দুমুটো খাইতে পায় না, তারা স্বাস্থ্য রাখিবে কোথা হইতে?" কেবলমাত্র কাণে শুনিতে কথাটা বেশ মিষ্ট, মোলায়েম ও সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি লইয়া একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় না কি যে আমাদের স্বাস্থ্য বা শক্তি ছিল না ও নাই বলিয়াই আমরা গরীব—আমরা পরাধীন? আমাদের স্বাস্থ্যহীনতাই আমাদিগের গরীবিয়ানা ও দাসমানসিকতা (slave mentality) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ নহে কি? খুব ঘি, দুধ, রুটি, মাংস খাইলেই কি একমাত্র স্বাস্থ্য রক্ষা হয় ও মানুষ শক্তিশালী হয়? মিথ্যা কথা! তাহা হইলে সফেন ভাত ও শুষ্ক মাছ খাইয়া বামন জাপান—রুষিয়া ভল্লুকের টুঁটি কামড়াইয়া ভয়াবহ ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া দিয়া, পৃথিবীর মধ্যে এক পরাক্রমশালী জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না; তাহা হইলে বনের ফলমূল ও বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া, প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ এরূপ অসামান্য শক্তির পরিচয় দিতে পারিতেন না। এখনও দেখিতে পাই—ঢের বেশী পরিমাণ খাইতে পায়—এমন কি খাইতে না পারিয়া যাহারা ফেলিয়া দেয়, তাহারাই বেশী স্বাস্থ্যহীন, তাহারাই অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তির ভিক্ষারী—সুখের সন্ধানী। আবার মুটে মজুর যাহারা দিন আনে দিন খায়, ভোরে উঠে, রাত্রি নয়টায় নিদ্রা যায়, মাথায় মোট বয়, সর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে চলা ফেরা করে ও গ্রাস-বাসের যৎসামান্য অভাব ব্যতীত অন্য কিছু জানে না, তাহারাই স্বাস্থ্য-সম্পদকে অযাচিতভাবে পায়, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবি হয় ও রোগের সহিত বড় বেশী দ্বন্দযুদ্ধ তাহাদিগকে করিতে হয় না। কর্ম্মকার বা অন্য কোন শ্রেণীর শ্রমজীবি—যাহারা বিলাস বা নেশার বশীভূত নহে, যাহারা সময়ে উঠে, সময়ে কাজ করে, সময়ে নিদ্রা যায়, সচেতনভাবে হোক বা অন্ধভাবে হউক শাস্ত্রীয় সদাচারগুলি নিয়ম মত পালন করিতে উদ্যোগী, তাহাদিগেরই সবল দেহ, সুস্থমন, সুখের সংসার।...

এই সকল কথা লইয়া সেবকগণের রীতিমত গ্রামবাসীদিগের সহিত লড়িতে হইবে এবং যতক্ষণ তাঁহারা এই সকল সত্য মানিয়া না লন্ ও আপনাদের জীবনের গতি সেই সত্যের আলোকের দিকে প্রসারিত না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। তাহাদিকে মুক্ত কণ্ঠে—দৃঢ়স্বরে—অবতারের ওজস্বিতা বিচ্ছুরিত করিয়া বলিতে হইবে:—অভাবকে সংহত কর—বিলাসকে সংযত কর—হিন্দুর সনাতন সদাচারগুলি পালন কর, তাহা হইলে স্বাস্থ্য তোমার—শক্তি তোমার—সুখ তোমার।

স্বাস্থ্যের অন্য এক অর্থ—সন্তোষ; সুতরাং নিজের আর্থিক সামাজিক বা সাংসারিক অবস্থায় বিতৃষ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইলে চলিবে না; তাহাহইলে স্বাস্থ্যও আসিবে না, সুখও আসিবে না, দারিদ্র্যও ঘুচিবে না। দরিদ্র যদি নিজেকে দীন দুঃখী বলিয়া মনে না করে, আপনার অবস্থাকে হাসি মুখে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কঙ্করমিশ্রিত মোটা চাউলের ভাত খাইয়াই তাহার কঙ্কালসার দেহের পৈশিক তন্তুগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া গুম্‌রাইতে থাকিবে—পোলাও-ভোজীর শক্তি অপরিহার্য্য ভাবে তাহার কাছে মাথা নীচু করিবে।

এইভাবে সেবকগণ যদি গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষিত করিতে পারেন ও ব্যক্তিগতভাবে হাতে কলমে তাহাদিগকে এক একজনের বাজে বিলাসিতা ও খুচরা নেশার দ্রব্যাদির খরচ কমাইয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয়ে সহায়তা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা বিনিময়ে সেবকগণকে সাহায্য না করিয়া পারিবে না। তা'ছাড়া সেবকগণ যদি দেখাইয়া দিতে পারেন—গ্রামবাসীদের প্রদত্ত অর্থের সমস্তটুকু বা অধিকাংশ তাহাদিগেরই স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় হইতেছে, তখন ঐরূপ সদনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না।

তার উপর গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক সময় হয়ত আর্থিক সাহায্য ছাড়া গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের কায়িক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। যেমন ধরুন, গ্রামের এক পার্শ্ব দিয়া একটা ছোট খাল আছে; পলি পাড়িয়া মজিতেছে ও ক্রমশঃ ধাপ জন্মাইয়া নৌকা চলাচলের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে ও মশককুলের বৃদ্ধি পাইবার প্রশ্রয় দিতেছে। তখন যদি ক্রমাগত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে দরখাস্ত করিয়া কোন ফলোদয় না হয়, তাহা হইলে জমীদারের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া হাত পাতিতে হইবে তিনি যদি একেবারে বঞ্চিত না করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করেন ত ভালই; তাহা হইলে ঐ টাকার সহিত দুই পারের গ্রামগুলি হইতে চাঁদা তুলিয়া, তাহা একজাই করিয়া নদীর পঙ্কোদ্ধারে নিয়োজিত করিতে হইবে। যদি জমিদার কিছু দান না করেন, বাহিরের লোক-লস্কর লাগাইয়া কাজ করাইতে অর্থের অকুলান্ হয়, তাহা হইলে যে যাহার ঘাট ও তাহার পার্শ্বস্থ খানিকটা করিয়া অংশ পরিষ্কার করিবার ভার লইবেন। মনে করুন, প্রথম দিন হরিবোল বসুর ঘাট পরিষ্কার করিবার দিন পড়িল; সেইদিন হরিবোল্ বসু যথাসাধ্য তাঁহার লোকজন বাটীর ছেলে-পুলেদের ঘাটে নিযুক্ত করিলেন; তাহা ছাড়া পাড়ার যে কয় ঘর লোক বসু মহাশয়ের ঘাটে স্নান করেন বা অন্য যে কোন ভাবে তাঁহার ঘাট ব্যবহার করেন, তাহাদিগের বাটীর প্রত্যেক পুরুষকে আসিয়া ঘাটের পঙ্কোদ্ধারে যোগ দিতে হইবে এবং তাহাদিগের সকলের কার্য্য পরিচালন করিবে—স্বাস্থ্য-সেবকগণ; সেবকগণ সাধারণের নিকট চাঁদা দ্বারা কতকগুলি নৌকা সমেত জেলে ও ডুবারী নিযুক্ত করিয়া কাজে লাগাইবে এবং উহাদিগকে লইয়া তাহারা প্রত্যহ প্রত্যেক ঘাটের পঙ্কোদ্ধারের সময় উপস্থিত থাকিবে ও সাহায্য করিবে। পাঁকগুলি দূরান্তরে কোন নিম্ন জমিতে ছড়াইয়া দিতে হইবে, এবং ধাপ্ ও কচুড়ী পানাগুলি কুলে আনিয়া শুষ্ক করিয়া সমূলে পোড়াইয়া ফেলিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। এই ভাবে গ্রামবাসীরা ইচ্ছা করিলে আপনাপন খালের একটি অংশ অখণ্ডভাবে পুনঃসংস্কার করিয়া নৌ-যানের পথ সুগম ও তাহার জল সুপেয় করিতে পারে। তাহাদিগের দেখাদেখি পার্শ্বস্থ গ্রামখানি ঐ কৌশল গ্রহণ করিতে পারে; আবার সেই গ্রামের দেখাদেখি নিশ্চয়ই তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম ও এই ভাবে গ্রামের পর গ্রাম ঐ খালের পঙ্কোদ্ধারে মনোনিবেশ করিবে। এইরূপে বোধ হয় ৫।৬ মাসের মধ্যে তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীগণের সমবেত চেষ্টায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় একটি নাতিদীর্ঘ খাল আমূল সংস্কৃত হইয়া যাইতে পারে। "দশের লাঠি একের বোঝা' প্রবচনটি একটু ঘুরাইয়া "একের বোঝা দশের লাঠি" এই সত্য বাক্যটি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া দিতে হইবে। পল্লী যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে শিখে, পরস্পর পরস্পরের অভাব-অভিযোগ উপলব্ধি করিতে পারে, আলস্যের

জৃম্ভন ছাড়িয়া কর্ম্মী নাম সার্থক করিয়া তুলে, তাহা হইলে সমগ্র জাতির শক্তি বা মুক্তি তাহার ভুজ-বন্ধনে আপনি আসিয়া ধরা দিবে।

তারপর এখন স্বাস্থ্যসেবক সঙ্ঘের অর্থোপায়ের আরো দুই একটি পন্থা বলি। সঙ্ঘ আপনাদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া বা গ্রামবাসী সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা গ্রামের মধ্যে বা নিকটে কোথাও দুই তিনটি অব্যবহার্য্য পুষ্করিণী জমা লইতে পারেন। নিজেরা সেই সকল পুষ্করিণীর পুনঃ সংস্কার করিয়া তাহাতে মৎস্যের ডিম বা পোনা ছাড়িয়া দিতে পারেন। বড় বড় পুষ্করিণী হইলে প্রত্যেকটি পুকুর পিছু বৎসরে গড়ে দুই তিন শত টাকা স্বচ্ছন্দে আয় হইতে পারে। তা ছাড়া সঙ্ঘ ফলের বাগান জমা লইয়া তাহার কারকিৎ করিয়া বা শাক সব্জীর বাগান বানাইয়া ঐ সকল ফলমূল বিক্রয়ের দ্বারা আয়ের পথ সুপ্রশস্ত করিতে পারে। এক এক ঋতুতে গ্রামে এক এক জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে গ্রাম বাসীদিগের অভাব পরিপূরণের পর যাহা থাকিবে, সেই উদ্বৃত্ত অংশ ঐ জেলা মধ্যস্থ কোন বড় গঞ্জে ও অন্যান্য সহরে চালান্ দিয়াও বেশ দু পয়সা রোজগার করা যাইতে পারে। যদি কিছুদিন পরে এই সকল প্রচেষ্টা সফল হয় ও ব্যবসাবৃদ্ধির সহিত অধিকতর মূলধনের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটি গ্রাম্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া গ্রামের ভিতর ও বাহিরে অংশ বিক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক অংশ যেন ২৲ বা ৩৲র বেশী মূল্যের না হয়।

এখন কি ভাবে অগ্রসর হইতেও স্বাস্থ্যোন্নতিকর কোন কোন প্রধান কাজে ওই অর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে? ইহার উত্তরে মোটা-মুটি ভাবে বলিতে হয়:—

কার্য্য নির্ঘণ্ট

(১) যাহাদের সামর্থ্য নাই বা যাহার উপস্থিত কোন মালিক নাই এরূপ ভিটা, বাগান ও পতিত ভূমির জঙ্গল আগাছা প্রভৃতি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে এবং জঙ্গল পরিষ্কার করিবার কাজটা আর্থিক হিসাবে যাহাতে অধিকতর সফল হয় অর্থাৎ তাহা দ্বারা অর্থাগমের কিছু সুবিধা হয় তদুদ্দেশ্যে ঐ সকল পরিষ্কার ভূমিতে গৃহস্থ দ্বারা কোন রবিশস্য বা সব্জীর চাষের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে গৃহস্থ যদি উহাতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সামান্য সুদে টাকা ধার দিয়া ঐ কার্য্যে সাহায্য করিতে হইবে। সুবিধা হইলে সেবক-সঙ্ঘ কিছু জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ওষধি ও সাধারণ পাচন-মুষ্টিযোগের জন্য আবশ্যকীয় গাছগাছড়ার চাষ করিতে পারেন। গ্রামবাসীরা ইচ্ছা করিলে এখানকার উৎপন্ন বৃক্ষলতাদি আবশ্যকমত বিনামূল্যে ব্যবহার করিতে পাইবেন; তাহা ব্যতীত কলিকাতা বা অন্য স্থানের বৈদ্যদিগকেও ঐ সকল দ্রব্যের উদ্বৃত্তাংশ অল্প লাভে সরবরাহ করা যাইতে পারে। (২) গ্রামের জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করা এবং পয়ঃপ্রণালী কার্য্যক্ষম অবস্থায় রক্ষা করা। (৩) গ্রামের কেন্দ্রস্থলের মধ্যে অন্ততঃ একটি পুষ্করিণী কাটিয়া তাহা হইতে উত্থিত মাটি দ্বারা অন্যান্য ছোট খানা খন্দ, ডোবা প্রভৃতি ভরাট করা এবং যে যে পুকুর বা নিম্ন ভূমি প্রভৃতিতে পাট পচান হয়, সেগুলির জলে পাট পচান সম্ভব হইলে বন্ধ করা নচেৎ পাট পচানোর কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার পর ছেঁচিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে, কিম্বা চুণ, পটাসিয়াম্ পার্মাঙ্গানেট অথবা অন্য কোন অল্প মূল্যের রাসায়নিক বিশোধক পদার্থের দ্বারা উহাদের অনিষ্টকারিতা নিবারিত করিতে হইবে। পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বে অন্ততঃ পনের কুড়ি গজের মধ্যে যাহাতে কোন বড় বা মাঝারী গাছ পালা না থাকে তাহার উপায় দেখিতে হইবে; এরূপ থাকিলে তাহা কাটাইয়া ফেলিয়া তক্তা বিক্রয় করাইয়া গৃহস্থের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে, কিম্বা গৃহস্থ নিজে যদি ঐ সকল করিতে পারগ হন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারাই উহা করাইয়া লইতে হইবে। (৪) অন্ততঃ গ্রীষ্ম বর্ষার সময় যাহাতে আপামর সাধারণ জল ফুটাইয়া (ঠাণ্ডা করিয়া পরে) পান করে

ও পারতপক্ষে সামান্য মাত্রায় ফট্‌কিরি ও কর্পূর প্রত্যেক পানীয় জলের কলসীতে মিশ্রিত করিয়া রাখে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতি গৃহে অল্প মূল্যের ফিল্‌টার ও বসাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৫) প্রতি গ্রামে এক একটি আখড়া স্থাপনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত একটি ওষধির বাগান সংলগ্ন থাকিবে এবং অর্থে সঙ্কুলান হইলে তদ্দ্বারা একটি ছোটো-খাটো মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইবে; ইহার নাম হইবে "স্বাস্থ্যধর্ম্ম মন্দির"। স্বাস্থ্যধর্ম্ম মন্দির বলিতে গেলে যে সেইটি হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধানে অবিকল মন্দিরের আকারে গঠন করিতে হইবে এরূপ কেহ যেন না বুঝেন। তবে যতদূর সম্ভব, ওইটিকে মন্দিরের ন্যায় নির্ম্মাণ করা উচিত এবং সর্ব্বোপরি, আকার যেরূপ হউক না কেন, স্থানটিকে দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র ও গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ জ্ঞান করিতে হইবে। এই মন্দিরে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। হিন্দু-প্রধান গ্রামে হিন্দুদিগের পাড়ায় কোন স্থানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে; মুসলমান্-প্রধান স্থানে মুসলমান্ পাড়ায় স্থাপিত হইবে। যেখানে হিন্দু মুসলমান্ প্রায় সমভাবে বাস করে, সেখানে দুই পাড়ার মধ্যবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক জায়গায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইবে। স্থানীয় হিন্দু মুসলমানগণের এক মত হইলে, হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মস্‌জেদের সংমিশ্রণে একটি নূতন আদর্শের অনুরূপ আমাদিগের প্রস্তাবিত "স্বাস্থ্যধর্ম্ম মন্দির" নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে কোন বিরোধের কারণ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে, দুই ধর্ম্মাবলম্বীগণ পরস্পর পৃথক পৃথক স্বাস্থ্যধর্ম্ম মন্দির বা স্বাস্থ্যধর্ম্ম মস্‌জেদ স্থাপন করিতে পারেন। এখানে যুবকদের মুগুর, ডাম্বেল, লাঠি, কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, সাবল, প্রভৃতি সঞ্চিত থাকিবে; নানারূপ ঔষধে ব্যবহৃত শুষ্ক গাছ গাছড়া ও পাচন প্রভৃতির একটি ছোটো খাটো ভাণ্ডার থাকিবে, এবং আকস্মিক বিপদের চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জামাদিরও এখানে যোগাড় থাকিবে। তদুপরি সঙ্ঘের সভা-সমিতি বৈঠকাদি এইস্থানে সম্পন্ন হইবে। শালিশী বিচারালয় ও কৃষক-শ্রমজীবিদিগের নৈশ বিদ্যালয়ও এখানে বসান যাইতে পারে। গ্রামের সকল শ্রেণীর ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের জন্য "স্বাস্থ্যধর্ম্ম প্রাথমিক বিদ্যালয়"ও দিবাভাগে বসান যাইতে পারে। এখানে স্বাস্থ্য ও সৃষ্টির স্থূল ও মূল তত্ত্বগুলি শিশু-বোধ্য করিয়া শিক্ষা দান ও প্রথম হইতে সদাচারগুলি প্রতি-পালনে ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা করিতে নিযুক্ত থাকিবেন—"স্বাস্থ্য-পণ্ডিত" বা "স্বাস্থ্য-মৌলবীগণ"; প্রকারান্তরে ইহারা "স্বাস্থ্য-পুরোহিত" বা "স্বাস্থ্য ইমাম্" নামে অভিহিত হইবেন ও সর্ব্বদা মন্দিরের তত্ত্বাবধান করিবেন। এই স্বাস্থ্য-পণ্ডিতগণকে দরকার হইলে গ্রামান্তর বা জেলান্তর হইতে আনয়ন করা যাইতে পারা যাইবে; কিন্তু তিনি যাহাতে কর্ম্মস্থলে স্বীয় পরিবার লইয়া (স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে) বাস করেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। অবশ্য তাঁহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য গ্রামবাসীগণের নির্দ্দিষ্ট চাঁদার উপরে নির্ভর করিতে হইবে; কিন্তু সে চাঁদা আদায় করা হইবে—স্বাস্থ্য সেবকগণের হাত দিয়া। বলা বাহুল্য স্বাস্থ্য-পুরোহিতগণের প্রধান গুণ থাকিবে—তাঁহাদিগের অসামান্য ও আদর্শ দৈহিক স্বাস্থ্য (শারীরিক বল) ও মানসিক স্বাস্থ্য (চরিত্র বল); এবং গৌণ গুণগুলি হওয়া চাই—আপন ধর্ম্মশাস্ত্রে ও জগতের স্বাস্থ্য বিষয়ক আধুনিক সংবাদগুলিতে অভ্রান্ত অধিকার, বয়াধিক্য (৩০এর কম ও ৫০এর বেশী না হয়), জাতিত্বের উচ্চতা (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য হইলেই ভাল হয়) ও অনর্গল প্রবর্ত্তনাজনক বক্তৃতা দানের ক্ষমতা। ব্যবহারতঃ স্বাস্থ্য-পুরোহিতগণ গ্রামের স্বাস্থ্য ও সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উন্নতির প্রাণ স্বরূপ ও গ্রামের ডাক্তারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইবেন। আবশ্যক ও অবসর মত ইহাঁরা সেবক লইয়া প্রচার কার্য্যে

যাইতে পারেন এবং সর্ব্বজীবে সমভাবে উদারতার সহিত স্বাস্থ্যধর্ম্ম বিষয়ে দীক্ষা দান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। অক্ষরে অক্ষরে ইহাঁদিগকে মিশনারী' জীবন যাপন করিতে হইবে।

(৬) Minor বা High Schoolএর শিক্ষকগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে যে কোন একটি শিক্ষককে (ড্রিল-মাষ্টার হইলেই ভাল হয়) কলিকাতা বা সদরে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শারীর বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী হইবার জন্য, ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন; স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁহার অনুপস্থিতিকালের পুরা মাহিনা দিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহাঁরা ৬ মাস কিম্বা একবৎসর ঐরূপ স্বাস্থ্য-শিক্ষক-বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া স্কুলে ফিরিয়া আসিয়া, ছাত্রদিগকে "সুমেরুশিখর শিরে সূর্য্যের মতন অক্ষয় কিরণে অন্তরে জাজ্বল্যমান্" সেই নূতন বিদ্যা অকাতরে দান করিবেন। সুতরাং স্বাস্থ্য-সেবক, স্বাস্থ্য-পুরোহিত ও সঙ্ঘের চিকিৎসক—সকলেই স্কুলের শিক্ষকদিগের সহিত একযোগে হাত ধরাধরি করিয়া কাজ করিবেন এবং অভাবের সময় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। গ্রামের এইরূপ সাধু প্রতিষ্ঠানে গ্রামের জমিদারদিগেরও যথাসম্ভব মুক্তহস্ত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদিগের পরিবারস্থ পুত্রপরিজনকে এই কার্য্যে সাধারণ লোকের মত যোগ দিতে আদেশ করা কর্ত্তব্য। খাজনা দেওয়া যেরূপ প্রজার কর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রজার জীবন রক্ষার জন্য ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা রাজা বা জমিদারের কর্ত্তব্য; দেশ ও জাতির হিতার্থে পরস্পর পরস্পরের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ না করিলে চলে না।

(৭) তারপর গ্রামের মধ্যে দুই একটি "স্বাস্থ্য-কথকে"র উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন; ইহাঁরা নানা পৌরাণিক গল্পের সহিত স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সংমিশ্রণ করিয়া নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কথকতা করিবেন; ইহাদের অবশ্য কোন ধরা-বাঁধা মাহিনা বা বৃত্তি থাকিবে না; যে বাড়ীতে যেদিন ইঁহারা কথকতা করিবেন, সেই বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহাদিগের সেইদিনের পারিশ্রমিক বহন করিবেন। তারপর আর এক কথা।—স্বাস্থ্যোন্নতির হন্তারক ইহলৌকিক উন্নতির পরিপন্থী যে সকল কুপ্রথা সমাজের বুকে জাগিয়া আছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনও সঙ্ঘের বিধিবদ্ধ কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। বাল্য বিবাহ বন্ধ করা, অক্ষত-যোনি বিধবার পুনর্ব্বিবাহ দান, আঁতুড় ঘর অপবিত্র জ্ঞান করা ও লোকাচারের অজুহাতে শিশু ও প্রসূতির অযত্ন করা, পণপ্রথা নিবারণ করা, কেবলমাত্র পয়সা বা লেখাপড়া দেখিয়া (স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া) কন্যাকে পাত্রস্থ করা প্রভৃতি যে সকল সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা একে একে দূর করিবার জন্য সঙ্ঘকে অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে ব্যয় করিতে হইবে। ইহাদের সহিত আমাদের স্বাস্থ্য-হীনতা, দাসভাব ও অবনতির যথেষ্ট সংযোগ রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্বাস্থ্য-শিক্ষকগণের আরো একটা উদ্দেশ্য হইবে যে, নিজ নিজ স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যতীত কিছু কিছু অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব ভদ্র যুবকগণের village exodus বন্ধ করা।

(৮) বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে মাত্র ৩৫৩৮ জন রেজেষ্ট্রী করা এলোপ্যাথিক ডাক্তার আছেন এবং বোধ হয় তুল্য সংখ্যক কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন; মোটামুটি বাংলা দেশের ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র অল্পবিস্তর ৭০০০ চিকিৎসক আছেন; অর্থাৎ প্রতি ১২,৫০০ লোকের পিছু এক একটি করিয়া বৈদ্য বিদ্যমান্।* কিন্তু এই সকল বৈদ্যের অধিকাংশই মিউনিসিপ্যালিটি অধিষ্ঠিত সহরের মধ্যে নিজ নিজ ব্যবসা চালান্। তাঁহারা সহরে বসিয়া রোগীর বৃথা

* আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে ৪০০ জনের মধ্যে একজন, বিলাতে গড়ে ৮০০ জনের মধ্যে একজন এবং পৃথিবীর যে কোন অর্দ্ধসভ্য দেশে দেশে অন্ততঃ ৫০০০ এর মধ্যে একজন ভালো ভিষক্ আছেন।

আশায় উপোসী হইয়া মরিবেন, তবু পল্লী-গ্রামের মাটি মাড়াইতে চাহিবেন না। ইঁহারা আপাততঃ যদি বাংলার এক একটি থানায় আসিয়া অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে পল্লীর লোক বাঁচে, তাঁহাদেরও রীতিমত পেট ভরে। তবে মোটর বা সেকেণ্ড ক্লাশ ছ্যাকড়া গাড়ী করিয়া কোট-প্যাণ্ট-বুট পরিয়া রোগী দেখিতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের হয়ত ঘটিয়া উঠিবে না:—কোন সময় পদব্রজে, কখনও বাতগ্রস্ত ঘোটকে কোথাও বা নৌকায়, বহু সময় হয় ত বা ধূলা কর্দ্দম অঙ্গে মাখিতে মাখিতে তাঁহাকে রোগীর বাটীতে পঁহুছিতে হইবে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সহরে সারাদিনের মধ্যে ৪৲ ভিজিটের যদি ১ বা ২টি রোগী পান্, সেখানে সারাদিনে ১ টাকা ভিজিটের দশটি রোগী অবশ্য মিলিবে। এখনকার মত অন্ততঃ এক একজন পাশকরা ডাক্তার বা কৃতবিদ্য ('Non-empirical') কবিরাজী ব্যবসায়ী গিয়া প্রত্যেকে ৫।১০ খানি গ্রাম নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া একটি সেবক-সঙ্ঘ গঠন ও পরিচালনের সহিত নিজ নিজ ব্যবসা-চালান্, তাহা হইলে দেশের ও দশের যথেষ্ট কাজ ত হয়ই, উপরন্তু তাঁহাদিগের অর্থাগমের পথও সুপ্রশস্ত হয়; অন্ততঃ যে সকল পাশকরা ডাক্তারদিগের পল্লীগ্রামে পৈত্রিক বাস, তাঁহারা যদি নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া এইরূপ একটা প্রচেষ্টা করেন, তাহা হইলে সকল দিক হইতে সে অনুষ্ঠান সফলতার মুকুটে বিভূষিত হইতে পারে। সেবার দিক ছাড়িয়া শুধু আর্থিক হিসাবের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, এক একজন ডাক্তার দশ বারো খানি গ্রামে ১৲ বা ২৲ ফি'তে চিকিৎসা করিয়া মাসে অন্যূন পক্ষে ২০০৲ দুইশত টাকা রোজগার করিতে পারেন—ইহা অবশ্য কলিকাতার মত সহরে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা উপার্জ্জনের সমান। স্বাস্থ্য-সেবকগণ যেরূপ একদিকে গ্রামের সেবার দিকে মন প্রাণ সমর্পণ করিবে, তেমনি ডাক্তারের সাংসারিক সচ্ছলতার উপায় বিধানের প্রতিও যথোচিত দৃষ্টি রাখিবে। সামান্য সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, পেটের অসুখের বেলায় অবশ্য তাহারা নিজেরাই টোট্‌কা, মুষ্টিযোগ, পাঁচন প্রভৃতি সহজ ও সুলভ ঔষধ দ্বারা গ্রামবাসীদিগকে আরাম করিয়া দিবে; কিন্তু তাহাদিগের কোন সঙ্কটাপন্ন বা জটিল ব্যাধির সময় ঐ সকল ডাক্তার বা কবিরাজের শরণাপন্ন হইতে হইবে এবং স্বাস্থ্য-সেবকগণ এই সকল ক্ষেত্রে দূতের কার্য্য করিবেন। বাংলা দেশে চিকিৎসক নামের অযোগ্য ছোট বড় আনুমানিক সতের হাজার হাতুড়ে আছে; তাহাদিগকে ও সাধারণ লোকদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় (এবং ক্রমশঃ প্রত্যেক মহাকুমায়) এক একটি "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিদ্যালয়" স্থাপন করা দরকার এবং ইহার সংলগ্ন এক একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যধর্ম্ম-মন্দির থাকা প্রয়োজন; এখানে এক একটি করিয়া আধুনিক ধরণের Health museum ও অনুবীক্ষণ-যন্ত্রাদি শোভিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাগার থাকিবে। এখানে অল্প মূল্যে কাশ, মূত্র, বমন, রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা ও vaccine, anto-vaccine ও Wassermann Reactionএর বন্দোবস্ত থাকিবে; দুর্জ্ঞেয় ও সন্দেহজনক ব্যাধি সঠিক নির্ণয় করিবার পক্ষে এরূপ যন্ত্রাগার যে কত উপকারী, তাহা অধুনা সহরের অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম করিতে বাকী নাই। বলা বাহুল্য, মফস্বল সহরে স্থাপিত এই সকল প্রতিষ্ঠান সমবায় প্রণালী মতই পরিচালন হইবে।

স্বাস্থ্যোন্নতি প্রচারের জন্য ও দেশকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য উপরোক্ত প্রণালীতে অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে, দশ বৎসরের মধ্যে আমাদিগের জাতীয় অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। দেশের শিক্ষক, ডাক্তার স্বাস্থ্য-সেবক ও তথাকথিত প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী নেতাকেই আজ

শেষ-কথা

মায়ের দরদ বুকে লইয়া জাতির এই বীজ রক্ষার গুরুতর

দায়িত্বটুকু হাসিমুখে কাঁধে করিয়া লইতে হইবে। দেশের চিন্তাশক্তি এদিকে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। রোগে, অনাহারে, অনাচ্ছাদনে, বিলাসিতায়, কদভ্যাসে ও অজ্ঞানতায়—মা'ও মরিতেছে, শিশুও মরিতেছে; বাকী লোক জীবন্মৃত হইয়া দিন গণিতেছে, জাতির সর্ব্বস্বই আজ উৎসন্নের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ অবস্থায় সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শরীর পালন ও জীবন-রক্ষাকেই বড় ধর্ম্ম জানিয়া, অমর পণ লইয়া, এই মরণ-সমুদ্র মন্থন করিয়া, মন্দারের অটল হৃদয় টলাইয়া দিয়া, আমাদিগকে অমৃত-লক্ষ্মীকে জয় করিয়া, অসুরের প্রতাপ প্রশমিত করিয়া, তাঁহাকে ঘরে আনিয়া তুলিতে হইবে,—ইহাই আমাদিগের আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম ও শেষ কথা। নিজের ও দেশের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষাই আমাদের এ যুগের কাম্য ও করণীয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে আমরা পারলৌকিক মঙ্গলের কল্পনাকে যতটা স্ফুটতর করিয়া তুলি, তদপেক্ষা বেশী প্রবলতর করিয়া দেখিতে হইবে এখন আমাদের পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের সংজ্ঞা ও চেষ্টাটাকে। কলিযুগে কেবল "হরের্নাম" বলিয়া যেমন পারলৌকিক মুক্তিলাভ করা যাইবে, তেমনি ইহলৌকিক মুক্তির জন্য—

স্বাস্থধর্ম্মঃ স্বাস্থ্যধর্ম্মঃ স্বাস্থ্যধর্ম্মৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এখন সেই ভারতের তরুণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মত দিনরাত হৃদয়ে অগ্নিমন্ত্র জপ করিতে হইবে—"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।" বিশ্ব-কবির সোণার বীণায় সেই প্রাণস্পর্শী ঝঙ্কারের মত পাঁচকোটি ভাইকে বাংলা মায়ের কুটীর প্রাঙ্গণে এক করিয়া ডাকিয়া, গাহিতে হইবে:—

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয় জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে! দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি' দিয়া দূর,
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ; সমস্ত তিমির
ভেদ করি' দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির—
এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে!
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদেরি মত!"

DOUBLE COLOUR PAGE
BLANK PAGE(S)